লাল চীন



লাল চীন
লাল চীন
না

অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী



নবভারতী : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুন—১৯৬০

প্রকাশক ঃ
সুনীল দাশগুপ্ত
নবভারতী
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক ঃ
অশোক ভট্টাচার্য
শোভনা প্রেস
১/১ জাননগর রোড
কলিকাতা-১৭

দাম ঃ ১৪·০০

ধার করে করে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছি। আধুনিক চীনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে চীনের নানা ঐতিহাসিকের লেখা আর বিদেশের যে সব বুদ্ধিজীবীরা চীনের সত্যিকার ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন তাঁদের অনেকের লেখা থেকে অনেক নিয়েছি। মাও ৎসে-তুং-এর নানা লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের অফুরন্ত উপাদান। লিন পিয়াও আর চেন পো-তার লেখা থেকেও প্রচুর সাহায্য নিয়েছি। অনেক কথাই বোধ হয় অনেকের জানা। সুবিধে এইটুকু হয়তো হবে যে অনেক ছড়ানো কথা এক জায়গায় পাওয়া যাবে।

চীনেরা যাকে বলে 'পাই হুয়া' বা সহজ ভাষা সেই জনগণের ভাষায় লিখতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কিন্তু বইয়ের যা দাম হয়েছে তাতে যাঁদের জন্যে লেখা তাঁদের কাছে এ বই পৌঁছনোই কঠিন। চলতি ব্যবস্থায় এ দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব নয়।

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী

চার চারটা সমুদ্র উঠছে ফুলে,
মেঘ আর জল করছে দাপাদাপি ;
পাঁচ পাঁচটা মহাদেশ দুলে দুলে উঠছে
ঝড় আর বাজ উঠছে গর্জে।
সব শত্রুকে খতম করো!
আমাদের শক্তিকে ঠেকাবে কে ?

—মাও ৎসে-তুং
৯ই জানুয়ারী.

সূচী

ছবির পরিচয়ঃ







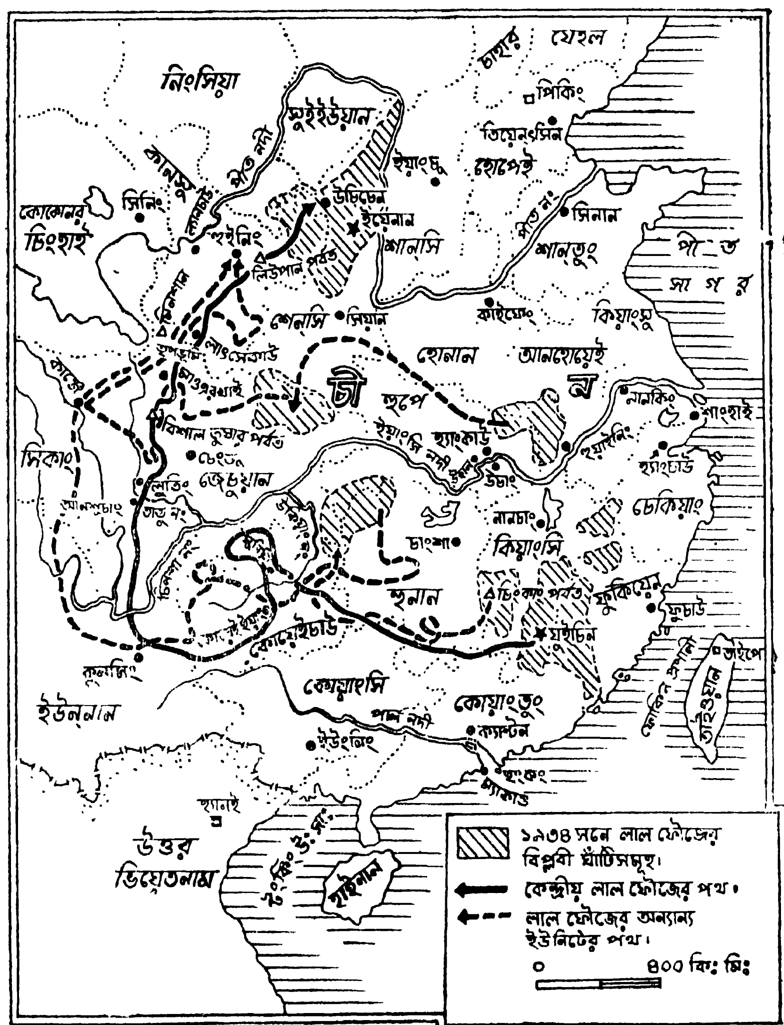












নিংসিয়া
সুইইউয়ান
চাহার
যেহল
পিকিং
তিয়েনৎসিন
হোপেই
ইয়াংচু
কানসু
সিনিং
কোকোনর
চিংহাই
উচিচেন
ইয়েনান
শানসি
সিনান
শানতুং
পীত সাগর
লিউপান পর্বত
শেনসি
সিয়ান
কাইফেং
কিয়াংসু
হোনান
আনহোয়েই
চীন
হুপে
নানকিং
শাংহাই
বিশাল তুষার পর্বত
ইয়াংসি নদী
হ্যাংকাউ
উচাং
হ্যাংচাউ
সিকাং
চেংতু
জেচুয়ান
চেকিয়াং
নানচাং
চাংশা
কিয়াংসি
হুনান
ফুকিয়েন
ফুচাউ
য়ুইচিন
কোয়েইচাউ
কুনমিং
ইউননান
কোয়াংসি
কোয়াংতুং
ক্যান্টন
হংকং
ম্যাকাও
ইউংনিং
হ্যানয়
উত্তর ভিয়েতনাম
হাইনান
তাইওয়ান
তাইপে
১৯৩৪ সনে লাল ফৌজের বিপ্লবী ঘাঁটিসমূহ।
কেন্দ্রীয় লাল ফৌজের পথ।
লাল ফৌজের অন্যান্য ইউনিটের পথ।
০
৪০০ কি: মি:

"চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দেশগুলোর মধ্যে একটি—তার এলাকা গোটা ইউরোপের সমান। আমাদের এই বিশাল দেশে আমাদের খাদ্য ও বস্ত্রের যোগান দেয় এমন বড়ো বড়ো উর্বর অঞ্চল আছে; দেশের দৈর্ঘ এবং প্রস্থ জুড়ে বহুদূর অবধি ছড়ানো বন আর দামী খনি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমালা; আছে অনেক নদী আর হ্রদ যারা জলপথে চলাচল এবং সেচের ব্যবস্থা করে দেয়; আর আছে এমন এক সুদীর্ঘ সমুদ্রতীর যা সাগরপারের দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়। প্রাচীন কাল থেকে এই বিরাট এলাকায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরিশ্রম করেছেন, জীবন কাটিয়েছেন এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে দিয়ে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

—মাও ৎসে-তুং
"চীন বিপ্লব ও চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি"

॥ পবিত্র সাম্রাজ্য ॥

বিরাট দেশ চীন। মার্চ মাসে উত্তর-পূবে যখন বরফের রাজত্ব তখন ইয়াংসির দক্ষিণে ফুল ফোটার মরশুম। পূব থেকে পশ্চিমে ঘড়ির কাঁটা চলে চার ঘণ্টা আগে পিছে।

হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দেশ, প্রাচীন সভ্যতা। রাজনীতিতে, দর্শনে, কাব্যে, চারুশিল্পে, যুদ্ধবিদ্যায় এই দেশ অনেক বড়ো বড়ো গুণী লোকের জন্ম দিয়েছে। বিজ্ঞানেও এই দেশ ছিল অসাধারণ। অতি প্রাচীন যুগে এদেশে কাগজ, রেশমী কাপড়, বারুদ, চীনেমাটির বাসনপত্র, ছাপাখানা, ভূমিকম্পের কাঁপুনি মাপবার যন্ত্র, নাবিকদের কম্পাস বা দিক ঠিক করবার যন্ত্র তৈরি হয়। কৃষি ও কুটীর শিল্পেও তাদের জুড়ি মেলা ভার। ইউরোপ তখন চীন দেশের চেয়ে অনেক অনেক পেছনে পড়ে। টাকাকড়ির লেন-

দেনের ব্যাপারে যা অন্যদেশের লোকেরা ভাবতেও পারত না সেই কাগজের নোটও চীন চালু করেছিল সেই অত দূরের যুগে। এও ভাবতে অবাক লাগে যে চীনের রয়েছে প্রায় চার হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস।

নানান্ জাতির মতো চীনের মানুষও পার হয়ে এসেছে সমাজের কয়েকটি ধাপ। এমন একটা সময় ছিল যখন সেখানে শ্রেণী ছিল না। অনেক হাজার বছর চীনের মানুষ শ্রেণীহীন সমাজে কাটিয়েছে। তারপর এল শ্রেণী-সমাজ—দেখা গেল শোষক ও শোষিত শ্রেণীকে। প্রথম এল দাস-সমাজ—শোষক দাস-প্রভু ও শোষিত দাস। তারপর সামন্ত-সমাজ।

অচল অনড় সামন্ত-সমাজ সাধারণ মানুষের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখল। সামন্ত-শাসকরাই ছিল জমির মালিক। কৃষকদের হাতে জমি ছিল না বললেই চলে। তারা ভূমিদাস হয়েই রইল। তাদের কাছ থেকে জমিদার, রাজ-পরিবার ও আমীর-ওমরাহ গোছের লোকেরা যেমন জবরদস্তি করে খাজনা খাটিয়ে আদায় করত তেমনি সরকার নজরানা আর ট্যাক্স আদায় করে এবং বেগার খাটিয়ে চাষীদের কাছ থেকে মোটা টাকা রোজগার করত। সেই টাকায় সরকার পুষত এক পাল আমলা আর প্রধানত চাষীদের ওপর অত্যাচার করবার জন্যে এক সৈন্যবাহিনী। জমিদারদের অধিকার ছিল কৃষককে মারধোর করার, গালাগাল করার, এমন কি হত্যা করার। কৃষকদের স্বাধীনতা অথবা রাজনৈতিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না।

এই সমাজ-ব্যবস্থার যে কোনও পরিবর্তন বহু যুগ ধরে হল না তার মূল কারণই হল কৃষক সম্প্রদায়ের পিছিয়ে থাকা অবস্থা এবং দারিদ্র্য। আর এর জন্যে দায়ী হল জমিদারী শোষণ এবং অত্যাচার। তাই চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি আর সংস্কৃতি এগিয়ে চলার পথ পেল না। তিন হাজার বছর এমনিভাবেই কাটল। পরিবর্তনের হাওয়া কোথায় বাধা পাচ্ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা ছিল আপনাতে আপনিই সম্পূর্ণ। চাষীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যে শুধু ফসলই ফলাত না, কুটীরশিল্পের মারফত অন্য অনে[illegible]জিনিসের চাহিদাও মেটাত। জমিদার ও বড়োঘরের লোকেরা যে[illegible]তা নিজেদের ভোগেই খরচ করত। বিনিময় বা ব্যবসায়ের [illegible]লেন-দেনের রেওয়াজ গড়ে উঠল না। আর সামন্ত জমিদারদের সরকার এই অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থার পাহারাদার হিসেবে কাজ করে চলল।

এই অচল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষীরা কিন্তু সচল ছিল। জমিদার বনাম কৃষকদের দ্বন্দ্বই ছিল সামন্ত সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব। মাও ৎসে-তুং বলেছেন:
"কৃষকদের প্রতি জমিদারশ্রেণীর নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়ন জমিদার শ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ করতে কৃষকদের বাধ্য করেছিল। ......চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কেবলমাত্র এই ধরনের কৃষকদের শ্রেণীসংগ্রাম, কৃষক বিদ্রোহ এবং কৃষক যুদ্ধই হল ঐতিহাসিক বিকাশের প্রকৃত চালক-শক্তি।"

রাজবংশের পর রাজবংশ আসছে, যাচ্ছে, ইতিহাস পাতা ওল্টাচ্ছে। এমনি করে এল মাঞ্চু রাজবংশ। এর আগে অনেক রাজবংশ রাজত্ব করে গেছে—যেমন, শাং, চৌ, চীন, হান, সুই, তাং, ইউয়ান, মিং রাজবংশ। সর্বশেষ রাজবংশ মাঞ্চু রাজবংশ থেকে আমরা শুরু করি। মিং রাজবংশের সঙ্গে লড়াই করে মাঞ্চু রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে।

মিংদের রাজত্বের সময় মাঞ্চুরা থাকত শান্‌তুং এলাকার চাংপাই পর্বতমালায়। যুদ্ধ আর শিকারে তারা ছিল ওস্তাদ। সব জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে নিয়ে তারা যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে তা চাষ করাত। মাটি দিয়ে অথবা কাঠের খুঁটির ঘন বেড়া দিয়ে দুর্গ তৈরি করে তার ভেতর তারা তাদের ধন-দৌলত রাখত। ক্রমে ভালো করে জোট বাঁধল তারা, আর, একজনকে নেতা বলে মানল কারণ তাতে যুদ্ধে সুবিধে হয়। সে নেতাটি হল নুরহাচু। ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে নুরহাচু মিংদের ফৌজকে হারিয়ে [illegible] এবং তাদের কিছু জমি দখল করল। যুদ্ধে নুরহাচুর মৃত্যু হলে পর তার ছেলে হংতাইচি অনেক মংগল উপজাতিকে যুদ্ধে হারিয়ে নিজেকে ১৬৩৬ সালে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। এই হংতাইচি অন্তর্মংগোলিয়া দখল করে এবং চীনের ওপর অসংখ্যবার আক্রমণ চালিয়ে বিখ্যাত চীনের প্রাচীর পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

এই বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জমিদার বা বড়ঘরের বাবুসাহেবরা কেউ রুখে দাঁড়াল না। রুখে দাঁড়াল চাষীরা। অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা যুগে যুগে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে হাসিমুখে। আজও তারাই এল [illegible]দের নেতা লি ৎসে-চেং পিকিংএ এসে মিং সেনাপতি উ সান-কু[illegible]একজন প্রতিনিধি পাঠালেন। তিনি তখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে এ[illegible] পথ পাহারা দিচ্ছিলেন। লি ৎসে-চেং অনুরোধ জানালেন উ সান-কুয়েই যেন তাঁর ফৌজের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করে মাঞ্চুদের

বিরুদ্ধে লড়ে। উ এতে রাজি হল না। বরং হানাদার মাঞ্চুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে উ চাষীদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সে নিজের শ্রেণীর স্বার্থ ঠিকই বুঝেছিল তাই বিদেশীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। উ সান-কুয়েইর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে লি ৎসে-চেং দুই লাখ সৈন্য নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু উর বন্ধু মাঞ্চুবাহিনী পাশ থেকে আক্রমণ করে, লিকে তাই পিছু হঠতে হয়। সিয়ানে ফিরে এসে লি কিন্তু হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েই যান। ১৬৪৪-এর মে মাসে মাঞ্চুরা পিকিং দখল করে। তখন এক চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। মিং আমলা আর জমিদাররা ছুটে যায় মাঞ্চুদের পা চাটবার জন্যে আর কৃষক-বাহিনীর ওপর হামলা করবার জন্যে এক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। যুদ্ধে লি ৎসে-চেং শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকারীরা মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকেন।

দক্ষিণ দিকে এগোতে এগোতে মাঞ্চুরা ইয়াংসি নদী পার হয়ে চলে আসে। চীনাদের মাথায় যে টিকি অদ্ভুত বলে এককালে সবারই চোখে পড়ত সে টিকি অত্যাচারী মাঞ্চুদেরই কুকীর্তির সাক্ষী। মাঞ্চু সৈন্যবাহিনী যখন কিয়াংসু অঞ্চলে এসে ঢোকে তখন হুকুম জারী করে যে প্রত্যেক পুরুষকে একটা বিশেষ কায়দায় চুল কাটতে হবে যাতে মাথার ওপরেব অংশের লম্বা চুল দিয়ে একটা বিনুনি মতো করা যায়। সে অঞ্চলের জনসাধারণ এতে রাগে ফেটে পড়ে। বিদ্রোহ হয়, প্রচণ্ড লড়াই বাধে। কিয়াংগিন অঞ্চলের (কিয়াংসুর একটা অংশের) বিদ্রোহীরা চার লক্ষ কুড়ি হাজার মাঞ্চু সৈন্যের সঙ্গে ৮১ দিন লড়ে সবাই শেষ অবধি প্রাণ দেয়। ঠিক এমনিভাবে আরেকটা অঞ্চলেব, চিয়াতিং-এর লোকেরা দু'মাস বেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে দলে দলে শহীদ হয় কারণ লড়াইটা আসলে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই। এর পরও নানা অঞ্চলে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু শেষ অবধি হত্যা ও রক্তপাতে ওস্তাদ এই মাঞ্চুদের হাতে সবারই সাময়িকভাবে হার মানতে হয়।

অনেক বছর ধরে লড়াই করার পর এই নতুন রাজবংশ, মানে, মাঞ্চু রাজবংশ, আর্থিক ব্যাপারে ভীষণ অসুবিধের মধ্যে পড়ে। ভালো ফলন হয় এমন কত জমি যুদ্ধের দরুন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে, কত বড়ো বড়ো শহর ধুলোয় মিশে গেছে। লোকসংখ্যাও কমেছে দারুণভাবে। জনসাধারণের ওপর খাজনা ও করের ভার চাপাতে গিয়ে মাঞ্চুরা বাধা পায় এবং বুদ্ধিমানের মত

তাদের কতকগুলো সুবিধে দেয় এবং তার ফল হয় খুব ভালো। আবার চাষীদের পরিশ্রমে প্রচুর ফসল হয় এবং জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। রেশম, সূতী কাপড় ও লোহার বাসনপত্র তৈরির শিল্প-কাজ, তামা ও রূপার খনির উন্নতি রাজ্যের অবস্থা অনেকখানি পাল্টে দেয়। মিং রাজবংশের রাজত্বের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য যা ছিল তার চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু এ উন্নতি কার উন্নতি? রাজার পরিবারের লোকদের আর আমীর-ওমরাহ্ গোছের লোকদের, আর জোতদার-জমিদারদের। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বুকের ওপর সেই পুরোনো বিরাট পাহাড় চেপেই থাকল যাকে বলে সামন্ত প্রথা, সহজ কথায় জমিদারী প্রথা। চাষীদের শুষতে থাকল জমির মালিকেরা। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু দেশের মানুষের কেনবার ক্ষমতা না থাকলে সে উন্নতি তো বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না দেশকে। জমিদারী শোষণে চাষীদের হাত শূন্য, অথচ চাষীরাই দেশের শতকরা ৮০ জন! লোভী মাঞ্চু সরকার শিল্প-বাণিজ্যের ওপর থাবল মারছে— দারুণ কর আদায় করছে। কুটীরশিল্পকেও বাড়তে দিচ্ছে না অর্থাৎ ঘরে বসে যে কারিগরেরা নানা রকমের কাজ করে তাদের সাহায্য তো করছেই না ববং যাতে তাবা বাড়তে না পারে তার কড়াকড়ি ব্যবস্থা করছে। এর ফলে পুঁজিবাদী কাযদায় কলকারখানাব যে উন্নতি হওয়া দরকার তা দেশে হচ্ছে না। বড়ো বড়ো সওদাগরেরা এবং হাতের কাজের কারখানার মালিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য বা কাবখানা বাড়ানোর কাজে টাকা ।খাটিয়ে জমিতে টাকা খাটিয়ে জমিদার হয়, সরকারী চাকরীর জন্যে পরীক্ষা দিয়ে বড়ো বড়ো অফিসার বা আপিসের বড়ো কর্তা হয়। এই হল অবস্থা।

গোটা দেশ জুড়ে মাঞ্চুদের সাম্রাজ্য, মানে, বিরাট রাজ্য। এই সাম্রাজ্যে নানা জাতিব বাস। যেমন, হান, মাঞ্চু, মংগল, হুই, তিব্বতী, উইঘুর, মিয়াও, লি, চুয়াং, কাওশান আব আবও কত জাতি। এরা আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে, পোশাক-আশাক আলাদা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার আলাদা। মাঞ্চুরা এই জাতিগুলোকে তাদের দেশজোড়া শাসনের বেড়াজালে ফেলে তাদের মধ্যে ব্যবসা-বা।.জ্য আর নানা বিদ্যার লেনদেনের সুবিধে করে দেয়। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে মাঞ্চুরা মাঞ্চু ছাড়া অন্যান্য জাতির ওপর চরম নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতে থাকে। মাঞ্চুরা যেসব অধিকার ভোগ করত, অ-মাঞ্চুরা সেসব অধিকার ভোগ করতে পারত না। যেসব

অঞ্চলে মাঞ্চু সৈনিকদের ঘাঁটি বসানো হত, সেখান থেকে চাষীরা উৎখাত হত। তাদের ক্ষেতখামার মাঞ্চু বড়োলোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হত, কিছু জমি সৈনিকরা পেত। মাঞ্চু সরকার আর তার আমলাদের অত্যাচারে সব জাতির সাধারণ মানুষের জীবন করুণ হয়ে উঠত। যেমন, মাঞ্চু শাসকরা উইঘুর জাতির লোকদের কাছ থেকে ফি-বছর জমির খাজনা ছাড়াও জবরদস্তি করে প্রচুর টাকা আদায় করত, উপ্‌রি হিসেবে। আরও আদায় করত তাল,তাল তামা, অনেক কার্পেট আর সোনাদানা। মিয়াও জাতিকে তারা নিষ্ঠুরভাবে বেগার খাটাতো। রাজ্যের বড়ো বড়ো সরকারী চাকরী বড়োলোকেরাই পেত—সেসব চাকরী ছিল বড়োঘরের ছেলেদের একচেটে। মাঞ্চুরা চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবি করলে অন্য জাতিব চোর-ডাকাতের মতো শাস্তি তাদের হত না কারণ তারা যে রাজার জাত! তাদের জন্যে আলাদা আদালত ছিল, সেখানে তাদের নরম শাস্তি হত, আর যা হত তাও আবার কমিয়ে দেওয়া হত, কারণ "ছোটলোকরা" যা সহ্য করতে পারবে, "ভদ্রলোকরা" তা কেমন করে সইবে?

যদি কেউ মাঞ্চুদের সমালোচনা করত তাহলে রক্ষে নেই। চুয়াং তিং-লুং বলে একজন লেখক মিং রাজবংশের একখানি ইতিহাস প্রকাশ করেন। চুয়াং তিং-লুং মরে যাওয়ার পর কে যেন আবিষ্কার করল যে ঐ ইতিহাসের বইটির কতকগুলো জায়গায় মাঞ্চু শাসকদের নিন্দা করা হয়েছে। আর যায় কোথা! চুয়াং তিং-লুং-এর লাশ কবর খুঁড়ে বার করা হল এবং লাশটির মুণ্ডু কেটে শাস্তি দেওয়া হল। এখানেই শেষ নয়। চুয়াং-এর পরিবারের ষোল বছরের বেশি বয়সের সব পুরুষ মানুষদের মুণ্ডু উড়িয়ে দেওয়া হল আর মেয়েদের দেশের সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হল নির্বাসনে। চুয়াং ছিলেন বইটির সম্পাদক। অন্য যাঁরা বইটির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ছিলেন—যেমন ভূমিকা-লেখক, ছাপাখানার কারিগর, এমন কি যে দোকান-দাররা বিক্রি করেছিলেন আর যে গ্রাহকরা বইটি কিনেছিলেন—মাঞ্চু সরকার সবারই গর্দান নিল। শুধু এই একখানি বইএর ব্যাপার নয়। মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও কিছু লেখা হচ্ছে কি না সব এলাকার আমলাদের খোঁজ রাখতে বলা হত। সেরকম বইএর খবর পাওয়া গেলে খারাপ জায়গাগুলো বদলে দেওয়া হত অথবা বইগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হত। এভাবে দশ-বারো বছরে তের হাজারেরও বেশি বই ধ্বংস করা হয়েছিল।

"একতা ভেঙ্গে ঘাড় ভাঙ্গি"—শোষকদের চিরদিনের নীতি এই। দেশের মধ্যেকার নানা জাতির লোক যাতে একজোট হয়ে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারে সেজন্যে মাঞ্চু শাসকেরা হরেক রকমের আইন-কানুন চালু করে। হান আর মংগলদের বিয়ে হতে পারবে না, তিব্বতীরা জুনগারদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না, হানরা উইঘুরদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। এই ধরনের হুকুমনামার দরুন জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারল না, বরং হিংসার ভাবটাই উগ্র হয়ে রইল। মাঞ্চুদের শাসন আর শোষণের সুবিধে হল।

আরেক দিকে শাসনের শেকলে বাঁধা পড়ে চাবুক খেতে খেতে হতভাগাদের চেতনা হল—তারা বুঝল দুষমণের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে লড়তে হবে, আলাদা থাকলে হবে না। আঠারো শতকের শেষের দিকে অনেকগুলো বিদ্রোহ হয়—হুই, মিয়াও, হান—এই জাতিগুলো বিদ্রোহ করে। মাঞ্চুদের প্রবল প্রতাপ, তাই হুই আর মিয়াও বিদ্রোহীরা শেষ অবধি হেরে গেল—হাজার হাজার চাষীর রক্তে মাটি ভিজে উঠল। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মাঞ্চু সরকারের সৈন্যবাহিনীর দরুণ অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। সে ক্ষতি পূরণ করবার জন্যে সরকার কয়েকটা বড়ো বড়ো অঞ্চলের ওপর নিদারুণ করের বোঝা চাপাল। প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করল। বিদ্রোহ ক্রমে আরও কয়েকটা বড়ো বড়ো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। এই বিরাট কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে মাঞ্চু সরকারের ন' বছর লেগেছিল। এত অত্যাচার অনাচার আর অজস্র রক্তপাত দিয়ে গার ভিৎ তৈরি হয়েছিল সেই মাঞ্চু সাম্রাজ্যকে মাঞ্চুরা নাম দিয়েছিল "বিশাল পবিত্র সাম্রাজ্য"। "পবিত্র"ই বটে!

॥ বিদেশী শকুন ॥

স্বদেশী শকুনদের কথা কিছু বলা হয়েছে, এবারে বিদেশী শকুনদের কথা বলি।

ষোল শতকের গোড়ার দিকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা চীনের দক্ষিণ-পূব অঞ্চলে সমুদ্রে এবং সমুদ্রের ধারে হামলা শুরু করে। বেআইনী জিনিস নিয়ে তাদের কাজ-কারবার, সুযোগ পেলেই মাল বোঝাই জাহাজ লুঠ করে, লোক-ধরার

ব্যবসাও করে—লোক ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। সেই ষোল শতকের মাঝামাঝি এই দস্যুর দল ম্যাকাওতে আসে। প্রথমে বলে—আমরা শুধু নোঙ্গর গাড়ছি, থাকব না বেশি দিন। কিন্তু ক্রমে পাঁচিল দিয়ে শহরটাকে ঘিরে ফেলে। দুর্গও তৈবি করে আমলাদের এনে বসায়। পর্তুগীজদের পেছনে পেছনে আসে স্পেনের আর হল্যাণ্ডের দস্যুরা। সমুদ্রের ধারে ধারে তারা ছোবল মারতে থাকে—লুঠতরাজ নরহত্যা চলতে থাকে। সতের শতকের মাঝামাঝি কিছুদিনের জন্যে ওলন্দাজরা (মানে, হল্যাণ্ডের লোকেরা) ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপের একটা অংশ দখল করে। তাইওয়ান চীনেব দক্ষিণ-পূর্বে একটি ছোট্ট দ্বীপ।

বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে মিশনারি সাহেববা অর্থাৎ পাদ্রী সাহেবরা আসতে লাগলেন যিশুব ভক্ত হিসেবে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করতে। এঁরা সব দেশেরই খানিকটা উপকার করেন কাবণ শিক্ষা প্রচার এঁদেব একটা কাজ। চীনে এঁরা ইউরোপের বিজ্ঞান-শিক্ষা ছড়াতে সাহায্য করেন। কিন্তু ধর্ম প্রচার বা শিক্ষা প্রচার মিশনারিদেব আসল কাজ নয়। আসল কাজ নিজের দেশের মাহাত্ম্য প্রচাব, সে দেশের সভ্যতা যে অনেক বড়ো এই কথা ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করা, যাতে সেই দেশেব শাসনকে লোকে ভক্তি-ভরে মেনে নেয়, ভগবানেব দান হিসেবে গ্রহণ কবে। মিশনারিদের আবেকটি কাজ হচ্ছে নিজের দেশের হয়ে গোয়েন্দাগিবি কবা। একদিকে ধবধবে পোশাক পরে পবিত্র চেহারা কবে ধর্মের ঝাণ্ডা উড়িয়ে এঁবা ধর্মের আর প্রেমের বুলি আওড়ান, আরেক দিকে অত্যন্ত নোংরা মন নিয়ে দেশটিকে শোষকদের হাতে তুলে দেবার গোপন ষড়যন্ত্র করে যান। চীনে এরকম ভণ্ড তপস্বী অনেক আসতে থাকে।

বিদেশীরা কিন্তু কখনও কখনও ইতিহাসেব হাতিয়ার হিসেবে আসে। সে হাতিয়ার পুরোনো পাঁচিল ভেঙ্গে অন্ধকার দেশে আলো ঢোকবাব পথ করে দেয়। আমাদের দেশে ইংরেজ ইতিহাসের হাতিয়াব হিসেবে এসেছিল। চীনেও তাই। দু'জায়গাতেই ইংরেজ সামন্ত যুগেব পাঁচিল খানিকটা ভেঙ্গে যন্ত্রযুগের আলো এনে দিয়েছিল, অবশ্য এ দু'টি দেশের লোকেদের মঙ্গল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে আসেনি, মুনাফার লোভে এসেছিল। কিন্তু দেশ দুটির চোখের জল আর রক্ত যতই ঝরুক না কেন, ঘুম ভেঙ্গে ছিল, বহুযুগের সামন্তবাদের হাত থেকে মুক্তির স্বাদ তারা খানিকটা জানল। এটাই বড়ো লাভ।

চীনের সামন্ত যুগে অর্থাৎ রাজা-জমিদারদের রাজত্বের যুগে চাষীরা যে বীরের মতো বিদ্রোহ করেছে তার কিছু কিছু উল্লেখ আমরা করেছি। "চীনের বিপ্লব এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" বইখানিতে মাও ৎসে-তুং দেখিয়েছেন দু'হাজার বছরে ছোটো বড়ো শত শত বিদ্রোহ চীনে হয়েছে। তিনি বলেছেন যে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ইতিহাসে এতো বিরাট বিরাট কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষক-যুদ্ধের নজীর পাওয়া যায় না। এই সংগ্রামগুলো সফল হল না বলে দুঃখ হতে পারে কিন্তু সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। মার্কসবাদীরা জানেন যে সামন্ত সমাজের মধ্যে নতুন উৎপাদন-শক্তি আর নতুন-উৎপাদন-সম্পর্ক না জন্মালে জনসাধারণের রাষ্ট্র স্থায়ীভাবে গড়ে উঠতে পারে না। নতুন উৎপাদন-শক্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কল-কারখানায় শ্রমিকের মাল পয়দা করবার শক্তি। নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক হচ্ছে কল-কারখানার মালিক আর মজুরদের মধ্যেকার সম্পর্ক। সামন্ত সমাজে ছিল ভূমিদাস আর জমিদারের সম্পর্ক আর পুঁজিবাদী সমাজে হবে মজুর আর মালিকের সম্পর্ক।

যে সময়কার কৃষক-বিদ্রোহের কথা হচ্ছে তখন চীনে পুঁজিপতিশ্রেণী গড়ে ওঠেনি। সুতরাং মজুরশ্রেণীও দেখা দেয়নি—যারা মেহনতী মানুষদের শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেতৃত্ব দিতে পারে। মজুরশ্রেণীই হচ্ছে নির্ভেজাল বিপ্লবী শ্রেণী, বিপ্লবের কারিগর। কৃষক ও অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণীরা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই রাশিয়ার এবং চীনের বি-প্লব ঘটিয়েছিল। চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে দেখি কতবার রাজ-বংশের পতন ঘটেছে, কতবার কৃষকের অসহ্য দুঃখে বিদ্রোহ করেছে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে উন্নতিও হয়েছে কিন্তু সমাজ সামন্ত সমাজই থেকে গেছে—সেই রাজা, সেই জমিদার, চাষীদের সেই নিষ্ঠুর শোষণ! কারণ মার্কসবাদ ও শ্রমিক নেতৃত্বের জন্ম তখনও হয়নি।

চীনের ভেতরে পুঁজিবাদ বেড়ে উঠে সেখানকার সামন্ত সমাজের পাঁচিল ধ্বসিয়ে দেয়নি। বাইরের পুঁজিবাদ মুনাফার খোঁজে এসে তার ওপর আছড়ে পড়ে, পাঁচিল খানিকটা ভেঙ্গে .থ হয়ে যায়। ঘটনাটা ঘটে আঠারো শতকের অর্ধেক পার হয়ে যাবার পরে। ভারতে তখন ইংরেজের ঘাঁটি গাড়া হয়ে গেছে। পৃথিবীর বাণিয়া দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যাণ্ড তখন সবার চেয়ে শক্তিশালী, অস্ত্রের জোরে সে তখন তার সাম্রাজ্যকে বাড়িয়ে যাবার কাজে

ব্যস্ত। আমাদের অতি পরিচিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সাম্রাজ্য-বিস্তারের হাতিয়ার। তার পেছনে পেছনে অবশ্য অন্য শকুনরাও ছিল—স্বাধীন ব্যবসাদার, জাহাজের মালিক, শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, অন্য বাণিয়া দেশেরও। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট এক দেশ। দিগন্তছোঁয়া ফসলের জমিতে, পাহাড়ে, বনে-মাটির গভীরে, বিশাল নদী আর সমুদ্রে তার সম্পদের অন্ত নেই। জনবলও বিপুল। এই সম্পদের লোভে ইংরেজ আর অন্যান্য ব্যবসায়ীরা হন্যে হয়ে চীনের দিকে ছোটে। ইংল্যাণ্ডের রাজার দূত ১৭৯৩তে পিকিংএ আসে মাঞ্চু সরকারের কাছে ব্যবসা করার সুযোগ-সুবিধের জন্যে অনুরোধ করতে। এমন সব বিশেষ সুবিধের আবদার সে করে যে মাঞ্চু সরকার ইংল্যাণ্ডের দাবীগুলো অগ্রাহ্য করে। কোথাও কোথাও কর কমিয়ে দিতে হবে, কোথাও বা একেবারেই কর থেকে রেহাই দিতে হবে, ইংরেজ ব্যবসায়ীদের থাকবার জন্যে একটা ছোটো দ্বীপ ছেড়ে দিতে হবে—এই ধরনের সব জামাইয়ের আবদার! মাঞ্চু সরকার মানবে কেন? সম্রাট চিয়েন লুং ১৭৯৬তে ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জকে জানিয়েছিলেন: "আমাদের সবরকম জিনিসই আছে। আমি আদেখ্‌লে নই যে ইতিপূর্বে দেখিনি এমন জিনিস বা কারিগরের কেরামতি আছে এমন জিনিসকে তোয়াক্কা করব, আপনার দেশের কলকারখানায় তৈরি মাল আমার কোনও কাজে লাগবে না।"[১] রাজা-জমিদারদের দিন ভালোই কাটছে, তাই পরিবর্তনকে তারা ভয় করে। বাইরের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে যদি জনসাধারণের মনে নতুন ধ্যানধারণা এসে ঢোকে—তাতে যদি রাজা রাজড়াদের আরামের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। তাই পরিবর্তনকে ভয়। এই সামন্তরা চোখ খুলে জগৎকে দেখতে পারল না। দেখল না যে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব বা কলকারখানার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে—বিজ্ঞানের নানা রকমের উন্নতির ফলে। বুঝল না যে এতে ইউরোপের সৈন্যসামন্ত নিয়ে লড়াই করবার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। ধন-দৌলতও অনেক বেড়েছে। ভাবল না যে এই অবস্থায় চীনকেও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হবে, তা না হলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চীন করতে পারবে না। মাঞ্চু সরকারের এই চোখ-বুজে-থাকার নীতি বা দোর-বন্ধ-রাখার নীতির দরুণ চীনের নতুন-জন্মানো পুঁজিবাদ অর্থাৎ মুনাফার জন্যে ধনীদের আধুনিক কলকারখানা গড়ে তোলার চেষ্টা বাধা পেল। তবে একদিক থেকে মন্দের

ভালোও হল। বিদেশী সাম্রাজ্যলোভীরা চীনের ধনদৌলত লুঠ করবার অবাধ সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং দেশের সর্বত্র দলে দলে গুপ্তচর ছেড়ে দেবার মতলব আঁটছিল। মাঞ্চু সরকারের দোর-বন্ধ-রাখার নীতি দেশকে সে বিপদ থেকে আপাতত রক্ষা করল। আফিং-এর ডেলা কামানের গোলা হয়ে বন্ধ দোরের ওপর এসে পড়ল। দোর খুলল এবং সে দোর দিয়ে শুধু ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরাই ঢুকল না, অন্য দেশের শকুনরাও ঢুকল। চীনের ইতিহাসে নতুন যুগ শুরু হল।

॥ সভ্যের বর্বর লোভ ॥

দোর বন্ধ, কড়া পাহারা। বাইরের ব্যবসায়ীদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। এরকম অবস্থায় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা চীনের সঙ্গে খুব সামান্যই বেচাকেনা করতে পারছে। তাদের একটা বড়ো অসুবিধে এই যে যেসব জিনিস তারা কেনে তার বেশির ভাগের বেলাতেই তাদের দাম দিতে হয় খাঁটি রূপো দিয়ে। সে শাদা ঝক্‌ঝকে রূপোর ইতিহাস কিন্তু মোটেই শাদা ঝকঝকে নয়—অনেক দুঃখী মানুষের রক্তে লাল সে ইতিহাস। প্রথমে এ রূপো খনি থেকে তোলা হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো আর পেরুতে। আমেরিকার আদিবাসী খনি মজুররা নিষ্ঠুর সর্দারের হাতে রক্ত-ঝ- -নো চাবুকের ঘা খেতে খেতে অন্ধকার খনির ভেতর থেকে অসহ্য পরিশ্রম করে এই রূপোকে এনেছিল বাইরের আলোতে। সে রূপোর অনেকখানি চলে গেল ইংরেজ দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে, যারা মানুষ বেচাকেনা করে, যারা আফ্রিকার সমুদ্রের ধারে ধারে ফাঁদ পেতে কালো মানুষ ধরে বেড়ায়। দক্ষিণ আমেরিকায় ধনী স্পেনীয়দের কাছে এই কালো মানুষগুলোকে বেচে শাদা রূপো নিয়ে তারা ভারতীয়দের দিল মিহি কাপড় আর সুগন্ধী মশলার দাম হিসেবে। তারপর ভারত জয় করে ইংরেজরা এই রূপো ভারতীয়দের নিংড়ে ফের আদায় করে নিল। আজ সেই রূ । চীনে এসে ব্যবসাতে খাটছে, সেই রক্তমাখা রূপো দিয়ে ইংরেজরা চীনে জিনিসপত্র কিনছে। শোষণের ইতিহাস তাহলে দেখিয়ে দিচ্ছে যে একটা শোষিত জাতির কাছ থেকে শোষকরা যা পায় তার সাহায্যে অন্য জাতিকে শোষণ করতে তাদের সুবিধে হয়।

ইতিপূর্বে চীনকে যারা আক্রমণ করেছে তারা এসেছে ডাঙ্গার পথে, উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এবারে যারা এল তারা এল খিড়কির দরজা দিয়ে অর্থাৎ দক্ষিণের সমুদ্রপথে। এতকাল উত্তরের সদর দরজায় কড়া পাহারা বসিয়ে যুগের পর যুগ চীনেদের কেটেছে। এবারকার শত্রু হচ্ছে ইংরেজ—উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত আর সবচেয়ে শক্তিশালী জাত। সে এল আচমকা পেছনের দরজা দিয়ে।

ঢোকার কায়দাটা হল এই। লেনদেন করেই যেতে হবে, লাভ করতেই তো আসা। কিন্তু এত রূপো কোথায় পাওয়া যাবে? ইংরেজের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তালে তালে থাকল রূপো ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে চীনের সওদার দাম দেওয়া যায় কি না। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল—আফিং দিয়ে তো দেওয়া যায়! ভারতে তখন প্রচুর আফিং-এর চাষ হচ্ছে। উত্তর ও মধ্য ভারতে অতি প্রয়োজনীয় ফসলের চাষ তুলে দিয়ে সভ্য ইংরেজ আফিং-এর চাষ চালাচ্ছে। ১৭৮১তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ভারতে তৈরি আফিং জাহাজে করে চীনে পাঠাল। ইতিপূর্বে সে দেশে আফিং খুব সামান্য চলত। কোম্পানীর চেষ্টায় হু হু করে আফিং-এর ব্যবহার বেড়ে গেল। আগে চীনের চা, রেশম এবং অন্যান্য জিনিসের বদলে রূপো দিয়ে কুল পাচ্ছিল না কোম্পানী, এখন রূপোর বদলে আফিং দিয়ে সে দাম তো চুকিয়ে দিচ্ছিলই, বরং এতো আফিং দিচ্ছিল যে চীনের পাওনাদার হিসেবে কোম্পানী প্রচুর রূপো উল্টো পেতে লাগল। ন'বছর যেতে না যেতেই মাঞ্চু সম্রাট চিয়া চিং ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। দেশের স্বাস্থ্য আর অর্থ দুদিক থেকেই আফিং দারুণ ক্ষতি করছে। ১৮০০তে তিনি চীনে আফিং আসা বন্ধ বলে হুকুম জারী করলেন। কিন্তু এ ক'বছরে অনেক লোককে নেশায় পেয়ে বসেছে, অভ্যেস ছাড়া মুস্কিল। এ নেশা সৈনিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে অনেককে কাবু করেছে। চীনে ব্যবসাদার আর আমলারা বেশ দুপয়সা কামাচ্ছে—ব্যবসাতে ইংরেজের শরিক হিসেবে। সুতরাং সম্রাটের হুকুম-নামা মাথায় তোলা রইল, ঘুষ আর চোরাকারবারের দৌলতে আফিং-এর ব্যবসা অবাধে চলতে লাগল। শুধু কি চলতে লাগল, দিনের পর দিন বাড়তে লাগল। আমেরিকানরা এসে এ ব্যবসাতে সামিল হল অল্প দিনের মধ্যেই। তুরস্কের স্মার্না থেকে জাহাজে করে তুর্কী আফিং-এর যোগান দিতে লাগল। এখানে চীনেদের বিষ গিলিয়ে এত লাভ হতে [illegible] টাকায় আমেরিকানরা



পরে নিজের দেশে বড়ো বড়ো কলকারখানা গড়ে তুলেছিল। কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ!

আফিং-এর দাম মেটাতে গিয়ে এত রূপো দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল যে দেশের মধ্যে রূপোর দাম খুব বেড়ে গেল। চাপটা গিয়ে পড়ল হতভাগা চাষীদের ওপর। কারণ শস্যের দাম নেবে গেল আর এদিকে জমিদার আর আমলারা তাদের পাওনা হিসেবে আগের চাইতে বেশি করে শস্যের ভাগ নিতে লাগল যাতে রূপোর দরের সঙ্গে তাল রেখে তাদের মোটা আয় আগের মতোই মোটা থাকে। চাষীদের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যাওয়ায় আরেক দফা কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিল। এই সময় একবার একদল বিদ্রোহী চাষী তো সরাসরি পিকিংএ সম্রাটের প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল।

পিকিং-এর কর্তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারলেন না। আফিং আমদানির বিরুদ্ধে আগের চাইতে কড়া হুকুম-নামা জারী করলেন এবং দক্ষিণ চীনে বিখ্যাত ক্যান্টন বন্দরে একজন স্বদেশপ্রেমিক অফিসারকে কমিশনার নিযুক্ত করে পাঠালেন। এই ক্যান্টনের একটা অংশ ইংরেজ ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—সেখানে ছিল তাদের গুদোম, বাড়িঘর ইত্যাদি।

স্বদেশপ্রেমিক কমিশনার লিন ৎসে-সু ১৮৩৯-এর বসন্ত কালে ক্যান্টনে এলেন। তিনি বিদেশী ব্যবসায়ীদের বললেন তাদের কাছে যে আফিং মজুত আছে তা তাঁকে দিয়ে দিতে। আরও বললেন যে একটি দলিলে সই করে বলতে হবে আর যদি আফিং-এর ব্যবসা তারা করে তবে তাদের জাহাজ এবং মালপত্র বাজেয়াপ্ত হবে এবং তাদের গর্দান যাবে।

ইংরেজ সুপারিনটেনডেন্ট ক্যাপটেন এলিয়ট লিন-এর হুকুম অমান্য করলেন। জনসাধারণ এবং সৈনিকদের সাহায্য নিয়ে লিন তখন সাহেবদের কুঠি, গুদোম ইত্যাদির এলাকা ঘেরাও করলেন, তাদের তরিতরকারী এবং খাবার জলের সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। চীনে কর্মচারীদের বললেন সাহেবদের কাজ ছেড়ে দিতে। আর বাড়িঘর নৌকো ইত্যাদি যেন ওদের কেউ ভাড়া না দেয় বলে হুকুম জারী করলেন। তিন দিন ঘেরাও হয়ে থাকার পর ২০,০০০ পেটিরও বেশি আফিং সাহেবরা দিয়ে দিল। এর ভেতর আমেরিকান ব্যবসাদারদেরও এক হাজার পেটির বেশি আফিং ছিল। ১৮৩৯-এর ৩রা জুন চীনের ইতিহাসে একটি লাল তারিখ। কারণ সেদিন

চীনের জনগণ সরাসরি বিদেশী শকুনদের শাস্তি দিয়েছিল। সেদিন ঐ আফিং-এর পেটিগুলোকে স্তূপ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সে আগুন নিভতে কুড়ি দিন সময় লেগেছিল।

কিন্তু এ আগুনে আরেক আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল—ইতিহাসে তার নাম "প্রথম আফিং যুদ্ধ"। সে বছর ছোটো-খাটো লড়াই হল কিন্তু ১৮৪০ এর জুলাই মাসে ইংরেজ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করে নৌবহর পাঠাল ক্যান্টন আক্রমণ করবার জন্যে। এই আফিং যুদ্ধে সভ্য ইংরেজের বর্বর লোভ বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠল। আরেক দিকে চীন সম্রাটের সাম্রাজ্যের বাইরের জৌলুস আর ঠাট-ঠমকের পেছনে যে অনেক দুর্বলতা ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। জনতার প্রতিরোধের জন্যে ক্যান্টন বন্দরে প্রবেশ করতে না পেরে ইংরেজরা সমুদ্রতীর ধরে শাংহাই, অ্যাময় ইত্যাদি বন্দর একের পর এক দখল করে চলল, অবাধ লুঠ চালাল, হত্যার উৎসবে নিরস্ত্র নরনারী-শিশুকেও বাদ দিল না, তাদের অগুনতি লাশে দেশের মাটি ভারি হয়ে উঠল। জনসাধারণ বীরের মতো লড়ল এবং মরল। দেশ পিছিয়ে আছে, এই পিছিয়ে থাকার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল অসংখ্য প্রাণ ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে। প্রচণ্ড ভয়ে মহাবীর মাঞ্চুসম্রাট নন্দ ঘোষকে সব দোষে দোষী করলেন—দেশপ্রেমিক লিন ৎসে-সুকে বরখাস্ত করে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। পরে অবশ্য তাঁর নীতি বদলেছিল। যাই হোক, এই প্রথম আফিং যুদ্ধের ফলে চীনের সামন্ত-প্রভুরা চীনকে বিদেশীর হাতে তুলে দিলেন। যুদ্ধের শেষে "নানকিং চুক্তি" নামে দুপক্ষের মধ্যে যে চুক্তি হল তা চীনের পক্ষে মারাত্মক। এই একতরফা চুক্তির প্রধান প্রধান শর্ত হল : (ক) বিদেশী ব্যবসাদারদের এই বন্দরগুলো অবাধে ব্যবহার করতে দিতে হবে—ক্যান্টন, ফুচাউ, অ্যাময়, নিংপো এবং শাংহাই। (খ) দুকোটি দশ লক্ষ রূপোর ডলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে চীন দেবে। (গ) হংকং পুরো ছেড়ে দিতে হবে। (ঘ) ইংল্যাণ্ড থেকে আসা জিনিসপত্রের ওপর শুল্ক বা কর বসাবার ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে বসাতে হবে। পরের বছর মাঞ্চু সরকারের ওপর আরও চাপ দিয়ে আরও সুবিধে আদায় করা হল : (ক) ইংল্যাণ্ড থেকে আসা জিনিসপত্রের ওপর পাঁচ শতাংশের বেশি আমদানি শুল্ক বসানো চলবে না। (খ) যে পাঁচটি বন্দরের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর কোনও কোনও অঞ্চলে ইংরেজদের বসবাস

করবার অনুমতি দিতে হবে। (গ) চীনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনও ইংরেজ যদি ঝগড়াবিবাদে জড়িয়ে পড়ে তাকে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য-প্রতিনিধির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। পরে এই সুবিধেটা এতদূর গড়িয়েছিল যে ইংরেজদের জন্যে আলাদা বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই সব শর্ত মেনে নিয়ে চীন ইংরেজের আধা-উপনিবেশ হয়ে উঠল—তার স্বাধীনতা কোথায় চলে গেল। সুযোগ বুঝে আমেরিকাও আরেকটি চুক্তি করে ইংরেজের মতো সুবিধে আদায় করল। মরা গোরুকে সব শকুনই ঠোকরায়। সুতরাং ফরাসী সরকারও একটি চুক্তি করে ইংরেজ ও আমেরিকানরা যেসব সুবিধে আদায় করেছিল তার সবগুলোই আদায় করল। একটি অতিরিক্ত সুবিধেও ফ্রান্স আদায় করল—চীনে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করবার অবাধ অধিকার। এর ফলে বিদেশী জিনিসপত্র আর আফিং-এর সঙ্গে মিশনারিরাও চীনে ঢুকবার অধিকার পেল। মিশনারিরাও এক রকমের আফিং। জনসাধারণের জঙ্গী মনকে চরিত্র ভালো করার ফাঁকা বুলি আর স্বর্গ-নরকের আজগুবি গল্প বলে নিস্তেজ করাই তাদের কাজ। কিন্তু জঙ্গী মানুষ অত সহজে নিস্তেজ হয় না। ১৮৪২-এর নানকিং চুক্তি দেশের কর্তারা সই করলেন বটে কিন্তু জনতা তাতে সায় দিল না। পাঁচিল-ঘেরা ক্যান্টন শহরে তারা ইংরেজকে ঢুকতে দেবে না বলে লড়াই শুরু করল—সে লড়াই অনেক বছর ধরে চলেছিল এবং প্রমাণ করেছিল যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাঞ্চু শাসকরা আত্মসমর্পণ করেছিল, চীনের জনসাধারণ করেনি। যে লড়াই হয়েছিল তাতে প্রধানত চাষী আর হাতের কাজের কারিগররা যোগ দিয়েছিল। অবশ্য কিছু ব্যবসাদার এবং বড়োঘরের লোকেরাও এতে সামিল হয়েছিল, এমন কি অনেক নারীও এ লড়াইতে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিদেশীর বিরুদ্ধে তখনকার মতো ঐক্য দেখা দিয়েছিল।

প্রথম আফিং যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। ১৯১৭ অবধি চীনে "আইনত" আফিং আমদানি চালু ছিল। ১৯২৮ অবধি সমস্ত বিদেশী আমদানি মালের ওপর পাঁচ শতাংশের বেশি শুল্ক বা কর বসানো যেত না। ১৯৪২ অবধি বিদেশীরা চীনে বাস করেও চীনের আইনের আওতায় "আইনত" পড়ত না। ১৯৪৯এ চীনের মুক্তির পরই কেবল চীনের আইন বিদেশীদের ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

চীনের জমিতে বাস করে সম্পূর্ণ স্বাধীন এলাকা বলে বিদেশীরা কিছু জমি

একেবারে নিজেদের জমি হিসেবে আলাদা করে নিয়েছিল। এই এলাকাগুলো 'কনসেশন' বলে পরিচিত। এই কনসেশনগুলো ছিল ভবিষ্যতে আরও জমি গ্রাস করবার ঘাঁটি। তা ছাড়া দেশের ভেতর ঢোকবার পর বিদেশী আমদানি মালের ওপর দ্বিতীয়বার কোনও শুল্ক বসানো হত না। এর ফলে যে চীনে ব্যবসাদারেরা ইউরোপ ও আমেরিকার সওদাগরী কোম্পানিগুলোর এজেন্টের কাজ করত তারা বেশ খানিকটা সুবিধে পেল। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত তারাই বিদেশী জিনিসপত্র বেচাকেনার ব্যবস্থা করে এবং তা থেকে মোটা মুনাফা তোলে। বিদেশীদের অনুগ্রহেই তো তাদের এই লাভের সুযোগটা হল, তাই তারা বিদেশীদের তাঁবেদার হয়ে রইল। ইংরেজীতে এদের বলে "কম্প্রাডর বুর্জোয়া", বাংলায় মুৎসুদ্দি বা দালাল ধনিকশ্রেণী, কারণ এরা স্বাধীন বুর্জোয়া বা ধনিক নয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দিগিরির বা দালালির ওপর এদের ধনদৌলত নির্ভর করে। চীনের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এদের কুৎসিত দালালির ব্যাপার ক্রমে প্রকাশ পাবে। এই সব কারণেই চীনের ইতিহাসে প্রথম আফিং যুদ্ধ খুঁটিয়ে দেখবার মতো আর গভীরভাবে ভাববার মতো একটি ঘটনা।

॥ পৃথিবীতেই স্বর্গ খোজো ॥

আফিং যুদ্ধের পরে বিদেশী পুঁজি চীনের বুকের ওপর বেশ জেঁকে বসল। মাঞ্চু সরকার কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনও কিছু করল না, তাকে কাবু করার দিকে আদপেই গেল না। বরং দুধকলা দিয়ে সাপকে পুষতেই সে ব্যস্ত। বিদেশীরা যে ক্ষতিপূরণ চেয়েছে তার টাকা তুলতে হবে। সুতরাং তিন বছরের মধ্যে বার কয়েক বাড়তি কর আদায় করতে হল। এতে গরীব চাষীরা আরও গরীব হল। সরকারী ট্যাক্স আদায়ের কি নিষ্ঠুর ধরনধারন! সৈনিক আর সরকারী আমলারা গিয়ে চাষীদের ঘরে ঘরে হামলা করত। দিন নেই, রাত নেই, যখন তখন গিয়ে হাজির হত। চাষী ট্যাক্স দিতে অপারগ, মাপ নেই—তাকে চাবুক মারতে মারতে ঘরময় দৌড় করান হত, শুধু রক্ত নয় তার মাংসও ঘরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ত। মাঞ্চু সম্রাটের কাছে ১৮৫২র একটি করুণ আবেদনে এই ছবি আঁকা হয়েছে।

জমিদারের কাছ থেকে কর্জ নিতে চাষীরা বাধ্য হয়। শস্য কর্জ নিলে শোধ দেবার সময় যা নেয় তার দুগুণ শস্য দিতে হয়। কঠিন জীবন। অনেক চাষী পরিবারকে বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের কাছে তাদের জমি-জায়গা বিক্রি করে দিতে হল। অনেকে ক্ষেত-খামার ছেড়ে মজুর, ভবঘুরে বা ভিখিরি হল। কেউ কেউ আবার মাঞ্চু রাজত্ব আর জমিদারীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে গোপন সমিতিতে যোগ দিল।

আফিং যুদ্ধের পর আফিং আমদানি অনেক বেড়ে গেল। ১৮৫০এ এল ৫২,০০০ পেটি আফিং, ১৮৫৩তে পেটির সংখ্যা দাঁড়াল ৮০,০০০।[1] শুধু কি এই! ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার সূতীর কাপড়ের আমদানি জোয়ারের বেগে বেড়ে চলল। চীন ছিল কাপড় রপ্তানিকারী দেশ, এখন আধা-উপনিবেশ হয়ে হল কাপড় আমদানিকারী দেশ। এতদিন বিদেশী ব্যবসাদারদের পুঁজি চীনে মুনাফা কামাবার কাজে খাটত, এখন থেকে ক্রমশঃ বেশি বেশি করে বিদেশের কলকারখানার মালিকদের পুঁজি এখানে খাটতে লাগল। মার্কসবাদীরা প্রথম ধরনের পুঁজিকে বলে বাণিজ্য-পুঁজি। ইতিহাসের ধারায় শিল্পবিপ্লবের পরে দ্বিতীয় ধরনের পুঁজি দেখা দেয়, তাকে বলে শিল্প-পুঁজি। চীনে শিল্প-পুঁজির আক্রমণ বেড়ে চলল। আমদানির দাম দিতে গিয়ে বাইরে রূপো চালান দিতে হয়, চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে গিয়েও বাইরে রূপো চালান দিতে হয়—তাই বিদেশের দিকে রূপোর স্রোত চলল আর দেশের মধ্যে গরীব প্রজার চোখের জল আর রক্তের স্রোত বইল।

দুঃখের কথা আরও কত আছে! বিদেশ থেকে সস্তা সূতী কাপড় আমদানির দরুণ চীনের লক্ষ লক্ষ তাঁতি আর অন্য কারিগর একেবারে পথে বসল। যারা আগে দিশী কাপড়ে টাকা খাটাত সেই ব্যবসায়ী আর সুদখোর মহাজনরা এখন দেখল যে বিদেশী মাল কেনাবেচাতেই বেশি মুনাফা, দেশের তাঁতি-জোলা চুলোয় যাক। আগে মাত্র একটা বন্দরে, ক্যান্টনে, চীনের চালানী জাহাজে মাল বোঝাই হত, এখন বিদেশীদের আক্রমণ আর কারসাজির ফলে নতুন আরও বন্দর খুলেছে, মাল বোঝাইয়ের কাজ সেখানেও হয়। দূর দূর থেকে ক্যান্টনে মাল বয়ে আনার যে ব্যবস্থা ছিল, যার ওপর হাজার হাজার মেহনতী মানুষের রুজিরোজগার নির্ভর করত, তা নতুন অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অর্থাৎ দক্ষিণ চীনের অগুনতি নৌকোর মাঝি আর মাল-বওয়া মজুর বেকার হয়ে গেল।

চীনের ইতিহাসে ১৮৪১ থেকে ১৮৪৯-এর মধ্যে যে কৃষকবিদ্রোহ হয় তার সংখ্যা একশ'র কম নয়। তার ভেতর এক ১৮৪৭-এই ছাব্বিশটা বিদ্রোহ—এক বছরে এতগুলো! এগুলোর মধ্যে দুটো খুব প্রচণ্ড রকমের বিদ্রোহ হয়েছিল—একটার নাম 'নিয়েন' বিদ্রোহ বা মশাল বিদ্রোহ, আরেকটার নাম 'তিয়েন তি হুই' আন্দোলন বা স্বর্গ-মর্ত সমিতির আন্দোলন। নিয়েন বিদ্রোহ পূর্ব-চীনে শুরু হয় এবং বেড়ে ওঠে—আনহোয়েই, কিয়াংসু আর হোনানের সীমান্ত অঞ্চলে। তিয়েন তি হুই আন্দোলনের জন্ম দক্ষিণ চীনের হুনানে ১৮৪৯-এর দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে। এখানেই পরে মাও ৎসে-তুং কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলনের ঘাঁটি গড়ে তোলেন। সেখান থেকে আরও দক্ষিণে কোয়াংসিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। যখন এই ভাবে নানা অঞ্চলে কৃষকরা অস্ত্র হাতে মারমুখো হয়ে আক্রমণ কবছে মাঞ্চু সরকারকে, তখন দক্ষিণ চীনের কোয়াংসিতে বিখ্যাত 'তাইপিং' বিদ্রোহ দেখা দেয়। মনে রাখা ভালো যে এই কোয়াংসি প্রদেশ ভিয়েৎনামের সীমান্তে। এ বিদ্রোহে চীনের নানা জাতি যোগ দিয়েছিল কারণ সবাই মাঞ্চুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মাঞ্চু সরকার বিদেশীদের সঙ্গে নানকিং আর অন্যান্য লজ্জাকর চুক্তি কবার সাত বছর পরেই, ১৮৫০এ, চীনে এই বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেয়। একজন লেখক বলেছেন যে খুব তাড়াতাড়ি তাইপিং বিদ্রোহের জোর বাড়তে লাগল আর এই বিরাট দেশের বুক চিরে আগুনের তলোয়ারের মতো এগিয়ে চলল এই বিদ্রোহ উত্তরে পিকিং-এর দিকে, পূবে শাংহাইকে লক্ষ্য করে আর পশ্চিমে তিব্বতী পাহাড়গুলোতে আগুন ধরিয়ে দেবে বলে।

ইতিপূর্বে চীনে যত কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছে সেগুলো থেকে তাইপিং বিদ্রোহের চরিত্র কিছু আলাদা। এ বিদ্রোহ একই সঙ্গে পুরোনো ধরনের শেষ কৃষক-বিদ্রোহ আর চীনের জনগণের আধুনিক যুগের প্রথম বিপুল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। আগের বিদ্রোহীদের তুলনায় তাইপিং বিদ্রোহীদের বিপ্লব-বোধ আরেকটু পাকা বলে তারা প্রথমেই ঘোষণা করে যে তারা তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছে তাদেরই জন্যে যারা সবার অবজ্ঞার পাত্র অথচ সমাজের জন্যে যারা সব চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে। ১৮৫১র ১১ই জানুয়ারী তারা ঘোষণা করল যে তাদের রাজ্যের নাম 'তাই পিং তিয়েন কুয়ো', মানে—'বিপুল শান্তির স্বর্গরাজ্য'। দক্ষিণ চীনের কোয়াংসিতে বিদ্রোহ শুরু করে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর বেড়াজাল টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তাইপিং বিদ্রোহীরা

উত্তরের দিকে এগিয়ে চলল। পথে তিয়েন তি হুই বিদ্রোহীরা তাদের সঙ্গে যোগ দিল। যেখানেই তারা যায় সেখানেই চাষীরা তাদের দলে যোগ দেয়—এমনি ভাবে জোয়ারের জলের মতো বিদ্রোহীরা ইয়াংসি নদী অবধি এসে পৌঁছল। তারপর দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য। লাল পাগড়ী-পরা বিদ্রোহীরা নৌকো করে হাজারে হাজারে ইয়াংসি দিয়ে নানকিং-এর দিকে চলল। সেদিন ইয়াংসি লালে লাল—যেন ভবিষ্যতের লাল দিনের স্বপ্ন দেখছে। এই লাল পাগড়ীর দল নানকিং শহরের পাঁচিল ভেঙ্গে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল। যে নানকিং-এ মাঞ্চু শাসকরা ইংরেজের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছিল, অপমানজনক নানকিং চুক্তি করেছিল, সেখানেই হল তাইপিংদের রাজধানী। তাদের এই "স্বর্গরাজ্য" পনের বছর স্থায়ী হয়েছিল, ১৮৫০ থেকে ১৮৬৫।

এই মেহনতী মানুষের আন্দোলনের নেতাদের পরিচয় পেলেই আমরা বুঝতে পারব এ আন্দোলন কোন্ শ্রেণীর লোকের আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রাণ এবং সব চেয়ে বড়ো নেতা ছিলেন হুং সিউ-চুয়ান। তিনি মাঝারি রকমের চাষীর ঘরের ছেলে, খুব গরীব এক স্কুলমাস্টার। ক্যান্টনের বিদ্রোহী জনতার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। ক্যান্টন যে প্রদেশের রাজধানী সেই দক্ষিণ চীনের কোয়াংটুং প্রদেশে হুং সিউ-চুয়ানের জন্ম হয়েছিল। সুতরাং হুং স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁর সমাজের মেহনতী মানুষেরা কি অত্যাচার ভোগ করে। তিনি আরও দেখেছেন আফিং যুদ্ধে ক্যান্টনের সশস্ত্র চাষীরা কি রকম বীরত্বের সঙ্গে বৃটিশ আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করেছে এবং জিতেছে। তাই তাঁর মনের ভেতরকার দুঃখের আগুন চোখের জলে নিভতে পারেনি, বিদ্রোহের ঝোড়ো বাতাসে মশাল হয়ে পথ দেখিয়েছে।

হুং সিউ-চুয়ানের ধর্মবোধ সম্পর্কে দুয়েকটা কথা বলা দরকার। চীনের অনেক পুরোনো কাল থেকে চলে আসা কনফুসিয়াসের ধর্মের তিনি বিরোধী ছিলেন। কনফুসিয়াস ছিলেন যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচ শো বছর আগেকার লোক, পূর্ব চীনের শানটুং প্রদেশের বাসিন্দা। সামন্ত সমাজে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। কনফুসিয়াস এই অবিরাম রক্তারক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন। ট্যাক্সের মস্ত বোঝা লোকের পিঠে চাপানো আর শোষণের অন্যান্য কলাকৌশল তাঁর অপছন্দ ছিল। কনফুসিয়াস এবং তাঁর

শিষ্যরা ভেবেছিলেন যে লোককে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কিছু শেখাতে পারলে তারা ভালো হয়ে যাবে। তখন আপনা থেকেই এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যেখানে অন্যায়-অবিচার আর থাকবে না—বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাবে, সম্রাট আর প্রজার মধ্যে কোনও বিরোধ থাকবে না। সামন্ত যুগের প্রভুব্যক্তিরা কন্‌ফুসিয়াসের এই মতবাদ ফলাও করে প্রচার করত কারণ এর মূল কথা শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমঝোতা। এই সমঝোতা আসলে কখনও হতে পারে না। জেনে শুনেই শোষকশ্রেণী তা প্রবল ভাবে প্রচার করে শ্রেণী-সংগ্রামকে দুর্বল করবার জন্যে, দুঃখী মানুষের জংগী ভাবকে কমজোর করবার কুমতলবে।

গরীব স্কুলমাস্টার হুং মাঞ্চু সরকাবের চাকুরে কন্‌ফুসিয়াসেব ভক্ত শিক্ষিত আমলাদের হাতে অনেক দুর্ভোগ ভুগেছেন। তাছাডা সমাজেব অবস্থা দেখে এও পরিষ্কার বুঝেছেন যে টাকাওয়ালারাই হচ্ছে সব নষ্টের গোড়া। যীশুখ্রীস্ট তাঁর ধর্মজীবনের শুরুতেই মন্দিরে ঢুকে যারা টাকার বাক্স নিয়ে বসে থাকে সেই পাণ্ডাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা খ্রীস্টান হুং-এর মনের মধ্যে দাগ কেটে বসেছিল। তিনি নিজেকে "যীশুখ্রীস্টেব ছোটো ভাই" বলে ঘোষণা করে কন্‌ফুসিয়াসের ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। আর রাজা ও জমিদারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে নামলেন।

তাইপিং বিদ্রোহের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন জমিহীন কাঠকয়লাওয়ালা—ইনি পরে তাইপিং সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং সেনা-বাহিনীর প্রধান নায়ক হয়েছিলেন। নাম ইয়াং সিউ-চিং। আবেকজন নেতা ছিলেন গরীব চাষী এবং কাঠুরিয়া, আরেকজন গাঁয়ের শিক্ষক। অবশ্য তাইপিংদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত লোকও ছিলেন। তাঁরা সমাজের পরিবর্তন চান বলে বিদ্রোহে যোগ দেননি, বিদ্রোহটা বিদেশীদের বিরুদ্ধে বলে যোগ দিয়েছিলেন—স্বদেশপ্রেমের আবেগে। এঁরা বিদ্রোহের স্থায়ী বন্ধু হতে পারেননি, শেষ অবধি বিদ্রোহের ক্ষতি করেছিলেন।

যখন চীনে এই তাইপিং বিদ্রোহ হচ্ছে তখন ইউরোপেও প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে—১৮৪৮-এর গণতান্ত্রিক বিদ্রোহের ঝড়, সামন্ত সমাজকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলে বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপুল আন্দোলন। মেহনতী মানুষেরাও এই আন্দোলনে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সামিল

হয়েছে কারণ সামন্ত প্রথাকে চুরমার করা তাদের প্রথম কাজ, পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনতে পারে তাতে তাদের প্রয়োজন আছে। বিপ্লব তো হঠাৎ হতে পারে না, ধাপে ধাপে এগোবে। গণতন্ত্রের এই ঝড়-ঝাপটায় অন্য অনেকের মতো এক ধার্মিক ভদ্রলোক খুব কাহিল হয়ে পড়লেন। তিনি হচ্ছেন এক পাদ্রী সাহেব—ডক্টর গুৎসলাফ। ইনি আফিং যুদ্ধের সময় ইংরেজদের দালালি করে পুরস্কার পেয়েছিলেন। এঁর একহাতে ছিল বাইবেল আরেক হাতে আফিং। ইনিও খ্রীস্টান আর তাইপিং বিদ্রোহীদের নেতা হুং সিউ-চুয়ানও খ্রীস্টান। কিন্তু একজন হচ্ছে ধনীর দালাল আর আরেকজন গরীবের বন্ধু। এখানে কোনও ব্যক্তির জাতটা বড়ো কথা নয়, আসল কথা শ্রেণী স্বার্থ। তাই গুৎসলাফ হুং-এর হুংকারে ভয় পেলেন কারণ তাইপিংরা ধনীদের স্বার্থ ধ্বংস করবে! তিনি ১৮৪৯-এ চীন থেকে তাঁর দেশ জার্মানিতে গেলেন। ইউরোপের বিদ্রোহের চেহারা দেখে তিনি চীৎকার করে বললেন যে, সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী নতুন সমাজ বা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যেসব কথা বলছে, সমাজ পাল্টাবার যেসব দাবীদাওয়া তুলছে সেগুলো যেন মিলে যায় চীনের ক্ষ্যাপা চাষীগুলোর কথাবার্তা আর দাবীদাওয়ার সঙ্গে!

মার্কসবাদের জন্মদাতা মার্কস এবং এংগেলস কিন্তু চীনের বিদ্রোহকে অন্য চোখে দেখেন। তাঁরা তখনকার ইউরোপের এগিয়ে-যাওয়া শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি ; তাই এশিয়ার ঘুমন্ত মানুষকে জাগতে দেখে তাঁরা আনন্দিত হয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন তাদের দিকে। বললেন—এটা……আনন্দের কথা যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও স্থায়ী সাম্রাজ্য (চীন) ইংরেজ বুর্জোয়াদের সুতীর কাপড়ের পাল্লায় পড়ে এমন একটা সামাজিক ওলট-পালটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সভ্যতার পক্ষে……যে ওলট-পালটের ফলাফল নিশ্চয়ই চরম গুরুত্বপূর্ণ হবে।

॥ অস্থায়ী স্বর্গ আর নরকের কীটরা ॥

তিন বছরের মধ্যে তাইপিংরা ছ' ছ'টা প্রদেশ দখল করল, সমস্ত অঞ্চলে বিরাট মাঞ্চু সৈন্যবাহিনীকে কচুকাটা করল, নানকিংএ স্বর্গরাজ্যের রাজধানী

প্রতিষ্ঠা করল—এত সব করতে পারল কিসের জোরে ? গোটা দেশটা দুটো রাজ্যে ভাগ হয়ে গেল—মাঞ্চু রাজ্য আর তাইপিং স্বর্গরাজ্য, দুটো সরকার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়তে লাগল—কি ব্যাপার ! মাঞ্চুদের তো জোর ছিলই, তাদের ধনবল জনবল সবই ছিল। তাইপিংরা কোথায় জোর পেল ? তাদের জোর তারা দেশের চাষীদের জাগাতে পেরেছিল—যারা সংখ্যায় কোটি কোটি আর মাঞ্চুদের অত্যাচারে যারা চোখের জলে দিন কাটায়। এমনি এমনি মানুষকে এমনভাবে জাগানো যায় না। তাইপিং বিদ্রোহের নেতারা চাষীদের বহু যুগের ক্ষুধা মেটাতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সাধ্যমত রাজনৈতিক কর্তব্য তাদের শিখিয়েছিলেন। সেই জন্যে যেখানেই তাইপিং সেনাবাহিনী যেত সেখানেই মাঞ্চুরাজবংশের ক্ষমতা তারা গুঁড়িয়ে দিত, সরকারী আমলাদের তাড়িয়ে দিত আর তাদের ধনদৌলত গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। তাইপিংদের কৃষি-নীতি ছিল একেবারে নতুন। জমিদারদের হাতে জমির একচেটিয়া মালিকানা থাকল না। তাইপিংরা ঘোষণা করল যে আকাশের তলায় যত জমি আছে, আকাশের তলার সব মানুষই সেই জমি চাষ করবে। ষোল বছর হয়েছে এমন প্রত্যেক পুরুষ এবং মেয়ে জমির ভাগ পাবে আর যারা ষোল বছরের নীচে তারা বড়োদের অর্ধেক ভাগ পাবে। এতে চাষীর জমির ক্ষুধা মিটবে। জমির মালিক চাষী, সুতরাং জমিদারকে খাজনা দেওয়া বাতিল। জমির মালিকানার দলিল চাষীরা পেয়ে গেল। "চাষ যার জমি তার" এই নীতির দরুণ চাষীদের অবস্থার উন্নতি হল। তাইপিং বিদ্রোহীরা জোর দিয়ে বলল ভালো খায় না এবং ভালো পরে না এমন লোক সমাজে থাকবে না। সামন্ত সমাজে মেয়েদের কোনও রকমের অধিকার ছিল না। তাইপিংরা মেয়েদের পুরুষদের সমান অধিকার দিল, আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে মেয়ে-পুরুষ তফাৎ রইল না। মেয়েরা চাষের জমিরও ভাগ পেল। সরকারী পরীক্ষা পাশ করে আমলা হবার অধিকারও তাদের দেওয়া হল। সৈন্যবাহিনীতে তাদের নেওয়া হল, লড়াইয়ের ময়দানে পুরুষদের পাশে তারা এসে দাঁড়াল। নতুন বিবাহ-আইনে মেয়ে কেনাবেচা নিষেধ হল। সামন্ত সমাজে এই কেনাবেচাই ছিল নিয়ম। দাসী হিসেবে মেয়ে বিক্রিও নিষেধ হল। নানকিং-এর বড়ো রাস্তায় মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে, এমন কি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দেখে, বিদেশীরা অবাক হল।

একজন বিদেশী লেখক লিখে গেছেন—মাঞ্চুরা ইউরোপের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল কিন্তু তাইপিংরা দেশের মানুষের সেবার ব্যাপারে ইউরোপের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। তাইপিংদের দখল-করা গ্রামে তিনি দেখেছেন দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। সেই পোস্টারে ইউরোপের কায়দায় খাদ্য, বস্ত্র আর ওষুধ বিলির নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং টীকা নেবার জন্যে কোথায় যেতে হবে তা বলা হয়েছে।

বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তাইপিংদের নীতি মাঞ্চুদের পা-চাটার নীতির ঠিক উল্টো ছিল। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের যে নীতি হওয়া উচিত তাই ছিল। তারা পৃথিবীর অন্য জাতিদের সমান রাজনৈতিক মর্যাদা দাবী করল, অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ চাইল, আফিং আমদানি কড়াকড়ি ভাবে বন্ধ করে দিল। তাদের আমলে উৎপাদন এবং বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে লেন-দেন বেশ বেড়ে গেল। বিদেশে রেশম ও চা রপ্তানি অনেকগুণ বাড়াতে চীনের তাইপিং অঞ্চলের উপকার হল। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে সমস্ত অঞ্চলটা ছিল তাইপিং অঞ্চল।

প্রথম দিকটায় ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং অন্যান্য বিদেশী শক্তিরা এমন একটা ভান করল যে তারা মাঞ্চু বা তাইপিং এই দুদলের কোনও দলের পক্ষে নয়, তারা নিরপেক্ষ। আসলে তাদের নিরপেক্ষ হওয়া মানে অপেক্ষা করা, কি হয় দেখা। চীনের অবস্থা জটি . চট করে কোনও পথ ঠিক করা যাচ্ছে না, ঘটনার গতি কোন দিকে যায় আরও কিছুদিন দেখা যাক—এই ভাব নিয়ে বিদেশীরা নিরপেক্ষ হয়ে রইল। তারা আশা করেছিল যে তাইপিংরা চীনের সমস্ত অঞ্চলে বিদেশীদের ব্যবসা করবার অধিকার দেবে এবং তাদের দাবীগুলো মেনে নেবে। কিন্তু তাইপিং নেতাদের কাছে সেরকম কোনও আশ্বাস পাওয়া গেল না। অপেক্ষায় কোনও ফল হল না, সুতরাং বিদেশী শক্তিরা মাঞ্চু রাজবংশকে তাদের কাজে লাগানোই স্থির করল। এই রাজবংশ দুর্বল ও চরিত্রহীন হওয়াতে সুবিধেই হবে কারণ তাতে বিদেশী রাজত্ব কায়েম করবার সুযো . আরো বেশি পাওয়া যাবে।

তাইপিংরা যখন শাংহাই আক্রমণ করতে যাচ্ছিল তখন মাঞ্চু আমলারা পালাতে শুরু করে আর সুযোগ বুঝে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের কনসাল বা বাণিজ্য-প্রতিনিধিরা বাণিজ্য-শুল্ক বা কর আদায়ের ব্যবস্থাটা দখল করে

নেয়। তাইপিংদের সঙ্গে মাঞ্চুদের যুদ্ধ চলতেই থাকে বলে পরে মাঞ্চুরা অন্যান্য বন্দরের কর আদায়ের ভারও বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দেয়। বিদেশীরা পাঁচ শতাংশ আমদানী কর দেবার সুযোগ তো ইতিপূর্বেই আদায় করেছিল, এবারে কর-আদায়ের অধিকার পেয়ে তারা একেবারে দ্বার-রক্ষী হয়ে গেল, সরকারের সব চেয়ে বড়ো আয়ের রাস্তাটা তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। সুতরাং এবারে তাইপিংদের সম্বন্ধে আর নিরপেক্ষ থাকা যায় না। কারণ এই যে দারুণ অধিকার পাওয়া গেছে তা তাইপিংরা গদীতে বসলে সেই মুহূর্তেই কেড়ে নেবে। দেশের সবচেয়ে বড়ো আয়কে বিদেশীর হাতে তুলে দেবে—দেশের স্বাধীনতাকে এত হালকা করে দেখে না তাইপিংরা।

এবারে আর শুধু সুযোগসুবিধে আদায় নয়, একেবারে হাতের মুঠোয় আনতে হবে মাঞ্চুদের। এই মতলব যখন তারা আঁটছে তখন একটা ঘটনা বিদেশীদের খুব সুবিধে করে দিল। বৃটিশ পতাকা উড়িয়ে একটা চীনে বোট আফিং আনছিল, মাঞ্চু সরকারের লোকেরা সেটাকে পাকড়াও করে। এতে বৃটিশের অপমান হয়েছে বলে ইংল্যাণ্ড চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, পরে দেখাদেখি ফ্রান্সও যুদ্ধ ঘোষণা করে, ক্যান্টনের ওপব কামানের আক্রমণ চালায় এবং ভালো করে চাপ সৃষ্টি কববার জন্যে পিকিং থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণে তিয়েনৎসিন বন্দর দখল করে। আবার মাঞ্চুরা এসে হাতে পায়ে ধরে। ১৮৫৮তে তিয়েনৎসিন চুক্তি হয়। মাঞ্চুরা এই দাবীগুলো মেনে নেয়—(ক) বিরাট টাকার ক্ষতিপূরণ; (খ) বিদেশীদের পিকিংএ বাস করবার অধিকার; (গ) আরও কয়েকটা নতুন বন্দরকে বিদেশীদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া; (ঘ) আমদানি ও রপ্তানি কর আদায়ের ওপর বিদেশীদের কব্জা রাখতে দেওয়া।

এ ছাড়াও চীনে মজুরদের বিদেশে চালান দেবার অধিকার বিদেশীরা পায়। মাঞ্চু সরকারের দৌলতে চীনের গরীব চাষীরা এখন থেকে হয়ে গেল "কুলি"। এদের মালয়ের বাগিচা ও খনিতে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে কাজ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তারা প্রায় কেনা গোলামদের মতো অসহ্য জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে চীনেরা প্রথম সুদীর্ঘ রেল লাইন তৈরির কুলি হিসেবে কাজ করে আর সে কাজ শেষ হওয়ার পর তাদের রুজি-রোজগারের ব্যাপারে কোনও সুব্যবস্থা তো করা হয়ই না বরং জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের ওপর জুলুম

আর খুনজখমের জোয়ার বয়ে যায়। শেষ অবধি উৎপাদনের ব্যাপারে আরও বেশি দরকারী কাজকর্ম থেকে তাদের হটিয়ে দিয়ে লণ্ড্রি বা ধোপার দোকান আর রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়।

জারের রাশিয়া এই দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধে যোগ দেয়নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা না করে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এই দুই শকুনই মড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইংল্যাণ্ড যেসব সুযোগ-সুবিধে চাইল এরাও মওকা পেয়ে সেগুলো দাবী করল। নতুন চুক্তি মঞ্জুর করতে মাঞ্চু সম্রাট দেরী করাতে বিদেশীরা আবার যুদ্ধ শুরু করল। এবার প্রচণ্ড আক্রমণে পিকিং-এর পতন ঘটল। ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী পিকিং-এর বিখ্যাত "গ্রীষ্ম প্রাসাদ", মানে, সাম্রাটের গ্রীষ্মে বা গরমের দিনে আরামে থাকার প্রাসাদ লুঠ করল। সেখানে ছিল পৃথিবী-বিখ্যাত নানা রকমের শিল্পের কাজ। সব লুঠ করল এই সভ্য দেশের ডাকাতেরা। শুধু লুঠ করেই তারা ক্ষান্ত হল না, প্রাসাদটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল—অথচ এই ইমারৎটি ছিল কারিগরদের আশ্চর্য শিল্প-সৃষ্টি। জনতার ওপর অকথ্য অত্যাচার করল। বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিকতর উগো তীব্র ঘৃণার সঙ্গে লিখেছেন—এক দিন দুটো ডাকাত গ্রীষ্ম প্রাসাদে ঢুকল। একটা লুঠ করল, আরেকটা আগুন লাগাতে লাগল।..... দুই বিজয়ীর মধ্যে একজন পকেট ভর্তি করল আরেকজন তার বাক্স ভর্তি করল, তারপর তারা হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে ইউরোপে ফিরে এল।

মাঞ্চুরা কাঁচা লোক নয়। তাই চুক্তির শর্তগুলোর মধ্যে এমন কথা তারা ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে বিদেশীদের তাইপিংদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যে চুক্তি হল তাতে লেখা ছিল যে ইয়াংসি নদীতে ইংরেজরা জাহাজ চালাবার অধিকার পাবে তাইপিংরা যে অঞ্চল দখল করে আছে সেখানে শান্তি ফিরে এলে পরে। অর্থাৎ ইংরেজদের একটু ঘুরিয়ে বলা হল যে তাইপিংদের দমন করতে সাহায্য কর নইলে ইয়াংসি নদীতে জাহাজ চালাতে পারবে না। ফ্রান্সের সঙ্গে যে চুক্তি হল তাতে লেখা ছিল যে তাইপিংদের স্বর্গরাজ্যের রাজধানী নানকিং শহরে বিদেশীরা ঢোকবার অধিকার পাবে নানকিং তাইপিংদের হাত থেকে মুক্ত হবার পর। অর্থাৎ ফরাসীদের বলা হল যে নানকিং থেকে তাইপিংদের তাড়াতে সাহায্য কর নইলে স্বর্গরাজ্যে ঢুকবে কি করে! আফিং-এর ব্যবসা সম্পর্কেও ঐ একই

কায়দা করা হল। একটা চুক্তিতে বলা হল যে আফিং-এর ব্যবসা আইনী, বেআইনী নয়। এর ফলে তাইপিংরা হয়ে গেল আইনভংগকারী কারণ তারা আফিং আমদানী নিষেধ করেছে। অর্থাৎ বিদেশীদের বলা হল তোমরা তাইপিংদের ঘায়েল কর তাহলেই অবাধে আফিং-এর কারবার চালাতে পারবে। অর্থাৎ দেশের লোকেদের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরা বিদেশীদের লেলিয়ে দিল। ধনীদের স্বদেশপ্রেম এই রকমই হয়!

সুতরাং বিদেশী সরকারগুলোর আর বিদেশের বুর্জোয়া খবরের কাগজগুলোর সুর বদলে গেল। তাইপিং বিদ্রোহের প্রথম দিকে তারা এই আশা প্রকাশ করেছিল যে খ্রীস্টান হুং যেহেতু তাইপিংদের নেতা সেজন্যে ভয়ের কোনও কারণ নেই এবং মাঞ্চু রাজত্বের দুর্নীতি ও উন্নতিহীন অচল অবস্থার বিরুদ্ধে এদের লড়াই ভালো জিনিস। এখন কিন্তু নতুন সুর শোনা গেল। সমাজের সংস্কার করছে, আমাদের মতোই খ্রীস্টান—এসব কথা আর নেই। এখন জোর প্রচার হতে লাগল যে তাইপিংরা অরাজকতা চায়, ধ্বংসপন্থী এরা, এদের কি স্পর্দ্ধা যে খ্রীস্টধর্মের পতাকা ব্যবহার করছে—অধার্মিকের দল! ইত্যাদি ইত্যাদি। তাইপিংদের সম্বন্ধে নানা রকমের অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করে প্রমাণ করবার চেষ্টা হল যে এরা অমানুষ। কাহিনীগুলো বিদেশীদের সরবরাহ করল তাঁবেদার মাঞ্চু সরকারের আমলারা আর কিছু কাহিনী বিদেশী প্রচারকেরা স্রেফ নিজেদের মগজ থেকে বানিয়ে বিলি করে দিল। একদিন আগে যে মাঞ্চু সরকারকে বিদেশী প্রচারকরা গালাগাল করেছিল খ্রীস্টধর্মবিরোধী, উন্নতির শত্রু, দাগী আসামী ইত্যাদি বলে সেই মাঞ্চু সরকারকে আজ প্রশংসা করা হতে লাগল এই বলে যে, এই সরকারই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে পারে, এই সরকারই আইন-শৃঙ্খলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খাঁটি অভিভাবক।

অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজ, ফরাসী এবং আমেরিকান সৈন্যবাহিনী মাঞ্চু সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শাংহাইতে তাইপিংদের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে দিল। তা ছাড়া ওয়ার্ড নামের একজন আমেরিকান ভাগ্যান্বেষী, মানে, যে ঠিক করেছে যেমন করেই হোক বড়োলোক হয়ে ভাগ্য ফেরাতে হবে, নানা দেশের গুণ্ডা, বদমায়েস ও লুঠেরাদের জড়ো করে এক আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তুলল। কিছু চীনে বদমায়েসকেও পেয়ে গেল। এরা মাঞ্চু সরকারের পক্ষে লড়তে লাগল। ওয়ার্ড মরে যাওয়ার পর তার জায়গায় নেতা

হল বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর গর্ডন। ইনি পরে জেনারেল গর্ডন হয়েছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকার সুদানে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হয়ে লড়তে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। মাঞ্চু সৈন্যদের পরামর্শদাতা হিসেবে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর অফিসাররা কাজ করতে লাগল। তাইপিংদের হারাতেই হবে বলে ইংরেজদের নতুন অস্ত্র এন্‌ফিলড রাইফেল মাঞ্চু সৈন্যদের জন্যে আনানো হল—অথচ ইউরোপে এই নতুন রাইফেল ইংরেজরা তখন পর্যন্ত ব্যবহার করেনি। গোলা ছুঁড়তে পারে এমন স্টিম বোট বা বাষ্পের সাহায্যে চলে এমন যুদ্ধজাহাজ ইংল্যাণ্ড থেকে এল ইয়াংসি নদীতে যুদ্ধের কাজে ঘুরে বেড়াবে বলে—অথচ যুদ্ধে এরকমের জাহাজ ইংরেজ ইতিপূর্বে কখনও ব্যবহার করেনি। নতুন হাতিয়ারগুলোর জোর চীনেদের ওপরই পরীক্ষা হয়ে যাক—এই বোধ হয় মতলব!

ফরাসী, ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্য যে বীভৎস অত্যাচার শুরু করল তা বর্ণনা করা যায় না। শুধু পুরুষরা তাদের রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাতে পারল না, নারী ও শিশুর ওপরও তারা চরম বর্বর অত্যাচার চালাল। তারা শুধু তাইপিং বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল না, অসহায় গাঁয়ের মানুষও তাদের শিকার হল। অথচ বৃটিশরাই স্বীকার করেছে যে, যুদ্ধে বন্দী একজন ইউরোপীয় সৈনিকের গায়েও তাইপিংরা হাত দেয়নি।

চীনের ব্যাপারে বিদেশীদের এই হস্তক্ষেপ বা অস্ত্রক্ষেপ যে অন্যায় একথা ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর নেতারা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন—বৃটিশ ও ফরসী সরকারের কুৎসিত চেহারা তাঁরা লোকের চোখে তুলে ধরেছিলেন। মার্কস ও এংগেলসের কলম থেকে আগুন ঠিক্‌রে বার হচ্ছিল। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষ লণ্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রুশ ও অন্যান্য দেশের ভ্রমণকারীরা চীনের ঘটনা দেখে কঠোর নিন্দা করেছিলেন। ইউরোপের কিছু গুণ্ডা-বদমায়েস মাঞ্চুদের পক্ষে যেমন লড়েছিল, ইউরোপের কিছু সৎলোক তেমনি তাইপিংদের হয়েও লড়েছিলেন। এবং সৎলোকদের অনেকে কোনও মাইনে না নিয়ে ভলান্টিয়ার বা সেচ্ছাসেবক হিসেবে তাইপিংদের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই করছিলেন।

তাইপিং যুদ্ধের শেষের দিকে একজন বীর সেনাপতির আবির্ভাব ঘটেছিল। ইনি এক গরীব চাষীর ছেলে, নাম লি সিউ-চেং। তাইপিং বাহিনী নিয়ে

লি সিউ-চেং শাংহাই আক্রমণ করেন। মাঞ্চু, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের লি কাবু করে এনেছিলেন কিন্তু রাজধানী নানকিং থেকে জরুরী তলব আসাতে তাঁকে চলে যেতে হল।

নানকিং-এর যুদ্ধ হচ্ছে তাইপিং বিদ্রোহের শেষ উল্লেখ করবার মতো ঘটনা। ১৮৬২র মে মাসে নানকিংকে রক্ষা করবার জন্যে লি সিউ-চেং চল্লিশ দিন ধরে চরম লড়াই করেন তবু মাঞ্চু বাহিনীকে একেবারে হটিয়ে দিতে পারেন না। আরও দুবছর কেটে যায়। আবার হুনান থেকে মাঞ্চু বাহিনী এসে নানকিং-কে ঘিরে ফেলে। তাইপিং বিদ্রোহের জন্মদাতা হুং সিউ-চুয়ান আত্মহত্যা করেন। খাদ্যের অভাবে অনেক তাইপিং সৈনিক এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে নেবার ক্ষমতা থাকে না। লড়বার ক্ষমতা আছে এমন মাত্র তিন-চার হাজার সৈন্য নিয়ে লি সিউ-চেং নানকিংকে বাঁচাবার সংগ্রাম চালাতে থাকেন। কিন্তু প্রাণ দিয়েও মাঞ্চুবাহিনীকে ঠেকানো গেল না। নানকিং-এর পতন হল। মহাবীর লি সিউ-চেং বন্দী হলেন এবং মাঞ্চুরা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল।

তাইপিংরা হেরে গেল কেন? সামন্ততন্ত্রের আওতায় কৃষকরা যে অবস্থায় থাকে তাতে তাদের পক্ষে বিদ্রোহে সফল হওয়া অর্থাৎ নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে যে কারণে চীনের বহু কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে সেই কারণেই তাইপিং বিদ্রোহও ব্যর্থ হল। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি এবং তার দরুণ সমাজের মধ্যে নতুন নতুন শক্তির জন্ম না হলে বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন কিছুতেই হতে পারে না। বিপ্লবের নেতা হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তখনও সংগঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। বিদ্রোহের তৃতীয় বছরেই তাইপিংরা নানকিং দখল করে। কিন্তু এর পর তাইপিং সরকার ও সৈন্যবাহিনী আরও ন'বছর টিকে ছিল, শহর ও গাঁয়ের গরীব জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনও তাদের পেছনে ছিল কিন্তু তাইপিং আন্দোলন আর এগোলো না—যেন কাণাগলিতে আটকে থাকল। তাইপিংদের চিন্তায় রাষ্ট্র ছিল পিতার মতো। রাষ্ট্র ভালো অভিভাবকের কাজ করবে। তার মানে আমলারা উদার ভালোমানুষ হবেন আর প্রজার কল্যাণ করবেন। এই ধারণার ফলে প্রজারা নিজেরা নিজেদের শাসন করবে এই বিপ্লবী ভাবটা তাইপিংরা জাগায়নি। তাইপিংরা আরও ভুল করেছিল। মাঞ্চু সরকারকে তারা দম ফেলবার সময় দিয়েছিল। যুদ্ধের

কৌশলের দিক থেকে এটা মারাত্মক ভুল। তাদের উচিত ছিল নানকিং দখল করার পর পিকিং-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে মাঞ্চুদের ওপর চরম চাপ সৃষ্টি করা। তা ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ চীনে আরও যেসব বিদ্রোহ হচ্ছিল সেগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ তাইপিংরা ভালোভাবে করেনি। দম ফেলবার সময় পেয়ে মাঞ্চুরা চীনের জমিদার সম্প্রদায়ের সমর্থন যোগাড় করল—অথচ মাঞ্চু রাজবংশ বাইরে থেকে এসেছে বলে চীনের জমিদারশ্রেণী স্বদেশী-ভাবের দিক থেকে গোড়ার দিকে মাঞ্চুদের বিরোধী ছিল। তাইপিংদের আক্রমণের মুখে জমিদাররা দেখল যে চাষীদের কাছ থেকে তাদের পাওনা খাজনা রক্ষা করতে হলে রাজবংশকে তাদের রক্ষা করতে হয়। তাইপিংদের হেরে যাওয়ার আরেকটা কারণ হল মাঞ্চুদের পক্ষে বিদেশীদের অর্থাৎ ইউরোপের শক্তিগুলোর যুদ্ধে যোগ দেওয়া। বিদেশীরা গোড়ার দিকে তাইপিংদের প্রচুর প্রশংসা করে শেষে মাঞ্চুদের দিকে নির্লজ্জভাবে ভিড়ে গেল। তাদের গোড়ার দিককার ধাপ্পা তাইপিংরা ধরতে পারেনি, তাই বিদেশী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আগে থাকতে তারা তৈরি হতে পারেনি। বিদ্রোহী নেতাতে নেতাতে মনকষাকষিও তাইপিংদের খানিকটা কমজোর করে ফেলছিল। কিন্তু তাইপিং বিদ্রোহকে ছোট করে দেখা অপরাধ। তাইপিংদের আদর্শ আর আত্মত্যাগ তাদের অমর করে রাখবে। তাদের বিদ্রোহ মাঞ্চু রাজবংশের শেকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল, প্রমাণ করে দিয়েছিল যে শুধু তাদের নিজের জোরে রাজত্ব বজায় রাখার দিন ফুরিয়ে গেছে। চীনের সামন্তপ্রথা এই চাষী বিদ্রোহীদের কড়া-পড়া হাতে এমন ঘা খেল যে সে আর কোনও দিনই সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারবে না।

তাইপিং বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল তাদের মুখে চীনের আগামী দিনের নেতা সুন ইয়াৎ-সেন বিদ্রোহের আগুন-ভরা কাহিনী শুনে বিদ্রোহী হবার উৎসাহ পেয়েছিলেন। তাঁর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে অত্যাচারীদের উৎখাত করবার ক্ষমতা জনসাধারণের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। আরও পরের যুগে মাও ৎসে-তুং-এর সৈন্যবাহিনী তাইপিং বিদ্রোহীদের শিক্ষাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। তাইপিংরা ভুখা আর নাংগাদের জন্যে আওয়াজ তুলেছিল "ভালো খাওয়া আর ভালো পরা", মাওএর সৈন্যবাহিনীও সেই একই আওয়াজ ব্যবহার করেছিল।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ চীনের সামন্ত শক্তির যোগসাজসে দেশটাকে আধা-

উপনিবেশ করে ফেলল। কিন্তু এটা ইতিহাসের একটা দিক মাত্র। অন্য দিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার স্বদেশী পা-চাটাদের বিরুদ্ধে চীনে জনসাধারণের সংগ্রাম এগিয়ে চলল। ১৮৪০ থেকে ১৮৬৪ অর্থাৎ প্রথম আফিং যুদ্ধ থেকে তাইপিং বিদ্রোহীদের পতন—এই চব্বিশ বছরের ইতিহাস থেকে আমাদের এই আশ্বাস পেতে হবে যে, জনগণ এগোচ্ছে এবং এগোবেই, যদিও বাধা বিস্তর।

॥ তোমারে বধিবে যে ॥

যে নতুন শক্তির অভাবে কৃষক-বিদ্রোহ সফল হচ্ছে না তার কিন্তু ইতিমধ্যে জন্ম হয়েছে। প্রথম আফিং যুদ্ধের পর থেকেই নানা অঞ্চলে সে শক্তির জন্ম শুরু হয়েছে। এ শক্তি হল আধুনিক কলকারখানার মজুরশ্রেণী। ১৮৪৫এ ইংরেজরা ক্যাণ্টনে একটি জাহাজ তৈরির ডক গড়ে তোলে। শাংহাইতেও ইংরেজের চেষ্টায় একটা আর আমেরিকানদের চেষ্টায় আরেকটা ডক গড়ে ওঠে। ক্রমে অ্যাময় আর ফুচাউ-তে ডক তৈরি হয়। শেষে চীনের জাহাজ তৈরির ব্যবসাটা পুরোপুরি বিদেশীদের হাতে চলে যায়। বিদেশীরা সিল্ক বা রেশম বোনার ফ্যাক্টরী বসালো, দেশের কারিগরদের বিপদ হল। চিনি রিফাইন করার এবং চামড়া ট্যান করার ফ্যাক্টরী এবং আরও ফ্যাক্টরী বিদেশী পুঁজির চেষ্টায় দেশে গড়ে উঠল। এই সব ফ্যাক্টরীতেই শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হল—যে শ্রেণী ধনিক শ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো শত্রু, সবচেয়ে খাঁটি বিপ্লবী শ্রেণী। এই শ্রমিকরা এল কোত্থেকে? এরা হচ্ছে সেই হতভাগা হাতের কাজের কারিগররা যারা কলকারখানার আক্রমণে বেকার হয়েছে আর সেই চাষীরা যারা ক্ষেতখামার থেকে উৎখাত হয়েছে। হাজারে হাজারে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সব কিছু এরাই পয়দা করে বটে কিন্তু এদের দুঃখের অন্ত নেই। বিদেশী বণিক রক্ত-জল-করা খাটুনি ঘাড় ধরে আদায় করে কিন্তু যে মজুরী দেয় তাতে বেঁচে থাকা কঠিন। সেই মজুরীর ওপর আবার দেশের সামন্তপ্রভুরা থাবল মারে। খাজনা দাও, ট্যাক্স দাও, দেন দাও, তেন দাও। প্রাণ বাঁচানোই দায়।

বিদেশীদের পাশাপাশি দেশী ধনীরাও কারখানা খোলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। শুধু কি বিদেশীরাই টাকা লুঠবে? একদল চীনে আমলা, সামন্ত-

প্রভুদের আমলা, পশ্চিমী দুনিয়ার অর্থাৎ ইউরোপের অনুকরণে কলকারখানা গড়তে লেগে যায়। তাদের উদ্দেশ্য শিল্পের উন্নতির মারফৎ মাঞ্চু রাজবংশকে জোরদার করে তুলবে। জাপান পশ্চিমী কায়দায় শিল্পে প্রবল হয়ে উঠেছে এই দৃষ্টান্ত দেখে এই চীনে আমলারা উৎসাহ পায়। তারা কিছু ডক, কয়লাখনি, এবং সৈন্যবাহিনী আর নৌবাহিনীকে যোগান দেবার মাল-গুদাম, জাহাজী ব্যবসা এবং আরও পরে কাপড়ের কল চালু করে। সমস্ত খবরদারির ভার কিন্তু নিজেদের হাতে রেখে দেয়। এই "পশ্চিমী" কায়দা নকল করে খুব বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না। জাপান "পশ্চিমী" হওয়ার ব্যাপারে সুবিধে করতে পেরেছিল নানা কারণে। সেখানে বড়ো ব্যবসাদার আর সামন্তরা এক জোট হয়ে শিল্প গড়ে তুলেছিল। আর চীনে আমলারা ব্যবসাদারদের আমল দেয় নি, একচেটিয়া শিল্পব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিল। তাছাড়া জাপানকে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড নিজ নিজ স্বার্থে আধুনিক শিল্প বা কলকারখানা গড়তে সাহায্য করেছিল। অথচ চীনকে করেনি, কারণ এই নানা ধনদৌলতে ভরা অগুণতি মানুষের দেশকে তারা 'লুঠের মহাল' হিসেবে ব্যবহার করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। সুতরাং মাঞ্চু আমলাদের "পশ্চিমী" ধাঁচে শিল্প গড়ার অর্থাৎ মুনাফা করার চেষ্টা সফল হল না। তবে একটা জিনিস হল, চীনের শ্রমিকরা যে নতুন যন্ত্রবিদ্যা আগ্রহের সঙ্গে শেখে এবং ভালোই শেখে তা প্রমাণ হল।

দেশের ভেতরে পুঁজিবাদ ক্রমশঃ দানা বেঁধে ওঠার দরুণ উঠতি পুঁজিবাদী-দের মধ্যে রাজনীতির ব্যাপারে একটা পরিবর্তনের [illegible] দেখা দিল, কারণ পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের আর চলে না—সেটা যে একান্তই সামন্তশ্রেণীর সুবিধের জন্যে তৈরি। এই পুঁজিবাদীরা রাজনৈতিক সংস্কার চাইল নিজেদের পুঁজির স্বার্থে, সমাজে তারা যেন স্থান করে নিতে পারে এই জন্যে। ইউরোপের ভাবধারা যাদের মনের মধ্যে ঢুকেছে সেই শিক্ষিত লোকেরা একদিকে চাইল পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাকে কিছুটা বদলাতে, আরেক দিকে চাইল আধুনিক বিজ্ঞান এবং কারিগরিবিদ্যা ইউরোপ থেকে নিয়ে এদেশের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি করতে। এতে ধনিক শ্রেণীর লাভের রাস্তা পরিষ্কার হবে। রাজনৈতিক সংস্কার তারা কি রকম চেয়ে-ছিল? তাদের মধ্যে একজন বলেছিল দেশে একটা আইন-সভা হোক আর রাজা ইংল্যাণ্ডের রাজার মতো সাক্ষীগোপাল হোন, শুধু সই করা আর

বক্তৃতা করা আর মন্ত্রীসভা যা বলে তাই করা তাঁর কাজ হোক। এতে পুঁজিবাদ বেড়ে উঠতে অনেক সুযোগ-সুবিধে পাবে।

একটু পেছনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই আজকের চিয়াং কাই-শেকের ফরমোজা বা তাইওয়ানের ওপর আমেরিকার অনেক দিন থেকেই লোভ ছিল। দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধের কয়েক বছর পরে আমেরিকান সৈন্যরা হঠাৎ তাইওয়ানের দক্ষিণ অঞ্চলে নেবে সে দ্বীপের লোকদের হত্যা করতে শুরু করে। কিন্তু সেখানকার লোকেরা প্রচণ্ড লড়াই করে আমেরিকানদের তাড়িয়ে দেয়। আমেরিকানরা এভাবে তাইওয়ানের ওপর চড়াও হয়েছিল এই অজুহাতে যে তাইওয়ানের কাছে একটা জাহাজডুবির পর সেই জাহাজের আমেরিকানদের আশ্রয় না দিয়ে তাইওয়ানের লোকেরা তাদের মেরে ফেলেছিল—তার প্রতিশোধ নিতে হবে।

এরপর ১৮৭৪এ জাপান তাইওয়ান আক্রমণ করে। সেদিন জাপানী যুদ্ধ-জাহাজে আমেরিকান মিলিটারি অফিসাররা ছিল—পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এবং সুপরামর্শ দেবে বলে। সেবারেও কিন্তু হতাশ হতে হল। তাইওয়ানের লোকেরা দারুণ লড়াই করে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিল। তখন আমেরিকানরা ভালোমানুষ সেজে হল "মধ্যস্থ"। দুর্বল মাঞ্চুদের ওপর চাপ দিয়ে জাপানীরা অনেক টাকা খেসারত আদায় করল। চমৎকার যুক্তি—"আমরা তাইওয়ানে অনেক রাস্তা তৈরি করেছি আর বাড়িও—তাই আমাদের খেসারত দিতে হবে।" মাঞ্চুরা এই নির্লজ্জ আক্রমণকারীদের মুখের ওপর এই প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারতে পারত—"কে তোমাদের আসতে বলেছিল এখানে?" কিন্তু তা না করে খেসারত দিয়ে খুশি করল।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে আরেক শকুন উঁকি মারল। ইংরেজ এতদিনে বার্মা দখল করে ফেলেছে। এবারে একটু একটু করে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রদেশ ইউনানে সে নাক গলাতে চেষ্টা করতে লাগল। খলের ছুতোর অভাব হয় না। ইউনানে একজন ইংরেজকে ১৮৭৫ সালে হত্যা করা হয়। ইনি পিকিং-এ বৃটিশ দূতের আপিসের একজন কর্মচারী ছিলেন। এই হত্যার অজুহাতে ইংরেজ মাঞ্চুদের ওপর চাপ দিয়ে বলে বার্মার মধ্যে দিয়ে চীনের

ভেতরে ব্যবসা করবার একটা পথ খুলে দিতে হবে। পরের বছর চুক্তি হল। ইংরেজ চীনের নানা এলাকায় ব্যবসার সুযোগ করে নিল—ইউনান, জেচুয়ান, তিব্বত, কানসু এবং চিংহাই। তিব্বত কব্জা করার চেষ্টা করেছিল ইংরেজ, কিন্তু তিব্বতীরা রুখে দাঁড়াল। মাঞ্চু সরকার ভয় পেল—তিব্বতীদের বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না, ইংরেজের সঙ্গে লড়লে ওদের নিশ্চয়ই শক্তি বাড়বে। তাই মাঞ্চুরা ইংরেজের হাতে তিব্বত ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু জঙ্গী তিব্বতীদের রকম-সকম দেখে ইংরেজকে সে যাত্রা তিব্বতে ঢোকার আশা ছাড়তে হল। বেহায়া ইংরেজদের তিব্বতে ঢোকার অজুহাত ছিল—"তিব্বতে নানারকম ধাতুর খনি আছে—সে সম্পর্কে আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে চাই!" তিব্বতীরা তীর-সন্ধান করবে দেখে এবারের মতো অনুসন্ধান এগোল না।

এবার আরেক সভ্য দেশের কাজকর্ম দেখা যাক। 'আঠারো শতকের শেষের দিকে ফরাসীরা ভিয়েৎনাম একটু একটু করে দখল করতে শুরু করে। ভিয়েৎনাম চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে। ভিয়েৎনাম থেকে ফরাসীরা দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের দুটি প্রদেশ ইউনান ও কোয়াংসিতে আক্রমণ চালায়। ফ্রান্সের সঙ্গে চীনেদের যুদ্ধ বেধে যায়। চীনেরা চমৎকার লড়ল, বার বার ফরাসীদের হারিয়ে দিল, তবু কাপুরুষ মাঞ্চু সরকার ফরাসীদের সঙ্গে চুক্তি করল এবং কতকগুলো সুবিধে তাদের করে দিল। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে ফরাসীদের জন্যে দরজা খোলা হল। আরও শয়তানীর রাস্তা এবার পরিষ্কার।

এদিকে ইতিমধ্যে দিশী পুঁজি অর্থাৎ চীনেদের নিজেদের পুঁজি আরও কিছুটা এগিয়েছে। সরকারী কারখানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানায় কিছু আধুনিক কলকারখানা গড়ে উঠেছে—অবশ্য তাদের ওপর সরকারী তদারকী ব্যবস্থা আছে। আবার সরকার আর ব্যক্তি-মালিক একই সঙ্গে চালায় এমন কারখানাও হয়েছে এবং একেবারে ব্যক্তিগত কারখানাও দেখা দিয়েছে। সব চেয়ে বেশি বেড়েছে কাপড়ের কল। প্রধানতঃ শাংহাইতেই কাপড়ের কল বেশি দেখা দেয়। কয়লার খনিও বেশ বেড়েছে। এক্ষেত্রেও সরকারী খনির পাশাপাশি সরকারী তদারকীতে ব্যক্তিগত মালিকানার খনি দেখা যায়।

এসব দেখে শুনে বিদেশীদের জিভে যে জল বেশি করে আসবে তা আর আশ্চর্য কি। জাপানী শকুনরা কোরিয়ায় নখ বসাবার একটা সুযোগ পেল।

কোরিয়ার সাধারণ মানুষ তাদের সামন্ত প্রভুদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝে বিদেশী আক্রমণও তাদের জীবনকে অসহ্য করে তুলেছিল। ১৮৯৪-র গোড়াতেই তারা ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ করল। কোরিয়ার সামন্ত সরকার তার জ্ঞাতিভাই আরেক সামন্ত সরকারকে অর্থাৎ মাঞ্চু সরকারকে অনুরোধ করল সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করতে। "স্বদেশী" ধনীদের স্বদেশপ্রেমের এ নমুনা আমরা ইতিহাসে বারবার দেখেছি এবং আরও দেখব। কোরিয়ার উত্তর সীমান্ত পেরিয়ে মাঞ্চু সৈন্য এল। আর মওকা বুঝে জাপান কোরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী নাবাল। বিদ্রোহ দমন হল। মাঞ্চু সরকার প্রস্তাব করল—এস আমরা দুপক্ষই সব বিদেশী সৈন্য নিয়ে কোরিয়া ছেড়ে চলে যাই। জাপান বলল আমি যেতে পারি না কারণ কোরিয়ার উন্নতির কাজে সাহায্য করবার জন্যে আমার সৈন্য নিয়ে এখানে থাকতেই হবে। বিখ্যাত সেউল শহরে ঘাঁটি গেড়ে জাপান বসে রইল। আসলে কিন্তু বসে রইল না—তলায় তলায় চীনকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রচণ্ড রকমের আয়োজন শুরু করল। কয়েকমাস পরেই যুদ্ধ ঘোষণা না করেই হঠাৎ জাপানের যুদ্ধ জাহাজ সেউলের দক্ষিণে চীনের যুদ্ধ জাহাজ-গুলোকে আক্রমণ করে জখম করল, ডুবিয়েও দিল। জাপানের স্পর্দ্ধা বেড়েই চলল, যুদ্ধের পর যুদ্ধে জাপান জিতেই চলল—এর কারণ মাঞ্চুদের দুর্বলতা, সরকারের কাপুরুষতা। সৈনিক ও জনসাধারণ লড়বার পক্ষে, লড়ে তারা প্রাণও দিল কিন্তু বিদেশী "পরামর্শদাতা"দের কুপরামর্শে মাঞ্চু সরকার ভালো ভাবে জাপানের মোকাবেলা করল না বরং শেষ অবধি "পরামর্শ" অনুসারে যুদ্ধ বন্ধ করল, জাপানও বিদেশী বন্ধুদের ইঙ্গিতে যুদ্ধ থামাল, নইলে ক্ষতি হতে পারে। চীনের পক্ষে চরম লজ্জাজনক চুক্তি হল—শিমোনোসেকি চুক্তি। কোরিয়ায় চীনের আর কোনও অধিকার থাকল না, জাপান কোরিয়ার পুরো অভিভাবক হল। শুধু কি তাই? চীনের লিয়াওতুং উপদ্বীপ অঞ্চল জাপানকে দিয়ে দিতে হল, আরও ছাড়তে হল তাইওয়ান (ফরমোজা) আর পেংহু দ্বীপপুঞ্জ। তা ছাড়া সেই অতি পরিচিত খেসারত বা ক্ষতিপূরণের টাকা দেবার প্রতিজ্ঞা করতে হল—অল্প স্বল্প নয়, ২০ কোটি তায়েল রূপো—প্রতি তায়েলের ওজন হচ্ছে দেড় আউন্সের মতো।

এতেও লোভ মিটল না। কয়েকটা নতুন অঞ্চলে বিদেশীদের ব্যবসা করবার অধিকার জাপান আদায় করে নিল—এতে তার বন্ধু অন্য সাম্রাজ্যবাদীদেরও

উপকার হবে। চীনের মাটিতে ফ্যাক্টরী বসাবার দাবীও জাপান আদায় করল কাবণ জোর যার মুল্লুক তার।

এই যে ফ্যাক্টরী বসাবার আগ্রহ এথেকে বুঝতে হবে যে ইতিহাসে নতুন যুগ এসেছে। এব আগে পুঁজিপতিবা মাল চালান দিত দেশবিদেশে। এখন তাদেব এত পুঁজি বেড়েছে যে তাবা পুঁজি চালান দিতে পারে এবং দিচ্ছে, নিজেব দেশ থেকে মাল এনে বিক্রি না কবে এখন থেকে তারা দেশ থেকে পুঁজি নিয়ে এসে বিদেশে কাবখানা খুলতে শুরু কবছে। কারণ সেখানে টাকা খাটিযে মুনাফা বেশি হবে—সস্তা মজুব পাওয়া যাবে, সস্তা কাঁচা মাল পাওয়া যাবে, তৈবি মালেব বিবাট বাজার পাওয়া যাবে, লগ্নীকরা টাকাব প্রচুব সুদ পাওযা যাবে। ইতিহাসে এই যে নতুন যুগ এল এযুগে পুঁজিবাদ আবও উগ্র হয়ে রাক্ষুসে সাম্রাজ্যবাদেব চেহাবা নেবে, পৃথিবী গ্রাস কবতে চাইবে। কিন্তু একটা দেশে তো পুঁজি বাড়েনি, কযেকটা দেশে বেড়েছে, ও পৃথিবীকে একা কারুব গ্রাস করবার ইচ্ছে থাকলেও পাববে না। আগামী দিনে পৃথিবীকে ভাগ ভাগ কবে ভোগ কববার জন্যে এক দেশেব সাম্রাজ্যবাদেব সঙ্গে আবেক দেশেব সাম্রাজ্যবাদেব লড়াই হবে অথবা সাম্রাজ্যবাদী দেশেব একটা জোটেব সঙ্গে আবেকটা জোটেব লড়াই হবে। আমবা জাপানী আক্রমণেব কাহিনী পড়লাম—এটা একটা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণেব নমুনা। এই চীন-জাপান যুদ্ধেব পব চীনে বিদেশী পুঁজি প্রবলভাবে ঢুকল—দেশেব মানুষ আধা-উপনিবেশেব দাসত্বের মধ্যে আবও খানিকটা তলিয়ে গেল বিদেশী কারখানাগুলো ফলাও কাববার চালাতে লাগল।

শিমোনোসেকি যাদেব মনে মত হযনি, অর্থাৎ যাব ঐ চুক্তিতে কিছু লাভ করতে পাবেনি তারা এবাবে নখ উঁচিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে এল। জাপানকে লিয়াওতুং উপদ্বীপ অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া বাশিযাব পছন্দ হয়নি কাবণ উত্তর-পূব চীনেব ওপর তাব নজব ছিল। ফ্রান্স জাপানকে তাইওয়ান আর পেংহু দ্বীপপুঞ্জ দখল কবতে দেখে অসন্তুষ্ট। লুঠেব মালের কোনও বখবাই জুটল না দেখে জার্মানিব মন খাবাপ হল আর জাপানেব ওপর ভাবি হিংসা হল। সুতবাং রাশিযা, ফ্রান্স আব জার্মানি এই তিন শক্তিতে মিলে চীনেব ওপব নোটিশ জাবী কবল লিযাওতুং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তিন জোয়ানেব সঙ্গে পেবে উঠবে না দেখে জাপান

উপদ্বীপটি চীনকে ফিরিয়ে দিল কিন্তু দেবার আগে কায়দা করে আরও তিন কোটি তায়েল রূপোর খেসারতের ব্যবস্থা করে নিল।'

সিমোনোসেকি যে তাইওয়ানের লোকদের মনোমত হবে না একথা বলাই বাহুল্য। চীন সরকার কলমের এক খোঁচায় তাইওয়ানের মানুষকে জাপানের দাস করে দিল। তাইওয়ানে প্রবল প্রতিবাদ শুরু হল। চীনের জনসাধারণ তাদের সমর্থন করতে লাগল। জাপানীরা সৈন্য পাঠিয়ে প্রতিবাদের জবাব দিল। তাইওয়ানের "কালো পতাকা" নামের স্বেচ্ছাসৈন্যেরা দারুণ বীরত্বের সঙ্গে লড়ল, শত্রুকে বার বার ঘায়েল করল। কিন্তু জাপান নতুন নতুন সৈন্যদল পাঠাল, নপুংসক মাঞ্চু সরকার নতুন সৈন্য বা অন্য রকম সাহায্য কিছু তো দিলই না বরং এই শয়তান সরকার চীনের লোকেদের নিষেধ করে দিল তাইওয়ানের লোকেদের সাহায্য করতে। জাপানীরা ১৮৯৫র অক্টোবরে তাইওয়ান দখল করে নিল।

এই পরের রাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস করার ব্যাপারে জাপানকে সাহায্য করেছিল বিশেষ করে ইংরেজ আর আমেরিকানরা। ইংরেজ জাপানকে তার যুদ্ধের নৌবহর গড়তে সাহায্য করেছিল আর আমেরিকান পরামর্শদাতারা সব সময়ই জাপানের পেছনে ছিল। জঘন্য শিমোনোসেকি চুক্তির আয়োজন উদ্যোগের মধ্যে চীন দেশের জন্যে নিযুক্ত আমেরিকান মন্ত্রী জন ফস্টার ছিলেন নাটের গুরু। ইনি আমাদের অতি পবিচিত একজন আমেরিকানের ঠাকুর্দা। "ভদ্রলোক"টি হচ্ছেন জন ফস্টার ডালেস। ডালেস আমেরিকার হাল আমলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন অর্থাৎ অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে এঁর কারবার ছিল। এঁর ঠাকুর্দামশাই-ই অপদার্থ মাঞ্চু আমলাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন জাপানকে তাইওয়ান দিয়ে দিতে। ঝাড়ে-মূলে বংশটা ভালোই!

চীন-জাপান যুদ্ধের আগের এবং ঠিক পরের বছরগুলোতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, জারের রাশিয়া এবং আমেরিকা পুঁজি রপ্তানি করে চীনে তাদের নিজস্ব ব্যাংক চালু করে। এই ব্যাংকগুলো হল চীনকে ভালো করে সাম্রাজ্যবাদী খপ্পরে রাখবার নতুন কৌশল। চীন-জাপান যুদ্ধের পর নানা

চুক্তিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মাঞ্চু সরকার বিদেশীদের খেসারত দিতে বাধ্য হয়ে অনেক টাকা হাওলাত করে ফেলেছে। এতে সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজি লগ্নী করবার ব্যাপারে দারুণ সুবিধে হয়েছে। হাওলাতী টাকার জামিন হিসেবে মাঞ্চু সরকারকে তারা বাধ্য করল শুল্ক আর লবণ-কর আদায়ের সম্পূর্ণ ভার তাদের ওপর দিয়ে দিতে। তারা ঋণের কিস্তি কেটে নিয়ে যা বাকী থাকে তা মাঞ্চু সরকারকে দেবে। এইভাবে চীনের আর্থিক অবস্থাকে তারা একেবারে নিজেদের মুঠোর মধ্যে পুরল। কাঁদে-পড়া চীনের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধে আদায় করবার ব্যাপারে বিদেশী শক্তিগুলোর পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শুরু হল।

শিমোনোসেকি চুক্তির ফলে যেসব বন্দরে ঢোকবার অধিকার তারা পেয়েছে সেখানে বিদেশীরা জাপানের মতো কলকারখানা গড়ে তুলল। তার মানে কাঁচা মাল, সস্তা মজুর—এসবের সুযোগ নিয়ে চীনকে আগের চাইতে বেশি করে শুষতে লাগল। বিদেশীরা কলকারখানার ব্যাপারে যেসব সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিয়েছিল দেশের পুঁজি-মালিকেরা সে সুবিধেগুলো পেল না, ফলে দেশের পুঁজির উন্নতি বাধা পেল। এই সময় রেল-লাইনে টাকা-খাটানো নিয়ে বিদেশী শক্তিগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান—সবাই এক একটা অঞ্চলে রেল-লাইন তৈরির অধিকার মাঞ্চু সরকারের কাছ থেকে জবরদস্তি করে আদায় করল। এই রেলের জন্যেও প্রচুর ঋণ মাঞ্চু সরকারের ঘাড়ে চাপল। তাছাড়া যে যেখানে পারল খনি খুঁড়বার অধিকারও আদায় করে নিল।

শুল্ক আদায় বিদেশীদের হাতে অর্থাৎ প্রধান আয়ই মাঞ্চুদের হাতছাড়া। আয় বাড়াবার জন্যে মাঞ্চু শাসকেরা ট্যাক্স বাড়িয়ে দিল—সমস্ত বোঝাটা সোজাসুজি গিয়ে পড়ল জনসাধারণের ওপর।

ক্ষুদে জাপানের কাছে চীনের মতো বড়ো দেশ হেরে গেছে দেখে বিদেশীদের সাহস অনেক বেড়ে গেছে। তাই চীনকে ভাগাভাগি করে ভোগ করবার ইচ্ছা প্রবল হল। মজার খেলা শুরু হল। ১৮৯৭ র নভেম্বর মাসে জার্মানি উত্তর-পূর্ব চীনের শানটুং প্রদেশের বিরাট বন্দর সিংতাও দখল করে নিল এই অজুহাতে যে মিশনারি বা পাদ্রীসাহেবকে চীনেরা হত্যা করেছে। মাস পাঁচেকের মধ্যে জার্মানি শানটুং-এর পূর্বাঞ্চল লীজ নিয়ে নিল, অবশ্য জবরদস্তি করে। ৯৯ বছরের লীজ, সুতরাং সে লীজ আইনতঃ এখনও

শেষ হয়নি, ১৯৯৬তে শেষ হবে। জার্মানির এই লীজের তিন সপ্তাহ পরে রাশিয়া পোর্ট আর্থার আর ডেরিয়েন বন্দর জোর করে লীজ নিল অবশ্য মাত্র ২৫ বছরের জন্যে। ইতিপূর্বে জাপান এগুলো দখল করতে চেয়েছিল বলে ইউরোপের শক্তিরা এক সঙ্গে হুমকি দিয়ে জাপানকে হটিয়ে দিয়েছিল। এর পাঁচদিনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড শানটুং প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে সমুদ্রতীরে ওয়েইহাইওয়েই দখল করে ঘাঁটি গেড়ে বসল, চমৎকার আবদারের সুরে বলল রাশিয়া যতদিন পোর্ট আর্থার দখল করে থাকবে আমরাও ততদিন ওয়েইহাইওয়েইর দখল ছাড়ব না। মগের মুল্লুক বলব কি? মগের মুল্লুক বললে মগদের হয়তো অপমান করা হয়! আর কয়েকদিন পরেই আরেকটি সভ্য দেশ, ফ্রান্স, দক্ষিণ চীনের কোয়াংচোয়ান উপসাগর অধিকার করল।

বিদেশী শক্তিগুলো ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে একমত হয়ে চুক্তি করে নিজ নিজ এলাকা ঠিক করে নিল। ইয়াংসি নদীর উপত্যকা ইংল্যাণ্ডের ভাগে পড়ল। বিখ্যাত চীনের প্রাচীরের উত্তরে মাঞ্চুরিয়া এবং মংগোলিয়া জারের রাশিয়ার এলাকা বলে স্থির হল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের দুই অংশীদার ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। পূবের ফুকিয়েন প্রদেশে জাপানীরা কর্তা হয়ে বসল আর উত্তর-পূব অঞ্চলের শানটুং প্রদেশ নিল জার্মানি। কেউ "দখল" কথাটা ব্যবহার করল না। আমার প্রভাব এখানে, তোমার প্রভাব ওখানে—এই ভাবে প্রভাবের এলাকা অর্থাৎ রাজত্ব ভাগ হল।

এই সময় আমেরিকার ইতিহাসে এক নতুন যুগ শুরু হয়েছে। আমেরিকার উত্তর অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলের "গৃহযুদ্ধ" শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিপ্রধান দেশ শিল্প-প্রধান হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয় শিল্প-প্রধান পুরোনো দেশগুলোকে উৎপাদনে হারিয়ে সে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং পৃথিবীর ভাগবাঁটোয়ারায় সেও এখন অংশ দাবী করতে লাগল। ১৮৯৮তে কিউবাকে "মুক্ত" করতে গিয়ে আমেরিকা স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাল। পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী স্পেন তখন বুড়ো থুথ্‌থুড়ো। তাকে হারানো খুব কঠিন হল না এবং লুঠের মালের মধ্যে আমেরিকা পেল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আর গুয়াম—প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। একই সময়ে আমেরিকান মিশনারি ও বাগিচা-মালিকরা কুটিল চক্রান্ত করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার দখলে আনল।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের তখন সবে যৌবন—যত গ্রাস করছে তত খিদে বাড়ছে। গরুড়ের মতো খিদে। ফিলিপাইনের লোকেরা আমেরিকার সঙ্গে একজোট হয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে লড়েছিল স্বাধীন হবার প্রবল আগ্রহে, স্পেনের বদলে আমেরিকাকে নতুন প্রভু হিসেবে বরণ করবার জন্যে নয়। কিন্তু স্পেনকে হটানোর পর আমেরিকা ফিলিপাইনের জনসাধারণকে আক্রমণ করল তাদের এত সাধের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্যে। আমেরিকান সৈনিকরা ফিলিপিনোদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে রক্তে ডুবিয়ে দিল। এও উল্লেখ করা যায় পরে যিনি বিখ্যাত জেনারেল হয়েছিলেন সেই ডগলাস ম্যাকআর্থার তখন অল্পবয়সী লেফটেনান্ট এবং সেই ফিলিপাইনে অত্যাচারী আমেরিকান সৈনিকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন—ভালো খুনী হবার জন্যে শিক্ষানবিশ! এই সময় আমেরিকার আইনসভার একজন সদস্য, বেভারিজ সাহেব বলেছিলেন, "ফিলিপাইন চিরকালের মতো আমাদের হয়ে গেছে··· ফিলিপাইন ছাড়িয়ে খানিক দূরে চীনের বিরাট বাজার—তার কূলকিনারা নেই···কোনওটা থেকেই আমরা পিছু হঠে সরে আসব না···আমাদের জাতির মহান্ কর্তব্যের যে অংশ আমাদের করণীয়, ভগবান্ পৃথিবীর সভ্যতার যে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে আমরা সরে আসতে পারি না।···যে শক্তি প্রশান্ত মহাসাগরকে দখলে রাখবে সেই শক্তিই পৃথিবীকে দখলে রাখবে।······চিরকালের মতো আমেরিকার প্রজাতন্ত্রই সেই শক্তি হিসেবে থাকবে।" [জানুয়ারী, ১৯০০।]

চীনের কূলকিনারাহীন বাজার দখল করবে, প্রশান্ত মহাসাগরকে তার কুঠীবাড়ির খিড়কির পুকুর করবে এত হিম্মৎ আমেরিকার তখনও হয়নি। সুতরাং যতই সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখুক না কেন, এগোতে হবে সাবধানে, নানা ছলাকলার সাহায্যে। তাই আমেরিকা দাবী করল চীনে সবার জন্যে "খোলা দরোজা" নীতি চালু করতে হবে—যাতে গেরস্তর খোলা দরোজা দিয়ে চোর-ডাকাতের ঢুকতে কোনও অসুবিধে না হয়।

ইতিমধ্যে "প্রভাবের এলাকা" ভাগ হয়ে গেছে—সে কথা আগে বলেছি। "খোলা দরোজা" নীতি বলতে আমেরিকা এটাই বোঝাতে চাইল যে প্রত্যেক বিদেশী শক্তির "প্রভাবের এলাকা" যেন তার একচেটিয়া না হয়—যেন ঐরকম প্রত্যেক এলাকায় সব বিদেশী শক্তি সমানভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকার পায়। কূটবুদ্ধি আমেরিকান ধনিকদের এরকম দাবীর

উদ্দেশ্য হল অঢেল ডলারের জোরে প্রত্যেক "প্রভাবের এলাকায়" ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে। অন্যেরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোণঠাসা হয়ে পড়বে তখন তাদের রাজনীতি আর সৈন্যবলের ব্যাপারে উৎখাত করা অনেক সহজ হবে। আমেরিকার আরেকটা উদ্দেশ্যও ছিল। কোনও এলাকার দখল চাইলে লোকে তাকে সাম্রাজ্যবাদী বলবে। অবাধ বাণিজ্যের নীতি চালু করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উদ্দেশ্যও সফল হবে আর বদনামও হবে না। একথা অবশ্য বলে রাখা ভালো "খোলা দরোজা" বা "বন্ধ-দরোজা" কোন্ নীতি চালু হবে সে সম্পর্কে চীনের মতামত কেউ জিজ্ঞেস করছে না, কারণ ঘরের মালিক তো চীন নয়, তাই দরোজার কথা তাকে জিজ্ঞাসা করার মানে হয় না। বিদেশী শক্তিরা, যারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তারাই নীতি ঠিক করবে। এ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা যুক্তভাবে উদ্যোগী হল দেখে অন্য শক্তিগুলো মোটামুটি "খোলা দরোজা" মেনে নিল।

॥ বিপ্লব না সংস্কার ॥

মাঞ্চু সরকারের বাইরের ঠাট যাই থাক ভেতরটা যে পচে গেছে তা চীন-জাপান যুদ্ধে খুব পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মাটির ঠাকুরের রং-চঙে মাটি খসে গিয়ে খড় বেরিয়ে পড়েছে। যারা চিন্তাশীল, একটু এগিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের এই ধারণা হয়েছে যে মাঞ্চু-রাজত্ব আরও চললে চীনদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

এহেন সময়ে ডক্টর সুন ইয়াৎ-সেনের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি গণতন্ত্র চান এবং বিপ্লব চান। ডাক্তারি বা চিকিৎসাই তাঁর পেশা ছিল কিন্তু তিনি সে পেশা ছেড়ে দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ব্যাবাম সারাবার কাজে লেগে গেলেন। প্রথমটা তাঁর ধারণা ছিল সরকারের কাছে আর্জি পেশ করলে সুফল পাওয়া যাবে, দেশের মানুষের উপকার করা যাবে। ক্রমে সে ভুল ধারণা কাটল, তিনি বুঝলেন মাঞ্চু সরকারকে উৎখাত না করলে স্বাধীন ও সুখী সমাজ এদেশে গড়ে তোলা অসম্ভব। সরকারকে উৎখাত করতে হলে সংগঠন চাই। তাই সুন ইয়াৎ-সেন সংগঠন গড়ার কাজে লাগলেন।

চীনে যে নতুন দিশী পুঁজিপতিরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তাদের মধ্যে কিছু লোক রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। সুন ইয়াৎ-সেন ছিলেন এই পরিবর্তনপন্থীদের প্রতিনিধি। "পশ্চিমী" ঢঙে যে মাঞ্চু আমলারা একচেটিয়া শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিল তারা ব্যর্থ হওয়ার পর দক্ষিণ ও মধ্য চীনে এই পরিবর্তনপন্থী পুঁজিপতিরা কিছুটা জোরদার হয়ে উঠেছিল। ইয়াংসি উপত্যকায় এরা প্রায় ৩০টা কাপড়ের কল ব্যক্তিগত-মালিকানায় চালু করেছিল। এরা সুন ইয়াৎ-সেনের পেছনে ছিল। বিদেশে নানা জায়গায় যে চীনেরা ছিল সুন তাদেরও প্রতিনিধি। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে বিদেশীদের চাপে মাঞ্চু সরকার চীনের জমিহীন চাষীদের এবং শহুরে গরীবদের বিদেশে মজুর হিসেবে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। এই হতভাগ্যরা "কুলি" হিসেবে আমেরিকা, কানাডা, মালয়, প্রশান্তমহাসাগরের ওলন্দাজদের দখলী দ্বীপগুলোতে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে নিউ ক্যালিফোর্নিয়া দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কলকারখানার মালিক হয়ে উঠেছিল! কিন্তু বিদেশীরা তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত করত কারণ তারা অন্য জাত, আধা-উপনিবেশের লোক, স্বাধীন নয়। তাদের প্রবল ইচ্ছা যে এক শক্তিশালী স্বাধীন ও আধুনিক চীন মাথা তুলে দাঁড়ায় কারণ তাহলে তারা বিদেশে যে যেখানে আছে সেখানে এই নয়া চীন সরকারের কাছ থেকে মদৎ পাবে, খুঁটির জোরে লড়তে পারবে। বিদেশে যেসব চীনে ব্যবসাদার আছে তারা স্বদেশে পুঁজি খাটাতে চায় অথচ পিছি ' যায় কারণ স্বদেশে বিদেশীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তাই তাদেরও ইচ্ছা মাঞ্চু আর বিদেশী শক্তিগুলোকে হটিয়ে দিয়ে স্বাধীন নয়া চীন জন্মলাভ করুক। তারা চায় একটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র অর্থাৎ আইনসভার মারফৎ যেখানে শাসন চলে বলে মনে হয় এমন একটি গণতন্ত্র চীনে হোক। এখানে বলে রাখা ভালো যে আসলে কিন্তু কোনও সরকারই আইনসভার ওপর নির্ভর করে দাঁড়াতে পারে না। তার আসল শক্তি হচ্ছে, পুলিশ মিলিটারি, জেল, গুলি, আমলাতন্ত্র। যাক সে কথা, চীনের ইতিহাসের এই যুগে সুন ইয়াৎ-সেনও ইউরোপের অনুকরণে চীনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর মত বদলেছিল।

১৮৯৪তে সুন ইয়াৎ-সেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলুতে যান। সেখানে জন

কুড়ি চীনে ছোটো দোকানদার এবং ক্ষেতখামারের মালিকদের নিয়ে একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির নাম হয় সিং চুং হুই—"চীনের পুনর্জীবন সমিতি"। সেবছরই তিনি চীনে ফিরে এলেন। ১৮৯৫তে সুন কেলাও হুই বা "প্রবীণ সমিতি" নামের একটি গোপন সমিতির সাহায্য পেয়ে দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটালেন। ব্যাপারটা গোপন থাকল না। বিদ্রোহ ব্যর্থ হল।

চীনে এই সময় আরেক ধরনের আন্দোলন ছিল। সে আন্দোলন বিপ্লবী নয় অর্থাৎ আমূল পরিবর্তন চায় না, কিছু সংস্কার চায় অর্থাৎ কোনও কোনও বিষয়ে কিছু কিছু অধিকার, জনসাধারণের কিছু উপকার হয় এমন পরিবর্তন হোক এই চায়। এই অবিপ্লবী সংস্কার আন্দোলন দেখা দিল আমলা শ্রেণীর এক অংশের মধ্যে এবং শিক্ষিতদের এক অংশের মধ্যে। তারা কাদের প্রতিনিধি? শিল্প ও বাণিজ্যের বেশ টাকাওয়ালা বিপ্লবভীরু মালিকশ্রেণীর তারা প্রতিনিধি। এদের জন্ম জমিদারশ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বা ব্যবসাদার ও শিল্পমালিক শ্রেণী থেকে। "পশ্চিমী" ঢঙে যে সামন্ত দল দেশেব শিল্পব্যবসা গডতে চেয়েছিল তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে। তারা ভেবেছিল যে শুধু "পশ্চিমী" কায়দাকানুন ধার করলেই পুরোনো সামন্ত সমাজকে টিকিয়ে রাখা যাবে।

নতুন সংস্কারপন্থী দলের লক্ষ ছিল অন্যরকমের। তারা মান্ধাতার আমলের রাজশক্তিকে জাপানী ছাঁচে নতুন করে গড়তে চাইল। এই নতুন রাজতন্ত্রে বুর্জোয়ারা সামন্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করবে। রাজা হবেন তাদেরই হাতের পুতুল—যা বলাবে তাই বলবেন, যা লিখতে বলবে তাই লিখবেন—পুরো সাক্ষীগোপাল। এদের এই পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শ সুন ইয়াৎ-সেনের দলের মতোই ছিল কিন্তু একটা গুরুতর ব্যাপারে সুন ইয়াৎ-সেনের দলের সঙ্গে এদের দারুণ অমিল ছিল—এরা সে দলের মতো মাঞ্চুদের পুরোপুরি উৎখাত করার পক্ষপাতী ছিল না। সংস্কারপন্থী দলের নেতা ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, নাম—কাং ইউ-ওয়েই। ইউরোপের রাজনীতি এবং চীনের প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি তাঁর ভালোই পড়া ছিল। তাইপিং কৃষকবিদ্রোহী-দের কাণ্ডকারখানার কথা ভাবলে এই সংস্কারপন্থী ভদ্রলোকদের গা

শিউরে উঠত। তাই মাঞ্চু সরকারকে সংস্কারের কথা বলবার সময় এঁরা বললেন: আমূল পরিবর্তনের কোনও দাবী নিয়ে আমরা আসছি না, মোটামুটি কিছু সংস্কার করুন, তা না হলে নতুন করে আবার তাইপিং বিদ্রোহের মতো ভয়ানক কৃষকবিদ্রোহ হবে, তখন বিপদে পড়বেন। সুন ইয়াৎ-সেনের "চীনের পুনর্জীবন সমিতি" কিন্তু তাইপিং বিদ্রোহকে শ্রদ্ধা করত। তবে কার্যত সুনের দলেরও কৃষকজনতার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই কম ছিল। পুনর্জীবনের দল আশা করত যে শিক্ষিত যুবক আর সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাহায্যে গোপন ষড়যন্ত্রের মারফৎ মাঞ্চুদের গদী থেকে হটানো যাবে।

১৮৯৫তে শিমোনোসেকি চুক্তি যখন সই হতে চলেছে তখন কাং ইউ-ওয়েই পিকিং-এ। তিনি সরকারী চাকরীর জন্যে পরীক্ষা দিতে এসেছেন। দেশের সেই সংকট মুহূর্তে বিচলিত হয়ে কাং তাঁরই মতো হাজার পরীক্ষার্থীর একটি আবেদন সম্রাট কুয়াং সুকে দিতে চান। আবেদনে সম্রাটকে অনুরোধ করা হয় তিনি যেন দেশের স্বার্থের দিকে নজর রেখে শিমোনোসেকি চুক্তিতে সই না দেন এবং তাড়াতাড়ি শাসনব্যবস্থার সংস্কার করেন। আমলারা কাং-এর আবেদন সম্রাটের কাছে পৌঁছতে দিল না। কিন্তু কাং এই আবেদন কাগজের মারফৎ প্রচার করলেন। কাং প্রচারের কাজে দেশের অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করেন। আন্দোলনের ফলে নানা জায়গায় রাজনৈতিক বিষয়ে পড়াশোনা ও আলোচনার জন্যে পাঠ-চক্র গডে ওঠে। বছর ঢু বাদে কাং ইউ-ওয়েই সম্রাটের কাছে আরেকটি আবেদন পাঠান এবং এবার আবেদন সম্রাটের হাতে পৌঁছয় কারণ ছেলেমানুষ সম্রাট ইতিপূর্বে নাবালক ছিলেন, সম্প্রতি সাবালক হয়েছেন। কাং-এর চেষ্টায় সংস্কার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল—সমাজের ওপরতলার শিক্ষিত লোকদের আন্দোলনের রূপ নিল। কাং এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে তরুণ সম্রাট অদ্ভুত কাণ্ড করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ফর্মানের পর ফর্মান ছাড়তে লাগলেন—লোকের তাক লেগে গেল। তিনি হুকুম করলেন প্রাচীন বিদ্যার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সরকারী চাকরীতে ঢোকার পরীক্ষাব্যবস্থা বাতিল হল, মন্দির আর মামুলি শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে আধুনিক কলেজ এবং হাই স্কুলে পরিণত করতে হবে, শিল্পের উন্নতির জন্যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে, কৃষি,

শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যে একটি কমিটি করা হল এবং এই কমিটি সরাসরি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করতে পারবে এবং এই কমিটির কাজ হবে রেললাইন বসানো বা বাড়ানো, শিল্প ও খনির উন্নতি করা, সব প্রদেশে কৃষি ও কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্ষেতখামারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার চালু করা। আরও কিছু ফর্মান জারী করে বলা হল যে আদালতের বিচারব্যবস্থার সংস্কার হবে, সর্বসাধারণের জন্যে মিলিটারি ট্রেনিং হবে, যেসব মাঞ্চু আমলারা কোনও কাজ না করে মোটা মাইনে নিচ্ছে তাদের চাকরী বাতিল হবে, সৈনিকরা সাবেকী কায়দায় পরের পরিশ্রমে আরামে থাকতে পারবে না, তারা নিজেদের খোরাক যোগাড় করবার জন্যে চাষের কাজ করতে বাধ্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাং ইউ-ওয়েই এবং তার দলের অন্য সংস্কারপন্থীরা ভয়ানক খুশি হল। নতুন দিনের স্বপ্নে মশগুল হয়ে তারা ভাবল সংস্কার কত সহজ—সম্রাট ফতোয়া দিচ্ছেন অতএব আমলারা হুকুম তামিল করতে বাধ্য। সংস্কার ঠেকায় কে? কিন্তু এই পণ্ডিত-মূর্খেরা জানতেন না যে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের আসল ক্ষমতার চাবিকাঠিটি ছিল সম্রাটের হাতে নয় একদল সংস্কারবিরোধী সামন্ত বা জমিদারের হাতে। তাদের নেতা ছিলেন নাবালক সম্রাটের অভিভাবিকা এবং জ্যাঠাইমা—বিধবা সম্রাজ্ঞী ৎজু সি। তিনি সংস্কারের কথা সহ্য করতে পারতেন না তাই সংস্কারের বদলে হল সরকারী হামলা। কুচক্রী সামন্তদের পরামর্শে সাম্রাজ্ঞীর হুকুমে তরুণ সম্রাট বন্দী হলেন এবং দশ বছর বন্দী থাকার পর ১৯০৮এ মারা গেলেন। কাং এবং তার কিছু সহকর্মী পালিয়ে বাঁচলেন, যাঁরা ধরা পড়লেন তাঁদের অনেকের জেল হল এবং কয়েকজন নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল। এই সংস্কার আন্দোলন একশ' তিন দিন স্থায়ী হয়েছিল। তাই পরে এর নাম হয়েছিল "একশ' দিনের সংস্কার"।

এই সংস্কারপন্থীরা উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্‌ও বটেন। কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি, কোনও কাজে লাগে না যদি না আমরা বুঝি সমাজের শোষকদের হটাতে গেলে কোন্ শ্রেণীকে জাগাতে হবে, কাদের জঙ্গী করে তুলতে হবে। সেদিনকার চীনে দেশের শোষণকারী সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতার ভিৎ কি ছিল? জমিদারী ব্যবস্থা বা সামন্তপ্রথা। অথচ অগুণ্‌তি

কৃষকদের জন্যে সংস্কারপন্থীরা কোনও কাজই করেননি, তাদের কোনও দাবীই সম্রাটের ফর্মানে স্থান পায়নি। কিন্তু জমিদারী শোষণের ওপর নির্ভর করে যে শাসন-ব্যবস্থা চলছে তাকে ভাঙবে কে, শোষিত কৃষকরা নয় কি? মাঞ্চু শাসনব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল চীনের কৃষকদের কড়া-পড়া হাতে, পাঁজর-জাগা বুকে। তাদের বাদ দিয়ে সমাজ-বদলানোর স্বপ্ন সফল হবে কি করে?

সংস্কারপন্থীদের আরেকটা ভুল—তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের আসল চরিত্র বুঝতে পারেননি। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে চীন পিছিয়ে আছে বলেই পৃথিবীর এগিয়ে থাকা জাতিগুলোর আসরে সম্মান পাচ্ছে না। সুতরাং ইউরোপের অনুকরণ করে পশ্চিমী দেশগুলোব মতো হতে পারলে আর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হবে না, বরং ইউরোপের শক্তিগুলোর সাহায্য পাওয়া যাবে। চীনের বুর্জোয়ারা এই প্রথম রাজনৈতিক লড়াইতে নেবেছিল। তাদের হার হওয়ায় বুর্জোয়া রাজনীতির দুর্বলতা লোকের চোখে ধরা পড়ল। সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে আপোষ-রফা করে রাজনৈতিক আন্দোলন যে এগোতে পাববে না—ইতিহাস চীনের মানুষের সামনে তা তুলে ধরল। সংস্কারপন্থীদের প্রভাব কমে যাওয়ায় সুন ইয়াৎ-সেনের দলের কাজের সুবিধে হল। কিন্তু তাঁদেব এগোতে সময় লাগল। ইতিমধ্যে চীনের কৃষকরা আরেকবার রাগে ক্ষোভে ফেটে পডল। এবারে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা। এখন আমরা বক্সার বিদ্রোহের আগুনের মুখোমুখি।

॥ ঈ হো তুয়ান ॥

বক্সার বিদ্রোহ। নামটা শুনলে মনে হয় বক্সাব একটা জায়গার নাম। কিন্তু নামটা এসেছে বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধ থেকে, বক্সার মানে মুষ্টিযোদ্ধা, ঘুষোঘুষি খেলার খেলোয়াড়। বিদেশীরা এই বিদ্রোহীদের বক্সার নাম দেয় এই জন্যে যে এদের সংগঠন বা সমিতি তাদের যে শরীর তৈরির শিক্ষা দিত তার মধ্যে বক্সিং বা ঘুষোঘুষি খেলার মতো একটা ব্যাপার ছিল। চীনেরা নিজেদের ভাষায় এই বিদ্রোহী সমিতিকে বলত ঈ হো তুয়ান—"ন্যায় ও শৃংখলা সমিতি"। বক্সার বিদ্রোহ চীনের আরেকটি প্রচণ্ড

কৃষক বিদ্রোহ। এই বিরাট বিদ্রোহের জমি কেমন করে তৈরি হয়েছিল তা একটু বলা দরকার।

বিদেশী ব্যবসাদারেরা চীন-জাপান যুদ্ধের পর থেকেই লক্ষ মুখ দিয়ে চীনের রক্ত শুষতে শুরু করেছে। চীনের রপ্তানি বাণিজ্যকে তারা কাবু করে ফেলেছে বেশি বেশি বিদেশী মাল আমদানি করে। বিদেশের কলের কাপড় আর কলের সুতো এসে চীনের বাজার ছেয়ে ফেলল। এতে শহর আর গাঁয়ের হাতের কাজের কারিগররা ধ্বংস হতে চলল। গাঁয়ের কয়েক কোটি মেয়ে আর পুরুষ কারিগরের রুজি কেড়ে নিল বিদেশী কাপড় আর সুতো। রেল আর টেলিগ্রাফ চালু হওয়াতে বেকার হল লাখে লাখে সেই হতভাগারা যারা জলপথে আর ডাঙ্গায় মালপত্র বইত। বিদেশীদের খেসারত দিতে গিয়ে মাঞ্চু সরকার জনসাধারণের টুঁটি টিপে বেশি বেশি ট্যাক্স আদায় করতে লাগল। বিদেশ থেকে মোটা ঋণ করেছে বলে সুদে-আসলে ঋণ শুধতে গিয়ে প্রজাদের পকেটে বেশি করে হাত দিতে বাধ্য হল মাঞ্চু সরকার। ফলে সব ট্যাক্সই বাড়ল। জমিদারের চেয়ে পেয়াদার দাপট বেশি। সরকারের ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে তারা নিজেদের পকেট ভারী করতে লাগল। সরকারী ট্যাক্সের চার গুণ পেয়াদারা আদায় করেছে এরকম দৃষ্টান্ত চীনের ইতিহাসে ভূরিভূরি।

মানুষের অত্যাচারের সঙ্গে প্রকৃতির অত্যাচারও এই সময় প্রজাদের জীবন দুঃখময় করে তুলেছিল। ১৮৯৭ এবং ৯৮র বন্যায় অসংখ্য লোকের চরম দুর্গতি হয়েছিল। ঘর ভেসে গেছে, গাছের বাকল আর ঘাসের বীচি খেতে হচ্ছে, শিশুদের বিক্রি করে দিতে হচ্ছে, দুমুঠো ভাতের জন্যে ভবঘুরে হতে হচ্ছে— এমনি দুর্যোগ নেবে এসেছিল লক্ষ লক্ষ চাষীর জীবনে উত্তর-পূর্ব চীনের হোপেই আর মধ্য চীনের পূর্ব অঞ্চলের কিয়াংসু ও শানটুং প্রদেশে। অগুণতি ক্ষেত-খামার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ, সামন্ত শাসকদের শোষণ আর প্রকৃতির নিষ্ঠুর অত্যাচার জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলল। ১৮৯৫ থেকে দেশের নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ হতে লাগল। মধ্যচীনে পূব অঞ্চলের আনহোয়েই ও কিয়াংসু, পূবে সমুদ্রতীরের শাংহাই ও অ্যাময় বন্দর এলাকায়, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউনানে, মধ্য চীনের পশ্চিম অঞ্চলে জেচুয়ান প্রদেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই সব

বিদ্রোহে বিদ্রোহীরা বিদেশী মিশনারিদের আক্রমণ করেছিল। কেন এই আক্রমণ?

যে সময়ের কথা বলছি তখন শানটুং-এর লোকেরা, বলতে গেলে উত্তর চীনের সকলেই, মিশনারিদের ওপর দিনকে দিন বেশি ক্ষেপে উঠছিল কারণ তারা নিজ নিজ দেশের সরকারের দালাল হিসেবে প্রত্যেক অঞ্চলে আগে আসত পরে প্রভুদের আসবার রাস্তা তৈরি করবার জন্যে। সাধারণ মানুষের রাগ চরমে উঠল ১৮৯৯-র মার্চ মাসের সরকারী ফর্মানের কথা শুনে। কারণ তাতে বলা হল যে সব দেশের রোমান ক্যাথলিক মিশনারিদের কতকগুলো বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে—দেশের সবাই যেন তাদের এই সব বিশেষ ক্ষমতা মেনে নিয়ে কাজ করে। বিদেশী সরকারের আমলাদের অসুবিধে হচ্ছে এই যে, তারা চীনের সর্বত্র যেতে পারে না। চুক্তি অনুযায়ী কতকগুলো বন্দরে তাদের স্থান, তার বাইরে তাদের আইনত যাওয়া বারণ। কিন্তু মিশনারিরা অবাধে আইনত দেশের সব জায়গায় যেতে পারে সুতরাং নিজ নিজ দেশের সরকারের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করার অফুরন্ত সুযোগ তাদের। এবং সে সুযোগ এই বকধার্মিকরা পুরোপুরি নিয়েছিল। যখন বিদেশী কসাইরা দেশটাকে নিজেদের ব্যবসার সুবিধের জন্যে টুকরো করবে বলে ছুরিতে শান দিচ্ছে তখন মিশনারিদের কার্যকলাপ লোককে ক্ষেপিয়ে তুলতে বাধ্য। ১৮৯৯ থেকে ১৯০১ অবধি বিদেশীদের বিরুদ্ধে আর মিশনারিদের বিরুদ্ধে চীনের মানুষের ঘৃণার আগুন যেভাবে ঝড়ের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তা দেখে ইউরোপের কোনও কোনও ইতিহাস-লেখক চীনে বিদ্রোহীদের পাগলের মতো ব্যবহারের কঠোর নিন্দা করেছেন। কিন্তু চীনেদের এ রাগ মোটেই পাগলের মতো নয়, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং তাদের স্বদেশপ্রেমেরই প্রমাণ। চীনে বিদ্রোহীরা চীনে খ্রীস্টানদেরও তখন সহ্য করতে পারেনি—তাদের ধরে নিয়েছে বিদেশী আক্রমণকারীদের সাঙ্গাৎ বলে, পোষা দালাল বলে। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বিদেশী মিশনারিরা তাদের সরকারগুলোর জন্যে খোলাখুলিভাবে খবর সংগ্রহ করত চীনের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে, চীনের শস্য, খনি ইত্যাদি সম্পদ সম্বন্ধে এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও কলকারখানা গড়ে তোলার সুবিধে-অসুবিধে সম্বন্ধে। মিশনারিদের এমনি দাপট যে বিভিন্ন অঞ্চলের

আমলারা তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে চাষীদের জমি কোথাও কোথাও কেড়ে নিত। কোনও কোনও মিশনারি আবার তাদের গির্জায় আদালত বসাত চাষীদের নিষ্ঠুর শাস্তি দেবার জন্যে। কোনও কোনও পাদ্রী সাহেবের এত বাড় বেড়েছিল যে তারা মাঞ্চু সরকারের আমলাদের তাদের হুকুম মেনে চলতে বলত। চীনের সাধারণ লোক আর মিশনারিদের মধ্যে কোনও মামলা হলে, সে অঞ্চলের সরকারী আমলারা বেহায়ার মতো সব সময় মিশনারিদের পক্ষ নিত। সেই জন্যেই চীনের শোষিত জনসাধারণ এই ছদ্মবেশী ধার্মিকদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করত।

বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা আর তাদের দালাল মিশনারিদের প্রতি ঘৃণা বক্সার বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়ে।

একেবারে গোড়াতে এই বিদ্রোহীদল, ঈ হো তুয়ান, ছিল মাঞ্চু-বিরোধী একটি গোপন সমিতি। এর কাজ ছিল চাষী আর হাতের কাজের কারিগর-দের মধ্যে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সমিতি মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন জার্মানি শানটুং-এর পূবে কিয়াওচাউ উপসাগরে সৈন্য নাবাল এবং জোর করে কিয়াওচাও থেকে উত্তর-পশ্চিমে সিনান পর্যন্ত রেল লাইন তৈরি করতে শুরু করল তখন প্রধানত এই বক্সাররাই শানটুং প্রদেশে বিদেশী আক্রমণের মোকাবেলা করতে এগিয়ে এল।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে তাইপিং বিদ্রোহীরা খ্রীস্টধর্মের পতাকা নিয়েলড়াইয়ে নেবেছিল কিন্তু এবারকার কৃষক-বিদ্রোহীরা খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে কোটি কোটি কৃষক ও অন্যশ্রেণীর লোককে বিদেশীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সামিল করল। এর কারণ তাইপিংদের সময় চীন দেশে খ্রীস্টধর্ম ছিল একটা নতুন জিনিস এবং সামন্ত প্রভুরা জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার জন্যে যেসব প্রচার চালাত তার বিরুদ্ধে তাইপিংরা খ্রীস্টধর্মকে কাজে লাগাত। বক্সারদের সময় খ্রীস্টধর্মের প্রচারক মিশনারিদের চরিত্র কি রকম হয়েছিল তা আমরা দেখলাম। তারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ দালাল হয়ে কাজ করছিল। চীনের জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কোন্ বিদেশীদের হাতের কাছে পেল? মিশনারিদের। প্রতিদিনের জীবনে এদের সঙ্গেই তাদের সরাসরি যোগাযোগ হয়। মেকি মমতা দেখিয়ে আর দয়ালুতার ভান করে এই মিশনারিরা চীনের সাধারণ মানুষের ঘাড় ভেঙে

আরাম-আয়েসে দিন কাটায়। সুতরাং জনতার রাগ গিয়ে পড়ল এদের ওপর। এইভাবেই আগুন জ্বলে ওঠে। অবশ্য মাঞ্চুরা দুর্বল এবং অক্ষম না হলে মিশনারিরা এত বাড়াবাড়ি করতে পারত না, সাম্রাজ্যবাদীরাও না।

সে যুগের ইউরোপের নামকে ওয়াস্তে ভদ্রলোকেরা চীনেদের নিন্দা করেছেন বিদেশীদের তারা ঘৃণা করে বলে। এ সম্বন্ধে লেনিনের কথা মনে রাখবার মতো। তিনি বলেছেন: "এটা সত্যি যে, চীনেরা ইউরোপীয়ানদের ঘৃণা করে। কিন্তু তারা কি রকমের ইউরোপীয়ানদের ঘৃণা করে এবং কেন ঘৃণা করে? চীনেরা ইউরোপের জনসাধারণকে ঘৃণা করে না—তাদের সঙ্গে চীনেদের কোনও বিরোধ নেই। তারা ঘৃণা করে ইউরোপের পুঁজিবাদীদের এবং পুঁজিবাদীদের চাকর ইউরোপের সরকারগুলোকে। যারা চীনে এসেছে শুধু টাকা কামাবার জন্যে, যারা তাদের নামকে ওয়াস্তে সভ্যতাকে ব্যবহার করে ঠগবাজি, লুঠ এবং হামলা করবার কাজে, যে আফিং মানুষের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেয় সে আফিং বিক্রি করবার জন্যেই যারা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছে, যারা ভণ্ডামি করে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করে তাদের লুঠতরাজকে আড়াল করবার জন্যে—সেই সব লোকদের চীনেরা ঘৃণা না করে পারবে কি করে?"

ইতিপূর্বে বলেছি যে, বক্সার বিদ্রোহ মাঞ্চু-বিরোধী ছিল। কিন্তু চিং বংশের শাসকরা অল্প কিছুদিন ঈ হো তুয়ানকে ধাপ্পা দিতে পেরেছিল। তারা গায়ে হাত বুলোনোর কায়দা নিল। ফলও ফলল। ঈ হো তুয়ানের কিছু সভ্য বিভ্রান্ত হল। চিং বংশের শাসকদের সম্বন্ধে তাদের দুর্বলতা দেখা দিল। ঈ হো তুয়ানের কতকগুলো শাখা তাই আওয়াজ তুলল "চিংকে সমর্থন কর আর বিদেশীদের খতম কর"। সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের তখনও মানুষ খুব ভালো করে চিনতে শেখেনি।

সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম থেকেই এই কৃষক-আন্দোলনকে কুনজরে দেখছিল। আন্দোলনের জোর বাড়তে দেখে তারা তাদের তাঁবেদার মাঞ্চু সরকারকে বলল আন্দোলন দমন করতে। আন্দোলনের ঘাঁটি শানটুং প্রদেশ। মাঞ্চু সরকার সেখানকার পুরোনো গভর্নরকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে নতুন একজন গভর্নর পাঠাল। নতুন গভর্নর সেখানে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই তার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে বক্সারদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদের অনেককে হত্যা করাল। কিন্তু মানুষ কেটে আন্দোলন

দাবানো যায় না। বক্সারদের বিদেশী-বিরোধী লড়াই জোরদার হতে লাগল।

১৯০০-র শুরুতে শানটুং থেকে বক্সাররা উত্তরে হোপেই প্রদেশে ঢুকল এবং গোটা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল। পিকিং-তিয়েনৎসিন রেল লাইন কেটে দিল। হোপেইর পশ্চিমে শানসি প্রদেশে এবং উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম চীনের নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিল। বন্যার মতো তার বেগ। রাজধানী পিকিং এবং বিখ্যাত বন্দর তিয়েনৎসিন বিদ্রোহীদের প্রায় পুরো দখলের মধ্যে এসে পড়ল। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পিকিং-এর যে অংশ বিদেশীদের বসবাসের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সেই অংশটা "ঘেরাও" করল। সেটা ১৯০০ সালের বসন্তকাল। বক্সাররা পিকিং-এর গির্জাগুলোর দেয়ালগুলোকে বিদেশী-বিরোধী পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে ফেলল আর মিশনারিদের আশ্রমের ওপর হামলা করতে লাগল। এদিকে বিদেশীরাও বসে রইল না। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ইটালি, জারের রাশিয়া, জার্মানি এবং ফ্রান্স কাছের সমুদ্রে যুদ্ধ-জাহাজগুলোর মহড়া দেখাল এবং তিয়েনৎসিন ও পিকিং-এ সৈন্যদল পাঠাল। সাম্রাজ্যবাদীদের এই সশস্ত্র হস্তক্ষেপ বক্সার বিদ্রোহীদের ও মাঞ্চু সৈন্যদের কাছে প্রচণ্ড বাধা পেল। যখন আটটি বিদেশী শক্তির সৈন্যরা পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন মাঞ্চু সরকার তাদের বিরুদ্ধে সরকারী-ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সৈন্যদের নির্দেশ দিল বিদেশীদের হটিয়ে দেবার ব্যাপারে ঈ হো তুয়ানকে অর্থাৎ বক্সারদের পুরো মদৎ দিতে। এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হল? মাঞ্চুরা রাতারাতি এত স্বদেশপ্রেমিক বনে গেল কি করে?

একটু পেছনের দিকে যেতে হবে। কাং ইউ-ওয়েইর সংস্কার আন্দোলনের দরুণ খোকাসম্রাট কুয়াং সু'র পতন হয়েছিল আমরা জানি, কারণ তিনি সে আন্দোলনের সমর্থনে ফর্মান জারী করে কতকগুলো সংস্কার বা পরিবর্তন চালু করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেগুলোকে ধূলিসাৎ এবং খোকাসম্রাটকে বন্দী করেছিলেন বিধবা সম্রাজ্ঞী ৎজু সি। সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছা ছিল সম্রাটকে চিরকালের মতো সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করা, কিন্তু এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে বাধা দেয়। সুতরাং তাঁর মনের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রাগ পুষে রেখেছিলেন।

ঈ হো তুয়ানরা যখন পিকিং-এ ঢুকে পড়ল তখন তাদের বাহিনীতে শুধু শহরের লোকেরাই যে যোগ দিল তা নয়, মাঞ্চু সরকারের অনেক আমলাও তাদের সাহায্য করতে লাগল। এখানে আরেকটা কথাও না বললেই নয়। তাইপিংদের আন্দোলন ছিল সামন্ত-বিরোধী কিন্তু ঈ হো তুয়ানদের আন্দোলন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলে এটার চরিত্র তাইপিং বিদ্রোহের চেয়ে জটিল বা প্যাঁচালো ছিল। তাইপিংদের শেষ পর্যন্ত কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল। আর ঈ হো তুয়ানরাও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়েনি বললে ভুল বলা হবে। আসল কথা হচ্ছে চীনা জনগণ তখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারেনি। লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে তাদের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল।

এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারব মাঞ্চু সরকার কোন্ মতলবে বক্সারদের পক্ষ নিল। সম্রাজ্ঞী বক্সারদের শক্তি দেখে ভয় পেয়েছেন এবং স্থির করেছেন যে, এ জোয়ারের স্রোতটাকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দিকেই আপাতত বইয়ে দেওয়া যাক। তাঁর ইচ্ছা একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের একটু খোঁচা দেওয়া, আরেকদিকে ঈ হো তুয়ান দলকে ভেতর থেকে দুর্বল করা। এই উদ্দেশ্যে সম্রাজ্ঞী বক্সার নেতাদের অনুগ্রহ দেখালেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং "সাধু সজ্জন" এই পদবী দিয়ে তাঁদের সম্মান করলেন। আর কথা দিলেন তাঁদের সব রকমে সাহায্য করবেন।

আগেই বলেছি যে, সরকারী সৈন্যবাহিনী ঈ হো তুয়ান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পিকিং-এর যে অংশে বিদেশীরা বাস করত সে অংশ "ঘেরাও" করেছিল। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে তারা সে অঞ্চলটা দখল করল না। কারণ তলায় তলায় সম্রাজ্ঞীর হুকুম ছিল দখল না করবার। গোপনে গোপনে মাঞ্চু সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল—কখনও সম্পর্ক ছেদ করেনি। এমন কি পিকিং-এ যখন যুদ্ধ চলেছে তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে মহারানী ৎজু সি চাকরানীর মতো এই ভাষায় আবেদন করেছেন: "আমাদের মহান দেশ............কখনও দেশ-দখলের কিছুমাত্র লোভ দেখায়নি।" তিনি ও তাঁর সরকার বিদেশী সরকারগুলোকে অনুনয় বিনয় করে বলেছেন যে, তাঁরা যেন মাঞ্চু রাজ-বংশকে শুধু তার বাইরের কাজ দেখে ভুল না বোঝেন এবং ভুল করে এই

সিদ্ধান্ত না করেন যে এই রাজবংশ সত্যিই জনসাধারণকে খাতির করে চলেছে। শেষ অবধি আবেদনে এই কথা বলা হয় যে, সৈন্যবাহিনীর খরচ চালাবার জন্যে মাঞ্চু সরকার কেমন করে টাকা সংগ্রহ করবেন ভেবে কূল পাচ্ছেন না, এই জটিল অবস্থা থেকে বেরোতে হলে "আপনাদের মহান্ দেশের কাছে হাত পাতা ছাড়া অন্য উপায় দেখা যাচ্ছে না।" একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এভাবে ভিখিরির মতো সাহায্য চাইছে আরেক দিকে বক্সার বিদ্রোহীদের সঙ্গে জুটে বিদেশীদের সঙ্গে লড়ার ভান করছে। "যুক্তফ্রন্ট" বটে!

আরও কথা আছে। বিদেশীর কাছে নিজের সৈন্যবাহিনীর জন্যে টাকা চাওয়ার মানে কি? মানে, ঘুষ চাওয়া, এই বলা—যদি ঘুষ দাও তবে আমাদের সরকারী বাহিনীর মুখ ঘুরিয়ে বক্সারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বিদেশীদের সাহায্য পাবার জন্যে মহারানীর দয়া উথ্‌লে উঠল। তাঁর সৈন্যেরা পিকিং-এর যে বিদেশী এলাকা "ঘেরাও" করে আছে মহারানী সেখানে বিদেশীদের বাঁচাবার জন্যে গোপনে খাদ্য পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। মাঞ্চু শাসকদের রাজনীতি গোটা দেশে এই সময় দুটি ধারায় বইতে লাগল। একদিকে বিধবা মহারানী এবং উত্তর চীনের বেশির ভাগ সরকারী আমলা। ঈ হো তুয়ানদের তোপের মুখে তাদের সমর্থন করার ভান করতে লাগলেন এঁরা। অন্য দিকে পূব এবং দক্ষিণ চীনের বড়লাট ও ছোটলাটরা। এঁরা ঈ হো তুয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণের এলাকা উত্তর চীন থেকে অনেক দূরে রয়েছেন এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। তাছাড়া বছর চল্লিশেক আগে তাইপিং বিদ্রোহের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা এঁদের হয়েছে। তাই এঁরা স্থির করেছেন যে, বিদ্রোহীদের দাবিয়ে রাখাই এঁদের প্রধান কর্তব্য এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের আঁচল ছেড়ে যাওয়া মূর্খামি হবে, শক্ত করে ধরে থাকতে হবে—নইলে রক্ষে নেই। এর ফলে যখন আটটি বিদেশী শক্তির যুক্ত বাহিনী উত্তর চীন আক্রমণ করল তখন পূব ও দক্ষিণের এই "স্বদেশপ্রেমিকরা" সেই বিদেশী শক্তিদের সঙ্গেই রাজনৈতিক ও ব্যবসাসংক্রান্ত সম্পর্ক অটুট রেখে চলল।

এই যে দুটি ধারার কথা বললাম, আসলে কিন্তু এ দুটি একই ধারার দুটি দিক মাত্র। পূব এবং দক্ষিণের প্রদেশগুলোর বড়লাট-ছোটলাটরা যে নীতি গ্রহণ

করলেন পিকিং-এর জমিদার-প্রধান সরকার তা মঞ্জুর করলেন, কারণ বিদেশীর সঙ্গে সহযোগিতা আর দেশের লোককে শোষণ করা এই তো মাঞ্চু নীতির মূল কথা। জমিদারদের সরকার কখনও কি কৃষক-বিদ্রোহ বরদাস্ত করতে পারে?

॥ ভয়ঙ্কর : মূল্যবান ॥

আট-আটটি বিদেশী শক্তির সৈন্যবাহিনী পিকিং-এ এসে পৌঁছল। হাজার হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুর রক্তে ভেজা পথ দিয়ে তারা রাজধানীতে এসে পৌঁছল। বিদেশী ফৌজ যখন বিদ্রোহীদের এবং পিকিং-এর জনসাধারণকে রক্ত-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল তখন মহারানীর দল বিদেশীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘোষণা করল তারাও "ক্ষিপ্ত জনতা"কে শায়েস্তা করবার পক্ষে। "সভ্য" বিদেশীরা পিকিং-এ যে বীভৎস অত্যাচার করল পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর অল্পই পাওয়া যায়। ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য তাইপিং বিদ্রোহের সময় ১৮৬০-এ পিকিং-এর "গ্রীষ্ম প্রাসাদ" লুঠ করেছিল, গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, শহরময় রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল বটে কিন্তু এবারকার বর্বরতা আরও ভয়ঙ্কর—কিচ্ছু আড়াল নেই তার, একেবারে ল্যাংটা। সৈনিকরা অনেক মেয়ের ওপর চরম অত্যাচার করল, অনেক মে[illegible] তাদের ভয়ে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিল। শহরের প্রত্যেকটি বাড়ি গুণে গুণে লুঠ করা হল—একটিও বাদ গেল না। রাজপথে লুঠেরা সৈনিকদের মিছিল যখন শেষ হল তখন অসংখ্য ভাঙ্গা বাড়ীতে ভরা, রক্তে লাল আর হাজার হাজার লাশ ছড়ানো সেই পিকিং শহরে লুঠের মাল বেচাকেনা শুরু হল—বিদেশের সব সৈন্যবাহিনী তখনকার মতো ব্যবসাদারে পরিণত হল। সে কুৎসিত দৃশ্য কল্পনা করা কঠিন। এমনি করে নরনারী ও শিশুর রক্তে চীনকে স্নান করিয়ে ইউরোপের "সভ্যতা" সে দেশকে বর্বরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত কলর। এ দৃশ্য দেখে মনে হবে চীনের মা[illegible]র অপমান-অত্যাচারের অন্ত নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হওয়া উচিত যে, তাদের মুক্তি-সংগ্রামেরও অন্ত নেই।

অবশেষে নামকে ওয়াস্তে শান্তি এল। চুক্তি হল। নাম—১৯০১এর চুক্তি। আবার রূপোয় ক্ষতিপূরণ দাও—যে ক্ষতি করেছে তাকেই ক্ষতিপূরণ দিতে

হবে—এই হল আজব সাম্রাজ্যবাদী নীতি। ৩৯ বছরে সুদ সমেত ৪৫ কোটি আউন্স রূপো ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে অর্থাৎ এই ৩৯ বছরে সুদে-আসলে রূপোর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৯৮ কোটি আউন্স। এই ক্ষতি-পূরণের জন্যে শুল্ক আর লবণ কর থেকে যে আয় হয় তার সবটাই জামিন বা বন্ধক রাখতে হবে। এই ১৯০১-এর চুক্তিতে আরও যেসব শর্ত থাকল তার নজীর মেলা ভার। আমলারা এবং কৃষক ছাড়া অন্য শ্রেণীর লোকেরা নানা মতলবে এই ঈ হো তুয়ান বা বক্সার আন্দোলনকে সমর্থন করত এবং সাহায্য করত। তাদের মধ্যে বড়ো-ঘরের লোকেরা ছিলেন যাঁরা অত্যন্ত গোঁড়া আর যাঁদের মন সেকেলে ধারণায় ভরা। এঁরা নতুন জিনিসকে, নতুন ধ্যান-ধারণাকে ভয় করতেন কারণ সেগুলোকে বিদেশীরা আমদানি করছে। জমিদারশ্রেণীর লোকেরা বক্সারদের সমর্থন করতেন কারণ বিদেশী মিশনারিদের দৌলতে তাঁদের প্রজারা খ্রীস্টান হয়ে গেলে পর তাদের ওপর তাঁরা আর আগের মতো কর্তৃত্ব করতে পারতেন না। বক্সারদের সমর্থকদের মধ্যে স্থানীয় আমলারাও ছিল, কারণ মিশনারিরা এই আমলাদের চিরকালের ক্ষমতাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। আমলাদের সমর্থনের আরেকটা গুরুতর কারণ ছিল এই যে, নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তারা "যা শত্রু পরে পরে" এই নীতি অনুযায়ী বিদ্রোহীদের মিশনারিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত। বিদ্রোহীদের দাবি মেটানো বা বিদ্রোহ দমন করবার ক্ষমতা যখন আমলাদের নেই তখন এই কৌশল নেওয়া ছাড়া তাদের আত্মরক্ষার অন্য উপায় ছিল না। মজার কথা হচ্ছে তাদের প্রভুর প্রভু বিদেশীরা যদি এই আমলাদের কাছে নালিশ করত কেন তারা বিদ্রোহীদের সমর্থন করছে তখন তারা এই ছক-বাঁধা উত্তর দিতে পারত—আমরা কিচ্ছু জানি না, স্যার, "ক্ষিপ্ত জনতা" বাড়াবাড়ি করছে, আমাদের বারণ মানছে না! যে সব আমলারা বক্সারবিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল তাদের হয় ফাঁসিতে লটকাতে হবে অথবা আত্মহত্যা করতে বলা হবে। যেসব শহরে বিদেশীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে বা তাদের হত্যা করা হয়েছে সে সব শহরে সরকারী বড়ো চাকরীতে ঢোকার পরীক্ষা পাঁচ বছর বন্ধ থাকবে। একটা সরকারী হুকুমনামা জারী করে ঘোষণা করতে হবে বিদেশী-বিরোধী কোন সমিতির সভ্য হওয়া চিরকালের জন্যে বারণ, সভ্য হলে প্রাণ-দণ্ড দেওয়া হবে। ১৯০১-এর আজব চুক্তিতে এইসব শর্ত থাকল।

ক্ষতিপূরণ শুধু বড়ো বড়ো হামলাবাজ দেশগুলোই আদায় করল না। সুযোগ পেলে ইঁদুরও হাতিকে লাথি মারে। ক্ষুদে ইটালি, হল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, স্পেন, পর্তুগাল, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি সবাই খেসারত আদায় করল।

দশটি বিদেশী শক্তি খোদ পিকিং শহরে তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধিদের আপিস ইত্যাদি পাহারা দেবার অছিলায় সৈন্য মোতায়েন করবার অধিকার পেল। শহরের যে অঞ্চলে বিদেশীরা এভাবে সৈন্য নিয়ে বহাল তবিয়তে বসবাস করবে সেখানে চীনেদের ঢোকবার অধিকার থাকবে না। বাঃ, নিজের দেশে চীনেরা বিদেশী হয়ে গেল! কারণ ঐ চুক্তি তো কলম দিয়ে লেখা হয়নি, বিদেশীর সঙ্গীন দিয়ে লেখা হয়েছিল! এখানেই অপমানের শেষ নয়। পিকিং থেকে সমুদ্রতীর অবধি অর্থাৎ তিয়েনৎসিন পর্যন্ত রেল লাইনটি বিদেশী সৈন্যের দখলে থাকবে। পাছে কিছু ফাঁক থেকে যায় এই জন্যে একটি শর্তে বলা হল যে, মাঞ্চু সরকার সম্মত থাকলো ভবিষ্যতে বিদেশীদের ইচ্ছামত ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত আরও কিছু সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা করবার জন্যে আলোচনা করতে।

এহেন চুক্তিতে মাঞ্চু সরকার অত্যন্ত খুশি হয়েছিল কারণ ভয়ানক বেকায়দায় পড়েছিল এই সরকার। এই চুক্তির খসড়া হাতে পড়তেই মাঞ্চু সরকার আনন্দে কেঁদে ফেলে এবং ফর্মান জারি করে ঘোষণা করে যে চীন আর বিদেশের বন্ধুদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল ই হো তুয়ান ডাকাতদের দরুণ। চুক্তি সম্বন্ধে এই চাকর সরকারের ফর্মানে বলা হয়: "বর্তমান চুক্তি আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করছে না, আমাদের দেশের কোনও অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য করছে না। আমরা বিদেশী শক্তিগুলোর কাছে ঋণী তাঁদের উদারতার জন্যে। আমরা বিদ্রোহীদের মূর্খতার নিন্দা করি। যা ঘটে গেছে তার কথা ভেবে আমাদের মন লজ্জায় এবং ক্ষোভে ভরে উঠছে।" এমন চাকর পাওয়া শক্ত! বিদেশীরা কেন চাইবে না এহেন চাকরকে যতদিন পারে গাদতে বসিয়ে রাখতে?

বক্সার বিদ্রোহের দুর্বলতা কোথায় ছিল? এদের রাজনৈতিক চিন্তা খুব পরিষ্কার ছিল না। যুক্ত ফ্রন্টের কথা আগেই বলেছি। এরকম নানা মতলবে জড়ো-হওয়া পাঁচমিশেলি জোট নিয়ে বিদ্রোহকে সফল করা যায় না। গুণ্ডা-বদমায়েস, অত্যাচারী জমিদার এবং স্বার্থপর আমলারা এর ভেতর

ছিল। বীর কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল আর এই মতলববাজরা তাদের মতলব হাসিল করবার জন্যে এদের সঙ্গে এসে জুটেছিল। এই ধরনের লোকেরা জনতাকে নিছক বিদেশী মারার আন্দোলনে মাতিয়ে তুলল যাতে তারা জমিদার-বিরোধী এবং সরকার-বিরোধী আন্দোলনের দিকে না যায়। কৃষক বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব থাকার দরুণ চক্রান্তকারী শয়তানদের প্রভাবে পড়তে তাদের দেরি হল না, ফাঁদে তারা পা দিল। আন্দোলনের তিনটে লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল—এক, জমিদারী প্রথা ধ্বংস করতে হবে; দুই, মাঞ্চু সরকারকে হটাতে হবে; তিন, সাম্রাজ্যবাদকে হটাতে হবে। এই তিনটে লক্ষ্যের দিকে এগোবার জন্যে যুক্তফ্রন্ট নিশ্চয়ই গড়া চলতে পারত। কিন্তু নেতৃত্ব দেবার মতো কোনও মার্কসবাদী দল তখন ছিল না। পরিষ্কার রাজনৈতিক চিন্তার অভাবে, সঠিক নেতৃত্বের অভাবে, মাঞ্চু সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে, চীনের অন্য বিপ্লবী দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ না করার দরুণ এবং গোটা দেশের এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা ভালো করে না বোঝার দরুণ প্রধানত কৃষকদের এই দেশপ্রেমিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

বক্সার বিদ্রোহ ব্যর্থ হল বটে কিন্তু বিদেশীরা তা থেকে গুরুতর শিক্ষা পেল, দেশের মানুষেরও শিক্ষা হল। বিদেশীরা এই শিক্ষা পেল যে, এই দেশ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ভোগ করবার যে প্ল্যান হচ্ছিল তা সফল হতে পারে না। চীনকে ভাগাভাগি করে যে যার মতো এলাকা ঠিক করে নেবে—এ চিন্তা ছাড়তে হল। দেশের শোষিত মানুষের এই শিক্ষা হল যে, সহজ সরল স্বদেশপ্রেম থাকলেই বিদ্রোহ সফল হয় না। সফল বিদ্রোহের পথ খুব আঁকাবাঁকা, ভয়ানক জটিল এবং বেশ দীর্ঘ সে পথ। অভিজ্ঞ নেতৃত্ব ছাড়া সে পথে এগোনো কঠিন। এবারে বিদ্রোহীরা ঠকে গেল, অনেককে শহীদ হতে হল—সবই ঠিক। কিন্তু একথাও ঠিক যে, তারা তাদের শত্রুকে ভাল করে চিনল—স্বদেশী শত্রুদের চিনল, বিদেশ থেকে আসা শত্রুদেরও চিনল। স্বচক্ষে দেখল তাদের দেশের কা'রা কা'রা বিদেশীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের দলে দলে হত্যা করল। স্বদেশপ্রেমের মুখোস অনেকের মুখ থেকে খসে পড়ল। ভালোই হল। হেরে যাওয়ার ভীষণ দুঃখের মধ্যেও শোষিতশ্রেণীর পরম লাভ শ্রেণীশত্রুদের ভালো করে চেনা কারণ আগামী লড়াইতে এই শিক্ষা খুবই কাজে লাগবে।

মাও ৎসে-তুং বলেছেন, ঈ হো তুয়ান যুদ্ধ ছিল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধ। এই বিপ্লবী যুদ্ধ প্রমাণ করল সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণের মনোবল দমানো যাবে না। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবার মনোবল তাদের রয়েছে। লড়াইয়ের ব্যাপারে জনসাধারণের ক্লান্তি ছিল না কোনও দিন। সাহসেরও অন্ত ছিল না। তাই সাম্রাজ্যবাদ চীনকে কব্জা করতে পারেনি, কখনো পারবেও না। এই প্রসঙ্গে লিউ শাও চি-র মতো শয়তানদের চরিত্র একটু তুলে ধরা দরকার। ঈ হো তুয়ান যুদ্ধকে খাটো করার জন্যে তারা উঠে পড়ে লেগেছিল। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে "চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনী" নামে একটি ফিল্ম পিকিং-এ এবং পরে গোটা দেশে দেখানো হয়। ১৮৯৮ সালের "একশ' দিনের সংস্কার" আন্দোলন এবং চিং রাজবংশের শেষের দিকের ঈ হো তুয়ান যুদ্ধ এই ছবিতে দেখানো হয়। লিউ শাও চি বলল এটি নাকি একটি "দেশপ্রেমিক" ছবি। মাও ৎসে-তুং বললেন, যদিও কোনও কোনও লোক এই ছবিকে "দেশপ্রেমিক" বলে বর্ণনা করছে, আসলে এটা হচ্ছে একটা "জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা"র ছবি। মাও ৎসে-তুং কথাগুলো বললেন ১৯৫৪ সালের ১৬ই অক্টোবর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর কাছে লেখা এক চিঠিতে। আগে যারা এই ধরনের ছবির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিল বা কলম ধরেছিল লিউ শাও চি ও তার দলবল তাদের মতকে জোর করে দাবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবার শ লোকের পাল্লায় পড়া গেছে। আজকের চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও ঐ ছবির প্রশ্নও উঠল। ছবিটি দেখে আপনার মনে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া জনসাধারণের কোনও দ্বিতীয় পথ নেই। ঈ হো তুয়ানদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অভিযানকে ভয়ঙ্কর করে দেখানো হয়েছে যাতে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে মানুষের মনে ভয় জাগে। অথচ আমরা দেখেছি যখন সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছিল সেই সঙ্কটের সময় নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসেছিল ঈ হো তুয়ানের বীরেরা। তারা যখন আওয়াজ তুললো "বি শী শয়তানদের হত্যা করো" তখন ভয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ সালের জুন মাসে লাল পাগড়ী, লাল আংরাখা আর লাল জুতো পরা বিপ্লবী জনগণ তলোয়ার আর বর্শা নিয়ে যখন পিকিং-এর রাজপথে মিছিলে মিছিলে ঐ আওয়াজ

তুলল তখন কাগুজে বাঘগুলোর কি অবস্থা চিন্তা করুন। তরুণদের পাশাপাশি তরুণীরাও এগিয়ে এলেন এই যুদ্ধকে সফল করতে। তাঁরা পরলেন লাল পোশাক আর হাতে নিলেন লাল লণ্ঠন আর লাল বর্শা। এক দিকে তাঁরা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রহাতে লড়লেন তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনে গুপ্তচরদের সাবাড় করলেন। ঈ হো তুয়ানরা সেকেলে তলোয়ার আর বর্শা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক রাইফেল ও কামানের বিরুদ্ধে শুধু লড়েইনি, বহুবার শত্রুকে ঘায়েল করেছিল। কিন্তু শয়তান লিউ শাও চি-র সার্টিফিকেট পাওয়া "চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনীতে" দেখানো হল যে ঈ হো তুয়ানরা হচ্ছে বর্বর—তারা "পাগল", "খুনি ও লুঠেরা" এবং "উচ্ছৃঙ্খল জনতা"। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও তাদের সরকারী ইস্তাহারে ঈ হো তুয়ান আন্দোলনকে "বিদেশীদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা" হিসেবেই দেখিয়েছিল। হাঙ্গামা বাধিয়েছিল কারা? ঈ হো তুয়ানরা তো আমেরিকায় অথবা ইংল্যাণ্ডে বা জাপানে গিয়ে হাঙ্গামা বাধায়নি। বরং উল্টো। তারা নিজের দেশে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ন্যায় যুদ্ধ লড়ছিল। আর আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদ এহেন অপরাধ নেই যা চীনের জনগণের বিরুদ্ধে করেনি। পিকিং দখল করার পর তারা ঘর পুড়িয়েছে, মানুষ হত্যা করেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে আর নারীর সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ঐই "সভ্য" বিদেশীরা হাজার হাজার বছরের পুরোনো বিশ্বকোষ পুড়িয়ে দিয়েছে। এই শয়তানদেরই "চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনী"তে সভ্যতার দূত হিসেবে বাহাবা দেওয়া হয়েছে; আর ঈ হো তুয়ানের দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের বলা হয়েছে "বর্বর দাঙ্গাবাজ"!

এই ছবিতে এও দেখানো হয়েছে যে, ঈ হো তুয়ানরা হচ্ছে সামন্তবাদী শাসকের হাতের পুতুল, মহারানী ৎজু সি-র তাঁবেদার। এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। ঈ হো তুয়ানের রক্তে ছিল সামন্ত শাসকদের প্রতি ঘৃণা। পিকিং যখন তাদের অধিকারে তখন তারা চিং রাজবংশের আমলাদের অফিসগুলো এবং জমিদার আর বড়োবাবুদের বাড়িগুলোর ওপর কড়া নজর রাখতো। সাম্রাজ্যবাদের অনুচর কোনও আমলাকে ধরতে পারলে তাকে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতো। যারা খুব গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাদের হত্যা করতো। কিন্তু ঈ হো তুয়ানদের সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তাঁবেদারদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই ঈ হো তুয়ানদের

মধ্যে থেকে কখনও কখনও আওয়াজ উঠেছিল "চিংকে সমর্থন করো, বিদেশী-দের খতম করো"। কিন্তু ঈ হো তুয়ান আন্দোলন সামন্তবাদ বিরোধী ছিল না এবং ঈ হো তুয়ানরা ছিল মহারানীর তাঁবেদার এমন কুৎসা যারা প্রচার করে তারা নিঃসন্দেহে চীনের জনগণের শত্রু।

ঐ ছবির আরেকটা দিকও লক্ষ করবার মতো। ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলনকে ওতে খুব বড়ো করে দেখানো হয়েছে। আসলে এই আন্দোলন ছিল বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণীর সংস্কারবাদী আন্দোলন—অর্থাৎ বর্তমানের অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থাকেই একটু জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার আন্দোলন। এ আন্দোলন বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে নতুন সমাজ গড়ার অন্দোলন নয়—বিপ্লবী আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন যারা শুরু করেছিল তারা হচ্ছে কিছু বুর্জোয়া সংস্কারক এবং সামন্ত শাসকশ্রেণীর কিছু লোক। তারা বিপ্লবকে ভয় করতো। তারা চেয়েছিল জমিদার এবং বুর্জোয়া দুয়েরই স্বার্থ রক্ষা করতে। কতকগুলো সংস্কারের সাহায্যে তারা চীনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তখনকার অবস্থায় এই সংস্কার আন্দোলন সামন্ত শাসকদের আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের মাথায় তুলে নাচবার কোনও কারণ নেই। ঐ লোকগুলো নিজেরাই ছিল শাসক এবং তারা জনগণকে শোষণ করতো। এই শোষণের কাজটাকে ভালোভাবে চালানোর জন্যেই তারা সংস্কারের পথ ধরেছিল। কিন্তু চীনের বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা বুঝতেই পারল না যে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ফলে চীন ইতিমধ্যেই আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ ও আধা উপনিবেশ হয়ে উঠেছে। তাই পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন অবান্তর। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করেই তারা সংবিধান সংশোধন ও আধুনিকীকরণের চেষ্টা চালালো। ভাবলো পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা হবে। ফল হল উল্টো। আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই জোর পেল। কিন্তু চীনা জনগণের পথ ছিল ভিন্ন। সে পথ হল সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। তাইপিং বিপ্লব এবং ঈ হো তুয়ান আন্দোলন এই পথই গ্রহণ করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ খানিকটা জখম হল। এই আন্দোলন চীনকে বিপ্লবের পথে কিছুদূর এগিয়ে দিল। কিন্তু "চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনী"তে দেখানো হল যে, চীনের শক্তি আর সম্পদ বাড়াবার জন্যে চাই সংবিধানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে

আন্দোলন করে কিছু সংস্কারের ব্যবস্থা করা আর পুঁজিবাদী কায়দায় কল-কারখানায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থা আমদানি করা—এক কথায় যাকে বলে "অধুনিকীকরণ"। ছবিতে সম্রাট কুয়াং সু-র শতমুখে প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি নাকি "রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে" "যথাসাধ্য" করেছিলেন—তাই "আমরা সকলেই মহামান্য সম্রাটের কথা ভাবি।" এই ছবিতে একথাও বলা হল যে, "জনগণ সবচেয়ে অনুগত সবচেয়ে অল্পে সন্তুষ্ট।" অথচ মাও ৎসে-তুং শিখিয়েছেন, "জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব-ইতিহাস সৃষ্টির চালকশক্তি।" সুতরাং লিউ শাও-চি এবং তার দলবলের ঈ হো তুয়ান আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং সংস্কার আন্দোলনের একতরফা প্রশংসা থেকেই বোঝা যায় যে, তারা চীনের জনগণের কত বড়ো শত্রু। চীনেব জনগণ তাই তাদের ষড়যন্ত্রকে ধ্বংস কবেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আলোয় আলোকিত চীনের জনগণ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে "ঈ হো তুয়ান আন্দোলনেব বিপ্লবী জনগণের বিরুদ্ধে তাদের (লিউ ও তার দলবলের) কুৎসা ও আক্রমণের মধ্যে চীন-বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীর প্রতি শ্রেণীশত্রুর তীব্র ঘৃণা এবং আমাদের পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি শ্রেণীশত্রুর তীব্র ঘৃণা প্রতিফলিত হচ্ছে।…ঈ হো তুয়ানের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চীনা জনগণের গর্ব ও গৌরবের বিষয় এবং চীনের জনগণের পঞ্চাশ বছর পরের মহান্ "জয়লাভের অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর।" (বেডফ্ল্যাগ, ১লা এপ্রিল, ১৯৬৭)

॥ উনিশ শ' এগারোর দিকে ॥

দশ বছর যেতে না যেতেই চীনে বিপ্লব দেখা দিল। আমরা এখন ১৯১১র বুর্জোয়া বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছি।

চীনে রেল লাইনের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। বিদেশীরা যে ঋণ চীনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে তাই দিয়ে এই সব রেল লাইন তৈরি হচ্ছে। সুতরাং রেল বাড়ার মানে বিদেশী ঋণদাতাদের মুনাফা বাড়া। এর আরেকটা দিক হচ্ছে রেল হওয়াতে চীনের সম্পদ সহজেই বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে এবং বিদেশী মালপত্র সহজেই চীনের সর্বত্র ঢুকে বাজার দখল করে

নিচ্ছে। কয়লার খনি, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা দিশী আমলাদের হাত থেকে বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাচ্ছে, কারণ তাদের টাকা বেশি। উত্তর-পূর্ব চীনের লোহা ও কয়লার খনি জাপান পুরোপুরি কব্জা করে ফেলল।

বিদেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য দু'গুণ বেড়েছে বটে কিন্তু সে বাণিজ্যের চেহারা কি ? চীন কাঁচামাল পাঠাচ্ছে আর বিদেশে তৈরি মাল এসে চীনের বাজার ছেয়ে ফেলছে। কম টাকার রপ্তানি আর বেশি টাকার আমদানি বাণিজ্যের ফলে চীনের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে, ঋণ বাড়ছে। নানা বিদেশী ব্যাঙ্ক চীনের প্রধান প্রধান শহরে আপিস খুলেছে—ঋণ গেলাবার জন্যে সুব্যবস্থা করেছে। এই ব্যাঙ্কগুলো হচ্ছে তাদের নিজ নিজ দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ব্যাঙ্কের শাখা।

এর ফলে চীনে মুৎসুদ্দি বা দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীর উন্নতি হয়েছে, প্রতিপত্তি বেড়েছে। বিদেশী ব্যবসাদারদের এরা এজেন্ট, এদেরই মারফৎ বিদেশীরা চীনের দূর দূর অঞ্চলে মাল পাঠায় বিক্রির জন্যে আর মাল কেনে বাইরে রপ্তানির জন্যে। বিদেশী পুঁজিপতি, কিছু দিশী ব্যবসাদার, জমিদার আর সুদখোর মহাজনদের প্রতিনিধি এই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা। রাজনীতি এবং আর্থিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে এরা দেশের সর্বত্র সব কিছুতে কলকাঠি নাড়ে।

এই সময়ে চীনে হাল্কা শিল্পে কিছু উল্লেখ করবার ম. া উন্নতি দেখা গেল—বিশেষ করে কাপড়ের কল আর ময়দার কলের ব্যাপারে। এদের মালিক চীনেরা নিজে সুতরাং এরা স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তিই আরও কিছুটা বাড়ালো। বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণীর এই অংশটা কম্প্রাডর বা মুৎসুদ্দিদের ঠিক উল্টো, কারণ এরা চায় চীন স্বাধীন, শক্তিশালী এবং আর্থিক ব্যাপারে উন্নত হোক। এই স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণী বিদেশী মালপত্র আমদানির বিরুদ্ধে। চীনে যে বিদেশীরা কলকারখানা গড়ে ট্যাক্সের ও শুল্কের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধে ভোগ করে বাজারে সস্তায় মাল ছাড়ছে তাদের ওপর এরা খড়্গহস্ত, কারণ তারা বাজার দখল করে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা রাজনীতির কৌশল আর অস্ত্রশক্তির চাপ দিয়ে মাঞ্চু সরকারকে হাতের মুঠোয় রেখে দিনের পর দিন বেশি বেশি করে টাকা এদেশে খাটাচ্ছে। তার জন্যে স্বদেশী বুর্জোয়ারা ভারী শিল্প, রেল

ইত্যাদি বড়ো বড়ো লাভের ব্যাপারে যে এগোবে তার উপায় নেই, কারণ সবই বিদেশীদের একচেটিয়া।

শ্রমিকশ্রেণী কিন্তু স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর চেয়ে আরও অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে লাগল। এই শ্রেণীর মধ্যে একতা বেশি এবং বিপ্লবের শক্তির দিক থেকে এই শ্রেণী অনেক বেশি জোরদার। বিদেশীরই হোক, অথবা স্বদেশী মালিকেরই হোক, সরকারীই হোক আর বেসরকারীই হোক প্রতিটি নতুন রেল লাইন, প্রতিটি নতুন ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক দরকার হয় এবং এক আধ জন নয়, এক দল শ্রমিক। এবং শ্রমিকরা যেখানেই কাজ করুক না কেন তাদের মূল সমস্যাগুলো একই ধরনের। শ্রমিকশ্রেণীই হল সবচাইতে বিপ্লবীশ্রেণী। দেশটা কৃষিপ্রধান, স্বদেশী বুর্জোয়াদের সবাই কম-বেশি জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, কারণ তখন পুঁজি সঞ্চয়ের প্রধান পথ ছিল জমিদারীর আয়। স্বদেশী বুর্জোয়ারা যে জমিদারী-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চরম কিছু করবার ব্যাপারে দোমনা, এটাও তার একটা কারণ। শ্রমিকদের অধিকাংশই চাষী পরিবার থেকে আসে, সুতরাং তাদের গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর। শ্রমিক হিসেবে মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে আবার চাষীদের বহুযুগের ক্ষোভ আর বিদ্রোহের আগুন তাদের শিরায় শিরায় জ্বলছে। চীনের পুরোনো সমাজ অর্থাৎ সামন্ত সমাজের জন্যে তাদের এতটুকু মায়া নেই। তাই এরাই সমাজকে বদলাবার সেরা বিপ্লবী শ্রেণী।

বিপ্লবের শক্তি হিসেবে গাঁয়ের চাষীদের কথা না বললেই নয়। এই কোটি কোটি গাঁয়ের মানুষগুলোকে শুধু যে চীনে জমিদাররা চুষে খায় তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমশ বেশি বেশি করে তাদের রক্ত শুষছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুম অনুযায়ী চাষীর শস্যের দর ঠিক হয় অর্থাৎ চাষী কম দাম পায়, আবার সেই বিদেশী শোষকদের হুকুমেই কলকারখানায় তৈরি জিনিসের দাম ঠিক হয় অর্থাৎ যা সস্তা হতে পারত তা চাষীকে বেশি দামে কিনতে হয়। ঐ বিদেশীরাই আবার নতুন রেল আর জাহাজের মালের ভাড়া বেঁধে দেয় অর্থাৎ সেখানেও বেশি ভাড়া হেঁকে মুনাফা কুড়োয়। স্বদেশী জমিদার আর বিদেশী ব্যবসাদার—দুই অত্যাচারী তার মাথার ওপর চেপে বসে আছে, তাই চাষী আর মাথা তুলতে পারে না।

মাঞ্চুরা সিংহাসনে বসে আছেন বটে কিন্তু সেই সিংহাসনের তলা থেকে

মাটি সরে যেতে শুরু করেছে। ঈ হো তুয়ান আন্দোলন বা বক্সার বিদ্রোহ একটা জিনিস চীনের মানুষকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের খপ্পর থেকে চীনের মুক্তি নেই যদি না একই সঙ্গে সে মাঞ্চু সরকারকে খতম করে। দেশের প্রতি ভালোবাসা একদল বুর্জোয়া ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শিক্ষিত লোককে বিপ্লবের পথে টেনে আনল। বুর্জোয়া বলতে আমরা স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর লোককে বোঝাচ্ছি—সামন্ত ও দালাল বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের তাঁবেদার মাঞ্চু সরকার এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ যাদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। আর ক্ষুদে বুর্জোয়া বলতে উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, এঞ্জিনিয়ার, ছোট ব্যবসাদার, ইত্যাদি বোঝাচ্ছি।

১৯০২ থেকে চীনের নানা অঞ্চলে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠল। বিদেশে চীনে ছাত্ররাও আওয়াজ তুলল—মাঞ্চু সরকার ধ্বংস হোক। এমন কি কোথাও কোথাও সশস্ত্র বিদ্রোহের গোপন আয়োজনও দানা বেঁধে উঠল কিন্তু ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ব্যর্থ হল। এরা সবাই বুর্জোয়া বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে কাজ করছিল অর্থাৎ এরা এমন বিপ্লব চায় যার ফলে রাষ্ট্রশক্তি বা সরকারী ক্ষমতা ধনিকশ্রেণীর হাতে, কলকারখানার মালিক আর ব্যবসাদারদের হাতে আসবে, সামন্তপ্রভুদের রাজত্ব খতম হবে। বুর্জোয়া বিপ্লবের আদর্শ চীনের দিকে দিকে প্রচার হতে লাগল। চীনের জনসাধারণের প্রথম কাজ যে সামন্তপন্থী মাঞ্চু সরকারকে ধ্বংস করা এই কথা প্রচারের জন্যে পত্র-পত্রিকা এবং বই ছাপিয়ে ছড়ানো হল দেশময়। মাঞ্চু সরকারকে না সরালে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে হঠানো যাবে না—এই অত্যন্ত দরকারী কথাটা লোকের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা প্রবল হল। ওঠো, জাগো, বিপ্লবে সামিল হও—দিকে দিকে জোর আওয়াজ উঠল।

এদিকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া উত্তর-পূর্ব চীন থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে কথা ছিল কিন্তু সরাবে না বলল। জাপান ক্ষেপে গেল, কারণ চীনের ঐ অঞ্চলের ওপর তার অনেক দিনের লোভ। সেরকম লোভ আমেরিকারও, তাই আমেরিকা জাপানকে বলল রাশিয়ার সঙ্গে লড়ো। আবার ইংরেজও চায় - পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়ার শক্তি বাড়ে। সুতরাং ইংরেজ জাপানকে সমর্থন করল। সুতরাং লড়াই না লেগে যায় কোথায়! যুদ্ধ ঘোষণা না করেই জাপান ১৯০৪-এ রুশ নৌবহরকে আক্রমণ করল। এইভাবে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হল। দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশেরই

উদ্দেশ্য চীনের খানিকটা জমি ছিনিয়ে নেওয়া। চীনের জমিতেই লড়াই চলতে লাগল। অথচ চীনের সরকার নির্বিকার, নিরপেক্ষ, চীনের জমি রক্ষার জন্যে কড়ে আঙুলটিও তুলল না। এক বছর ধরে যুদ্ধ হল, শেষ অবধি জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে দিল। যুদ্ধের শেষে আবার সেই শান্তি আর সেই চুক্তি। চোর-ডাকাতদের ভাগ-বাঁটোয়ারা। উত্তর-পূর্ব চীনে জারের রাশিয়া নিজের দখল থেকে মাসতুতো ভাই জাপানকে খানিকটা জমি ছেড়ে দিল। জাপান চীনে ঢুকতে পেয়ে খুশি হল, কারণ ক্রমে আরও অঞ্চল গ্রাস করার রাক্ষুসে ক্ষিদে সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে পেয়ে বসেছে। আমেরিকা তার স্বার্থেই জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে উৎসাহ দিয়েছিল কিন্তু যুদ্ধে জিতে জাপান আমেরিকাকে আমল দিল না। আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক খারাপ হল। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মিতালি বজায় রেখে জারের রাশিয়ার সঙ্গে জাপান নতুন করে ভাব করল এবং রাশিয়াকে মধ্যস্থ করে ফ্রান্সের সঙ্গে খাতির জমালো। রুশ-জাপান ও ফ্রান্স-জাপান চুক্তি হল। আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক আরও খারাপ হল। আমেরিকা দেখল যে, সে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং জাপানের সঙ্গে সমঝোতায় আসা দরকার। তবে উত্তর-পূর্ব চীনে ঢোকবার মতলব সে ছাড়তে পারে না। ১৯০৯-এ চীন, জাপান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জার্মানির কাছে আমেরিকা একটি প্ল্যান দাখিল করল। প্ল্যানের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলের সমস্ত রেলপথ এবং রেলের জন্যে টাকা খাটানোর ব্যাপারটা এই সব ক'টা দেশ মিলে পরিচালনা করবে। জাপান ও রাশিয়া ঘোরতর আপত্তি করল বলে প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। তবু আমেরিকা দমবার পাত্র নয়। ১৯১০-এ সে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর জার্মানির সঙ্গে মিলে চার বিদেশী শক্তির এক সংগঠন গড়ল। উদ্দেশ্য চীনকে চার শক্তিতে মিলে ঋণ দিয়ে বা না দিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বক্সার বিদ্রোহের পর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে তাদের কর্তৃত্ব আরও বাড়াবার জন্যে আগের চাইতে বেশি করে চেষ্টা শুরু করল এবং এর ফলে চীনকে এরা ভাগ করে ফেলবে এরকম সম্ভাবনা আবার দেখা দিল। এই ভাবে দেশের আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠায় বুর্জোয়া বিপ্লবের ঝড় আসন্ন হয়ে উঠল।

সেই প্রচণ্ড ঝড়ের কথা জানবার আগ্রহ আমাদের নিশ্চয়ই প্রবল। তবু

১৯০৫ এবং তার পরের বছরগুলোকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে আসা ঠিক হবে না।

১৯০৫-এ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে দেয়। জারের রাশিয়ার বাইরের একটা জৌলুস ছিল। অত বড়ো দেশ, আধুনিক ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্রের মালিক, বিরাট সৈন্যবাহিনী, এশিয়ার একটা ক্ষুদে দ্বীপ জাপানের কাছে হেরে গেল! পশ্চিমী শক্তিগুলোর পক্ষে এটা এক হিসেবে লজ্জার কথা। পশ্চিমী শক্তিগুলোর পায়ের তলায় পড়ে মার খাচ্ছে এশিয়ার আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশগুলো। অত্যাচারী শক্তির হাতিয়ারকে তারা খুব জোরদার মনে করে, কারণ তাদের ওসব আধুনিক মারণাস্ত্র নেই। এ কথা দেশে দেশে প্রচার হয়েছে যে, পশ্চিমীদের সঙ্গে অস্ত্রবলে কারুর পারবার জো নেই, পশ্চিমীদের ার নেই। কিন্তু পূর্ব-এশিয়ার জাপান যখন পশ্চিমী রাষ্ট্র রাশিয়াকে হারিয়ে দিল তখন বোধ হয় রাশিয়ার কমিউনিস্টরা ছাড়া সবাই অবাক হল, কারণ কমিউনিস্টরা জানত এই রুশ সরকার কতখানি ঘুণে ধরা, জানত এই যাত্রার দলের ভীমের প্রকাণ্ড গদায় কতখানি তুলো পোরা আছে। পশ্চিমীরা হারে না, এ আষাঢ়ে গল্প মাঠে মারা গেল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা লড়তে চায় সেই শোষিত মানুষেরা দেশে দেশে মনে জোর পেল, আত্মবিশ্বাস বাড়ল, "আমরাও পারব" এই ধারণা তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। সে আগুনে ঘি ঢালল ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লব, যাকে বলা হয় রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব! শোষকদের বিরুদ্ধে সে বিপ্লব গণ-আন্দোলনের এক আশ্চর্য উদাহরণ। সে আন্দোলন শিক্ষা দিল কেবলমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরকার বদলানো যায় এবং জনতার অবস্থার উন্নতি সম্ভব হয়, শিক্ষা দিল যে, জনতাকে কেবলমাত্র জনতাই মুক্তি দিতে পারে। ১৯০৫-এর বিপ্লবের আরেকটি শিক্ষা হল এই যে, অত্যাচারী সরকারকে শুধু দুর্বল করলে, তার ক্ষমতাকে শুধু খর্ব করলে জনতার লাভ হয় না তাকে একেবারে খতম করতে হয়। সে বিপ্লবের তৃতীয় শিক্ষা হল যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকদের সহযোগিতায় যে সংগ্রাম হবে তাই জনগণকে সত্যিকার মুক্তি এনে দেবে। ১৯০৫-এর শেষ শিক্ষা হল "ভদ্রলোক" বা "বাবু" বিপ্লবীরা "শান্তিপূর্ণ উপায়"-এ বিপ্লব ঘটিয়ে দেবে বলে ভাঁওতা দেয়। সে ভাঁওতায় জনগণ যেন না ঠকে। কারণ আজাদী সশস্ত্র লড়াই করেই কেড়ে নিতে হয়।

সব শিক্ষা সব শোষিত দেশের মানুষ ঠিক মতো নিতে পারেনি, পারার কথাও নয়, কারণ বিপ্লবী আন্দোলন সব জায়গায় সমান ভাবে গড়ে ওঠে না। কিন্তু ১৯০৫-এর বিদ্যুতের ঝিলিকে চীনে, ভারতবর্ষে, তুরস্কে, আয়ারল্যাণ্ডে দুঃখী মানুষ খাড়া হয়ে উঠে নতুন উৎসাহে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল—ইতিহাস এ ছবি বুকে করে রেখেছে।

আমরা যদি চীনের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে দেখব যে, চীনের স্বদেশী বুর্জোয়ারা, মুৎসুদ্দি চাকরেরা নয়, ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লব দেখে বুঝল যে, তারা যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় সেখানে পৌঁছবার একমাত্র পথ ঐ ধরনের বিপ্লব। অর্থাৎ তারা বুঝল সশস্ত্র লডাই ছাডা দেশের মুক্তির দ্বিতীয় পথ নেই। ইতিপূর্বেই স্বদেশ থেকে নির্বাসিত সুন ইয়াৎ-সেন বিদেশে বিপ্লবের মালমশলা সংগ্রহে লেগে গেছেন। পৃথিবীর যেখানেই চীনেরা আছে সেখানেই তিনি গেছেন, বিদেশে পডাশোনা করছে এমন চীনে তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আলাপ করেছেন, চাঁদা তুলেছেন, কার্যসূচী ঠিক করেছেন, সমিতি ও পত্রিকা চালু করেছেন, অস্ত্র কিনে জাহাজে করে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। যারা দেশে ফিরছে সেই ছাত্রদের তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা নানা রকম গোপন কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে তারা দেশে ফিরে শাসন বিভাগে এবং সৈন্য বিভাগে ঢুকেছে, ধরা পড়েছে, প্রাণ দিয়েছে কিন্তু সাহসের সঙ্গে শেষ অবধি কর্তব্য করে গেছে।

১৯০৫-এ সুন ইয়াৎ-সেন ইউরোপ থেকে জাপানে এসে পৌঁছান এবং সেখানকার চীনে স্বদেশপ্রেমিকরা তাঁকে আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন। বিপ্লবীদের তিনটি দলের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয় যে, আলাদা আলাদা ভাবে বিপ্লবী কাজকর্ম করে ঠিক ফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে সবাই মিলে একটি বিপ্লবী দল গডা যাক। তিনটি দলকে একত্র করে সুন ইয়াৎ-সেনই একটি নতুন সংগঠন গড়েন—তুং মেং হুই বা বিপ্লবী সংঘ। সংঘের প্রথম সভায় তাঁকেই সবাই একমত হয়ে সভাপতি নির্বাচন করেন। তুং মেং হুইর আদর্শ: "মাঞ্চুদের তাড়িয়ে দাও, চীনকে নতুন জীবন দাও, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর, জমির মালিকানায় সমান অধিকার দাও।" এই তুং মেং হুই হল চীনের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবী পার্টি। সুন ইয়াৎ-সেন ঘোষণা করলেন, "জনগণের তিনটি নীতি"—জাতীয়তার নীতি, গণতন্ত্রের নীতি এবং জনতার রুজি-রোজগারের নীতি। এই নীতিগুলোর ভিত্তিতেই

চীনের জনসাধারণের সব সমস্যার সমাধান হবে। তুং মেং হুইর পত্রিকা মিন পাও বা "জনতার কাগজ" প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে প্রবন্ধ ছাপাতে থাকে। এতদিন চীনের শিক্ষিত পরিবর্তনপন্থীরা অতীত যুগের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে থাকত বিপ্লবী শিক্ষা ও উৎসাহ পাবার জন্যে কিন্তু এবারে নিজেদের যুগের বিরাট আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে তারা আগ্রহ করে রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। চীন ১৯০৫-এর বিপ্লব থেকে বিশেষ ভাবে এই শিক্ষা পেল যে সংবাদপত্রের মারফৎ প্রচার চালাতে হবে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কাজের মত কাজ হবে না, আর বুঝল জমির সমস্যাটাই হল মূল সমস্যা। ১৯০৫-এ চীনের হুনান ও কিয়াংসিতে দুর্ভিক্ষ হয় এবং জনতা বিদ্রোহ করে। কয়লাখনির ছ' হাজার শ্রমিক এই বিদ্রোহে যোগ দেয়, তুং মেং হুই' বা সুন ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী সংঘের লোকেরাও এতে যোগ দেয় এবং আওয়াজ তোলে ঃ "প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক, জমিতে সমান অধিকার দাও।" কিন্তু সব বিদ্রোহীদের মিলিয়ে নিয়ে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া যায়নি বলে এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। ১৯০৭ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে সুন নিজে ছ'টা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটালেন। আরও অনেকগুলো সশস্ত্র বিদ্রোহ ১৯০৬ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে দক্ষিণ চীনের হুনান, কোয়াংটুং, কোয়াংসি, ইউনান ও জেচুয়ানে ঘটে। বেশির ভাগই ঘটায় তুং মেং হুই। বিদ্রোহীরা জনসাধারণের সঙ্গে ভালো করে মিশে তাদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহ না করার দরুণ তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় কিন্তু এই বিদ্রোহ-গুলো বহু লোককে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনে এবং জনসাধারণের মনে মাঞ্চুদের প্রতি ঘৃণাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ১৯০৮-এ সুন ইয়াৎ-সেন উত্তর ভিয়েৎনামের হ্যানয়তে তাঁর দলের প্রধান আপিস বসাবার আয়োজন করছিলেন। তখন ভিয়েৎনাম থেকে সশস্ত্র তুং মেং হুইরা চীনে ঢুকেছিল। যখন তারা ফিরে যেতে বাধ্য হল তখন সঙ্গে করে আরও অনেক উৎসাহী লোককে নিয়ে গেল—তার মধ্যে ছিল মাঞ্চু সরকারের সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এমন বহু সৈন্য।

সংস্কারপন্থী কাং ইউ-ওয়েইর কথা আমরা হয়তো ভুলে যাইনি—সেই কাং যাঁর দল খোকা সম্রাটের সাহায্যে এক শ' দিনের সংস্কার" চালু করেছিল এবং বিধবা মহারানীর আক্রমণে যে দলের কিছু লোকের প্রাণ গিয়েছিল এবং কাং-এর মতো কিছু লোক পালিয়ে বেঁচেছিলেন। সংস্কারপন্থী

কাং-এর দল তুং মেং হুইর কাণ্ডকারখানা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং আবার আসরে নাবল। মজা হচ্ছে এই যে, বিপ্লবীরা যেমন বিপ্লব থেকে শিক্ষা নেয়, বিপ্লব-বিরোধীরাও তেমনি শিক্ষা নেয়। কাং-এর দল ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লব থেকে এই শিক্ষাই নিয়েছিল যে, জনতার ক্ষোভকে দমাতে হলে দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা নতুন আইন করা দরকার—যাকে বলে সংবিধান। কাং-পন্থীরা মাঞ্চু সরকারকে বলল তাড়াতাড়ি করে একটা সংবিধান করে ফেলা ভালো, নইলে "কুচক্রী লোকেরা জনসাধারণের রাগকে কাজে লাগিয়ে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে বসতে পারে।" বলা বাহুল্য, এই কাং-রা একটু পিছিয়ে পড়েছিল, ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলতে পারেনি—কারণ তখন সংবিধানের কাগুজে দেয়াল দিয়ে বিপ্লবের জোয়ার ঠেকাবার দিন আর যেখানেই থাক চীনে নেই। তবু মাঞ্চু সরকার বিপদে পড়ে সেই ধরনের চেষ্টা করল। গড়িমশি করবার একটা সরকারী কায়দা হচ্ছে কমিশন বসানো। সংবিধান তৈরির কমিশন বসল কিন্তু অন্য দেশের সংবিধান দেখা দরকার। দেশে বসেই দেখা যায় কিন্তু তা হলে কি হয়, কমিশন বিদেশে বেড়াতে গেল, কারণ স্বচক্ষে দেখতে হবে সংবিধান অনুযায়ী কিরকম ভাবে নানা দেশের কাজকর্ম চলছে। এর তিন বছর বাদে মাঞ্চু সরকার ঘোষণা করল যে, হঠাৎ এমন একটা জরুরী ব্যাপারে কিছু করা উচিত হবে না, তাই ন' বছরের একটা কার্যসূচী নেওয়া গেল—ধাপে ধাপে দেশের শাসনব্যবস্থার সংস্কার হবে এবং একটি আদর্শ সংবিধান গড়ে উঠবে। তারপর বিপ্লবী আন্দোলন বাড়ছে দেখে নতুন সংবিধান চালু করার সময় কমিয়ে এনে তিন বছরে দাঁড় করাল। ১৯১১-র মে মাসে নতুন মন্ত্রীসভা হল। দেখা গেল বড়ো বড়ো মন্ত্রীরা সবাই মাঞ্চু বড়োলোক আর মাঞ্চু আমলা। মাঞ্চু সরকারের ভাঁওতা লোকের কাছে ফাঁস হয়ে গেল, শুধু তাই নয়, লোকের ঘৃণা আরও বেড়ে গেল।

তুং মেং হুই বা সুন ইয়াৎ-সেনের দল সংবিধানের ধাপ্পাবাজিতে ভোলবার পাত্র নয়। তারা কাং ইউ-ওয়েইর আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাল। বলল, কাং-এর দলের আদর্শে সংবিধান তৈরি হলে মাঞ্চু রাজত্বই স্থায়ী হয়ে থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে চীনের জনসাধারণের দুঃখও দীর্ঘস্থায়ী হবে। তুং মেং হুই একদিকে মাঞ্চু সরকারকে উপড়ে ফেলবার আয়োজন করতে লাগল আরেক দিকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা প্রচার করতে লাগল, আর যারা মাঞ্চু

শাসনকে জিইয়ে রাখতে চায় তাদের আসল চেহারা লোকের চোখে তুলে ধরতে লাগল।

ইতিপূর্বে ১৯০৮ অবধি যে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছিল তা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। তার পরের বিদ্রোহের কথা বলতে বলতে এবারে ১৯১১-র বিরাট বুর্জোয়া বিদ্রোহে পৌঁছে যাব—যে বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চুদের পতন হল, চীনে রাজতন্ত্র খতম হল।

১৯০৯-এ বন্যা এবং খরা দুই-ই হুনান প্রদেশকে আক্রমণ করল। ঘাসের শেকড় আর গাছের বাকল খেয়ে লোকেরা দিন কাটাতে লাগল। জমিদাররা, স্বদেশী আর বিদেশী ব্যবসাদাররা মুনাফার জন্যে চাল মজুত করে রেখে দিল। হু হু করে চালের দাম বাড়ল। হুনান প্রদেশের চাংশা চালের জন্যে গোটা দেশময় বিখ্যাত। সেখানেও দুর্ভিক্ষ হল। ভুখা মানুষ হুনানের বড়লাটকে বলল চালের দাম কমাতে, বড়লাট দাম কমালো না, গুলি করে বেশি কিছু ভুখা লোক কমালো। জনতা ক্ষেপে গিয়ে চালের দোকান লুঠ করতে শুরু করল। তারপর বড়লাটের কুঠি, পুলিস আপিস এবং মাঞ্চু ব্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গির্জা, বিদেশী কোম্পানীর বাড়ি, জাপানের বাণিজ্য-প্রতিনিধির আপিসও জ্বালিয়ে দেওয়া হল। মাঞ্চু সরকারের ফৌজ আর বিদেশী ফৌজ মিলে বিদ্রোহীদের দমন করল। মাঞ্চুদের স্বদেশপ্রেমের আরেকবার প্রমাণ পাওয়া।

তুং মেং হুই বা সুন ইয়াৎ সেনের দল শুধু এখানে ওখানে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়েই খুশি ছিল না। তারা তাদের দলের কিছু লোককে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে গোপনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যাতে সময়মত সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাতে পারে। ১৯১০-এ সুনের দল দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনের নতুন সৈন্যবাহিনীর একটা অংশকে হাত করে নিয়ে বিদ্রোহের আয়োজন করতে লাগল। আয়োজন শেষ হবার আগেই সৈন্যবাহিনীর কয়েকজনের সঙ্গে পুলিশের মারামারি হয়। তুং মেং হুইর নেতারা ভাবলেন এই মারামারির দরুণ স্থানীয় মাঞ্চু আমলারা সৈন্যদের ওপর কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করতে পারে এবং এই কথা ভেবে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্রোহ করানো স্থির করলেন। বিদ্রোহ হল বটে কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা কম থাকায় ব্যর্থ হল। ১৯১১-তে আরেকটি ব্যর্থ বিদ্রোহ হয়। সেটা আরও বড়ো বিদ্রোহ। এবারে ত্রিশটিরও বেশি গোপন সমিতি বিদ্রোহে সামিল হয়। প্ল্যান করেন সুন ইয়াৎ-

সেন স্বয়ং এবং হুয়াং সিং। বড়লাটের কুঠি আক্রমণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে নেতাদের আদেশ ও সংকেত বার বার বদল হওয়ায় বিদ্রোহীদের দশটি দলের মধ্যে মাত্র চারটি লড়াইতে নাবে। বাহাত্তর জন বীর সৈনিক সেদিন দেশের জন্যে শহীদ হন। তাঁদের স্মৃতি বুকে করে ক্যান্টন শহরের উত্তর সীমানার কাছে হুয়াংহুয়াকাং-এ অতি সুন্দর এক স্মৃতিমন্দির আজ দাঁড়িয়ে আছে। এরই পাশাপাশি শানটুং প্রদেশের একটা অঞ্চলে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন চলছিল। জেলার সদরে গিয়ে তারা খাজনা কমানোর দাবি আর উদ্বাস্তুদের জন্যে সাহায্যের দাবি জানাল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল হাতের কাজের কারিগররা এবং ছোট ব্যবসাদারেরা। কয়েকমাস ধরে এই অন্দোলন চলল, শেষ অবধি সরকার জবরদস্তি করে এদের জমায়েৎ ভেঙ্গে দিল।

দেশ ক্ষুধায় অস্থির, অত্যাচারে জর্জর আর বিদ্রোহে মারমুখো। এমনি সময়ে বিদেশীদের হুকুমে মাঞ্চু সরকার এমন একটা কাজ করতে গেল যে, তুং মেং হুইর সঙ্গে মাঞ্চু সরকারের এক প্রচণ্ড লড়াই হল। ব্যাপারটা রেল কোম্পানী নিয়ে। রেলের ব্যবসা মোটা লাভের ব্যবসা। তাই ১৯০৫ থেকে একদিকে যেমন বিদেশীরা রেলের ব্যবসাতে জেঁকে বসেছে তেমনি আরেকদিকে চীনে পুঁজিপতি এবং কিছু কিছু স্থানীয় জমিদার নিজেরাই রেল লাইন বসিয়েছে। ১৯১১-র গোড়ার দিকে আমেরিকার চাপে পড়ে মাঞ্চু সরকার ঘোষণা করল যে, রেল এখন থেকে সরকারের একচেটিয়া হল এবং ইতিপূর্বে যাদের যাদের রেল তৈরির অধিকার দেওয়া হয়েছে তাদের সে অধিকার বাতিল করা হল। মাঞ্চু সরকারের উদ্দেশ্য হল রেল তৈরির অধিকার বিদেশী ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রেখে নিজের টাকার প্রয়োজন মেটাবে। তার মানেই হল বিদেশী কোম্পানীরা রেল তৈরির একচেটিয়া অধিকার পাবে। মধ্য চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে জেচুয়ান প্রদেশে একটা রেল লাইন বসাবার জন্যে বেসরকারী একটা কোম্পানী হয়েছিল। সেই কোম্পানীর রেল লাইন তৈরির অধিকার সরকার কেড়ে নিচ্ছে দেখে যারা শেয়ার কিনেছিল তারা ক্ষেপে গেল। বড়লাটের কাছে তারা আবেদন নিয়ে গেল, লাটসাহেব তাদের বন্দী করলেন আর তারপর যারা বন্দীদের মুক্তির দাবি নিয়ে এসেছিল সেই জনতার উপর শাস্তি ও শৃঙ্খলার নামে গুলি চালাতে বললেন সৈন্যদলকে। গুলিতে মানুষ ভয় পেলে কোনও কালেই বিদ্রোহ হত না। রাজধানীর লোকের সঙ্গে গাঁয়ের চাষীরা এসে জুটল, কারণ

বন্যায় তারা সর্বস্ব হারিয়েছে। কয়েক মাস ধরে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলল। একদিন জনতা অত্যাচারী বড়লাটকে পাকড়াও করে তার মুণ্ডু দিল উড়িয়ে। যে রেল লাইন নিয়ে এত রক্তারক্তি তা চীন মুক্ত হবার পর জনগণতান্ত্রিক সরকারের আমলে ১৯৫০-৫২তে তৈরি হয়েছিল। বিদেশীরা তৈরি করেনি, স্বাধীন চীন সরকার, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে সরকার গড়ে উঠেছিল, সেই সরকার এই লাইন তৈরি করেছিলেন। এই রেলের লড়াই মনে রাখবার মতো ঘটনা।

এবারে আমরা ১৯১১-র বিপ্লবের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি।

জেচুয়ানে যখন রেল লাইন নিয়ে জোর বিক্ষোভ চলছে তখন তার পূব পাশের হুপে প্রদেশে দুটো বিপ্লবী সমিতি একত্র হয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন শুরু করে। হুপে প্রদেশে মাঞ্চুদের "নয়া ফৌজ" রয়েছে এবং জেচুয়ানে রেল বিদ্রোহ দাবাবার জন্যে এই ফৌজের কিছু কিছু লোক পাঠানো হচ্ছে। মাঞ্চু সরকার এই "নয়া ফৌজ" গড়ে তুলছেন শুধু চীনে সৈনিক দিয়ে এবং এই ফৌজের অফিসার হিসেবে নিয়োগ করছেন সেই সব চীনেদের যারা বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। কিন্তু সরষের মধ্যেই ভূত। এই "নয়া ফৌজ"-এর মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক অনেক, এবং কিছু অফিসারও বিপ্লবী। সুতরাং "নয়া ফৌজ" এক অর্থে সত্যিই "নয়া"। এই নয়া ফৌজের উদ্যোগে ১৯১১-র ১০ অক্টোবর রাত্রিতে বিদ্রোহ ঘটে। জায়গাটির নাম উচাং—ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরে। বিদ্রোহী ফৌজ সেখানে অস্ত্রাগার দখল করল, বড়লাটের কুঠি আক্রমণ করল। মাঞ্চু সরকারের আমলারা ঘাবড়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের হাতে শহর ফেলে পালাল। পরদিন বিদ্রোহীরা এক ফৌজী সরকার গঠন করল এবং ঘোষণা করল যে "চীন প্রজাতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর বিদ্রোহী ফৌজ ইয়াংসি পার হয়ে উত্তর তীরের হানিয়াং এবং হ্যাংকাউ দখল করল। হ্যাংকাউ দখল একটা দারুণ ঘটনা, কারণ হ্যাংকাউ হচ্ছে মধ্য চীনের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি। হানিয়াংও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—চীনের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্রাগার ছিল সেখানে, রাশি রাশি অস্ত্র মজুত ছিল হানিয়াং-এ। শ্রমিক ও ছাত্রদের সাহায্যে বিদ্রোহী ফৌজ এই হানিয়াং দখল করে। হ্যাংকাউর পাশের শহর হানিয়াং-এ সেদিন কি আনন্দ-উৎসব!

মাঞ্চু সরকার হুকুম দিল ইয়াংসি নদী ধরে নৌবাহিনী এগিয়ে যাক হ্যাংকাউর দিকে, কারণ বিদ্রোহ দমন করতে হবে। নৌবাহিনী এসে হ্যাংকাউতে নোঙর গাড়ল কিন্তু বিদ্রোহীদের ওপর গুলি চালাতে বললে চালাল না, আপত্তি করল। মাত্র এক মাস যেতে না যেতেই ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে চীনের এমন একটি অঞ্চলও রইল না যেখানে এতদিনকার সর্বশক্তিমান মাঞ্চু বংশকে কেউ মেনে চলে। মাঞ্চু ফর্মান একেবারে বরবাদ হয়ে গেল দক্ষিণ চীনে। উত্তর চীনের কয়েকটি শহরেও মাঞ্চু সরকারের পতন হল। জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা দিল। শ্রমিক, কৃষক এবং বিদায়ী পুরোনো সৈনিকরা ভিড় করে বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাল। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাহিনী বিশাল হয়ে উঠল। মাঞ্চু সৈন্যদল সব জায়গাতেই মার খেয়ে পালাতে লাগল।

বানের জল পরিষ্কার থাকে না—নানা স্রোত তাতে এসে মেশে। বিদ্রোহের জোয়ার যখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন তার মধ্যে বিদ্রোহ-বিরোধী যারা তারাও ঢুকে পড়ল। কাং ইউ-ওয়েইর দল অর্থাৎ রাজতন্ত্রের সমর্থক দল আর সরকারী বড়ো আমলারা ভান করল যে, তারাও বিদ্রোহের পক্ষে। কিয়াংসুর বড়লাট মজার ব্যাপার করলেন। প্রদেশের পর প্রদেশ বিদ্রোহীরা দখল করে নিচ্ছে শুনে তিনি মাঞ্চুদের দেওয়া লাটের পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আর তাঁর কুঠির গেটে সাইনবোর্ড টাঙালেন—"বিদ্রোহী সরকার"। অনেক আমলা সৈন্যদলে ঢুকে গেল। বাঁচতে হবে তো! কোপটা না হয় ঝোপ বুঝেই মারা যাবে!

রাজসিংহাসনের অবস্থাটা একটু দেখা যাক। সেই যে মহারানী ৎজু সি, তিনি এতদিনে মারা গেছেন। একজন ইতিহাস-লেখক এই রানীটি সম্বন্ধে বলেছেন যে, ইনি ছিলেন "বুড়ো জবুথবু মাঞ্চু ড্রাগনের শেষ ধারালো দাঁতটি!" এ দাঁতটি সবার আগে খোকা সম্রাটকে হত্যা করে গেছে বলে অনেকের ধারণা। খোকা সম্রাটের নেহাৎ কচি এক খোকা ভাগনে এখন সিংহাসনের অধিকারী। নাম তার পু ঈ, বয়েস তিন বছর। জাপান বছর বিশেক পরে বেআইনীভাবে উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল দখল করে মাঞ্চুকুয়ো নামে যে তাঁবেদার রাজ্য গড়ে তুলেছিল এই পু ঈ সেই রাজ্যের পুতুল শাসনকর্তা হয়েছিল—জাপানী সরকারের হুকুম অনুযায়ী এই পুতুল নড়ত-চড়ত, কথা কইত।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বুঝতে পারল যে, রাজতন্ত্রকে বোধ হয় আর বাঁচানো যাবে না। হঠাৎ কি-জানি-কোথা-থেকে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এসে তাদের রক্ষা করতে পারে এমন একজন "ঘোড়-সোয়ার পয়গম্বর" তারা খুঁজতে লাগল। এমন একজন পয়গম্বর বা রক্ষাকর্তা দরকার যিনি হয় বিদ্রোহকে গুঁড়িয়ে দিতে পারবেন অথবা তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবেন যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা যেসব সুযোগ-সুবিধে চীনের বুকের ওপর চেপে বসে ভোগ করছে সেগুলো বিদ্রোহীদের ধাক্কায় বাতিল হয়ে না যায়। এহেন লোক চট করে পাওয়া গেল। নাম ইউয়ান শিহ্-কাই। বড়ো হবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, স্পর্দ্ধাও তেমনি আকাশ-ছোঁয়া। চরিত্র বেশ খারাপ, কারণ সৈন্যবাহিনীর একজন অধিনায়ক হিসেবে সে ১৮৯৮-র সংস্কারপন্থীদের সমর্থন করার ভান করে পরে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বক্সার বিদ্রোহের সময় ইউয়ান উত্তর-পূর্ব চীনের শানটুং-এর ছোটলাট ছিল। বিদেশীদের রক্ষা করবার জন্যে সে সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের হত্যা করাল। তখন বিদেশীদের আক্রমণ থেকে রাজধানী পিকিংকে রক্ষা করবার জন্যে সৈন্য নিয়ে সেখানে যাবার ডাক আসে কিন্তু ইউয়ান গেল না, কারণ সে গেলে বিদেশীদের কে রক্ষা করবে? স্বদেশের চেয়ে বিদেশীরাই তো বড়ো, কারণ তারাই তো মোটা ঘুষ দিতে পারে! চীনের সবচেয়ে শক্তিশালী "নয়া ফৌজ" তো ইউয়ানেরই হাতে গড়া, অবশ্য বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে। এই "নয়া ফৌজ"-এর জন্যেই প্রথম ইউয়ান বিখ্যাত হয়। শানটুং-এর পরে ইউয়ান শিহ্-কাই চিহ্লির (বর্তমান নাম হোপেই) বড়লাট হয় আর একই সঙ্গে পেইইয়াং সৈন্য জোটের অধিনায়ক হয়। এই জন্যে তার দেশের রাজনীতিতে প্রবল প্রতিপত্তি হয়, কারণ এই দু'টি পদ যিনি কব্জা করতে পারতেন তিনিই মাঞ্চুদের গোটা সৈন্যবাহিনীকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারতেন। ইউয়ানের প্রতিপত্তি বাড়তে দেখে ১৯০৯-এ মাঞ্চুরা তাকে চাকরী থেকে বিদায় করে দেয়। কিন্তু যখন ১৯১১তে উচাং বিদ্রোহ হল তখন মাঞ্চুদের ইউয়ান ছাড়া গতি নেই বলে তাকে ডেকে আনতে হল কারণ একজন "শক্ত" লোক চাই। বিদেশীরাও ইউয়ানকে পছন্দ করল। এবারে আমরা ইউয়ানের অতীত থেকে বর্তমানে এসে পড়েছি।

ইউয়ান প্রথমে হল মাঞ্চুদের সরকারী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক এবং তার পরেই তাকে করা হল প্রধান মন্ত্রী কারণ এরকম সব দিক থেকে সাম্রাজ্য-

বাদীদের যোগ্য দালাল কোথায় পাওয়া যাবে! ক্ষমতা পেয়ে ইউয়ানের কাজ হল এক দিকে যতদিন দরকার ততদিন মাঞ্চু সরকারের পতন ঠেকিয়ে রাখা, আরেক দিকে বিদ্রোহীদের দাবিয়ে রাখা। এক দিকে সে মাঞ্চুদের ভয় দেখায়—বাড়াবাড়ি করবে তো বিদ্রোহীদের লেলিয়ে দেব। আরেক দিকে বিপ্লবী নেতাদের বলে — যদি আমার কথা শুনে না চল তবে মাঞ্চুদের হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে চরম লড়াই করব।

ইউয়ানের কায়দা-কানুন দেখে বিদেশীরা বুঝল তার আসল মতলব কি। তারা তাদের নীতি ঠিক করে ফেলল। মাঞ্চু সরকার যদিও অতি বাধ্য চাকরের মতোই কাজ করছে তবু এ সরকারের সাধ্য নেই বিপ্লবের ঢেউ ঠেকাবার। কাং ইউ-ওয়েইর দলের সংস্কারপন্থী "ভদ্রলোকরা" যে বিপ্লবীদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে গদিতে বসতে পারবে এ বিশ্বাস বিদেশীদের নেই। সুতরাং মাঞ্চুদের জায়গায় ইউয়ানকে বসাতে হবে এবং তাকে দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করাতে হবে। নীতি ঠিক হয়ে গেল। কাজও শুরু হল। অন্য দিকে সুন ইয়াৎ-সেনের নিন্দা আরম্ভ হল, বিপ্লব ও বিপ্লবী সবারই কুৎসায় বিদেশীরা পঞ্চমুখ হল। সুনের বিরুদ্ধে প্রধান নালিশ—কাজের লোক নয়, শুধু স্বপ্ন দেখতে জানে, নিছক কল্পনা-রাজ্যের লোক আর বক্তৃতাবাগীশ। কাজের লোক হচ্ছে ইউয়ান শিহ্-কাই—লাখে একজন মেলে।

১৯১১-র নভেম্বরে ইউয়ান আর তুং মেং হুইর বিপ্লবীদের মধ্যে আপোষ ও শান্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হল।

হ্যাংকাউ বিপ্লবীদের দখলে এসেছে এ খবর সুন ইয়াৎ-সেন বিদেশে বসে পান। তিনি তখন আমেরিকায় রাজনৈতিক বক্তৃতা করছেন। বিদ্রোহ হঠাৎ ঘটে। প্রায় বিশ বছর সুন দেশ থেকে নির্বাসিত। খবর পেয়েই সুন লণ্ডনে ছুটে গেলেন। সেখানে তাঁর অনুরোধে ইংরেজ সরকার তাঁকে কথা দিল যে, চীনের ব্যাপারে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করবে না এবং জাপানকেও করতে দেবে না। সুনের উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের কাজের সুবিধে করে দেওয়া।

সুন ডিসেম্বরে দেশে ফিরে এলেন। অসাধারণ অভ্যর্থনা পেলেন। ১৯১২-র ১লা জানুয়ারী নানকিং-এ বিপ্লবীদের অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। সুন হলেন সেই সরকারের অস্থায়ী সভাপতি। নানকিং হল নতুন সরকারের রাজধানী—তাইপিং বিদ্রোহীদের রাজধানী ছিল এই নানকিং। সভাপতি হিসাবে সুন

যে সব ঘোষণা প্রচার করলেন তার মধ্যে এমন কোনও ফাঁক থাকল না যার সুযোগ নিয়ে মাঞ্চু বংশ চীনের সিংহাসনে টিঁকে থাকতে পারে। দুহাজার বছরেরও বেশি পুরোনো ঘুণেধরা সামন্ত রাজতন্ত্রের অবসান হল। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা জনগণের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল। কিন্তু সুনের ঘোষণায় একটা অন্য রকমের বড়ো ফাঁক থেকে গেল। তিনি এবারে "জমিতে সবার সমান অধিকার" তুং মেং হুইর এই নীতি ঘোষণা করলেন না। এখানে তাঁর দলের বিরাট এক দুর্বলতা থেকে গেল। চাষীদের লড়াইতে জাগিয়ে তুলে গ্রাম-প্রধান চীনের মাটিতে তুং মেং হুই শেকড় না গেড়ে মস্ত ভুল করল এবং সেই ভুলের জন্যে উত্তর চীনের বিপ্লব-বিরোধীরা নতুন চীন প্রজাতন্ত্রকে চুরমার করবার সুযোগ পেল। তাদের নেতা ইউয়ান শিহ্-কাই এবং তার অধীন সেনানায়কেরা মাঞ্চু রাজবংশকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য করল। পিকিং থেকে এক অপূর্ব ফর্মান জারি হল। জারি করলেন স্বয়ং সম্রাট পু ঈ, তিন বছরের খোকা। তিনি বললেন, আমি সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ইউয়ানকে আদেশ করছি চীনের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলকে এক করে ফেলতে হবে, ভাগ রাখা চলবে না, আর অস্থায়ী ভাবে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ সম্রাটের মুখ দিয়ে বলানো হল যে, বিপ্লব-বিরোধীদের ঘাঁটি উত্তর চীন যাতে বিপ্লবীদের ঘাঁটি দক্ষিণ চীনকে দখল করতে পারে তার ভার উয়ানকে দেওয়া হচ্ছে। আরও বলানো হল, নানকিং-এ সুনকে সভাপতি করে যে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র হয়েছে সেটাকে আমরা উত্তরের লোকেরা মানি না। এই মজার ফর্মানে আরও ঘোষণা করা হল যে, গদি যাওয়ার দরুণ সম্রাটকে বছরে ২০ লক্ষ আমেরিকান ডলার মাইনে দেওয়া হবে। আরও ঘোষণা ছিল। সাম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর হাত দেওয়া চলবে না, তাঁর সবক'টা প্রাসাদ তাঁরই থাকবে আর তাঁর পাত্র-মিত্র-অমাত্য পাইক-বরকন্দাজ সবার খরচ চীনের প্রজাতন্ত্রকে বইতে হবে। সম্রাট কি শুধু নিজের কথা ভাবতে পারেন? মাঞ্চু বড়োলোকরা সবাই তাঁদের পুরোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করতে থাকবেন, তাঁদের সম্মানের পদবী-টদবী কেড়ে নেওয়া চলবে না, আর সৈন্য-বাহিনীতে তাঁদের যোগ দিতে বাধ্য করা যাবে না। আরও মজার কথা আছে। যেসব বড়োলোকরা প্রজাদের কাছ থেকে জবরদস্তি করে আদায় করা সব সম্পত্তি ফুঁকে দিয়েছেন, অথবা ঐ রকমে পাওয়া সম্পত্তি যাঁদের

ভবিষ্যতে ফুরিয়ে যাবে তাঁদের কি হবে? তাঁরা তো এখন আর নতুন করে সম্পত্তি করতে পারবেন না, কারণ "প্রজাতন্ত্রে" তো প্রজাকে আর শোষণ করা যাবে না! কি হবে? উদার সম্রাট পরের ধনে পোদ্দারি করে ব্যবস্থা বাৎলালেন, "অভাবী রাজা-জমিদারদের খোরপোষের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে"—মানে, সরকারের করতে হবে! চমৎকার!

মাঞ্চু রাজবংশ বিদায় হল বটে কিন্তু বিপ্লব বলতে যে দারুণ পরিবর্তন বোঝায় তার তো কিছুই হল না। চীনের পুরোনো দিনের সমাজ অচল অনড় হয়ে রইল। গ্রামে জমিদার বহাল তবিয়তে বসে রইলেন, সরকারী আপিসে আমলারা গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন। সমাজের ওপর তলায় একটু ওলট-পালট হয়তো হল কিন্তু বিরাট দেশের বিশাল গ্রামাঞ্চলের এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত পরিবর্তনের কোনও ঢেউ উঠল না। এ বিপ্লবের প্রধান দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে মাও ৎসে-তুং বলেছেন, "১৯১১-র বিপ্লব যে ব্যর্থ হল তার কারণ শ্রমিকশ্রেণী এ বিপ্লবে সচেতনভাবে যোগ দেয়নি আর কমিউনিস্ট পার্টির তখনও জন্ম হয়নি।"

"শক্ত" ইউয়ান বিদেশীদের আর স্বদেশী শোষকদের সমর্থন পেলেন, সংস্কারপন্থী "ভদ্রলোকেরাও" এই লোকটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করলেন, কারণ সুনের তো "মাথা গরম" — বিপ্লব চান তিনি! বিপ্লবের সময় মওকা বুঝে যে মেকী বিপ্লবীরা জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল তারা এবার মুরুব্বী পেয়ে ইউয়ানকে ঘিরে দাঁড়াল। অর্থাৎ জমিদার, আমলা ইত্যাদি ধড়িবাজেরা এবার নিজেদের উপযুক্ত নেতা পেল।

ইউয়ান ও তাঁর স্বদেশী ও বিদেশী সমর্থকরা ইউয়ানকেই নতুন প্রজাতন্ত্রের সভাপতি করতে চান, সুনকে তাঁরা চান না। এর ফলে সুনের ওপর চাপ পড়ে, এমন কি তাঁর দলের লোকেরা মনে করেন যে, সুনের সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে আপোষ করাই ভালো, নইলে বিদেশীদের যেরকম মতি-গতি দেখা যাচ্ছে তাতে তারা সৈন্য নিয়ে ইউয়ানের পক্ষে নেবে পড়বে আর ইউয়ান নিজেও কম লড়িয়ে নয়, তার নিজস্ব সৈন্যবলও কম নয়। উত্তর চীনে তার বড়ো ঘাঁটি, সেখানে তুং মেং হুই বেশী নাক গলাতে পারেনি।

আমরা দেখেছি যে, তুং মেং হুইর সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুন ইয়াৎ-সেন আমেরিকা থেকে লণ্ডনে চলে যান এবং ইংরেজদের অনুরোধ

করেন যে, তাঁরা যেন চীনে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করেন এবং তাঁরাই চেষ্টা করে যেন জাপানের হস্তক্ষেপ বন্ধ রাখেন। ইংরেজের কথা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সুন দেশে ফিরে আসেন। তুং মেং হুইর একটা বড়ো দুর্বলতা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর বিশ্বাস। ইউয়ানের সঙ্গে নানকিং সরকারের লড়াইয়ের সময় এই দুর্বলতার দরুণ ইউয়ান জিতে গেল একথা বলা যেতে পারে।

বিপ্লবের ছ'বছর আগে সুন যখন জাপানে তুং মেং হুই গড়ে তোলেন তখন তিনি "জগতের সবার জন্যে ঘোষণা" বলে ভবিষ্যতের বিপ্লবী সরকারের জন্যে যে ঘোষণার খসড়া তৈরি করেন তাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের নিশ্চিন্ত করবার জন্যে বলেন যে, মাঞ্চু সরকার অন্য দেশের সঙ্গে অতীতে যেসব চুক্তি করেছে তার কোনও নড়চড় হবে না, সব ক্ষতিপূরণ আর ঋণের টাকা বিদেশীদের পুরোপুরি দেওয়া হবে, বিদেশীরা যেসব সুযোগ-সুবিধে পেয়ে আসছিল সেগুলো সযত্নে চালু রাখা হবে, বিদেশীদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ঘোষণা পড়লে মনে হয় না কি যে, তুং মেং হুই বিদেশীদের চীন-বিপ্লবে হস্তক্ষেপ ঠেকাবার জন্যে ভয়ানক ব্যাকুল এবং দলটির বিশ্বাস যে এই ধরনের সুযোগ-সুবিধে আর ভালো ব্যবহারের আশ্বাস দিয়ে তারা বিদেশীদের চীন-বিপ্লবে নিরপেক্ষ করে রাখতে পারবে? এ ধারণাটা দারুণ ভুল এই কারণেই যে, "বিপ্লবী" সরকারের কাছ থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা যে সুযোগ-সুবিধে পাবে তার চেয়ে অনেক বেশি মুনাফার ব্যবস্থা করতে পারবে চাকর সরকারকে গদিতে বহাল রাখলে। আর একটা কথা, তুং মেং হুইর বোঝা উচিত ছিল যে, মাঞ্চুদের জনসাধারণ ভয়ানক ঘৃণা করত। এই মাঞ্চুরা চীনের স্বার্থ নানা চুক্তির মারফৎ বিদেশীদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল—এটা ছিল এ ঘৃণার একটা কারণ। সুতরাং মাঞ্চুদের সেই চুক্তিগুলোকে মেনে চললে যে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশকে বিপ্লবের সামিল করা যাবে না—এটা কেন এই দল বুঝল না? বক্সার বিদ্রোহের সময় তারা যেমন করেছিল এবারেও তেমনি বিদেশীরা প্রথমটা দূরে সরে থেকে দেখতে লাগল ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় এবং কোন দল কতটা শক্তিশালী হয়। তাদের চীনের ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ না করার দুটো কারণ ছিল। এক, প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্যোগ তখন শুরু হয়ে গেছে, নানা রকমের বাদ-বিসংবাদ ও বিরোধের জালে জড়িয়ে গেছে বিদেশী শক্তিরা। দুই, চীন বিপ্লবের

চেহারা দেখে বিদেশীরা বুঝতে পেরেছে যে, মাঞ্চু সরকারকে সমর্থন করা বুদ্ধির কাজ হবে না। শেষ অবধি তারা একদিকে ঝুঁকে পড়ল, নিরপেক্ষ থাকার কোনও প্রশ্ন আর থাকল না। তারা ইউয়ানকে অনেক টাকা ঋণ দিল কিন্তু সুনের নানকিং সরকারের অর্থাভাব সত্ত্বেও কোনও ঋণ দিয়ে তাকে সাহায্য করল না। ঋণ না হয় না-ই দিল। কিন্তু মাঞ্চু সরকারের দেওয়া অধিকারের বলে সব শুল্ক আদায়ের ভার বিদেশীরা পেয়েছিল। সেই শুল্ক থেকে একটি কানাকড়িও নানকিং সরকারকে বিদেশী শয়তানরা দিল না। সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের ভয় ছিল তুং মেং হুইর পররাষ্ট্রনীতির মূলে। তাদের এই ভয় হয়েছিল যে, যদি সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের ভেতরকার লড়াইতে মাঞ্চুদের পক্ষ নিয়ে নেবে পড়ে তাহলে তুং মেং হুইর অবস্থা তাই-পিংদের মতো হবে। সুনের দল বুঝল না যে, যদি চীনের জঙ্গী জনসাধারণকে পুরোপুরি লড়াইতে নাবানো যায় তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপে ভয় পাবার কোনও কারণ থাকে না। তারা বুঝল না যে, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষ করলে এবং তাদের খাতির কুড়োবার চেষ্টা করলে বিপ্লবের সর্বনাশ হবে। সভাপতি হয়েই সুন আবার সেই ১৯০৫-এর খসড়া ঘোষণার মতো আরেকটি ঘোষণা প্রচার করে বিদেশী শক্তিগুলোকে তাদের চুক্তি, সম্পত্তি, সুযোগ-সুবিধে ইত্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বৃথা চেষ্টা—ভবী ভুলবার নয়। তারা তাদের আত্মীয় ঠিকই চিনেছিল, তাই ইউয়ানের পেছনে দাঁড়াল।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু টাকাকড়ি না দিয়ে নানকিং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করল না, অন্যরকমের চাপও দিল। সে এক রীতিমত নাটক। জাপানী আর বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ ইয়াংসি নদীতে এসে জড়ো হল। উত্তর-পূর্ব চীনে জারের রাশিয়া আর জাপানের সৈন্যবাহিনী এক পায়ে খাড়া—হুকুম পাওয়া মাত্র আক্রমণ করবে। আর বিদেশী শক্তিগুলো ঘন ঘন ঘোষণা প্রচার করতে থাকল যে, যদি দেশের ভেতরকার দুই দলের "গৃহযুদ্ধ" বন্ধ না হয় তবে তারা অর্থাৎ বিদেশীরা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে। উত্তর ও দক্ষিণ চীনে অর্থাৎ ইউয়ান শিহ্-কাই ও সুন ইয়াৎ-সেনের দলের মধ্যে যখন আপোষ আলোচনা চলছিল তখন ইউয়ানের পক্ষের আমলারা আর "ওঅরলর্ড" বা যুদ্ধবাজ সামন্ত সর্দাররা থেকে থেকে আবেদন প্রচার

করে নানকিং সরকারকে অনুরোধ করতে লাগল ইউয়ানের সঙ্গে আপোষ করতে, কারণ তা না হলে বিদেশী শক্তিরা সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করল বলে! তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে! সমস্ত ব্যাপারটাই কিন্তু আগাগোড়া সাজানো—নানকিংকে বাগে আনবার জন্যে। নানকিংপন্থী দক্ষিণ চীনের বিপ্লবীদের অর্থাৎ সুনের দলের ভয় ধরে গেল। তাদের অনেকের মনে হল যে, ইউয়ানের ছোটোখাটো প্রতিটি দাবি না মানলে দেশ রসাতলে যাবে। ইউয়ানকে সভাপতি না করলে বিদেশীরা নেবে পড়ল বলে! এমন আবহাওয়া শয়তান ও দুর্বলেরা মিলে সৃষ্টি করল যে, এক এক করে ইউয়ানের সব দাবি নানকিং সরকারকে মানতে হল।

নানকিং সরকারের নেতা সুন ইয়াৎ-সেন ইউয়ানের সঙ্গে আপোষের আগে কতকগুলো শর্ত উপস্থিত করলেন। কিন্তু দুর্বল পক্ষের শর্ত টেকে না। সুন বললেন, নানকিং সরকারকে উত্তর-দক্ষিণ চীন একত্র করতে দেওয়া হোক অর্থাৎ এক সরকারের অধীনে আনতে দেওয়া হোক। ইউয়ান এ প্রস্তাব মানতে পারে না, কারণ উত্তরে তার ঘাঁটি, দক্ষিণে তার কোনও জোর খাটে না। আর বিদেশীরা নানকিং সরকারকে কোনও আমল দিতেই রাজি নয়। নানকিং সরকারের বিদেশী দপ্তরের মন্ত্রী দুই দুইবার আমেরিকার সরকারকে অনুরোধ করলেন নানকিং সরকারকে স্বীকার করে নিতে কিন্তু আমেরিকা রাজি হল না। অথচ ইউয়ান শিহ্-কাই যখন তাড়াতাড়ি পিকিং-এ অস্থায়ী সরকার গঠন করল তখন তাকে বিদেশীরা আইনত স্বীকার না করলেও তক্ষুণি কার্যত স্বীকার করল এবং বেশ খানিকটা ঋণ দিয়ে তাকে নানকিং-এর সঙ্গে লড়বার রসদ দিল। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাম্রাজ্যবাদীরা ইউয়ানের সরকারকে পছন্দ করে এবং সুনের সরকারকে মোটেই পছন্দ করে না। বেচারা নানকিং সরকারের আর কোনও উপায় থাকল না। ইউয়ান যেমন চায় তাই হোক। তার কায়দাতেই উত্তর দক্ষিণ "এক" হোক। সুতরাং ১৩ই ফেব্রুয়ারী সুন ইয়াৎ-সেন অস্থায়ী সভাপতির পদ ছেড়ে দিলেন এবং ইউয়ান শিহ্-কাই হল অস্থায়ী সভাপতি। পনের-ষোল দিনের মধ্যেই আমেরিকার আইন সভা এতদিনে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে আনন্দ প্রকাশ করল। এর আগে নানকিং-এ যে চীন প্রজাতন্ত্র সুনকে অস্থায়ী সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল সেটা আমেরিকার মতে ঠিক

প্রজাতন্ত্র হয়নি, এবারে সুন ইউয়ানকে গদি ছেড়ে দেওয়ায় খাঁটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল।

সুন ইয়াৎ-সেন শেষ মুহূর্তে একটা চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন পিকিং ছেড়ে ইউয়ানকে নানকিং-এ রাজধানী করতে হবে এবং নানকিং-এ তাকে সভাপতি পদে বরণ করা হবে। ইউয়ান এতে রাজি হল না। কারণ তার শক্তির ভিৎ হচ্ছে উত্তর চীনে। তাছাড়া তার প্রভু বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীরাও চায় না যে, পিকিং থেকে রাজধানী নানকিং-এ সরে যায়। কারণ পিকিং-তিয়েনৎসিন এলাকা তাদের সৈন্যদের দখলে, রেল লাইনের ওপর তাদের পুরো কব্জা, তাই পিকিং এবং ইউয়ানকে তারা সহজে সাহায্য করতে পারবে এবং দরকার মতো ওঠ্-বস্ করাতে পারবে।

সুন ইয়াৎ-সেন কিন্তু নরম হলেন না, বললেন, নানকিং-এ "ইউয়ানকে আসতেই হবে।

এবারে নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে পৌঁছেছি। জবর নাটক!

ইউয়ান শিহ্-কাই পিকিং-এ তার নিজস্ব যে সৈন্যবাহিনী ছিল তাকে গোপনে হুকুম করল যে, লোক দেখানো "বিদ্রোহ" করতে হবে। সৈন্যরা মেকী বিদ্রোহে ফেটে পড়ল। চারদিকে তুমুল উত্তেজনা। এ অবস্থায় ইউয়ান কি পিকিং ছেড়ে নানকিং যেতে পারেন? অসম্ভব! এ নাটকে বিদেশীরাও নেবে পড়ল। তারা পিকিং-তিয়েনৎসিন এলাকায় প্রচুর সৈন্য ছড়িয়ে টহল দেওয়াতে শুরু করল, কারণ সৈনিকদের "বিদ্রোহে" পিকিং "বিপন্ন"! তারপর স্টেজে জাপানের প্রবেশ। চীনের চিনওয়াংতাও অঞ্চলে জাপান সৈন্যদল নাবিয়ে দিল, কারণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে! এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করা হল যাতে সবাই বিশ্বাস করে যে, ইউয়ান পিকিং ছেড়ে গেলে পিকিং-এ গুরুতর বিশৃঙ্খলা এবং দেশের ওপর বিদেশী হামলা হবে।

আর গতি না দেখে সুন ইয়াৎ-সেন নানকিং-এ রাজধানী থাকবে এই দাবিও ছেড়ে দিলেন।

১৯১১-র বিপ্লবের নেতাদের দুটি দুর্বলতার জন্যে এরকমের ঘটনা ঘটল। এক, তাঁরা দেশ ভাগ হয়ে যাবে এই ভয়ে সব সময় কাহিল হয়ে ছিলেন। একতা দিয়ে গাঁথা এক চীন চাই—উত্তর-দক্ষিণ ভাগ হলে সর্বনাশ! যেন প্রথমে এক অঞ্চলে শক্ত ঘাঁটি গেড়ে দুষমণদের খতম করে ক্রমে গোটা দেশকে মুক্ত করা যায় না। দুই, তাদের আরেক প্রবল ভয়, বিদেশীরা হস্তক্ষেপ করবে।

তাদের বড়ো সাধ বিদেশীরা নতুন সরকারকে "স্বীকার" করুক। তাহলেই সব মুস্কিলের আসান, তা না হলে চীন প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। এরকম ভয়ভাবনার মূল কারণ কি? মূল কারণ ১৯১১-র বিপ্লবের নেতারা দেশের জনতাকে তাদের লড়াইতে তেমনভাবে সামিল করতে পারেননি, জনতা পিকিং-নানকিং তর্কবিতর্কের সময় সুন ইয়াৎ-সেনের পেছনে অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে এ অবস্থা তাঁর হত না। তাই ইউয়ান আর বিদেশীদের সঙ্গে দাবাখেলায় চাল দিতে দিতে তুং মেং হুইর নেতারা যখন চারদিকে তাকালেন তখন তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়ায় এমন গণবাহিনী দেখতে পেলেন না। সুতরাং হাল ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর অন্য উপায় থাকল না। জনতার বিপ্লব সুন ইয়াৎ-সেনকে সভাপতি করেছিল আর মাঞ্চুদের চাকর আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল ইউয়ান তাঁকে গদি-চ্যুত করল, তাতে হাততালি দিয়ে সায় দিল কাংপন্থী সংস্কারকের দল আর জমিদার-আমলা বদমায়েসের দল। বিপ্লবে জনতাকে সব সময় সঙ্গে না রাখলে এরকম অঘটন ঘটবেই।

ইউয়ানের রাজত্ব পাকা হবার পর সংস্কারপন্থী আমলা ইত্যাদি মিলে একাধিক পার্টি তৈরি করল। তাদের সঙ্গে সুনের তুং মেং হুই দলের কিছু লোকও যোগ দিল কারণ তুং মেং হুইতে তো নানা রকমের লোক ছিল। ১৯১২-র আগস্ট মাসে তুং মেং হুইর "খাঁটি" লোকেরা তুং মেং হুই ভেঙ্গে দিয়ে নতুন দল গড়ল, নাম দিল কুয়োমিনতাং। এই কুয়োমিনতাং-এর প্ল্যান হল আইনসঙ্গত উপায়ে ইউয়ানের কু-শাসনের বিরোধিতা করা, যাকে বলে পার্লামেণ্টারি বা সংসদীয় আন্দোলন তাই করা, অর্থাৎ আইন সভার সভ্য হয়ে আইনসভার মধ্যে সরকারের বিরোধিতা করা—তার বেশি কিছু না করা কিন্তু এই "খাঁটি"রা খুব দুর্বলতা দেখাল। এরা ঝাপসা ভাবে "সমাজের সেবা" এমন কি "সমাজতন্ত্রের" কথা বলত কিন্তু তুং মেং হুইর কার্যসূচীতে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করবার যে খুব জরুরী কর্তব্যের উল্লেখ ছিল কুয়োমিনতাং-এর কার্যসূচীতে তা একেবারেই স্থান পেল না। তুং মেং হুইর আদর্শের জোর আর আগুন-ভরা উৎসাহ এই নতুন দলের মধ্যে ছিল না। শুরু থেকেই এই কুয়োমিনতাং-এর চাল-চলন সুন ইয়াৎ-সেনের অপছন্দ হল। তাই তিনি ঐ দলের মধ্যেই "তুং মেং হুই ক্লাব" নাম দিয়ে একটি ছোট

সংগঠন গড়ে তুললেন। এই ক্লাব বৃথাই চেষ্টা করল পুরোনো তুং মেং হুইর বিপ্লবী ভাব এবং তার নামটাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

এদিকে ইউয়ান অন্য দলগুলোকে হাত করে তাদের একত্র করে নিজের পেছনে দাঁড় করাল। তাছাড়া সে আরও বেশি জরুরী মনে করে তার সৈন্যবল বা হামলা করবার শক্তি বাড়াতে আদা-জল খেয়ে লেগে গেল। আইন সভার মুখোশ তার খুব বেশি আর দরকার হল না। সে সরাসরি বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঋণ পাবার জন্যে কথাবার্তা শুরু করল। অথচ এ ধরনের ঋণ নেওয়ার জন্যে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রবল হয়েছিল, জনতা বার বার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। নিজের খেয়ালখুশিমত কাজ করার জন্যে কেউ যদি ইউয়ানের সমালোচনা করত তাহলে তাকে চিরকালের জন্যে চুপ করাবার ব্যবস্থা ছিল—গুপ্ত ঘাতককে দিয়ে সমালোচককে গুলি করে মারা হত। প্রথমে যখন আইন সভার নির্বাচন হল তখন কুয়োমিনতাং দল সবচেয়ে বেশি ভোট পেল কিন্তু তাদের মন্ত্রী-হওয়ার সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কারণ যাঁকে তারা প্রধান মন্ত্রী করবে ভেবেছিল সেই সুং চিয়াও-জেনকে ইউয়ানের লোক গুলি করে মেরে ফেলল। ইউয়ান যে কাজের লোক এহেন গুণ্ডা-বাজির পর সে বিষয়ে আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের মনে কোনও সন্দেহ রইল না। বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান, রুশ ও জাপানী ব্যাঙ্ক-মালিকরা এবারে বুঝল ইউয়ান সত্যি সত্যি বিপ্লবের খাঁটি শত্রু, তাই তারা ইউয়ানকে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিল। বিপুল ঋণ। আপন জন কিনা তাই এত উদার! আমেরিকান খবরের কাগজগুলো ইউয়ানকে "শক্ত লোক" বলে প্রচুর প্রশংসা করতে লাগল।

ইউয়ানের ঋণ নেওয়ার প্রধান প্রয়োজন ছিল সৈন্যবাহিনী বাড়াবার জন্যে খরচ যোগাড় করা আর ঘুষ ছড়ানো। ঋণ পেয়ে ইউয়ান ঠিক করল যে, দক্ষিণ চীন থেকে কুয়োমিনতাং-এর সৈন্যবাহিনীকে খতম করবে।

১৯১৩তে সুন ইয়াৎ-সেন ইউয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করেন। চীনের ইতিহাসে একে বলা হয়েছে "দ্বিতীয় বিপ্লব"। দক্ষিণ চীনে সৈন্যরা এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। কিন্তু কয়েক মাস যুদ্ধের পর ইউয়ান সে বিদ্রোহ দাবিয়ে দেয়। সুনের আবার যে এই হার হল তার কারণ কিন্তু পুরোনো—চাষীদের দাবিদাওয়া এই বিদ্রোহীরা তুলে ধরেনি তাই বিরাট কৃষক জনতা

বিদ্রোহ থেকে দূরে থেকেছে। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে সুন এখনও ঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি বোঝা যাচ্ছে।

জবরদস্তি আর রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে "দ্বিতীয় বিপ্লব" দমন করার পর ইউয়ান জনতার ওপর আরও কড়া রকমের শাসন চালাবে ঠিক করল। "জাতীয় সভা" নামে যে আইন সভা ছিল সেটাকে ইউয়ান বাধ্য করল তাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে। এর পর সে কুওমিনতাংকে বেআইনী ঘোষণা করল এবং "জাতীয় সভা" থেকে কুওমিনতাং-এর সভ্যদের তাড়িয়ে দিল। ইউয়ানের সভাপতি হওয়ার কায়দা সম্পর্কে একটু বলা ভালো। যেদিন তাকে সভাপতি "নির্বাচন" করা হবে সেদিন কয়েক হাজার ভাড়াটিয়া গুণ্ডা-বদমায়েসকে ইউয়ান আইন সভার চারপাশে এনে জমায়েৎ করল। এই গুণ্ডারা অবশ্য "নাগরিক সমিতি" বলে ঝাণ্ডা উচিয়ে এসে হাজির হল। এই গুণ্ডারা সভ্যদের ভয় দেখাল, শাসাল যে সভাপতির নির্বাচনে ভোট না দিয়ে তারা সভার ঘর ছেড়ে বেরুতে পারবে না। এই ধরনের কল-কৌশল করে ইউয়ান সভাপতির গদি দখল করল।

শুধু সভাপতি হলেই তো চলবে না, সভাপতির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সুতরাং কয়েক মাস পরেই ইউয়ান "সংবিধান চুক্তি" নাম দিয়ে একটা ঘোষণা প্রচার করল। তারই লোকজন দিয়ে সে ইতিমধ্যে একটা "সংবিধান মন্ত্রণাসভা" করেছিল, তাদেরই নিয়ে "সংবিধান চুক্তি" হল। এই চুক্তির ঘোষণায় জানা গেল ১৯১১-র বিপ্লবের পরে নানকিং-এর বিপ্লবী সরকার যে অস্থায়ী সংবিধান তৈরি করেছিল সেটা বাতিল হল। সেই অস্থায়ী সংবিধান চীনের ইতিহাসের সেই যুগে ভালো সংবিধান ছিল কারণ তাতে বলা ছিল যে, পশ্চিমী গণতন্ত্রের ধাঁচে সরকার গঠন করতে হবে আর সভাপতির ক্ষমতার ওপর অনেক বাধা-নিষেধ থাকবে—তাঁকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হবে না। ইউয়ান সব বাতিল করে দিয়ে সভাপতির ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিল। সভাপতির কার্যকালের কোনও সীমা থাকল না—যতদিন খুশি তিনি ঐ পদে থাকতে পারেন। তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী ঠিক করে দিয়ে যেতে পারেন। নতুন আইনে ঠিক হল যে ইউয়ান মৃত্যু পর্যন্ত সভাপতি থাকবে। তার পর তার ছেলে বাবার গদিতে বসবার অধিকার পাবে। তা হলে মাঞ্চু রাজবংশ কি দোষ করেছিল? আমরা পরে দেখব যে ইউয়ান মাঞ্চুদের মতো সম্রাট হতেও চেয়েছিল। সে এক মজার কাহিনী।

আপাতত আমরা দেখছি যে, ১৯১১-র বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে দুটি জিনিস এতদিন টিঁকে ছিল সে দুটিও এবারে নির্মূল হল—বুর্জোয়া বিপ্লব যেন ধুয়ে মুছে গেল। সে দুটি জিনিস হচ্ছে—জাতীয় সভা আর অস্থায়ী সংবিধান। ইউয়ান বিদেশীদের আশীর্বাদ লাভ করল, স্বদেশের শোষক-দেরও আনন্দ দিল। কারণ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে সে পুরোপুরি ডিক্‌টেটার বা স্বেচ্ছাচারী শাসক হয়ে বসল।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমেরিকা, জাপান, ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানি ইউয়ানকে উৎসাহ দিয়েছিল স্বেচ্ছাচারী শাসক হতে এবং পরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। ইউয়ানের আইন সংক্রান্ত পরামর্শ-দাতা ছিলেন একজন আমেরিকান অধ্যাপক। নাম ফ্র্যাঙ্ক গুডনাউ। এঁরই পরামর্শে ইউয়ান সভাপতির ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে সভাপতির পদটিতে নিজের পরিবারের স্বত্ব কায়েম করেছিল। অন্য বিদেশী শক্তিরা এতে সায় দিয়েছিল।

১৯১৪-র জুলাই মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল। জাপান এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং পূর্ব-চীনের শানটুং অঞ্চলে সৈন্য নাবিয়ে দিয়ে জার্মানির দখল থেকে কিয়াওচাউ-সিনান রেল লাইন আর সিংতাও বন্দর কেড়ে নিল। তখন ইউয়ান শিহ্‌-কাই রাজতন্ত্র আবার চালু করবার প্ল্যান নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। সে এই ব্যাপারে জাপানের সমর্থন পেল, সুতরাং বিদেশী জাপানীরা যে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে চীনের জমি, বন্দর, রেল-লাইন ইত্যাদি দখল করে নিল তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না। জাপান দেখল দারুণ মওকা পাওয়া গেছে। ইউয়ান যখন সম্রাট হতে চায় তখন সম্রাট হওয়ার মাশুল তার কাছ থেকে আদায় করবার এই চমৎকার সময়। সুতরাং ১৯১৫-র ১৮ই জানুয়ারী জাপান সরাসরি ইউয়ান শিহ্‌-কাইর কাছে "একুশ দফা দাবি" উপস্থিত করল। চীনের ইতিহাসে এই "একুশ দফা দাবি" একটা দারুণ ঘটনা। জাপান যেসব দাবি করেছে তা দেশময় রটে গেল। দাবিগুলো মেনে নেওয়া মানে চীনের সর্বনাশ করা। কয়েকটা দাবি দেখলেই বোঝা যাবে জাপানের স্পর্ধা কত বেড়েছিল এবং ইউয়ান কত বড়ো গোলাম হয়ে উঠেছিল। যেমন—

শানতুং-এ জার্মানি যেসব অধিকার ভোগ করছিল সেগুলো জাপানকে দিতে হবে এবং সেখানকার প্রধান প্রধান বন্দর ও শহরে জাপানীদের অবাধে ব্যবসাবাণিজ্য করতে দিতে হবে।

আর্থিক, রাজনৈতিক এবং মিলিটারি বা যুদ্ধ ব্যাপারে জাপানীদের পরামর্শদাতা হিসেবে চাকরি দিতে হবে।

চীনের প্রধান প্রধান শহরে পুলিশ বিভাগের শাসনভার যুক্তভাবে চীনে ও জাপানী অফিসারদের হাতে থাকবে।

চীনের অস্ত্রাগারগুলোও চীনে ও জাপানীরা যুক্তভাবে পরিচালনা করবে। এরপর আরও দাবি উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে কি? কোনও স্বাধীন দেশের কাছে এরকম দাবি কেউ করে না। কোনও দেশ যদি এসব দাবী মেনে নেয় তাহলে তার স্বাধীনতার আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং এইসব দাবির কথা শুনে চীনের মানুষ রাগে ফেটে পড়ল। দেশদ্রোহী ইউয়ান কিছুটা বিপদে পড়ল, তবে "কি করি, কি করি" ভাবটা অল্পদিনেই সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে জাপানী প্রভুর পায়ে ধরে বলল, জো হুকুম, একুশ দফা মেনে নিচ্ছি, আমাকে সম্রাট্ করে দাও! প্রভু বললেন, চেষ্টা করে যা, আমি পেছনে আছি। দেশের লোকের মতামতকে গ্রাহ্য করা প্রয়োজন মনে করল না ইউয়ান। তবে একেবারে যে গ্রাহ্য করল না তাও নয়। কারণ একেবারে গ্রাহ্য না করলে সম্রাট হওয়ার পক্ষে দেশজোড়া প্রচার চালাবে কেন সে? সেই আমেরিকান অধ্যাপককে দিয়ে প্রচার চালাল, সেই ফ্র্যাঙ্ক গুডনাউকে দিয়ে। বেহায়া গুডনাউ ইংরেজীতে এক প্রবন্ধ লিখে বলল যে, চীনের ইতিহাসের ধারা এবং চীনেদের মনমেজাজের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করলে একথা জোর দিয়েই বলা যায় এদেশের লোকেদের পক্ষে রাজতন্ত্রই ভালো, প্রজাতন্ত্র এখানে ঠিক খাপ খায় না। এই জঘন্য দালালের ইংরেজী প্রবন্ধটা চীনে ভাষায় অনুবাদ করে ইউয়ান দেশময় ছড়িয়ে দিল। তারপর একদিন ইউয়ান কৌশলে "সম্রাট" বলে "নির্বাচিত" হল। কিন্তু বেচারা সিংহাসনে বসতে পারল না। নববর্ষের দিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী সিংহাসনে বসবার দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু শুভ কাজে অনেক বাধা।

দেশের লোকেরা অভদ্র! তারা দক্ষিণ চীনে ইউনানে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে বসল। ইউয়ানকে শায়েস্তা করতে হবে বলে এক গণবাহিনী তৈরি হল।

বিদ্রোহ অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। এসব হচ্ছে ১৯১৫-র শেষের দিককার ঘটনা। দেশের এই অবস্থা দেখে ইউয়ান চিন্তিত হল। বিদ্রোহ যদিও প্রথমে অল্প লোকের বিদ্রোহ ছিল পরে কিন্তু দেশময় ইউয়ানের বিরোধীরা গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি করে তুমুল ব্যাপার করতে পারে, এ আশঙ্কায় ইউয়ান তার অভিষেক উৎসব অর্থাৎ সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসার দিন পিছিয়ে দিল। জাপান যেন কেমন কেমন করতে লাগল আর সাহেব প্রভুরা শুধু অসহায়ভাবে দুঃখ প্রকাশ করল। ইউয়ানের নিজের শাসন-যন্ত্রেও ভাঙ্গন ধরল, তার সাঙ্গাতরা কেউ কেউ খসে পড়ল। অবশেষে ১৯১৬-র ২১শে মার্চ ইউয়ান সম্রাট হবে না বলে ঘোষণা করল, রাজতন্ত্র বাতিল করল। তার প্রায় আড়াই মাসের মধ্যেই ইউয়ান মারা না গেলেও তার রাজনৈতিক মৃত্যুর খুব বেশি দিন আর বাকি ছিল না।

ইউয়ান শিহ্-কাইকে সাম্রাজ্যবাদীরা "শক্ত মানুষ" মনে করেছিল—মাঞ্চু রাজাদের চেয়েও শক্ত ভেবেছিল তাকে। কিন্তু প্রমাণ হল যে, মাঞ্চুদের মতো ধাক্কার পর ধাক্কা খেয়ে সিংহাসন ধরে ঝুলে থাকার মতো "শক্ত" ইউয়ান ছিল না, প্রবল সংকট দেখা দিতেই সে মাঞ্চুদের চেয়েও বেশি ঘাবড়ে গেল। একথার মানে এই নয় যে, ইউয়ান মাঞ্চুদের চেয়ে কম জবরদস্ত শাসনকর্তা ছিল। আসল কথা হল এই, জনসাধারণের চেতনা বা রাজনীতিজ্ঞান ক্রমশ বাড়ছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা "শক্ত মানুষ" ঠিকই বেছেছিল কারণ বিবেকহীন ইউয়ান অনায়াসেই বিদেশীর কাছে নিজের দেশকে বিকিয়ে দিতে পারত এবং দিয়েওছিল আর শক্ত হাতে দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। কিন্তু যতই সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে লাগল দেশের মানুষ ততই তার ওপর চটতে লাগল, তাকে ততই ঘৃণা করতে লাগল। এর ফলে "শক্ত" ইউয়ান দুর্বল হতে বাধ্য।

কেউ কেউ মনে করেন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা যখন প্রথম মহাযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত সেই সময়টা সম্রাট হওয়ার সময় নয়। সম্রাট হওয়ার সময়টা ইউয়ান ঠিকমত বেছে নেয়নি। যুদ্ধের পরে হলে বিদেশী শক্তি-গুলো তাকে মসনদে বসিয়ে দিতে পারত এবং সে আরও অনেক দিন "শক্ত" শাসন চালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এ ধারণা মস্ত ভুল। ইউয়ান হয়তো আরও কিছুদিন টিঁকে থাকতে পারত, কিন্তু জনসাধারণের চোখে দেশদ্রোহী বলে ধরা পড়ার পর কোনও অত্যাচারী

শাসনকর্তার বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে বেশি দিন গদিতে টিঁকে থাকা শক্ত। আর অবস্থা বুঝে আসল মালিক অর্থাৎ দেশী বিদেশী শাসকশ্রেণী তাদের দালালও পাল্টে নেয়। এ সত্য বার বার প্রমাণ হয়েছে। সুতরাং ইতিহাসের গতি ঠেকাতে না পেরে ইউয়ানকে তার স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে হল।

ইউয়ানের মৃত্যুর পর সভাপতি হল লি ইউয়ান-হুং। তবে তার কোনও ক্ষমতা ছিল না। আসল ক্ষমতা ছিল প্রধান মন্ত্রী তুয়ান চি-য়ুইর হাতে। এই তুয়ান চি য়ুইকে ইউয়ান শিহ্-কাইর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলা যেতে পারে। এই তুয়ান এক কালে ইউয়ানের অধীনে জেনারেল বা সেনানায়ক ছিল। ইউয়ানের মৃত্যুর পর সরকারী ক্ষমতা তুয়ানই কব্জা করে। এই সময় গোটা দেশের ওপর পিকিং সরকারের কর্তৃত্ব ছিল না। এমন কি পিকিং-এর ওপর কর্তৃত্বও হাত বদল হত। ইউয়ানের যে সৈন্যজোট ছিল তার মৃত্যুর পর সে জোট ভেঙ্গে দুভাগ হয়ে গেল। এক দলের নাম আনহোয়েই দল—এদের ঘাঁটি আনহোয়েই প্রদেশ আর এদের পেছনে শক্তি যোগায় জাপান। আরেক দলের নাম চিহ্‌লি—এদের ঘাঁটি হোপেই প্রদেশ আর এদের পেছনে শক্তি যোগায় ইংরেজ আর আমেরিকানরা। আরও পরে আরেকটা দল দেখা দিয়েছিল—মাঞ্চুরিয়ার দল। এদের পেছনে ছিল জাপানীরা। এইসব দলের সর্দাররা ছিল যুদ্ধবাজ সামন্ত বা জমি-মালিক। ইংরেজী নাম "ওঅরলর্ড"। চীনের ইতিহাসের এই যুগটাকে বলা হয় "যুদ্ধবাজ সর্দারদের যুগ"। ওপরের বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, চীনে বিদেশী শক্তিগুলো কিছু যুদ্ধবাজ চীনেদের হাত করে টাকা আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এবং তাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে নিজেরা কে কত বেশি ক্ষমতা দখল করতে পারে সেই তালে ছিল।

যে তুয়ান চি-য়ুইর কথা একটু আগে বলেছি সে ছিল আনহোয়েই দলের নেতা। জাপানের তাঁবেদার এই যুদ্ধবাজ দলই প্রথম পিকিং সরকারকে হাত করে। এই সময় ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে তাই ইউরোপীয় শক্তিগুলো চীনের ব্যাপারে মোটেই মন দিতে পারছে না। এতে জাপানের সুবিধে হয়েছে। মোটা ঋণ দিয়ে জাপান তুয়ান চি-য়ুইকে পুরোপুরি গোলাম বানিয়ে কাজ হাসিল করে চলেছে! তুয়ান টাকা পেয়ে রেল, খনি, ব্যাঙ্ক,

বন ইত্যাদি সব কিছু জাপানের হাতে তুলে দিচ্ছে। আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল দেখে তুয়ানও ১৯১৭-র আগস্ট মাসে চীনকে মহাযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যোগ দেওয়াল। চীন দেশের অধিকাংশ লোকের এ যুদ্ধে যোগ দেওয়ার মত ছিল না। এমন নয় এর ফলে জার্মানি চীনের যা কিছু দখল করেছিল সেগুলো উদ্ধার করা যাবে, কারণ সেগুলো ইতিপূর্বে ইউয়ান মহাশয় ২১ দফা দাবি গেলার সময় জাপানকে দানখয়রাত করেছেন! তুয়ানের আইনসভা গোড়ায় যুদ্ধে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ঘুষ আর ঘুষির জোরে তুয়ান আইনসভায় মেজরিটি বা বেশির ভাগ ভোট তার পক্ষে শেষ অবধি টেনে নেয়। ইউয়ানের পরে তুয়ান—যেন দুটি যমজ ভাই!

যুদ্ধে চীন যোগ দিল বটে কিন্তু সে শুধু কাগজে-পত্রে। সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরি করাও হল কিন্তু সে যুদ্ধ দেশের বাইরে নয়, দেশের ভেতরে। পিকিং-এর সৈন্যবাহিনী দিয়ে অন্য সর্দারের সৈন্যদের ঠ্যাঙ্গাতে হবে না! চীন থেকে কোনও সৈন্যদল বিদেশে পাঠানো হল না কারণ ইউরোপীয় শক্তিগুলো যদিও চীনকে দলে নিয়েছে তবু চীনেরা শাদা সাহেবদের গুলি করার অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরবে (হোক না সে শাদারা শত্রুপক্ষের) এ জিনিস বরদাস্ত করা যায় না। অবশ্য অন্য কাজের জন্যে প্রায় দুলক্ষ চাষী এবং শহরের গরীবদের "চীনের শ্রমিক বাহিনী" নাম দিয়ে বৃটিশ কনট্র্যাক্টারের অধীনে ইউরোপে পাঠানো হল। তার মানে কর্তারা সৈনিক নিতে নারাজ, "কুলি" নিলেন। নিরস্ত্র এই হতভাগাদের পশুর মতো তাড়িয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ফ্রান্সের যুদ্ধ-এলাকায় দারুণ গুলিগোলার আগুন-ঝড়ের মধ্যে। সেখানে তাদের দিয়ে ট্রেঞ্চ বা পরিখা খোঁড়ানো হল—সৈনিকদের লুকোবার জন্যে। আর তাদের দিয়ে মরা সৈনিকদের কবর দেওয়ানো হল। এ থেকে পরিষ্কার হল যে, প্রভুদের যুদ্ধে চীনেরা চাকরের কাজ পেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়!

টাকা ঋণ ছাড়াও তুয়ান চি-যুই জাপানের কাছ থেকে "অস্ত্র ঋণ" পায়। এই অস্ত্র ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্য তুয়ানকে চীনের গৃহযুদ্ধে সাহায্য করা—আনহোয়েই দল যেন অন্য যুদ্ধবাজ সর্দারের দলের কাছে হেরে না যায়। তুয়ান এই "অস্ত্র ঋণ" দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে ভয়ানক ভাবে গোপন করে রেখেছিল কারণ তারা জানলে খোলাখুলি বিরোধিতা করবে। বিশ্বযুদ্ধের অর্থাৎ

মহাযুদ্ধের নাম করে চীনে সৈনিকদের ট্রেনিং-এর জন্যেও জাপান ঋণ দেয়। ঋণের ছড়াছড়ি কারণ যত ঋণ তত লাভ এবং লাভ ঋণের টাকার অনেক গুণ বেশি।

এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চীনকে বিদেশীর কাছে বিকিয়ে দেবার ব্যাপারে তুয়ান চি-য়ুই ইউয়ান শিহ্-কাইর ওপর টেক্কা দিয়েছিল। জাপানের সেই বিখ্যাত ২১ দফা দাবির মধ্যে একটা ছিল যে চীনের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর ওপর জাপানকে কর্তৃত্ব করতে দিতে হবে। ইউয়ানের কিন্তু সাহস হয়নি এ দাবি মেনে নিতে। এখন মোটা ঋণ দিয়ে জাপান তুয়ানের মাথা কিনে নিল। জাপান এই অধিকার পেল যে, সে অফিসার পাঠিয়ে চীনে সৈনিকদের ট্রেনিং দিতে পারবে। এ ধরনের জিনিস ঘটতে পারে শুধু পরাধীন উপনিবেশে। তাছাড়া জাপান পিকিং সরকারকে সাহায্য করবার জন্যে নানারকমের "পরামর্শদাতা" পাঠাল। যেমন, আর্থিক পরামর্শদাতা, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা, মিলিটারি বা যুদ্ধ-বিষয়ে পরামর্শদাতা। এরা চীন সরকারকে কান ধরে চালাবে বলেই এদের জাপান পাঠালো।

ইতি মধ্যে সুন ইয়াৎ-সেন আরেকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। ইউয়ান শিহ্-কাইর মৃত্যুর পর তিনি বিদেশ থেকে চীনে ফিরে এসেছিলেন। চীনের প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে তিনি প্রতিবাদ করলেন বললেন যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছাড়া অন্য কোনও যুদ্ধে চীনের যোগ দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই।

এদিকে তুয়ানের ক্ষমতা বাড়ছে দেখে অন্য অঞ্চলের, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের, যুদ্ধবাজ সর্দাররা ভীষণ অসন্তুষ্ট হল। তুয়ান আইনসভা ডাকছে না এই অভিযোগ করে তারা তুয়ানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা ভাবতে শুরু করল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের গভর্নর বা ছোটলাট আওয়াজ তুললেন "সংবিধানকে বাঁচাতে হবে" এবং চারদিকে টেলিগ্রাম করতে লাগলেন এই প্রচারের জন্যে যে, পুরোনো আইনসভা ডাকা দরকার, সংবিধানকে সম্মান করা দরকার, তা নইলে বেআইনী সরকারকে মেনে নিতে হয়। কোয়াংতুং, কোয়াংসি এবং জেচুয়ান প্রদেশের যুদ্ধবাজ সর্দাররা তাঁকে সমর্থন করল। তুয়ান যাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল এমন কিছু আইনসভার সদস্য ক্যান্টনে এসে জড়ো হল। তারা এক মিলিটারি সরকার বা ফৌজী সরকার প্রতিষ্ঠা করল এবং সুন ইয়াৎ-সেনকে করল অধিনায়ক।

ঠিক হল এই সরকার "সংবিধানকে বাঁচাতে হবে" এই দাবি নিয়ে লড়াই করবে।

এমন সব লোক তাঁর চারপাশে জড়ো হল যে, বছরখানেক অধিনায়ক থেকে শেষ অবধি সুন সেই ফৌজী সরকার থেকে বেরিয়ে এলেন। কারণ লোকগুলো আসলে ক্ষমতার লড়াইতে নেবেছে, সংবিধানকে বাঁচাবার কথাটা লোক-ঠকানো ফাঁকা বুলি মাত্র!

জাপান তার পেছনে আছে, কেউ তার কিছু করতে পারবে না, এ রকমের বেপরোয়া ভাব নিয়ে তুয়ান চলতে লাগল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ফৌজী সরকারকে সে মোটেই আমল দিল না এবং আইনসভা ডাকবার দাবি তার কানেই ঢুকল না। বরং সে উল্টো এক কাজ করে বসল। ১৯১৮-র আগস্ট মাসে তার নিজের বাছাই করা লোকদের দিয়ে এক নতুন আইনসভা তৈরি করল, দক্ষিণ-পশ্চিমের ফৌজী সরকারের বিরুদ্ধে সৈন্য লেলিয়ে দিল এবং খোলাখুলি ঘোষণা করল যে, অস্ত্রের জোরে সে উত্তর-দক্ষিণ এক করে ফেলবে। জাপান বরাবর পেছনে আছে আর চীনেদের লড়িয়ে দিয়ে মুনাফা লুঠছে বলেই গৃহযুদ্ধ এভাবে চলছিল।

১৯১৮-র নভেম্বরে তুয়ান চি-যুই ইচ্ছে করেই প্রধান মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিল। তখনও সে রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ায় রয়েছে। প্রধান সেনাপতি হিসেবে সে তখনও পিকিং সরকারকে তার ইচ্ছামত চালাতে লাগল। প্রধান মন্ত্রী থাকতে জাপানের সঙ্গে সে যেসব চুক্তি করেছিল মহাযুদ্ধের শেষ অবধি তাদের মেয়াদ ছিল। কিন্তু তুয়ান এমনি গোলাম যে, ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারীতে অর্থাৎ মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় তিন মাস পরে সেগুলোর মেয়াদ বাড়িয়ে দিল।

মহাযুদ্ধ কিন্তু চীনে গুরুতর পরিবর্তন এনেছিল। সে পরিবর্তন আর্থিক ক্ষেত্রে। তার ফলে সমাজে এমন শক্তিশালী শ্রেণী জন্মাল যে, চীনের ইতিহাসে নতুন ধরনের সংগ্রাম শুরু হল। এবারে আমরা নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি। চীনে নতুন যুগ শুরু হচ্ছে।

॥ নতুন আলো ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চীনের জাতীয় পুঁজিপতিরা বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতি করে ফেলল কারণ ইউরোপ এবং আমেরিকা তখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। কাপড়, ময়দা, রেশম, দেশলাই, এবং অন্য হাল্‌কা শিল্প প্রচুর উন্নতি করল। চীনেদের নিজস্ব ব্যাঙ্কের সংখ্যাও প্রায় চারগুণ বাড়ল। জাপানীরাও চীনে অনেক ফ্যাক্টরী বসাল। আগেকার যে কলকারখানাগুলো তাদের উৎপাদন করবার ক্ষমতা পুরো ব্যবহার করত না এখন তারা পুরো দমে উৎপাদন চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার ঘটল। শিল্পের উন্নতি যেমন হল তেমনি শ্রমিকের সংখ্যা প্রবল বেগে বেড়ে গেল। শ্রমিকশ্রেণী এখন আকারে অনেক বড়ো হয়েছে, তাই নিজের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হতে আরম্ভ করেছে এবং শুধু আর্থিক দাবিদাওয়া ছাড়াও রাজনৈতিক দাবির ব্যাপারেও চঞ্চল হয়ে উঠছে। চীনের ইতিহাসে এ এক দারুণ ঘটনা—সমাজে এক নতুন শক্তি বেশ খানিকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিসও লক্ষ করতে হবে। যুদ্ধের সময় এই যে শিল্পের উন্নতি হল এটা একতরফা উন্নতি কারণ শুধু হাল্‌কা শিল্পেরই উন্নতি হল। মূল শিল্পে বা ভারী শিল্পে, যেমন—ধাতু, এঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি এবং খনির ব্যাপারে, তেমন কোনও উন্নতি হল না। যে সামান্য ভারী শিল্প চীনেদের ছিল জাপান সেগুলোকে প্রায় মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে। সুতরাং উঠতি চীনে পুঁজিপতিরা এ অবস্থায় কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এবারে তাই চীনেব বিপ্লবী আন্দোলন আগেব চাইতে অনেক বেশি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারবে।

যাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয় সেই শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে পরিবর্তন এল তাও বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে, কারণ এরাই তো বিপ্লবী ধ্যানধারণার প্রচারক। চীনের যে বুদ্ধিজীবীরা দেশের মুক্তির পথের কথা ভেবে ব্যাকুল হয়েছিলেন এই মহাযুদ্ধের বছরগুলোতে তাঁদের মনে নানা সন্দেহ দেখা দিল, বিরক্তিও জন্মাল। তাঁদের বরাবরের চেষ্টা ছিল ইউরোপের বুর্জোয়া কালচার বা বিদ্যা, বুদ্ধি ও রুচির অনুকরণ করবেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের

মতো অন্য জিনিসও গ্রহণ করবেন। কিন্তু এখন তাঁদের ধারণা পাল্টাতে লাগল। মাও ৎসে-তুং বলেছেন : "পশ্চিমের কাছ থেকে শেখবার যে আজগুবি ধারণা চীনেদের ছিল সেগুলো সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে চুরমার হয়ে গেল। এটা কি অদ্ভুত নয় যে, শিক্ষকরা ছাত্রদের অধিকারে সব সময় হস্তক্ষেপ করবে? চীনেরা পশ্চিমের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল কিন্তু যা শিখেছিল তা তারা কাজে লাগাতে পারেনি এবং কখনও আদর্শগুলোকে বাস্তব জীবনে রূপ দিতে পারেনি।......"শিক্ষক বলতে এখানে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের বোঝাচ্ছে।

রাশিয়ায় নতুন দিন এসেছে। অক্টোবর বিপ্লব এই নতুন দিন এনেছে। সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। এই আশ্চর্য খবর চীনে পৌঁছেছে, সাম্রাজ্যবাদীরা খবরটা চেপে রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও পৌঁছেছে। শুধু পৌঁছয়নি, চীনেদের মনকে চঞ্চল করে তুলেছে। রুশ বিপ্লব পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যবাদী জোটে ভাঙ্গন ধরিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মনে দারুণ ভয় আর ঘৃণা জাগিয়েছে। এসব দেখে শুনে সাম্রাজ্যবাদীদের নালবাঁধানো বুটের তলায় থেৎলে যাওয়া চীনের মানুষ বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছে। অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম প্রভাব পড়েছে চীনের বুদ্ধিজীবীদের মনে। যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সত্যি সত্যি চিন্তা করেন তাঁরা রাশিয়ায় বিপ্লব কিভাবে এগোয় তার প্রতি লক্ষ রাখছেন এবং খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে এবং বুঝতে চাইছেন সমাজতন্ত্রের আদর্শ কি, যা বিপ্লবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কি।

একটু পেছনের দিকে ফেরা যাক। ১৯১৭-র গোড়ার দিকে যখন মহাযুদ্ধে চীনের যোগ দেবার কথা উঠল তখন দেশের লোক উত্তেজিত হল। তুয়ানের দল চীনকে মানুষ মারার মহাযজ্ঞে নাবাতে চায় অথচ যে সাম্রাজ্যবাদীরা সবাই মিলে চীনকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছে তারাই এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছে। চীনের জনসাধারণ যুদ্ধে যোগ দেবার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলল। তুয়ানের দল কেন যুদ্ধের ব্যাপারে এত উৎসাহী তা শীগ্‌গিরই ফাঁস হয়ে গেল। শয়তানরা জাপানের কাছ থেকে ঋণ পেতে চায়, তার মানে টাকা লুঠতে চায়। জাপান টাকা ধার দিতে রাজি কিন্তু খুব বদমায়েসি শর্তে। তুয়ান তাতেই রাজি। তাছাড়া চীনের পক্ষে ক্ষতিকর একটা গোপন মিলিটারি চুক্তিও জাপানের সঙ্গে তুয়ান করবে বলে

কথাবার্তা চালাচ্ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। তবু শয়তান তার মতলব ছাড়ে না, লোভ তার বাড়ে বই কমে না। তুয়ান জাপানের সঙ্গে ঋণের ব্যাপারে কতকগুলো চুক্তি করল এবং মিলিটারি চুক্তি করল—১৯১৮-র মে মাসে। খবরটা যাতে জানাজানি না হয় সে জন্য খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা করল। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, বিশেষ করে জলজ্যান্ত মাছ। খবর ফাঁস হল। গোটা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল—কারণ চুক্তির শর্ত ইউয়ান শিহ্-কাইর আমলের সেই বিখ্যাত ২১ দফা দাবির চেয়েও মারাত্মক। যে চীনে ছাত্ররা জাপানে লেখাপড়া করতে গিয়েছিল তারা স্ট্রাইক করল এবং চীনে ফিরে এসে জাতীয় মুক্তির জন্যে সংঘ গড়ে তুলে চীন-জাপান মিলিটারি চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। ১৮ই মে ইংরেজী পত্রিকা পিকিং গেজেটে ইউজেন চেন "চীনকে বিকিয়ে দেওয়া" নাম দিয়ে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেন এবং খোলাখুলি তুয়ান সরকারকে নিন্দা করলেন। চেন বন্দী হলেন এবং তাঁর কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হল। ২১ মে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুলের ছাত্ররা দেশের সভাপতি বা রাষ্ট্রপতির আপিসে মিছিল করে গেল। তাদের আবেদন চীন-জাপান মিলিটারি চুক্তি বাতিল করা হোক। দেশময় ছাত্ররা পিকিং-এর ছাত্রদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করল। দেশের লোকের মধ্যে জাপ-বিরোধী এবং তুয়ান-বিরোধী মনোভাব বেড়ে উঠছে বোঝা গেল। এই ঘুম-ভাঙ্গা ভোরে চীনের জনসাধারণ শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের ছলাকলাই ধরে ফেলল তা নয়, তারা আমেরিকান সমেত অন্য বিদেশীদেরও মুখোশ ধরে টানাটানি করতে লাগল।

যুদ্ধের সময় পিকিং সরকার অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বড়ো বড়ো বুলি আওড়াতে লাগল—ন্যায়, সাধুতা, মানবতা ইত্যাদি গালভরা সব কথা। জনসাধারণ কিন্তু এসব প্রচারকে বিশ্বাস করল না। তার একটা কারণ জাপানও ঐ পশ্চিমী শক্তিজোটে আছে আর জাপান চীনের বুকের ওপর "ন্যায়," "সাধুতা," "মানবতা"-র যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তার পরে আর কিছু বলবার থাকে না। তাছাড়া জাপানের অন্যান্য বিদেশী বন্ধুরাও চীনের কম রক্ত ঝরায়নি। উপরন্তু চীন অল্প দিন হল এক নতুন শিক্ষা লাভ করেছে। যুদ্ধে যোগ দেবার ব্যাপারে চীন বিদেশী শক্তিগুলোর কাছে কতকগুলো বেশ মোলায়েম শর্ত উপস্থিত করেছিল। যেমন—সেই যে আফিং যুদ্ধের পর

চুক্তি হয়েছিল চীন কোনও কারণেই আমদানি মালের ওপর ৫ শতাংশের বেশি শুল্ক বসাতে পারবে না, সেটা বদলাতে হবে, বক্সার বিদ্রোহের পর থেকে যে ক্ষতিপূরণের টাকা চীনের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে কিছু দিনের জন্যে তা নেওয়া বন্ধ রাখতে হবে আর "১৯০১-এর চুক্তি" অনুযায়ী পিকিং-তিয়েনৎসিন এলাকায় বিদেশী সৈন্য মোতায়েন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। এ দাবীগুলো বিদেশী শক্তিরা পত্রপাঠ বাতিল করে দিল—এগুলো তাদের চোখে এত অন্যায় দাবি যে তারা এগুলোকে বিবেচনার যোগ্যই মনে করল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাগজ "নর্থ চায়না ডেইলি নিউজ" অর্থাৎ "উত্তরচীন দৈনিক সংবাদ" লিখল, "১৯০১-এর চুক্তি" কিছুতেই বদলানো উচিত নয় কারণ ঐ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল চীনকে চরম শিক্ষা দেওয়া যাতে বক্সার বিদ্রোহের মতো অপরাধ চীনেরা আর কোনও দিন না করে, যে চরম শিক্ষা হয়েছে তা যেন কখনও না ভোলে।

গোলাম পিকিং সরকার এ অপমান মাথা পেতে নেয়। কিন্তু দেশের জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় এবং তাদের ক্ষোভ বেড়ে যায়।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা এই সময় জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে চলেছিল। তাদের উদ্দেশ্য সাধু, চীনদেশের কল্যাণ ও গণতন্ত্রের উন্নতি ইত্যাদি বড়ো বড়ো ছেঁদো কথার জাল ফেলে মানুষের মন ধরবার জোর চেষ্টা চালানো। কিছু লোক যে সে জালে ধরা পড়েনি তাও নয়। কিন্তু লোভীদের স্বার্থ এমনই জিনিস যে মুখোশ ফুঁড়ে ধারালো দাঁত আর লকলকে জিভ বেরিয়ে আসতে বেশি দেরি হয় না। ১৯১৭-র ২রা নভেম্বর আমেরিকানদের দাঁত এবং জিভ দেখা গেল লানসিং-ইশিয়াই চুক্তিতে। নিজেকে চীনের বন্ধু বলে আমেরিকা যে রূপকথা ছড়াচ্ছিল তা চুপসে গেল এই চুক্তির ধাক্কায়। এই চুক্তিতে আমেরিকা পরিষ্কার ভাষায় মেনে নিল যে, চীনে জাপানের "বিশেষ স্বার্থ" আছে, বিশেষ করে সেই সব জায়গায় যেগুলো তার অধিকার করা অঞ্চলের কাছাকাছি। এই চুক্তিতে চীনের জমি জাপান দখল করতে পারবে একথা মেনে নেওয়া হল। এই চুক্তির আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল জাপানকে রাশিয়ার জমি দখল করতে উৎসাহিত করা। কারণ চীনের যে জমিতে জাপানের "বিশেষ স্বার্থ" আমেরিকা স্বীকার করে নিল সে জমি রুশ সীমান্তের খুবই

কাছাকাছি। যেহেতু "কাছাকাছি" সেই জন্যে জাপান সেই রুশ সীমান্ত পেরিয়ে জায়গা দখল করলে জাপ-আমেরিকান নীতির দিক থেকে কোনও অন্যায় হবে না। এই "কাছাকাছি" তত্ত্বটা খুব মজার। লানসিং-ইশিয়াই চুক্তিতে বলা হল যে "জমির দিক থেকে কাছাকাছি থাকাটা এক দেশ এবং আরেক দেশের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ সৃষ্টি করে।" তাহলে এই চমৎকার ডাকাতি-তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশ তার কাছের দেশের জমি দখল করতে পারবে এবং খানিকটা দখল করার পর বাকিটাও "কাছাকাছি" জমি বলে দখল করতে পারবে এবং সেই প্রতিবেশী দেশটা পুরো দখল হলে তার পরের দেশটাও তো কাছের দেশ হয়ে যাবে তখন সেটাকেও দখল করা যাবে, কারণ "কাছাকাছি" জমি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী চললে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর হাঁ করা মুখের কাছাকাছি আমরা সবাই চলে যাব কারণ পাশে যদি সাম্রাজ্যবাদী দেশ থাকে সে তো চট করেই আমাদের দেশের সবটুকু নিয়ে নিতে পারবে আর দূরে থাকলে আক্রমণ করে আমাদের দেশের খানিকটা দখল করার পর বাকিটা "কাছাকাছি" তত্ত্ব মতে আপনা থেকে টুপ্ করে তার কোলের মধ্যে পড়বে। অপূর্ব নয় কি?

লানসিং-ইশিয়াই চুক্তি নিয়ে চীনের আমেরিকা-পন্থী আমলা ও রাজনীতিকরাও বিপদে পড়ল। কারণ খোলাখুলিভাবে আমেরিকা যে চীনে জাপানের "বিশেষ স্বার্থ" স্বীকার করে নিল এটা কোন্ মুখে সমর্থন করবে তারা? কিন্তু তবু সবার যে চোখ খুলল তা বলা যায় না। চীনে বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত লোকদের ওপর আমেরিকান প্রভাব এর পরেও বেশ খানিকটা রয়ে গেল।

১৯১৮-র জানুয়ারীতে আমেরিকার সভাপতি উইলসন্ সাহেব বিশ্বের শান্তির জন্যে বড়ো বড়ো বুলি আওড়ালেন। তাঁর বিখ্যাত "চোদ্দ দফা" বুলির মধ্যে ছিল গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ বা প্রত্যেক জাতির স্বাধীন সবকার গঠনের অধিকার ইত্যাদি। ১৯১৯-এর গোড়ার দিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বে "শান্তি" স্থাপন করতে হবে বলে তারই ব্যবস্থা করবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো প্যারিস শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করল। এ ব্যাপারে আমেরিকাই হল উদ্যোগী। চীনের বুর্জোয়ারা এবং একদল বুদ্ধিজীবী উইলসনের কথায় বিশ্বাস করেছিল সুতরাং তারা খুব আশা করল যে এই শান্তি সম্মেলনে চীনের ওপর সুবিচার করা হবে,

আশা করল যে "ন্যায়", "স্বাধীনতা" ইত্যাদি আদর্শ অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো চীনকে এবারে সত্যি সত্যি স্বাধীনতা দেবে।

সব বুদ্ধিজীবী কিন্তু এরকম অন্ধবিশ্বাস নিয়ে চলত না। কারণ দেশে কয়েক বছর ধরে নতুন কালচার বা সংস্কৃতির, নতুন চিন্তা ও আদর্শের, আন্দোলন চলেছে। যুদ্ধের সময় মানুষের মন তোলপাড় হতে শুরু হয় কারণ অসংখ্য সমস্যা নিয়ে লোকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। জাতীয় বুর্জোয়াদের আর্থিক শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ার দরুণ বুর্জোয়া রাজনীতি ও বুর্জোয়া অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রচার বাড়ে এবং সে প্রচারে বুর্জোয়া ধ্যানধারণা লোকের কাছে প্রিয়ও হয়ে ওঠে। সামন্ত বা জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে এবং নতুন কালচার বা সংস্কৃতির আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৫-তে একদল ক্ষুদে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী "সিং চিং নিয়েন" বা "নতুন যৌবন" নাম দিয়ে একটি পত্রিকা বার করে। উদ্দেশ্য নতুন ধ্যান-ধারণা প্রচার করা। সাধারণ ভাবে গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের পক্ষে এবং সামন্তদের স্বেচ্ছাচার, সামন্ত রীতি-নীতি এবং কনফুসিয়াসের মতবাদের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা প্রচার চালাতে থাকে। সবরকম কুসংস্কার ও বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তা ও কাজকে "নতুন যৌবন" আক্রমণ করে।

নতুন আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে ভাল করে ছড়িয়ে দিতে হলে সহজ ভাষায় পত্র-পত্রিকা বই ইত্যাদি ছাপিয়ে ছড়ানো দরকার। এই কথা ভেবে এই "নতুন যৌবন" দল আন্দোলন শুরু করল। তাদের দাবী হল যে "পাই হুয়া" বা "সহজ ভাষা" অর্থাৎ যে ভাষায় কথা বলা হয় সেই ভাষায় লিখতে হবে। তা না হলে জনসাধারণের মনের মধ্যে নতুন চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না। এতদিন সব লেখাই পণ্ডিতী ভাষায় লেখা হয়েছে। এমন কি খবরের কাগজের ভাষাও তাই। ভালো লেখাপড়া না জানলে লোকে সে ভাষা পড়তেই পারে না, কেউ পড়লে শুনে বুঝতেও পারে না। এই আন্দোলনের দরুণ কিছু এগিয়ে-চলা বুদ্ধিজীবী ঝরঝরে সহজ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এই সব প্রবন্ধে তাঁরা দেশের তরুণদের ডেকে বলেন যে তাদের নিজেদের বদলাতে হবে, এগিয়ে-চলা আধুনিক জগতের চিন্তাধারা গ্রহণ করতে হবে, মামুলী সংস্কারের বাঁধন ছিঁড়তে হবে এবং চীনের সামন্ত-প্রধান সমাজকে গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

এই নতুন সংস্কৃতির একজন প্রধান প্রচারক চেন তু-সিউ চীনের সামন্ত সমাজব্যবস্থাকে এবং তার সংস্কৃতি বা ধ্যানধারণাকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। সে তরুণদের মামুলী চিন্তাধারা ছেড়ে দিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথ গ্রহণ করতে বলল। যুদ্ধবাজ সর্দারদের শাসন বরবাদ হোক, দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক, এই ছিল তার প্রধান বক্তব্য। চেন তু-সিউ কিন্তু জনসাধারণকে বিপ্লবে সামিল করতে অনিচ্ছুক ছিল। তার এই আজগুবি ধারণা ছিল যে, শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়াই চীনে বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

নতুন সংস্কৃতির আরেকজন বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন লু সুন। বিপ্লবী চিন্তায় তাঁর জুড়ি ছিল না। ১৯১১-র বিপ্লবের আগে লু সুন সুন ইয়াৎ-সেনের বুর্জোয়া বিপ্লবের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সামন্ত সমাজের অনাচার-অত্যাচারের বীভৎস দিকটা লোকের সামনে তুলে ধরেন এবং সে সমাজকে উৎখাত করবার জন্যে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করবার ডাক দেন। এখানেই লু সুনের সঙ্গে চেন তু-সিউর তফাৎ। চীনের মানুষকে জাগানোর ব্যাপারে লু সুন যে কাজ করেছিলেন তা চিরকাল মনে রাখবার মতো।

আরেকজন নতুন সংস্কৃতির প্রচারক, লি তা-চাও, অসাধারণ বিপ্লবী লেখা লিখেছিলেন। সামন্ত-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একথা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীর জনসাধারণের দুষমন এবং এই সাম্রাজ্যবাদকে খতম না করতে পারলে সত্যিকার গণতন্ত্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তিনিই প্রথম চীনের সামন্ত-বিরোধী লড়াইকে একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হয়ে উঠতে বলেন।

নতুন আলোয় জেগে ওঠা এই চীনে আমরা লক্ষ করি যে শত শত নয়, হাজার হাজার তরুণ-তরুণী ইউরোপের ভাববাদী দর্শন পড়ছে এবং সেই সঙ্গে মার্কস-এর দর্শনও পড়ছে—যে দর্শনের জোরে লেনিন-স্তালিন সদ্য সদ্য রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়েছেন। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে বাজার ছেয়ে গেছে। মার্কস, লেনিন, মিল, লিনকন, রুশো, ওয়েলস, হুইটম্যান, এমারসন, গোর্কী সবই এই তরুণরা পড়ে চলেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় ৩০০ পত্রিকা চালু করল এবং এর মধ্যে বেশিরভাগই সেই "পাই হুয়া" বা সহজ ভাষায়

লেখা—যে ভাষা পড়ে শোনালে অশিক্ষিতরাও বুঝতে পারে, যে ভাষায় পণ্ডিতের কথা অপণ্ডিতের কানে গেলেই মনে ঢোকবারও পথ পায়। যুব সংগঠনও গড়ে উঠতে লাগল প্রচুর, তেমনি গড়ে উঠল অসংখ্য পাঠচক্র। এই ধরনের দুটি সংগঠনের নাম এখানে উল্লেখ করা উচিত। একটি হল দক্ষিণ চীনের হুনান প্রদেশের "জনতা পাঠ সংঘ"। এর নেতা মাও ৎসে-তুং। আরেকটি হল উত্তর-পূর্ব চীনের তিয়েনৎসিনের "জাগরণ সংঘ"। এটির নেতাদের মধ্যে ছিলেন চৌ এন-লাই। ক্রমে নতুন বুদ্ধিজীবীদের এই আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী দুরকমের মত দেখা দিল। দক্ষিণরা বলল, আমরা রাজনীতির মধ্যে যাব না, শুধু সংস্কৃতি নিয়ে থাকব। বামরা বলল, আমরা জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন চাই—রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, সর্বত্র।

সমাজে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে অর্থাৎ মানুষের মনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এবং ঠিক তার পরে যে পরিবর্তন ঘটল আফিং যুদ্ধের পরে আর অন্য যেসব যুদ্ধ ঘটেছিল সেগুলো এরকম পরিবর্তন আনতে পারেনি। এবারকার পরিবর্তন আগের চাইতে অনেক গভীর, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুহাজার বছর ধরে যে মাঞ্চু রাজতন্ত্র চীনের বুকে চেপে বসে ছিল তাকে বাতিল করল ১৯১১-র বুর্জোয়া বিপ্লব। কিন্তু এবারকার পরিবর্তনগুলো ভবিষ্যতের যে ধরনের বিপ্লবী আন্দোলনের ভিৎ গড়ে তুলল তার তুলনায় ১৯১১-র বিপ্লবী আন্দোলনকে মনে হবে জলের ওপরতলার খুচরো ঢেউ, সব কিছুকে তোলপাড় করা ঢেউ আদপেই নয়। স্বদেশপ্রেম এখন প্রবল হয়ে উঠেছে। জাতীয় বুর্জোয়া, ক্ষুদে বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য মেহনতী মানুষ এখন চায় বিদেশীর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় চুক্তিগুলো বাতিল হোক, চীন স্বাধীন হয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াক। তারা একথা এখন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, যদি এই অন্যায় চুক্তিগুলো চালু থাকে তাহলে যুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যবাদীরা ঐগুলোর সাহায্যে অর্থাৎ তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধেগুলো ব্যবহার করে চীনের উন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে। সুতরাং চুক্তি বাতিল করবার জোরদার আন্দোলন শুরু হল।

চীনের ভেতর যখন এই অবস্থা তখন ফ্রান্সে শান্তিসম্মেলন বসল। এই সম্মেলনে পিকিং সরকারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন। জনতার

আন্দোলন তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই জনতার দাবি তাঁরা সম্মেলনে এইভাবে তোলেন—এক, চীনে বিদেশীদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকাগুলো বাতিল করতে হবে। দুই, চীন থেকে বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিন, চীনের আইনের আওতার বাইরে থাকার যে অধিকার বিদেশীরা ভোগ করছে সেগুলো বাতিল করতে হবে। চার, লীজ করা এলাকা বা 'কনসেশন' নামের যেসব এলাকা বিদেশীরা কব্জা করেছে সেগুলো চীন সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পাঁচ, শুল্ক আদায়ের অধিকার চীন সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে, যাতে বিদেশী আমদানির ওপর পাঁচ শতাংশের বেশি শুল্ক বসানো যাবে না চীনের পক্ষে ক্ষতিকর এই নিয়ম চীন বাতিল করে দিতে পারে। ছয়, ১৯১৫-তে ইউয়ান শিহ্-কাইর আমলে যে ২১ দফা দাবি জাপান চীনের ওপর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলোকে বাতিল করতে হবে। এই ছ'টা দাবির ওপরই চীনের প্রতিনিধিরা শান্তিসম্মেলনে বেশি জোর দেন।

সম্মেলনের সাধারণ সভায় অর্থাৎ যেখানে সব দেশের প্রতিনিধিরা আছেন সেই পূর্ণ অধিবেশনে চীনের এই দাবিগুলো আদৌ আলোচনা হল না। কারণ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান, ফ্রান্স এবং ইতালী এই পাঁচ দেশের পাঁচ জনকে নিয়ে যে সর্বোচ্চ সমিতি সম্মেলন চালাচ্ছিল সেই সমিতির কাছে চীনের দাবিগুলো প্রথম গিয়েছিল। সমিতি বলে যে, শান্তিসম্মেলনে এই ধরনের দাবি নিয়ে আলোচনা হতে পারে না। প্রথমেই এই রকমের বাধা পেয়ে চীনের প্রতিনিধিরা কোনও রকমে সাহস সংগ্রহ করে বলেন যে যুদ্ধের আগে জার্মানি শানতুং-এ যে "বিশেষ অধিকার" ভোগ করত সেগুলো বাতিল করা হোক। জাপানের প্রতিনিধি তখন বলল যে, চীন সরকার, (মানে তুয়ান চি-যুইর চাকর সরকার) শান্তুং-এ জার্মানির যে অধিকারগুলো ছিল দলিল করে সেগুলো জাপানকে দিয়ে দিয়েছে এবং সেই দলিলে লেখা আছে যে, শানতুং-এর ওপর এই "বিশেষ অধিকার" সম্পর্কে জাপানের দাবি পিকিং সরকার "আনন্দের সঙ্গে মেনে নিচ্ছে"। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালী চীনের প্রতিনিধিদের বলল যে, যুদ্ধের সময় তারা জাপানকে কথা দিয়েছিল যে, শানতুং-এর ওপর জাপানের দাবি তারা সমর্থন করবে এবং সেই জন্যে এখন কথা রক্ষা না করে তাদের কোনও উপায় নেই। আমেরিকা বলল বর্তমান অবস্থায় তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। চীনের

মানুষ বুঝতে পারল যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা সবাই একজোট হয়েছে। তাই "সব শেয়ালের এক রা"।

শান্তিসম্মেলনে যখন শান্তি চুক্তির ধারাগুলো লেখা হল তখন শানতুং সম্বন্ধে ধারাগুলো পুরোপুরি জাপানের ইচ্ছামত লেখা হল। বিদেশী শক্তিগুলো চীনের প্রতিনিধিদের পীড়াপীড়ি করল চুক্তি মেনে নিতে এবং চুক্তিতে সই করতে। কিন্তু চীনের জনসাধারণ তখন প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। পিকিং-এর চাকর সরকারের ইচ্ছা যে, চীনের প্রতিনিধিরা ঐ চুক্তিতে সই করে আসে। পিকিং-এর সরকার চীনের প্রত্যেক প্রদেশের সরকারের কাছে তার করে বলল যে, সব দিক বিবেচনা করলে চুক্তিতে সই না করলে চীনেরই বিপদ হবে, সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে যদি বেয়াড়া লোকেরা পিকিং সরকারের চুক্তিতে সই করার ছুতো ধরে গণ্ডগোলে উস্কানি দেয় তা হলে প্রদেশের সরকারগুলো যেন যে কোনও উপায়ে বিশৃঙ্খলা ঠেকায়।

সুতরাং শান্তির নামে ডাকাতদের লুঠের মাল ভাগ করার চুক্তি পিকিং-এর প্রতিনিধিরা সই করত যদি না চীনে ৪ঠা মে'র প্রচণ্ড ঝড় উঠত। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের ন্যায্য-দাবিগুলোকে সম্মেলনে আলোচনা না করে সরাসরি বাতিল করেছে এ খবর চীনে পৌঁছতেই দেশময় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। ১৯১৯-এর ৪ঠা মে পিকিং-এর প্রায় তিন হাজার ছাত্র মিছিল করে সরকারী দপ্তরগুলোর ওপর চড়াও হয়। পিকিং-এর সাধারণ বাসিন্দারাও এসে বিক্ষোভে যোগ দেয়। সেখানে ঠিক সেই সময় মন্ত্রীরা জাপানী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দহরম মহরম করছিল। ছাত্ররা আওয়াজ তুলল, "আজাদীর জন্যে লড়তে হবে!" "বেইমানদের শাস্তি চাই।" "আমাদের শপথ—সিংতাও ফিরিয়ে আনব!" "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।" "শান্তি চুক্তিতে করব না সই!" "২১ দফা দাবি বরবাদ হোক!" "জাপানী জিনিস বয়কট কর!" হাজারো তরুণ ছাত্রের মুখ দিয়ে নতুন চীন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে। আকাশ তোলপাড়, লক্ষ লক্ষ মন তোলপাড়। মাও ৎসে-তুং বলেছেন, "৪ঠা মে আন্দোলন ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। এর বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য দেখতে হবে এর একটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে—সেটা হচ্ছে এর সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের প্রতি সম্পূর্ণ এবং আপোষহীন বিরোধিতা যা ১৯১১-র বিপ্লবে অনুপস্থিত ছিল।"

বিক্ষোভ-মিছিল থেকে দাবি উঠল তিনজন দেশদ্রোহীকে শাস্তি দিতে হবে। এক, সাও যু-লিন—এ ইউয়ান শিহ্-কাইর আমলে সহকারী বিদেশ-মন্ত্রী হিসেবে জাপানের চাপিয়ে-দেওয়া "২১ দফা দাবি"র দলিলে সই করেছিল। দুই, লু সুং-ইউ—"২১ দফা দাবি" যখন সই হয় তখন এ অস্থায়ীভাবে জাপানে চীনের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিল। তিন, সেই সময়কার জাপানে চীনের স্থায়ী মন্ত্রী চাং সুং-সিয়াং—এ লোকটা পর পর অনেকগুলো রেল-লাইন তৈরির অধিকার জাপানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশ কর্ডন করে অর্থাৎ সার বেঁধে দাড়িয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে জনতাকে। জনতা সেই বাধা ভেঙ্গে সাও যু-লিনের বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখে সেখানে চাং সুং-সিয়াং লুকিয়ে আছে। তাকে তারা খোজ্জা করে মার লাগায় এবং বাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পিকিং-এর সরকার অর্থাৎ যুদ্ধবাজ সর্দারদের সরকার জনতার ওপর গুলি চালায় এবং অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন পিকিং-এর ছাত্ররা অত্যাচারের প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘট করে। তারা তাড়াতাড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মধ্যবিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদের একটি ছাত্র ফেডারেশন বা সংঘ গড়ে তোলে এবং ইস্তাহার ছড়িয়ে গোটা দেশকে বিদ্রোহ করবার জন্যে আবেদন জানায়। সারা দেশে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। চীনের তরুণ ছাত্ররা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার মতো অন্ধ-দাসত্বের মধ্যে জীবন কাটাবে না বলে লড়াইতে ঝাঁপ দেয়। তিয়েনৎসিন, শাংহাই, নানকিং, উহান, ক্যান্টন এবং অন্যান্য শহরে ছাত্র-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অঞ্চলে অঞ্চলে ছাত্র-সমিতি যেমন গড়ে ওঠে তেমনি একটি সারা চীন ছাত্র-সমিতিও গড়ে ওঠে। চীন সরকার অভিযোগ করে যে, বিদ্রোহী অধ্যাপক ও ছাত্ররা ছাত্র-অন্দোলনকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং হামলাবাজ ছাত্ররা ছাত্র-আন্দোলনকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নাবাচ্ছে। স্বদেশপ্রেমের অগ্নি-স্রোত দেশের সীমার বাইরেও ছড়ায়। জাপানে যে চীনে ছাত্ররা লেখাপড়া করতে গিয়েছিল তারাও টোকিওর পথে মিছিল বার করে এবং জাপানী সরকার তাদের বিরুদ্ধে ঘোড়সওয়ার লেলিয়ে দেয়।

সিনান ও শানতুং-এ হাজার হাজার শ্রমিক জমায়েৎ হয়ে জাপানী জিনিস বয়কটের দাবি তুলল। জাতীয় বুর্জোয়ারাও ধর্মঘটে উৎসাহ দিয়েছিল। কারণ এ লড়াই তাদেরও লড়াই। ৩রা জুন ছাত্ররা আবার পিকিং-এর রাস্তায়

বিরাট দল নিয়ে বিক্ষোভ দেখাল। এক হাজারেরও বেশি ছাত্রের জেল হল। শাহাংই সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাল। ৫ই জুন শাংহাই-এর ঘাট থেকে সত্তর হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করল, জাপানী মালিকদের কাপড়ের কলগুলোও এই ধর্মঘটে অচল হল। এর পর এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ছাপাখানা, ট্রাম, বাস ও জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থা—সর্বত্রই ধর্মঘট হল। ইংরেজ মালিকের কাইলান খনি এবং পিকিং-হ্যাংকাউ রেলপথেও ধর্মঘট হল। চীনের ইতিহাসে শ্রমিকরা এই প্রথম রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘটে নাবল। শ্রমিকদের এই দৃষ্টান্ত গোটা দেশের জঙ্গী ভাব আরও বাড়িয়ে দিল। উত্তরে তিয়েনৎসিন থেকে দক্ষিণে ক্যাণ্টন অবধি, আর পূবে শাংহাই থেকে পশ্চিমে চেংতু পর্যন্ত জাপানী জিনিস বয়কট আর প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাতিলের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। শানতুং, শানসি, হোপেই, কিয়াংসি, হুপে এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা দলে দলে পিকিং-এ এসে দাবি করল "২১ দফা দাবি" বাতিল করতে হবে, সভাসমিতি করার আর মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিতে হবে।

লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে ৪ঠা মে'র আন্দোলন যে এত বিরাট হয়ে উঠেছিল তার কারণ দেশময় শ্রমিক ধর্মঘটের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ঐ আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে আন্দোলন ক্রমে গণ-আন্দোলন হয়ে উঠেছিল।

প্রতিবাদের ঝড় দেখে পিকিং সরকার ভয় পেয়ে গেল এবং জুন মাসের গোড়ার দিকে বন্দী ছাত্রদের ছেড়ে দেবার হুকুম দিতে বাধ্য হল। বন্দী ছাত্ররা বলল তারা জেলখানা থেকে বার হবে না, যদি না দোষী আমলাদের বরখাস্ত করা হয়। নতুন নতুন বিক্ষোভ দেখাবার অনুমতি পরিষ্কার ভাষায় দেওয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চায়। দেশ-জোড়া জনতার ক্ষোভকে শান্ত করবার জন্যে সরকার পুলিশকে জেলখানায় পাঠাল বন্দীদের কাছে ক্ষমা চাইতে, এমন কি জেল থেকে বন্দীদের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে মোটর গাড়িরও ব্যবস্থা করল। গরজ বড়ো বালাই!

যে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করবার দাবি উঠেছিল তারা চাকরিতে ইস্তফা দিল। চীন সরকার ঘোষণা করল ভের্সাই শান্তি-চুক্তিতে চীন সই করবে না। গণ-আন্দোলনের জয় জয়কার।

মনে রাখতে হবে যে, এই ৪ঠা মে'র আন্দোলন চীনের ইতিহাসে দেখা

দিয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর এবং অক্টোবরের মহাবিপ্লবের পর। মাও ৎসে-তুং বলেছেন, "বিশ্ববিপ্লবের, রুশ বিপ্লবের এবং লেনিনের ডাকেই ৪ঠা মে আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। এটা ছিল সেই সময়কার বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অঙ্গ।" এতদিন চীনের বুর্জোয়া বিপ্লবীদের চোখ ছিল ইউরোপের গণতন্ত্রের দিকে। সেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ওপরই তাদের লোভ ছিল। কিন্তু "গণতন্ত্রী" ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স শান্তি-চুক্তির ব্যাপারে যা করল তাতে তাদের বজ্জাতি বেশ ভালোভাবেই ধরা পড়ল। বুর্জোয়াদের বড়ো বড়ো বুলি আওড়ানো যে ভাঁওতা তা বুঝতে বাকি রইল না।

এসম্বন্ধে লেনিন বলেছেন, ১৯১৪-১৮-র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ দেশে দেশে যারা অত্যাচার ভোগ করে তাদের সামনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাঁওতায় ভরা বুলির বেসাতি পরিষ্কার করে তুলে ধরল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশগুলো মহাযুদ্ধের পর যে নীতি চালাল তাতে একটা আজগুবি ধারণা বেশ খানিকটা ভেঙ্গে গেল। ধারণাটা হল এই যে, পুঁজিবাদের অধীনেও নানা জাতির শান্তি ও সাম্যের আবহাওয়ার মধ্যে মিলেমিশে বাস করা সম্ভব। এ আজগুবি ধারণা ক্ষুদে বুর্জোয়া আর জাতীয় বুর্জোয়াদের ছিল। ধারণাটা দেউলে হতে শুরু হওয়ায় পৃথিবীর এগিয়ে থাকা দেশ-গুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম আর উপনিবেশ আর পরাধীন দেশ-গুলোতে মেহনতী জনতার বিপ্লবী সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠল।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দুর্বল মনের আজগুবি ধারণা ধুলো-ধোনা করার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার অক্টোবর মহাবিপ্লব আরেকটা অসাধারণ কাজ করল। সে মহাবিপ্লব বিশ্বের মানুষকে দেখিয়ে দিল কোন্ পথে সংগ্রাম করলে সাম্রাজ্যবাদের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা যায় আর সংগ্রামী মানুষের মনে এই বিশ্বাস এনে দিল যে, জয় হবেই হবে।

১৯১৮তে স্তালিন বলেছিলেন, অক্টোবর বিপ্লব এশিয়ার অত্যাচরিত জাতি-গুলোর মেহনতী জনতার যুগযুগান্তের দীর্ঘ ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তাদের টেনে নাবিয়েছে।

নতুন সংস্কৃতির নেতা লি তা-চাওর কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ১৯১৮-র নভেম্বর মাসের "নব যৌবন" পত্রিকায় তিনি অক্টোবর বিপ্লবকে প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে, এ বিপ্লব শুধু একটা দেশে নয় সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে এনেছে এক

নতুন দিনের ভোরের আলো। একটা সশস্ত্র দল আরেকটা সশস্ত্র দলকে হারিয়ে দিয়েছে বলে আমরা আজ উৎসব করছি না, গণতন্ত্র স্বেচ্ছাতন্ত্রকে হারিয়েছে, সমাজতন্ত্র যুদ্ধবাজদের হারিয়েছে, তাই আমরা বিজয়-উৎসব করছি।

১৯১৯-এ মাও ৎসে-তুং "সিয়াং কিয়াং রিভিউ" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় বললেন, জনগণকে সংগঠিত করতে হবে রাশিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করে।

নতুন পথ

৪ঠা মে'র আন্দোলনে জনতার জয় হল বটে কিন্তু দেশদ্রোহী পিকিং সরকারের চেষ্টা থাকল কেমন করে সেই জয়লাভকে বরবাদ করে দেওয়া যায়। জুলাই মাসে সরকার একই সঙ্গে ঘোষণা করল যে, ভের্সাই শান্তি চুক্তিতে চীন সই করেনি এবং জাপানী জিনিস বয়কট করা আইনত নিষেধ করা হল। এতে জনসাধারণ ক্ষেপে গেল। তাদের স্বদেশী জিনিস বেশি করে কেনার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাপানী জিনিষ বয়কটের আন্দোলন ক্রমে জোরদার হয়ে উঠতে লাগল। তাঁবেদার পিকিং সরকার কিছু করে উঠতে পারছে না দেখে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই হামলার কাজে নেমে পড়ল এবং নভেম্বর মাসে ফুচাউ শহরে রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিল। জাপানের বাণিজ্য-প্রতিনিধির উস্কানিতে জাপানী গুণ্ডারা দাঙ্গা বাধিয়ে অনেক স্বদেশপ্রেমিক ছাত্রকে হত্যা করল। শক্তি দেখাবার জন্যে জাপানের সরকার ফুচাউ বন্দরে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাল এবং একদল সৈন্যকে ডাঙ্গায় নামিয়ে দিল। এই ঘটনার ফলে চীনের জনসাধারণের ক্ষোভ আরও প্রবল হল। পিকিং-এর তাঁবেদার সরকার এক বছর ধরে ধানাই পানাই করে ১৯২০-র নভেম্বরে জাপানের সরকারের কাছে লিখে পাঠাল যে, গত মে মাসে ফুচাউতে যে জাপানী জিনিস বয়কটের ব্যাপারটা ঘটেছিল সেটা ভুল বোঝাবুঝির দরুণ হয়েছিল এবং চীন সরকার তার জন্যে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে।

এই যে হাঁটু গেড়ে বসে কথা বলা এটা একটা জেগে ওঠা জাত কেন সহ্য করবে?

ফুচাউর ঘটনার মাসখানেক পর পিকিং সরকার আবার ফতোয়া জারি করল জাপানী জিনিস বয়কট করা আইনত নিষেধ। এর অল্প দিন পরেই, জাপানের সরকার পিকিং সরকারকে বলল, এস, শানতুং-এ "বিশেষ অধিকারের" ব্যাপারটা আমরা দুপক্ষ মিলে আপোষে মিটিয়ে ফেলি। একথা শোনা মাত্র দেশের মানুষ ক্ষেপে উঠল। কারণ তাদের বুঝতে একটুও দেরি হল না যে, আপোষে মেটানো মানে বেহায়া সরকারের সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে দাসখত লিখে দেওয়া। চীনের সর্বত্র প্রতিবাদের ঢেউ উঠল। পিকিং, শাংহাই, তিয়েনৎসিন এবং অন্য জায়গার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংঘগুলো যুক্তভাবে এক "জাতীয় সভা" প্রতিষ্ঠা করল। উদ্দেশ্য—আগের চাইতে জোরদার জাপ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা।

পুলিশ পিকিং-এর ছাত্র-সমিতি এবং "জাতীয় সভা" ভেঙ্গে দিল। সেটা ১৯২০-র এপ্রিল মাস। ১৪ই এপ্রিল শাংহাইতে সারা চীন ছাত্র সমিতি সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করল। ৬ই মে সাংহাইয়ের ফরাসী বাণিজ্য-প্রতিনিধি পিকিং সরকারের অনুরোধে ফরাসী এলাকায় ছাত্র সমিতি এবং সর্ব অঞ্চল ফেডারেশনের আপিস বন্ধ করে দিল। লোকের চোখে আরেকবার পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পিকিং সরকার হাত মেলাচ্ছে গণ-আন্দোলন দমন করবার জন্যে। কিন্তু জনতার স্বদেশী আন্দোলনকে দমন করা গেল না। পিকিং সরকারের এ সাহস হল না যে, জাপানের প্রস্তাব মেনে নেয়, আবার এ সাহসও হল না যে, সে প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। জাপানের পা-চাটা চীনে মন্ত্রী চিন ইউং-পেং মন্ত্রীত্ব ছাড়তে বাধ্য হল। পিকিং সরকার মনের দুঃখে জাপানকে কান্নার সুরে লিখে পাঠাল যে, শানতুং সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবার মতো আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে না।

১৯১৯ থেকে ১৯২০—গণ-আন্দোলনের জোয়ার চলল, জয়লাভও হল কিন্তু বড়ো রকমের জয়লাভ তেমন একটা হল না। সাম্রাজ্যবাদী জাপান এবং তার চাকররা চীনের বুকের ওপর বসে শাসন চালিয়ে যেতে লাগল। আরেক দিকে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড দেশটার ওপর তাদের রাজনৈতিক চাপ বাড়িয়েই চলল। তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, এ দু'বছরে গণ-আন্দোলনের একটা শক্ত ভিৎ গড়ে উঠল, নতুন পথে এগোবার জন্যে জনতা প্রস্তুত হল। একথা সত্যি যে, স্বদেশপ্রেমিক আন্দোলন মাঞ্চু রাজবংশের শেষ জীবনে

দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এবং জাপানী জিনিস বয়কটের অনেক বছর আগেই বয়কট আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। ১৯০৫এ একবার আমেরিকান জিনিস বয়কটের আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৯-এর আন্দোলনের চরিত্র আলাদা। এ আন্দোলন ছড়িয়েছিলও অনেক গুণ বেশি। এই আন্দোলনের ফলে শ্রমিক-আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল এবং দেশে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ দারুণভাবে প্রচার হল। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পরে শ্রমিকরা গণ-আন্দোলনে একটা স্বাধীন শক্তি হিসাবে দেখা দিল। মাও ৎসে-তুং বলেছেন, "৪ঠা মে আন্দোলনের পরে বুর্জোয়ারা আর চীনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা রইল না, নেতা হল সর্বহারা শ্রেণী।" অনেক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করলেন এবং ক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে লাগল।

১৯২০-এ ক্যান্টন-হ্যাংকাউ রেলওয়ের দক্ষিণ অংশের শ্রমিকরা এবং লুংহাই রেলওয়ের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। ১৯২১-এ শাংহাই, ক্যান্টন, হংকং, হ্যাংকাউ ও অন্যান্য জায়গায় এবং প্রধান প্রধান রেলওয়েতে সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে লাগল। এই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা জনগণের মনে শেকড় গাড়তে আরম্ভ করল।' ৪ঠা মে'র আন্দোলন নতুন সংস্কৃতির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সে আন্দোলনের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। এগিয়ে চলা বুদ্ধিজীবীরা সবার আগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করেণ এরং তাঁদের প্রচারের ফলে সমাজতন্ত্রের আদর্শ চীনে বেশ প্রচার হয়। সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রচার হওয়ার পর দেশের মানুষ তাদের সমাজের চরিত্রটা চিনতে আরম্ভ করল এবং চীনের রাজনীতির আসল ব্যাপার কিছুটা বুঝতে পারল। ফলে সাম্রাজ্যবাদী জমিদার, ব্যবসায়ী এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা তাদের মিথ্যে কথা দিয়ে আর আগের মতো সহজে সাধারণ মানুষকে ঠকাতে পারল না। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা যোগ হওয়াতে ১৯২১-এ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়। এখন থেকে সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের পা-চাটা দেশী শোষণকারীদের বিরুদ্ধে যে লড়াই হবে তাতে চীনের মানুষ নেতা হিসেবে পাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে।

মাও ৎসে-তুং বললেন, "১৮৪০-এর আফিং যুদ্ধ থেকে ১৯১৯-এর ৪ঠা মে'র

আন্দোলনের ঠিক আগে পর্যন্ত সত্তর বছরেরও বেশি সময় চীনেদের কোনও মতাদর্শগত হাতিয়ার ছিল না যা দিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারে। পুরোনো গোঁড়া সামন্তবাদের মতাদর্শগত হাতিয়ারগুলো হেরে গেছে, তারা পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের দেউলে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে চীনেরা বিবর্তনের তত্ত্ব, স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের তত্ত্বের মতো মতাদর্শগত হাতিয়ার ও রাজনৈতিক সূত্রগুলোর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিল—সেগুলো সবই ধার করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের জন্মস্থান পশ্চিমের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবী যুগের অস্ত্রাগার থেকে। চীনেরা রাজনৈতিক দল গড়ে তুলল এবং বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটাল এই বিশ্বাসে যে, এইভাবে তারা বিদেশী শক্তিগুলোকে ঠেকাতে পারবে এবং একটা প্রজাতন্ত্র গড়তে পারবে। কিন্তু এই সব মতাদর্শগত হাতিয়ারগুলো, সামন্তবাদের হাতিয়ারগুলোর মতো খুব দুর্বল বলে প্রমাণিত হল এবং তাদের যখন পালা এল তখন পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল এবং তাদের সরিয়ে নেওয়া হল এবং দেউলে বলে ঘোষণা করা হল। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব চীনেদের জাগিয়ে তুলল এবং তারা নতুন কিছু শিখল—মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। চীনে জন্ম হল কমিউনিস্ট পার্টির—সে এক যুগান্তকারী ঘটনা।"

এই প্রসঙ্গে আমরা আরেকবার রাশিয়ার অক্টোবর মহাবিপ্লবের উল্লেখ করব। আমরা জানি অক্টোবর বিপ্লবের আগে চীনের বিপ্লবীদের কাছে আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা ছিল পশ্চিমী গণতন্ত্র অর্থাৎ পার্লামেন্ট বা আইনসভার মারফৎ শাসন চালানো। প্রথম মহাযুদ্ধে এই বিপ্লবীরা কি দেখল? দেখল যে, "গণতন্ত্রী" দেশগুলো রাজতন্ত্রী জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং তুরস্ককে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে হারিয়ে দিল। তাহলে দেখা গেল যে, রাজতন্ত্র এবং "গণতন্ত্র" দুই-ই অনবরত জনসাধারণকে ঠকায় এবং অঝোরে তাদের রক্ত ঝরায়। সুতরাং চীনের বিপ্লবীদের মনে প্রশ্ন জাগল—পথ কি? কোন্ পথে আমাদের মুক্তি? এই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাথী কে হবে?

মার্কস এবং লেনিন চীনের মানুষের সংগ্রামকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন কিন্তু তখন পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকদের চীনের সংগ্রামকে সাহায্য করবার মতো অবস্থা ছিল না। মার্কস ও লেনিন যে চীনকে সমর্থন করেছেন এ খবর তখন চীনে এসে পৌঁছতও না। তখন চীনের মানুষের মনেও এ

-ধারণা জন্মাতে পারেনি যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা তাদের বন্ধু কারণ তারা এবং ঐ বিদেশী শ্রমিকরা সবাই পুঁজিবাদের পায়ের তলায় পড়ে মার খাচ্ছে। ১৯১৭-র মহাবিপ্লবের পরে অবস্থাটা পাল্টে গেল। তখন চীনেরা উত্তর সীমান্তের দিকে তাকালেই দেখতে পাচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে—নতুন সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের মূর্তি। সে রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী শাসন চালাচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যেই চীনের মানুষ দেখল এই নতুন রাষ্ট্র শুধু মূর্তি নয়, মানুষও বটে। আশ্চর্য মানুষের মতো ব্যবহার করল চীনের সঙ্গে। যখন যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-গুলো চীনকে দাসত্বের শেকলে আরও ভালো করে বাঁধবার জন্যে নতুন ফন্দি আঁটতে লাগল তখন কিন্তু শিশু রাষ্ট্র সোভিয়েৎ রাশিয়া ঘোষণা করল যে যেসব অন্যায় চুক্তির জোরে জারের সরকার চীনে নানা রকমের বিশেষ সুবিধে বা অধিকার ভোগ করত এবং চীনের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে প্রচুর "ক্ষতিপূরণ" আদায় করত সেগুলো বাতিল করে দেওয়া হল। সোভিয়েৎ রাশিয়া আরও জানাল যে, তারা সমানে সমানে যে রকম চুক্তি হয় সেরকমের চুক্তি চীনের সঙ্গে করতে চায়। এ ঘোষণা ১৯১৯-এর জুলাই মাসে। ১৯২০-র এপ্রিলে সোভিয়েৎ সরকার পিকিং সরকারের কাছে নিয়ম-মাফিক চিঠি পাঠাল ঐ ঘোষণা অনুযায়ী নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়ে। এর পর এক মজার ব্যাপার ঘটল। মজার বলছি বটে কিন্তু চরম বদমায়েসি ব্যাপার! পিকিং সরকার সোভিয়েৎ রাশিয়ার চিঠিখানা দপ্তরখানার কোন অন্ধকার খোপে রেখে দিল তার ঠিক নেই, বলল রাশিয়ার সঙ্গে আলাদা রকমের ব্যবহার তো তারা করতে পারে না, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যেমন রাশিয়ার সঙ্গেও তেমনি ব্যবহার করবে। জারের আমলের যে রুশ প্রতিনিধি পিকিং-এ তখনও ছিল তাকে পিকিং সরকার "১৯০১-এর চুক্তি" অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতেই থাকল যদিও লোকটি তখন আর কোনও সরকারেরই প্রতিনিধি নয়। পিকিং-এর চাকর সরকার এতদূর পর্যন্ত গেল যে, ঘোষণা করল, সোভিয়েৎ সরকারের চিঠিকে পাত্তা দেওয়া হয়নি। মাস পাঁচেক বাদে সোভিয়েৎ সরকার আবার চুক্তির জন্যে লিখল, পুরোনো চুক্তি বাতিল করতে বলল। একজন প্রতিনিধিও পাঠিয়ে দিল পিকিং-এ। এবারে পিকিং সরকার জারের আমলের প্রতিনিধিকে বাতিল করে দিল বটে কিন্তু নতুন সোভিয়েৎ সরকারকে মেনে নিল না। বিদেশী সাম্রাজ্য-

বাদীদের উস্কানিতে পিকিং সরকার এক কুৎসিত কৌশল করল। লোক-দেখানোভাবে যদিও জারের আমলের রুশ আমলাদের বাতিল করে দিল, আসলে কিন্তু তাদের ঠিক আগের চাকরিতেই বহাল রেখে দিল। ১৯২২-এ সোভিয়েৎ সরকার আবার প্রতিনিধি পাঠিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করল। পিকিং সরকারকে এই সম্পর্ক গড়তে বাধ্য করবার জন্যে চীনের জনসাধারণ এবারে আন্দোলন শুরু করল কারণ তারা সোভিয়েৎ সরকারের ব্যবহারে খুশি হয়েছে খুব আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যে রুশ-চীন মিতালিতে বাধা দিচ্ছে তা বুঝে ক্ষেপেও গেছে বেশ। চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন এতে এক ধাপ আগে বাড়ল।

চীনের জঙ্গী মানুষ নতুন রাশিয়ার কাছ থেকে অনবরত উৎসাহ পেতে থাকল। তারা প্রথমে দেখল যে, তাদের রুশ প্রতিবেশীরা "স্বদেশী" সাম্রাজ্য-বাদীদের কুপোকাৎ করল। তারপর দেখল যে, রুশ শ্রমিকশ্রেণী নতুন সরকারের আমলে এমন জবরদস্ত হয়ে উঠেছে যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সমাজতন্ত্র ধ্বংস করবার জন্যে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাল তখন তাদের চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিল। দেখে তাদের বেশ মজা লাগল যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যারা একে অন্যের বিরুদ্ধে ছিল তারা এখন এক জোট হয়ে নতুন রাশিয়াকে আক্রমণ করতে সৈন্য পাঠাল। যেমন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জাপান এক পক্ষ হয়ে জার্মানির সঙ্গে লড়েছিল, কিন্তু এবারে সোভিয়েৎ শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যে তারা জার্মানির সঙ্গে জোট বেঁধে আক্রমণ চালাল সে রাষ্ট্রের ওপর। শুধু কি তাই? কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আকাশ ফাটানো চীৎকারে প্রচণ্ড প্রচার চালাল পৃথিবীর সর্বত্র। চাকর পিকিং সরকারও সোভিয়েৎকে সশস্ত্র আক্রমণের নোংরা কাজে শরিক হল। চীনের মানুষ যখন দেখল তাদের সব পুরোনো শত্রুরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে তখন তারা সহজে বুঝল যে, সোভিয়েৎই সত্য ও ন্যায়ের পথে আছে আর চিরকালের অন্যায়কারীরা অসত্য ও অন্যায়ের পথ বরাবরের মতো বেছে নিয়েছে। তারা আরেকটা কথাও বুঝল, পৃথিবীর দেশে দেশে তাদের যদি খাঁটি বন্ধু কেউ থাকে তাহলে সে বন্ধু হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের একমাত্র বন্ধু রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র সোভিয়েৎ রাশিয়া।

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং রুশ মহাবিপ্লবের পরেও উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ গোছের দেশগুলোতে বিপ্লবের চরিত্র কিন্তু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিকই রয়ে গেছে, সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি। তার মানে সেসব দেশে যেমন চীনে তখন যে বিপ্লব করতে হবে বা যে বিপ্লবের চেষ্টা চলছে তা বুর্জোয়া বিপ্লব। এক লাফে সমাজতন্ত্রে পেঁছনো যাবে না, প্রথমে বুর্জোয়া-বিপ্লবের ধাপ পার হয়ে তারপর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে। এই সব উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ গোছের দেশে বিপ্লবীদের কাজ হচ্ছে প্রথমে দেশের ভেতরকার সামন্তপ্রথাকে ধ্বংস করা। সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-বিপ্লব ইতিপূর্বেও ইউরোপে বার বার হয়েছে সতেরো, আঠারো এবং উনিশ শতকে। কিন্তু উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশে এখন যে বুর্জোয়া বিপ্লব করতে হবে তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিরোধ লাগবেই লাগবে। এই ব্যাপারটা পুরোনো বুর্জোয়া বিপ্লবের বেলা ছিল না। আজকে জগৎ-জোড়া সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে বিরোধ লাগবেই কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের তাঁবেদার মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর সামন্ত জমিদার শ্রেণীকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেই।

উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশের বিপ্লব আরেক দিক থেকেও আগের বিপ্লবের চেয়ে অন্যরকম। ইতিপূর্বে যখন বুর্জোয়া-বিপ্লব হয়েছে তখন বুর্জোয়ারাই ছিল প্রগতিশীল বা এগিয়ে-চলা শ্রেণী। পুঁজিবাদ ক্রমে সাম্রাজ্যবাদের রূপ নিল। আজকে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশে আমরা পুঁজিবাদের বিশ্বকে গ্রাস করার ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়ছি। তাছাড়া আরেকটা বড়ো ব্যাপার হচ্ছে—চীন যখন তার বুর্জোয়া-বিপ্লব করতে যাচ্ছে তখন তার সামনে এক বিরাট আশার আলো তুলে ধরেছে রাশিয়া, কেন না রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে তার কবরের ওপরে নতুন শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আগে পুঁজিবাদ কোথাও হারেনি। যে নতুন যুগে পুঁজিবাদ রাশিয়া থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর ছ' ভাগের এক ভাগ জায়গা থেকে উৎখাত হয়েছিল সেই নতুন যুগে, সেই নতুন পৃথিবীতে চীন বুর্জোয়া বিপ্লব করতে যাচ্ছে। সুতরাং আগের বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে তার তফাৎ আছে। আগের বুর্জোয়া-বিপ্লবের সঙ্গে চীনের এখনকার বিপ্লবের তফাৎটা কি? রুশ মহাবিপ্লবের পরে জনগণ যেখানেই বিপ্লব করবে সে

বিপ্লব উঠতি সমাজতন্ত্রেকে সাহায্য করবে। এই অবস্থায় কোনও দেশের বিপ্লবকে বুর্জোয়াশ্রেণী কিছুতেই নেতৃত্ব দিতে পারে না। চীনের মতো আধা-ঔপনিবেশিক দেশের মুৎসুদ্দি বা দালাল বুর্জোয়ারা তো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তেই পারে না আর জাতীয় বুর্জোয়ারা দোটানার মধ্যে পড়তে বাধ্য। এক দিকে জাতীয় বুর্জোয়া হিসেবে তাদের লড়াই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, আরেক দিকে নিজের শ্রেণীর মুনাফার স্বার্থে তাদের লড়াই তাদের নিজের দেশের মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে। এমন কি বিপ্লবে যোগ দেওয়ার পরও তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কটা পুরোপুরি ছাড়তে চায় না আর জমির খাজনার মধ্যে দিয়ে তারা গ্রামাঞ্চলের শোষণের সঙ্গেও যুক্ত। এই অবস্থায় চীনের বিপ্লবে সামন্ত-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পুরোপুরি চালাতে হলে নেতৃত্ব করতে হবে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকে। এই শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক জনতা ও ব্যাপক জনসাধারণকে সঠিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে জনগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে। সেই অবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর সংগ্রাম চলবে। মাও সে-তুং বলেছেন যে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়ার ১৯১৭-র অক্টোবর মহাবিপ্লব পৃথিবীর ছ'ভাগের এক ভাগে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাতে চীনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। এই ঘটনাগুলো ঘটবার আগে চীনের ..র্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব পুরোনো বিশ্ব বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোঠায় পড়ত এবং সেই বিপ্লবের অংশ ছিল। এই ঘটনাগুলোর পর চীনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র বদলেছে এবং তা এখন নতুন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোঠায় এসেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ হয়ে পড়েছে।

তাহলে আমরা দেখেছি যে চীনের বিপ্লব এবারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নতুন পথে পা বাড়ালো—নয়া গণতন্ত্রের পথে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক চেন তু-সিউ কিন্তু কিছুতেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মানতে পারলো না। সে বলল যেহেতু বিপ্লবের স্তরটা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সেই জন্যে এ বিপ্লবের নেতা হবে বুর্জোয়া শ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণী বড়ো জোর এ কাজে সাহায্য করতে পারে। সে শ্লোগান তুললো, "সব কাজ কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে দিয়েই হোক।" শয়তান লিউ শাও-চিও প্রথম থেকেই চেন তু-সিউ-র

মতকে সমর্থন জানায়। ১৯২৩ সালে লিউ লিখল যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা "চীনের বর্তমান অবস্থা বিচার করলে শিশু শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভবই নয়। যেহেতু এটা একটা দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার সেই জন্যে এ প্রসঙ্গে আলোচনায় কথার বাজে খরচের কোনও প্রয়োজন নেই" ("ক্লাবের অতীত কাজের সমালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা," আগস্ট, ২০, ১৯২৩)। বলাবাহুল্য যে এই সব বাধা উপেক্ষা করে চীন-বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলল।

॥ নতুন নেতৃত্ব ও গণসংগ্রাম ॥

একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় যে চীনে মার্কসবাদ এসেছিল কপালে জয়-তিলক নিয়ে, সদ্য সদ্য রাশিয়ায় জারের শাসনকে ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণীকে যুদ্ধে জিতিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে। রুশ মহাবিপ্লবের আগে যদি মার্কসবাদ চীনে আসত তাহলে ইউরোপের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করেছে এমন কতকগুলো পুরোনো সোশ্যালিস্ট পার্টির নানা তর্ক আর বাজে ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্কা ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির ভেজাল নিয়ে এসে হাজির হত। যে চেহারায় সে তখন চীনের মানুষের সামনে এসে দাঁড়াত তাতে তাকে অভ্যর্থনা করে নিতে তাদের মনে দ্বিধা হত। "অক্টোবর বিপ্লবের কামান-গর্জনের শব্দ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে।" কথাগুলো মাও ৎসে-তুং-এর। এভাবে আসাই ভালো হয়েছে। এক যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের পরীক্ষায় পাশ করা খাঁটি ইস্পাতের তরোয়ালটি আরেক যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের হাতে এসে পড়ল। তরোয়ালটি থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ছে তাতে বিপ্লবের আগেকার তর্কের কুয়াশা অনেকটা কেটে গেছে।

৪ঠা মে'র আন্দোলনে সংখ্যায় কম হলেও চীনের মার্কসবাদীরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। অন্য আওয়াজের সঙ্গে তারাই সেই আন্দোলনে যোগ করে দিয়েছিল এই আওয়াজটি—"সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।" এই আওয়াজটি "শান্তি চুক্তি ধ্বংস হোক।" আওয়াজটির চেয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে বেশী জ্ঞানের পরিচয় দেয়, চীনের জনগণের ভয়ঙ্কর শত্রু হিসেবে সাম্রাজ্যবাদকে লোকের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়

পেলেই দেশের মধ্যে সামন্ত আর দালাল বুর্জোয়ারা শোষণ চালায় এ সত্য মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর মার্কসবাদীদের সংখ্যা বেশ তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল। পিকিং, শাংহাই, হ্যাংকাউ, চাংশা, সিনান এবং হ্যাংচাউতে ছোটো ছোটো কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। উল্লেখ করা ভালো যে, হুনান প্রদেশের চাংশা গ্রুপের নেতা ছিলেন মাও ৎসে-তুং, পিকিং গ্রুপের নেতা ছিলেন লি তা-চাও। চীনে ছাত্ররা ঐ রকম কমিউনিস্ট গ্রুপ তৈরি করে ফ্রান্সে, সোভিয়েৎ রাশিয়ায়, জাপানে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে কমিউনিস্ট গ্রুপের নেতা ছিলেন চৌ এন-লাই। শাংহাইতে প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠার পর রাত্তিরের স্কুল, মিস্ত্রী ও ছাপাখানার মজুরদের সংঘ গড়ে ওঠে। পিকিং-এর গ্রুপটি শ্রমিকদের লেখাপড়া যাতে আরও এগিয়ে যায় তার জন্যে স্কুল চালু করে এবং রেলের কর্মীদের মধ্যে কাজ করতে থাকে। হুপে প্রদেশের কমিউনিস্ট গ্রুপ হ্যাংকাউ শহরের রিক্সাওয়ালাদের লড়াইতে নেতৃত্ব দেয়। এই ভাবে নানা অঞ্চলে কাজ চলতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো নানা জায়গায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচারের জন্যে অনেক পত্র-পত্রিকা ছাপাতে শুরু করে। এর ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রাম কোন্ পথে চলবে সে সম্পর্কে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা শ্রমিকদের মনকে নাড়া দেয়। এমনিভাবে দেশে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার মতো আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

১৯২১-এর ১লা জুলাই শাহাংইতে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর বারো জন প্রতিনিধি নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে। নানা জায়গার প্রতিনিধিদের মধ্যে হুনানের পার্টি সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে মাও ৎসে-তুংও এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির ধাঁচে এই কংগ্রেস চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করে। চীনের শ্রমিক-কৃষক ও তাদের স্বার্থ হল এই পার্টির ভিৎ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাহায্যে এই পার্টি দেশের ও বিদেশের অবস্থা বিবেচনা করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। এহেন একটা পার্টির জন্ম হওয়াতে চীনের দুঃখী মানুষের আপনা থেকে গড়ে ওঠা অথবা খানিকটা সংগঠিত দীর্ঘদিনের সংগ্রাম এখন থেকে সতর্ক এবং সজাগ বিপ্লবী সংগ্রাম হিসেবে নতুন রূপ নিল। এই সংগ্রাম এমন এক শ্রেণীকে তার সেনাপতি হিসেবে পেল যে

শ্রেণীর কোনও পিছুটান নেই, শেকল ছাড়া কিছু খোয়া যাবার ভয় নেই অথচ যে শ্রেণীর লড়াই ফতে হলে বিশ্বসংসার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। এই খাঁটি বিপ্লবী শ্রেণী হল শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ গুণগুলোর কথা আগে কিছু কিছু বলা হয়েছে, এবার আরেকটু গুছিয়ে বলা যাক। অন্য দেশের শ্রমিকদের মতো চীনের কলকারখানার শ্রমিকরাও উৎপাদনের সব চাইতে উন্নতরূপের সঙ্গে যুক্ত। তারাই সব চাইতে সংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল। তাছাড়া দেউলিয়া কৃষকদের মধ্যে থেকেই চীনের শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম বলে সুবিশাল কৃষক জনতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। চীনের জনগণের অন্য কোনও অংশই শ্রমিকশ্রেণীর মতো এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে না। তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা কল্পনার অতীত। উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কারখানাবাড়ি ইত্যাদি থেকে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মাও ৎসে-তুং বলেছেন, "নিজেদের হাত ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই, কখনো ধনী হওয়ার আশা নেই, তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের, যুদ্ধবাজ সর্দারদের ও বুর্জোয়াদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার তারা পায়। এই জন্যে তারা বিশেষ ভাল লড়িয়ে।" তিনি আরও বলেছেন, "বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই চীনের শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বের অধীনে আসে এবং চীনের সমাজের সব চাইতে রাজনীতি-সচেতন শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায়।"

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অভাবেই অর্থাৎ একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্বের অভাবেই অতীতে চীনের মানুষের সব বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বারবার ব্যর্থ হয়েছে। তাইপিং এবং বক্সার বিদ্রোহীরা নিছক কৃষক-বিদ্রোহের বেশি কিছু করে উঠতে পারেনি এবং সেই জন্যেই তাদের আন্দোলন কৃষকদের মুক্তি আনতে পারেনি। ১৯১১-১২র বুর্জোয়া বিপ্লবও এই রকমের নেতৃত্ব না পাওয়ার দরুণ খানিক দূর এগিয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেমে যেতে বাধ্য হয়। এতদিনে চীনের সামন্ত-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন সঠিক পথে পা দিল—এ পথে জয় হবেই। তবে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের মতো কঠিন সংগ্রামের পর চীনে বিপ্লবের জয় হবে। মাও ৎসে-তুং বার বার বলেছেন যে, বিপ্লবের পথ দীর্ঘ আঁকাবাঁকা কঠোর সংগ্রামের পথ। কিন্তু লড়াইর তোড়জোড় তো শুধু একতরফা হবে না। সাম্রাজ্যবাদীরাও নতুন অবস্থার জন্যে তৈরি হতে লাগল

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদীদের চেষ্টা হল চীনকে আগের চাইতে আরও ভালো করে শোষণ করে যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ করা এবং যুদ্ধের পর যে আর্থিক সংকট দেখা দেবে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। সুতরাং এবার চীনের মজুরদের খাটুনির ঘণ্টা বাড়বে, মজুরীর টাকা কমবে এবং আরও নানা দিক থেকে তাদের ওপর অত্যাচার চলবে, কারণ বিদেশী মালিকদের বেশি মুনাফা চাই, তাদের স্বদেশী সাকরেদদেরও সে মুনাফার বখরা চাই।

মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আমেরিকা। তার এখন ইচ্ছা চীনকে সবচেয়ে বেশি ভোগ করে এবং জাপানকে কোণঠাসা করে। এই উদ্দেশ্যে শকুনদের মধ্যে একটা চুক্তি হওয়া দরকার। সেই জন্যে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে সম্মেলন বসল—১৯২১-এর ১২ই নভেম্বর থেকে ১৯২২-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, প্রায় তিন মাস এই সম্মেলন চলে।

ওয়াশিংটন সম্মেলনে যাবার আগে আমরা চীনের ভেতরকার অবস্থাটা একটু ঘুরে দেখব। চীনের ভেতরে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের তখন পোয়া বারো। পিকিং সরকার জাপানের চাকর তুয়ান চি-যুইর হাতে। কিন্তু আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড বসে থাকতে পারে না। তারাও চীনের ভেতরে তাদের প্রভাব বাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। জাপান আনহোয়েইর যুদ্ধবাজ দলের সর্দার তুয়ান চি-যুইকে হাত করেছে সুতরাং তা পাল্টা দল চিহ্‌লির যুদ্ধবাজ সর্দারকে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড হাত করল। ইনি হলেন উ পেই-ফু। দুই দলে ১৯২০র জুলাই মাসে লড়াই হল। "আনহোয়েই দল" অর্থাৎ তুয়ান চি-যুই হেরে গেল, মানে জাপান হেরে গেল।

তবে পুরো হার হল না। কারণ ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর ধূর্ত জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছিল যে, তাকসাইটে "আনহোয়েই দল" বেশি দিন ক্ষমতায় নাও টিকতে পারে। সুতরাং তারা নতুন চাকরের খোঁজে লেগে গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই "ফেংতিয়েন দল"-এর সর্দার চাং সো-লিনকে হুকুমবরদার হিসেবে পেয়ে গে । যুদ্ধের সময় যখন "চিহ্‌লি" আর "অনেহোয়েই" দল লড়ছিল তখন "ফেংতিয়েন" দলের চাং সো-লিন চিহ্‌লিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুয়ান চি-যুইকে ঘায়েল করতে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধের পর পিকিং সরকারের ওপর চিহ্‌লি এবং ফেংতিয়েন দুই দলই যুক্তভাবে কর্তৃত্ব করতে থাকে। মনে রাখতে হবে চিহ্‌লির পেছনে

বা উ পেই-ফুর পেছনে ছিল ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা, আর ফেংতিয়েনের পেছনে অর্থাৎ চাং সো-লিনের পেছনে জাপান। পিকিং সরকারের ওপর তাহলে কর্তৃত্বের ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে জাপান সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। কিন্তু ওয়াশিংটন সম্মেলনের মুখে চিহ্‌লির সর্দার উ পেই-ফু আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সাহায্য নিয়ে ইয়াংসি উপত্যকাকে কব্জা করে ফেলল। এর ফলে জাপানী তাঁবেদার ফেংতিয়েন দলের হিংসা হল এবং পিকিং সরকারে দুই দল একই সঙ্গে থাকলেও তাদের বিরোধ ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল।

এবারে ওয়াশিংটনে আসা যাক। এই সম্মেলনে যেসব বড়ো বড়ো শক্তি যোগ দিয়েছিল তারা হল আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালি। চীনকেও যোগ দিতে ডেকে পাঠানো হল। হল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও বেলজিয়ামকেও নেমন্তন্ন করা হল, কারণ চীনের সঙ্গে তাদেরও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ জড়িয়ে আছে।

চীনের কোনও সমস্যার সমাধানের জন্যে তো ওয়াশিংটন সম্মেলন ডাকা হয়নি, তাই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে সেখানে সব চেয়ে বড়ো কাজ হল "নয় শক্তির চুক্তি"। এই চুক্তির ব্যাপারে দেখা গেল আমেরিকারই সব চেয়ে বেশি আগ্রহ। এর কারণ বোঝা মোটেই কঠিন নয়—আমেরিকা চীনে আমাদের অতি পরিচিত "খোলা দরোজা" নীতি চালু করতে চায়। "খোলা দরোজা" নীতির সাদা কথায় মানে দাঁড়ায় এই যে, বিদেশী লুঠেরাদের জন্যে চীনের দরোজা সব সময় খোলা থাকবে। কিন্তু এই মানেই সবটুকু মানে নয়। আরও তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই "খোলা দরোজা" নীতি একটা ধোঁয়ার পর্দা মাত্র। এই পর্দার আড়াল থেকে আমেরিকা চীনের ওপর পুরো শোষণ চালাতে পারবে, কারণ আর্থিক শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আমেরিকার জুড়ি কেউ নেই। সাম্রাজ্যবাদীদের চাকর পিকিং সরকারের প্রতিনিধিরা নিজেরাই প্রথম ওয়াশিংটন সম্মেলনে "খোলা দরোজা" নীতির প্রস্তাব উপস্থিত করে। আমেরিকা সে নীতির পক্ষে জোর ওকালতি করে এবং খুশি হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা নীতিটি দলিলে লিখে সবার সই নিয়ে নেয়, বিশেষ করে চীনের। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইচ্ছে করেই চীন সরকার গলা বাড়িয়ে ফাঁস পরে খুশি হয়।

এ সম্মেলনে চীনের সমস্যার কথা উঠলই না। যেমন চীনের শানতুং প্রদেশে জাপান যে "বিশেষ স্বার্থ" ভোগ করে চলেছে সে সম্বন্ধে জাপান সম্মেলনে

কোনও কথাই তুলতে দিল না। "খোলা দরোজা" নীতি সবাই মেনে নেওয়ার ফলে জাপানের চীনে কোনও অসুবিধে হল না। দশ বছর পর ১৯৩১এ যখন জাপান চীন আক্রমণ করল তখন সে এই নয় শক্তির দলিলখানাকে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে হো হো করে বীভৎসভাবে হেসে উঠেছিল।

ওয়াশিংটনে চীনের লাঞ্ছনা হল যথেষ্ট কিন্তু ভরসা এই যে, কর্তারা যখন মাসের পর মাস সম্মেলন করছিলেন তখন চীনের মানুষের সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধবাজ সর্দারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এগিয়ে চলছিল।

একই সময়ে চীনে টাকা লগ্নী করার জন্যে "চার শক্তির ব্যবসায়ী জোট" প্রতিষ্ঠা হয়—আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান হচ্ছে এই চার শক্তি। এই ব্যবসায়ী জোটের ওপর আমেরিকাই যে খবরদারি করবে তা বলাই বাহুল্য, কারণ ইংল্যাণ্ডের আর সে দিন নেই, যুদ্ধের পর আমেরিকারই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সবচেয়ে বেশি।

আমেরিকার সবচেয়ে আগে একটা কাজ করতে হবে—জাপানের কব্জা করা এলাকা মাঞ্চুরিয়ার ভেতর তার লগ্নীর ব্যবসা নিয়ে ঢুকতে হবে কারণ সেটা মুনাফার ভালো জায়গা। শুধু তাই নয় সেখানে আমেরিকার ঢোকার আরও দুটো কারণ ছিল। এক, মাঞ্চুরিয়াতে ভালো করে বসতে পারলে সেখান থেকে চীনের ওপর খবরদারি করার সুবিধে হবে। দুই মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েৎ রাশিয়ার ওপর মিলিটারি আক্রমণের ঘাঁটি তৈরি করা যাবে।

মোট কথা চীনকে সব শকুনে মিলে শুষবে, এই জন্যে নয় শকুনের চুক্তি হল, চার শকুনের জোট হল—সবই হল বটে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে চুক্তি ক'দিন টেকে? কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যেকে নিজের নিজের চীনে সর্দারের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে লড়াইর মহড়ায় নেবে গেছে। কারণ প্রত্যেকেরই ইচ্ছা গোটা দেশটাকে একা ভোগ করে—ভাগাভাগি করে ভোগ করে আশা মিটছে না। প্রথম মহাযুদ্ধের বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র আর হেরে যাওয়া জার্মান আর অস্ট্রিয়ানদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্রশস্ত্র জোয়ারের স্রোতে চীনে আসতে লাগল। নিজ নিজ দলের যুদ্ধবাজ সর্দারকে প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাহাজে করে অস্ত্রশস্ত্রের ভেট পাঠাতে লাগল। জাপান ফেংতিয়েন সর্দার চাং সো-লিনকে অস্ত্র যোগান দিল। আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ড চিহ্‌লি সর্দার

উ পেই-ফুকে অস্ত্র পাঠাল। সুতরাং আগামী কয়েক বছর সর্দারে সর্দারে লড়াই চলল আর উলুখড়ের প্রাণ গেল, মানে, গ্রাম অঞ্চল ধ্বংস হতে লাগল। চীনকে শোষণ করবার ব্যাপারে কোন্ সাম্রাজ্যবাদী দেশ অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের চেয়ে বেশি সুবিধে আদায় করবে এই জন্যেই এই মারাত্মক লড়াই চলল।

এই সময় বাইরে থেকে দেখলে চীন লড়াইয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। বুর্জোয়া খবরের কাগজে যুদ্ধের জোর খবর বার হচ্ছে—আজ এই সর্দারের পতন, কাল ঐ সর্দারের পতন, গোলা-গুলির ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার, রক্তে ইয়াংসি লাল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব খবরের চেয়ে অনেক বড়ো একটি খবর কাগজে ছাপা হত না। খবরটি হচ্ছে বুর্জোয়াদের পক্ষে খারাপ খবর—চীনের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন গড়তে শুরু করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সময় পার্টির সভ্য ছিল মাত্র পঞ্চাশ জন। কিন্তু তখনই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তার রাজনীতিকে পার্টি এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে অন্য কোনও দলের রাজনীতি এসে তাকে উৎখাত করবে এ সম্ভাবনা একেবারেই আর নেই। এই শ্রমিকশ্রেণীই ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বড়ো বড়ো লড়াই চালায়।

একেবারে গোড়া থেকেই চীনের শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দাবী নিয়ে গণসংগ্রাম করছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার একেবারেই ছিল না বলে আইনী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চীনে গড়ে ওঠেনি। পুঁজিবাদী দেশের মতো বেশি মাইনে পাওয়া এক শ্রেণীর ওপরতলার "বাবু শ্রমিক"ও চীনে জন্মাতে পারেনি। ভালোই হয়েছে, কারণ অন্যত্র দেখা গেছে যে, এই বাবুরাই শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি করে, তাকে সঠিক রাজনীতির পথে চলতে দেয় না, বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোসের পথে তাকে চালায়, মার্কসবাদকে খানিকটা বদলে তাকে নতুন অবস্থার উপযুক্ত মতবাদ বলে চালায়—যাকে বলে সংশোধনবাদ অর্থাৎ দাঁত-নখ-ভাঙ্গা "মার্কসবাদ," যা মালিকশ্রেণীর কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন জন্মায়নি তখন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা কম হত। ১৯১৮-তে সারা চীনে ছ'হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়, ১৯১৯-এ

৪ঠা মে'র আন্দোলনে এক লাখ শ্রমিক ধর্মঘট করে আর কমিউনিস্ট পার্টি কাজ শুরু করার এক বছর পর ১৯২১-এ তিন লাখ শ্রমিক হাত থেকে হাতিয়ার নামিয়ে রেখে বলে, "কাজ করব না"।

সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে হংকং-এ চীনের জাহাজী শ্রমিকেরা চরম অত্যাচারের মধ্যে দিন কাটাত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিপ্লবের হাওয়া লেগে তাদের এতদিনের ঘুম ভাঙ্গে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ক্রমশ জাহাজীদের ওপর বাড়তে থাকে। ১৯২২-এর জানুয়ারীতে বেশি মাইনের জন্যে জাহাজীরা বৃটিশ জাহাজ-মালিকের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। চীনের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে হংকং-এর এই জাহাজী ধর্মঘট একটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ত্রিশ হাজার ডক শ্রমিক ও নাবিক হংকং-এর মতো বিখ্যাত বন্দরের সব জাহাজকে অচল করে দিল। এরপর হংকং-এ শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট হল এবং এই ধর্মঘটের ডাকে ষাট হাজার শ্রমিক সাড়া দিল। ধর্মঘটীরা এরপর ঠিক করল হংকং বন্দরের কাজ ছেড়ে তারা ক্যান্টন বন্দরে যাবে। কিন্তু সীমান্তে বৃটিশ সৈন্যরা তাদের যেতে দেবে না বলে তাদের ওপর গুলি চালাল। কয়েক শ' মারা গেল এবং জখমও হল অনেক। সংগ্রাম আরও দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ল। জাহাজীদের এই সংগ্রামকে দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন থেকে উত্তর-পূর্ব চীনের মুকদেন (মাঞ্চুরিয়া) পর্যন্ত রেল-লাইনের সমস্ত শ্রমিকরা সমর্থন করল, তারা "রেল-জাহাজ শ্রমিক একতা সমিতি" গড়ল এবং ধর্মঘটী জাহাজীদের জন্যে চাঁদা তুলে পাঠাল। বিদেশ থেকে চীনেরা চাঁদা তুলে পাঠাল এবং বিদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলো থেকে বন্ধু হিসেবে সমর্থন জানিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসতে লাগল।

আট সপ্তাহ মানে, দু'মাস হংকং-এর এই জাহাজী ধর্মঘট চলেছিল। ইতিপূর্বে কৃষক সংগ্রাম বা জাতীয় বুর্জোয়াদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে এক কাণা-কড়িও আদায় করতে পারেনি। কিন্তু হংকং-এর জাহাজী ও অন্যান্য শ্রমিকদের লড়াইয়ের ফলে শতকরা পনের থেকে ত্রিশ ভাগ মাইনে বাড়লএবং ট্রেড ইউনিয়নকে কর্তৃপক্ষ আইনী বলে স্বীকার করে নিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ইতিপূর্বে হংকং-এর বৃটিশ ছোটো লাট অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইনের বলে জাহাজীদের ইউনিয়নকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছিল।

১৯২২-এর বাকি মাসগুলোতে ধর্মঘট আর শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলন প্রবলভাবে চলতে লাগল। শ্রমিকদের মূল দাবি ছিল: মানুষের মতো

খেয়ে পরে থাকতে পারি এমন বেতন চাই, ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করব না (কল-কারখানায় ১৪ থেকে ১৭ ঘণ্টা তখন খাটানো হচ্ছে) এবং ইউনিয়নকে মেনে নিতে হবে (পিকিং সরকারের আইনে তখন সব শ্রমিক সংগঠন এবং ধর্মঘট বেআইনী হয়ে আছে)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল কমিউনিস্টরা। সাধারণ শ্রমিকদের দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হত কারণ তারা লড়াই করে মরবার জন্যে সব সময় প্রস্তুত কারণ শ্রমিক-জীবনের নরকে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মানুষের অতি ছোটো ছোটো অধিকারগুলোও তারা ভোগ করতে পারে না। যে ছোটো বা হালকা শিল্পে জাতীয় বুর্জোয়াদের পুঁজি খাটছিল এবং ক্রমশ বেড়ে উঠছিল সেগুলো শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল না, প্রধান ক্ষেত্র ছিল রেল, জাহাজ আর মেরামতি কারখানা এবং খনিগুলো। কারণ এগুলোই ছিল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আসল ঘাঁটি, এদের সাহায্যে যে বেড়াজাল তৈরি হয়েছিল তাই দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা গোটা দেশটাকে ঘিরে রেখেছিল। আবার এগুলোতেই শ্রমিকরা সংখ্যায় বেশি এবং কাজের এবং শোষণের একই ধরনের ছাঁচের মধ্যে পড়ে তাদের একতা গড়ে উঠেছে এগুলোতেই। তাই দেশ-জোড়া যোগাযোগের সুযোগ আর আন্দোলন করবার সুযোগ এই শ্রমিকদেরই বেশি। এই রেল, জাহাজ, মেরামতি কারখানা আর খনিগুলোতেই শ্রমিকরা জনসাধারণের সমর্থন পায় বেশি—এমন কি জাতীয় বুর্জোয়াদের কাছ থেকেও পায় কারণ রেল-জাহাজ ইত্যাদি চলাচল ব্যবস্থা এবং খনির মতো মূল শিল্প যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতের মুঠোয় থাকে তাহলে জাতীয় বুর্জোয়াদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে খুব অসুবিধে হয়। এই সব কারণে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধটা হয় খুব প্রচণ্ড রকমের। জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণীই যে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের নেতা হয়ে উঠেছে এই বোধটা যে বুদ্ধিজীবীদের এল তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে লাগল।

তারপর একদিন বড়ো রকমের লড়াই বাধল। বাধল বৃটিশের অধীন পিকিং-হ্যাংকাউ রেলপথে। চারদিকে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই চলছে, রাজনৈতিক চেতনাও ছড়িয়ে পড়ছে, এই অবস্থায় পিকিং-হ্যাংকাউ রেলপথের একটার পর একটা স্টেশনে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে লাগল। কিছুদিন আগে হংকং-এর জাহাজীদের ধর্মঘটের সময় এই রেলপথের এঞ্জিনগুলো কপালের ওপর "হংকং-এর জাহাজীদের মদৎ দাও" বলে বিশাল বিশাল

ঝাণ্ডা এঁটে পিকিং থেকে হ্যাংকাউ অবধি ছুটে বেড়িয়েছিল। একই শ্রমিক স্বার্থে ১৯২৩-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারা অচল হল, শত শত রেল কামরা, মালগাড়ি, সৈন্যদের গাড়ি, অচল হল—চাকা বন্ধ্! কারণ কি? স্টেশনে স্টেশনে তো ইউনিয়ন হয়েইছে, এবারে শ্রমিকরা চাইল সব ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিয়ে একটি জেনারেল ইউনিয়ন বা সাধারণ সমিতি করা। উদ্দেশ্য—শ্রমিক ঐক্য। এ ইচ্ছাটা অন্যায় ইচ্ছা মোটেই নয় কিন্তু মালিকের চোখে ভয়ানক অন্যায়। মালিকের চাকর চিহ্‌লি দলের সর্দার উ পেই-ফু বলল ওরকম সাধারণ ইউনিয়ন করা নিষেধ। উ পেই-ফু-র ঐ রেলপথের ওপর জমিদারী স্বার্থ ছিল বলা যেতে পারে। কারণ ঐ রেলের মোট আয়ের যে অংশটা বিদেশী অংশীদারের পাওনা সেটা দেওয়ার পর যা থাকত সবই ফু'র, মানে, সর্দারের পেটে যেত। কারণ তার কতো খরচ! দেশের লোককে সময়ে-অসময়ে খুন করবার জন্যে হাজারে হাজারে সৈন্য পুষতে হয়!

সমিতি করা নিষেধ শুনেই শ্রমিকরা চাকা বন্ধ করে দিল। যাত্রীদের কিন্তু বেশি অসুবিধে হতে দিল না শ্রমিকরা। স্ট্রাইক কমিটি যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করল আর যাদের বাড়ি বেশি দূরে নয় অন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিল। শ্রমিকরা আওয়াজ তুলল, "আজাদীর জন্যে লড়ে যাও, লড়ে যাও মানুষের মতো বাঁচার জন্যে!" ভয় পেয়ে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা পিকিং সরকারের ওপর চাপ দিল। অমনি উ পেই-ফু সৈন্য পাঠাল, বন্দুক আর সংগীনের মুখে বলে পাঠাল—শ্রমিকদের আলবৎ কাজে যোগ দিতে হবে। শ্রমিকরা বলল—জান কবুল, যোগ দেব না।

হ্যাংকাউর কাছে কিয়ানগানে শ্রমিকরা তাদের ইউনিয়নের একটা অস্থায়ী আপিস খাড়া করেছিল। উ পেই-ফুর সৈন্যরা সেটা দখল করতে চেষ্টা করাতে শ্রমিকদের সঙ্গে তুমুল লড়াই হল। দীর্ঘ সময় দারুণ সাহসের সঙ্গে তারা লড়ল, নিজেদের তেমন কোনও হাতিয়ার নেই, তাই সৈন্যদের হাতের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে লড়ল কিন্তু শেষ অবধি হার হল তাদের। যে শ্রমিক-নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল তাদের মধ্যে ছিলেন ইউনিয়নের সেই শাখার সভাপতি লিন সিয়াং-চিয়েন এবং ইউনিয়নের আইন সম্পর্কে পরামর্শদাতা একজন বুদ্ধিজীবী শিহ্ ইয়াং। তাঁদের হুকুম করা হল

শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বলতে। লিন সিয়াং-চিয়েন ধীর ভাবে বললেন, "আমার মাথা কাটা যেতে পারে তবু আমি কক্ষণও ধর্মঘট উঠিয়ে নেব না।" লিন এবং শিহ্ দুজনেই শহীদ হলেন যুদ্ধবাজ সর্দারের ঘাতকের হাতে।

৭ই ফেব্রুয়ারী পিকিং-এর কাছে যেখানে রেল-শ্রমিকদের সংগঠন শুরু হয়েছিল সেই চাংসিনতিয়েন-এ সৈন্যরা শ্রমিকদের জমায়েৎ-এর ওপর গুলি চালাল, অসংখ্য শ্রমিক জখম হল, চার জনের প্রাণ গেল। এই হত্যাকাণ্ডে সারা দেশের মানুষ আগুন হয়ে উঠল। পিকিং-এ শহীদদের শবযাত্রায় সমাজের নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে যোগ দিল। আরও চারটি রেলপথের শ্রমিক শ্রমিক-হত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘট করল। জাপানী মালিকের হানিয়েপিং ইস্পাত ও লোহা কারখানা এবং আরও কিছু কলকারখানায়ও ধর্মঘট হল। কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশনাল বা কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সমিতি ধর্মঘটীদের পক্ষে এবং শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে এক ঘোষণা প্রকাশ করল। জাপান এবং কোরিয়ার শ্রমিকরা চীনের শ্রমিক ভাইদের সংগ্রামে সমর্থন জানিয়ে তার পাঠাল।

ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্যে শ্রমিকদের ঐক্য ও সংঘশক্তি অটুট রাখবার জন্যে পিকিং-হ্যাংকাউ রেলপথের জেনারেল ইউনিয়ন শ্রমিকদের কাজে ফিরে যেতে বলল।

"৭ই ফেব্রুয়ারী" আন্দোলনের শিক্ষা সম্পর্কে "চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিশ বছর" বইখানিতে লেখক হু চিয়াও-মু বলেছেন যে, এই আন্দোলন চীনের পার্টি এবং শ্রমিক শ্রেণীকে বুঝিয়ে দিল যে, শক্তিশালী মিত্র এবং নিজস্ব সশস্ত্র সৈন্য-বাহিনী ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী তার সশস্ত্র শত্রুদের সঙ্গে লড়াইতে জিততে পারবে না, বিপ্লবকে সফল করতে পারবে না। তার মানে জিততে হলে দুটো জিনিস দরকার—এক, মিত্রদের সঙ্গে জোট বাঁধা; দুই, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা। মিত্রদের সঙ্গে জোট বাঁধা মানে হচ্ছে এই যে, কৃষকরা দেশের জনসংখ্যার ৮০ ভাগ—তাদের সঙ্গে নিতে হবে, আর সঙ্গে নিতে হবে শহরবাসী কোটি কোটি ক্ষুদে বুর্জোয়াকে যারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধী এবং আরও সঙ্গে নিতে হবে জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী অংশকে। মোটকথা, কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া এবং জাতীয়

বুর্জোয়ার এক অংশকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইর যুক্তফ্রন্ট বা যুক্ত মোর্চা গড়তে হবে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং সশস্ত্র লড়াইর জন্যে তৈরি হতে হবে। অন্য পথ নেই।

॥ যুক্তফ্রন্ট ॥

উত্তর চীনে যখন যুদ্ধবাজ সর্দারদের লড়াই চলছিল তখন সাংহাই থেকে সুন ইয়াৎ-সেন ক্যান্টনে এলেন। ইতিপূর্বে ১৯১৮তে তিনি ক্যান্টন থেকে সাংহাইতে চলে এসেছিলেন, কারণ ক্যান্টনে "সংবিধান রক্ষা"-র দাবিতে যুদ্ধবাজ সর্দারদের যে সরকারের তিনি সর্বাধিনায়ক বা সবার বড়ো কর্তা হয়েছিলেন সে সরকার তাঁর হাত-পা বেঁধে রেখেছিল। ঐ লোভীদের আড্ডায় সৎ লোকের সৎ উদ্দেশ্যের কোনও স্থান ছিল না। এখন কোয়াংতুং প্রদেশের যুদ্ধবাজ সর্দার চেন চিউং-মিং কোয়াংসি প্রদেশের সর্দারদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ভরসা করে সুন ক্যান্টনে এলেন। চেন চিউং-মিংকে বিশ্বাস করে এবং তারই শক্তির ওপর নির্ভর করে সুন ১৯২১এ এক "জরুরী সরকার"-এর "জরুরী" সভাপতি হলেন। ভাবলেন এবার উত্তরমুখী অভিযান বা উত্তর চীনে যুদ্ধযাত্রার জন্যে তৈরি হওয়া যাক। কিন্তু চেন চিউং-মিং সাম্রাজ্যবাদীদের এবং চিহ্‌লি সর্দারদের টাকা খেয়ে বিদ্রোহ করে বসল এবং সুন ইয়াৎ-সেনকে কোয়াংতুং ছেড়ে যেতে বাধ্য করল। তাঁর প্রাণ যেতে বসেছিল, অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেন।

অনেকবার হিসেবে ভুল করে আর ঠকে এই অত্যন্ত খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকটি এবারে একটা পথ পেলেন। চীনের নতুন গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েৎ সরকার সুন ইয়াৎ-সেনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কারণ সুন যে সংগ্রামী মানুষ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই কারুর। তিনি অনেক দিন আগেই সঠিকভাবে বুঝেছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়া সশস্ত্র যুদ্ধবাজ সর্দারদের হারানো যাবে না এবং জাতির জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এক মনে তিনি তাই খুঁজছিলেন একটা 'রেডিমেড' বা আগে থাকতে তৈরি সৈন্যবাহিনী। সেরকম একটা তৈরি সৈন্যবাহিনী পেতে গেলে একজন "স্বদেশপ্রেমিক" সর্দারের সঙ্গে ভাব করা দরকার।

কিন্তু ভাব করে সুনের কাজ হল না, ঠকতে হল। এই একপেশে দৃষ্টির জন্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ৪টা মে'র আন্দোলনের যে বিপ্লবের দিক থেকে অনেকখানি সম্ভাবনা ছিল তা বুঝলেন না। তাছাড়া, দীর্ঘদিন তিনি সাম্রাজ্যবাদের আসল চরিত্র যে কি তা বুঝতে পারেননি। "আন্তর্জাতিক চেষ্টায় চীনের উন্নতি" নামে যে বইখানি সুন লিখেছিলেন সেটাই আমাদের এ কথার প্রমাণ। সেই বইখানিতে তিনি বিদেশী পুঁজিপতিদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরেকার আর্থিক সঙ্কট তারা এড়াতে পারে। কি করলে এড়াতে পারে? সুনের কথা শুনে চললে এড়াতে পারে। সুনের পরামর্শ হচ্ছে এই যে, পুঁজিপতিরা চীনকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হতে দিক, দেশকে নতুন করে গড়ার কাজে চীনেদের লাগতে দিক। চীনের ওপর রাজনৈতিক খবরদারি করার চেষ্টা করে চীনকে খণ্ড খণ্ড করে সেখানে বিদেশীদের বাজার নষ্ট করার মতো বোকামি তারা কেন করছে? কিন্তু চীনের তখনকার দুর্বল আধা-উপনিবেশিক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে ঐক্যবদ্ধ আর স্বাধীন হতে সাহায্য করবে এ কথা ভাবাই যায় না। উপনিবেশই তো সাম্রাজ্যবাদের ভালো বাজার।

বলা বাহুল্য, সুনের পরামর্শকে সাম্রাজ্যবাদীরা আমলই দেয়নি। আর যে "স্বদেশপ্রেমিক" সর্দারের ওপর তিনি সম্প্রতি নির্ভর করেছিলেন সে বেটা তাঁকে আরেকটু হলেই মেরে ফেলত। এবং সে ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছিল ক্যান্টনে অর্থাৎ তাঁরই খাস রাজধানীতে!

জনতার বিপ্লবী জঙ্গীভাবকে সুন ইয়াৎ-সেন জাগাতে চেষ্টা করেননি এটাই ছিল তাঁর আসল দুর্বলতা। এবারে রুশ বিপ্লবের প্রভাব তাঁর কাছে মূর্তি ধরে এল—চীনে রাশিয়ার যিনি প্রতিনিধি তিনি স্বয়ং তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাশিয়া বিপ্লবের পর থেকেই চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পিকিং-এর চাকর সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের ইঙ্গিতে এবং স্বার্থের তাড়ায় সে বন্ধুত্ব ঘটতে দেয়নি এতদিন। ভুলের পথ ছেড়ে এবার সুন রাশিয়ার বাড়ানো হাত আনন্দে জাপটে ধরলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও তাঁদের জাতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নীতি অনুযায়ী সুনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে পড়ে সুন তাঁর আগেকার ধ্যানধারণা অনেকখানি বদলালেন এবং অন্য ধরনের কার্যসূচীর কথা ভাবলেন। তাঁর

সারা জীবনের লক্ষ্য চীনের বিপ্লব এবারে সার্থক হবে মনে করে তিনি এই নতুন ধ্যানধারণার প্রচারে পরম উৎসাহে লেগে গেলেন।

১৯২২-এর সেপ্টেম্বরে সাংহাইতে সুনের পুরোনো দল কুয়োমিনতাংকে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন করে গড়ার জন্যে সভা হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যেরাও এই সভায় যোগ দেন। ১৯২৩-এ সুন তাঁর "কুয়োমিনতাং ইস্তাহার" প্রকাশ করেন। তাতে তিনি দাবি করেন যে, জোর করে চাপানো অন্যায় চুক্তিগুলো বদলাতে হবে। সোভিয়েতের প্রতিনিধির সঙ্গে যুক্তভাবে এক ইস্তাহার প্রকাশ করে ঘোষণা করা হয় যে, সমান সমান রাষ্ট্র হিসেবে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সরকারীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হল।

অল্প কিছুদিন পরেই সুন ইয়াৎ-সেন ক্যান্টনে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁর "বিপ্লবী সরকার" তার সদর দপ্তর বসাল। সুন হলেন সর্বাধিনায়ক। কুয়োমিনতাং-এর অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি এই সরকার প্রতিষ্ঠা করল। এতে কয়েকজন কমিউনিস্টকেও নেওয়া হল। এর পর সুন ইয়াৎ-সেন তাঁর দলের "তিনটি মূল কর্মনীতি" ঘোষণা করলেন। এক, সোভিয়েৎ রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা। দুই, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা। তিন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে সাহায্য করা।

পরপর কতকগুলো বক্তৃতায় সুন আরও তিনটি নীতির ব্যাখ্যা করেন। প্রায় বিশ বছর আগে এই নীতি তিনটিকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। এই "তিনটি গণ-আদর্শ" বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে এবারে ভালো করে প্রচার হওয়ার ফলে কুয়োমিনতাং দল আবার তার সংগ্রামী চরিত্র ফিরে পেল। ১৯১১-র পরের যুগে পার্লামেন্টারি কায়দার পাকে পড়ে সে চরিত্র কুয়োমিনতাং হারিয়েছিল। এই "তিনটি গণ-আদর্শ" কি? এক, জাতীয় স্বাধীনতা। অর্থাৎ চীনকে সব রকম সাম্রাজ্যবাদী শাসন বা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে! তাছাড়া চীনের ভেতরে যেসব জাতি-উপজাতি বাস করে তাদেরও স্বাধীন জীবনের সমান অধিকার দিতে হবে। দুই, গণতন্ত্র। এই আদর্শটিকে ব্যাখ্যা করে বলা হল যে আধুনিক দেশগুলোর নামকে ওয়াস্তে গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণী নিজেরা ভোগ করে এবং সেই গণতন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করে। কিন্তু কুয়োমিনতাং যে গণতন্ত্র গড়তে চায় তার ভাগীদার হবে জনসাধারণ এবং একদল বড়লোক সেটাকে

একচেটিয়া সম্পত্তির মতো কজা করতে পারবে না। তিন, জনগণের জীবিকা বা রুজি-রোজগার। এ নীতির মূল কথাই হল "কৃষকের হাতে জমি চাই।" তাছাড়াও শ্রমিকের সংগঠন গড়ার অধিকার এবং বাঁচার মতো রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা চাই। ব্যক্তিগত পুঁজিকেও খানিকটা অধিকার দেওয়া হবে, তবে একচেটিয়া ব্যবসা করতে দেওয়া চলবে না। আর অর্থনীতির মূল শাখাগুলো গণতান্ত্রিক সরকারের সম্পত্তি হিসেবে থাকবে অর্থাৎ তাদের "জাতীয়করণ" করা হবে।

এই কর্মসূচী দালাল বুর্জোয়া আর সামন্তরা ছাড়া অন্য সব শ্রেণীর লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত, যেমন, কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদে বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া। কারণ এই কর্মসূচী হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ বিরোধী। মাও ৎসে-তুং বলেছেন: শুধু ১৯১১-র মহাবিপ্লবে (যদিও সেটা ছিল পুরোনো আমলের নিছক গণতান্ত্রিক বিপ্লব) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলেই ডক্টর সুন ইয়াৎ-সেন মহান্ নন, বিশ্বের ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে এবং জনগণের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করা এই তিনটি বিপ্লবী মহানীতি তুলে ধরতে পেরেছিলেন, জনগণের তিনটি আদর্শকে নতুন তাৎপর্য দিতে পেরেছিলেন এবং এইভাবে জনগণের তিনটি আদর্শ এবং মহান্ নীতিকে গড়ে তুলেছিলেন।...জনগণের পুরোনো তিনটি আদর্শকে লোকে মনে করত ক্ষমতা দখল করতে অর্থাৎ গদি দখল করতে আগ্রহী একদল লোকের সুবিধাবাদের ঝাণ্ডা মাত্র, যে ঝাণ্ডাকে ব্যবহার করা হয় শুধু রাজনৈতিক চালবাজীর কাজে।...কারণ সাম্রাজ্যবাদ বা সামন্ত সমাজব্যবস্থার এবং সামন্ত সংস্কৃতি ও আদর্শের বিরোধিতার প্রশ্ন ঐ তিন আদর্শ তোলেনি।...এর পর এল জনগণের নতুন তিনটি আদর্শ তাদের তিনটি মহান্ নীতিকে সঙ্গে নিয়ে।...জনগণের সাবেকী তিনটি আদর্শ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী এবং নয়া-গণতান্ত্রিক তিনটি জনগণের আদর্শে এবং তাদের তিনটি মহান্ নীতিতে পরিণত হল।

১৯২৩-এ ক্যান্টনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে সুন ইয়াৎ-সেনের দান স্বীকার করে এবং নতুনভাবে গঠিত কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে দুই ধরনের ভুল চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

চালায়। মাও ৎসে-তুং নিজে এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। এর আগের বছর দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাতে দেখানো হয়নি যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব করবে শ্রমিকশ্রেণী—এটা ছিল একটা বড় গলদ। চেন তু-সিউ আর লিউ শাও-চি এই ভুলগুলোকে বাড়িয়ে তুলে কমিউনিস্ট আন্দোলনে গুরুতর ক্ষতি করছিল। তারা নানা অছিলায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটাকে আড়াল করতে চাইল। আগেই বলেছি যে, চেন তু-সিউ সব কাজ কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে দিয়ে করার পক্ষপাতী ছিল। আর লিউ শাও-চি বলল যে, চীনের শ্রমিকশ্রেণার বয়স বড়ো অল্প তাই এখন তার নেতৃত্বের কথাই ওঠে না। অন্যদিকে চ্যাং কুও-তাও ও তার মতের লোকেরা "দরোজা বন্ধ" নীতি প্রচার করতে লাগল। তারা বলল, কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে কোনও মতেই কমিউনিস্ট পার্টি এক সঙ্গে কাজ করতে পারে না। তৃতীয় কংগ্রেস এই দক্ষিণ ও বাম দুই ভুল নীতিরই সমালোচনা করল। ঠিক হল কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে, আবার সংগঠন ও রাজনীতির দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাতন্ত্র্য বা আলাদা অস্তিত্ব রক্ষা করা হবে। দক্ষিণ ও বাম ভুলগুলোর বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্টদের দীর্ঘ সংগ্রাম চলল। চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরেকটা বড়ো দুর্বলতা ছিল এই যে, তখন পর্যন্ত কিষাণ সমস্যা আর বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর প্রশ্নে ক তেমন গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা হয়নি।

১৯২৪-এর জানুয়ারীতে সুন ক্যান্টনে কুয়োমিনতাং-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেস ডাকেন। মাও ৎসে-তুং, লি তা-চাও ও অন্য কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতাও সেই কংগ্রেসে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টি যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সামন্তবাদ বিরোধী নীতি প্রচার করে কুয়োমিনতাং এই কংগ্রেসে সেই নীতি মেনে নিল, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রী যুব সংঘের সভ্যদের কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে তাদের নিজ নিজ দলের লোক হিসেবে নয়, ব্যক্তি হিসেবে নিতে রাজি হল এবং কুয়োমিনতাংকে নতুন করে ঢেলে সেজে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদে বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের এক বিপ্লবী জোট হিসেবে গড়ে তুলবে বলে সিদ্ধান্ত করল। তার মানে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেন কুয়োমিনতাং-এর শিরায় শিরায় নতুন রক্ত প্রবেশ করিয়ে দিল, বিপ্লব সম্বন্ধে সুন ইয়াৎ-সেনের ধারণা ও বিশ্বাসকে আগের চাইতে

পরিষ্কার ও প্রবল করে তুলল আর এই ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করল। ওপরে যে তিন মূল নীতি এবং তিন গণ-আদর্শের কথা বলেছি সেগুলো কুয়োমিনতাং-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে সুন ইয়াৎ-সেন ব্যাখ্যা করে বলেন এবং কংগ্রেস ইস্তাহারটি পাশ করে। এই ইস্তাহারে কুয়োমিনতাং নিজের অতীত কাজের সমালোচনাও করল, বিশেষ করে ১৯১২-তে ইউয়ান শিহ্-কাইর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার সমালোচনা করল। সংগ্রামের পথে এগোবার আগে এর প্রয়োজন ছিল। সুনের কুয়োমিতাং এই ভাবে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটি বিপ্লবী জোটের মধ্যে এসে পড়ল। মাও ৎসে-তুং বলেছেন, "জনগণের তিনটি বিপ্লবী আদর্শ কুয়োমিনতাং, কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ভিত্তি হল এবং যেহেতু 'কমিউনিজম হচ্ছে জনগণের তিনটি আদর্শের খাঁটি বন্ধু,' তাদের দুয়ের মধ্যে এক যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠল। সামাজিক শ্রেণীগুলোর দিক থেকে সেটা হল শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে মধ্যবিত্ত বা পেতিবুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট।" যুক্তফ্রন্ট গড়লেও কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু তার আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখল।

ক্যান্টনে একটি নতুন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা হল। সোভিয়েৎ সরকার ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে এই নতুন সরকার ক্যান্টনের কাছে হোয়ামপোয়া মিলিটারি বিদ্যালয় স্থাপন করল। কুয়োমিনতাং-এর চিয়াং কাই-শেক হলেন এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির চৌ এন-লাই হলেন রাজনৈতিক পরিচালক। এই সৈনিক স্কুলের উদ্দেশ্য হল যুদ্ধবাজ সর্দারদের বিরুদ্ধে এক নতুন ধরনের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্যে উপযুক্ত তালিম দিয়ে সৈনিক ও সেনাপতি তৈরি করা। এই সৈনিক স্কুলে যেসব সোভিয়েৎ পরামর্শদাতারা ছিলেন তাঁরা তাঁদের দেশের 'রেড আর্মি' বা লাল ফৌজ যে নিয়ম ও আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা পায় সেই নিয়ম ও আদর্শ এখানে চালু করেন। ফলে হোয়ামপোয়াতে নয়া চীনের বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর জন্ম হয়। আজকের লিন্ পিয়াও এখানকার ছাত্র ছিলেন—অসাধারণ মেধাবী ছাত্র।

কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত-আন্দোলনের নীতির ফলে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হল। "৭ই ফেব্রুয়ারী"র রাজনৈতিক ধর্মঘট আন্দোলনের সময় যেসব ট্রেড ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আবার নতুন প্রাণ পেল।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকরা শিরদাঁড়া খাড়া করে আবার দাঁড়িয়ে উঠল এবং বিপ্লবের পথে পা বাড়াল। ক্যান্টন হয়ে উঠল নতুন চীনের বিপ্লবী স্বপ্ন ও কর্মের আশ্চর্য শহর। চীনের কল্যাণ, চীনের ভবিষ্যৎ যেন ক্যান্টনের মুখ চেয়ে অপেক্ষায় রইল।

ক্যান্টন তাই সাম্রাজ্যবাদীদের দু'চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়াল। তারা নানা ভাবে ক্যান্টনকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করল। এদিকে এই সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে পিকিং সরকার নিজের চেহারার খানিকটা চুণকাম শুরু করল। গণতন্ত্রের বুকনি ছড়িয়ে সভাপতি নির্বাচনের ভড়ং করল। ভাঙ্গা পার্লামেন্টের জনকয়েককে নিয়ে নির্বাচন। সভ্যদের আমেরিকার টাকায় মোটা ঘুষ দিয়ে যুদ্ধবাজ সর্দার সাও কুন সভাপতি "নির্বাচিত" হল। তারপর পিকিং সরকার অনেক কায়দা করল। এতদিনে সোভিয়েৎ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জনসাধারণকে খুশি করল।

কিন্তু এত করেও লোককে ভোলানো গেল না। দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনের বিপ্লবী কার্যকলাপের ঢেউ যুদ্ধবাজ সর্দারদের ঘাঁটি উত্তর চীনের মনকে নাড়া দিতে লাগল।

এসব ভালো লক্ষণ নয়। সাম্রাজ্যবাদীরা তাই ক্যান্টন সরকারকে যেমন করে হোক ঘায়েল করবার ফিকির খুঁজতে লাগল। ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে গুরুতর বিরোধ ঘটল। ক্যান্টন সরকারের ওপর বিদেশী শক্তিরা ভয়ানক রেগে গেল কারণ ক্যান্টন সরকার "শুল্কের বাড়তি" নিজের হাতে রেখে দিল। চলতি প্রথা ছিল যে, বিদেশীরাই সরাসরি শুল্ক সংগ্রহ করবে এবং বক্সার বিদ্রোহের দরুণ ক্ষতিপূরণের পাওনা টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ইত্যাদির টাকা কেটে রেখে বাকী টাকা (যার নাম দেওয়া হয়েছিল "কাস্‌টমস্‌ সারপ্লাস্‌" বা "শুল্কের বাড়তি") পিকিং সরকারকে দিয়ে দেবে। ১৯১৭তে যখন ক্যান্টন সরকার গঠিত হয় তখন থেকে বিদেশীরা এই শুল্কের বাড়তির খানিকটা ক্যান্টন সরকারকে দিতে থাকে। উদ্দেশ্য টাকা দিয়ে ক্যান্টন সরকারকে হাত করা। ১৯২৩-এ পৌঁছে বিদেশীদের আর ক্যান্টন সরকার সম্বন্ধে কোনও মোহ থাকল না। তারা বুঝল যে, টাকা দিয়ে এ সরকারকে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আনা যাবে না। যদিও সব টাকাই চীনের তবু দক্ষিণ চীনের এই বেয়াড়া সরকারকে টাকার থলের বিদেশী মালিকরা এক পয়সাও দিতে রাজি হল না। ক্যান্টন সরকার তখন শুল্ক নিজে কব্জা

করল। পিকিং থেকে বিদেশী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বলল যে শুল্ক ব্যবস্থার ওপর এটা ক্যান্টন সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং এ হস্তক্ষেপ বন্ধ না করলে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কি স্পর্দ্ধা!

ক্যান্টন সরকার উত্তর দিল, "শুল্ক-ব্যবস্থা চীনের সরকারের। চীনের বন্দরে বন্দরে শুল্ক সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের এই সরকারের আদেশ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। পিকিং-এ শুল্কের টাকা পাঠানো মানে যুদ্ধ করবার জন্যে পিকিং সরকারের হাতে টাকার তোড়া তুলে দেওয়া।" এই কড়া উত্তর পেয়ে ক্ষ্যাপা বিদেশীরা তাদের জোর দেখাবার জন্যে ক্যান্টনের কাছে পাইওতান নামের একটা জায়গায় যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে দিল—আমেরিকা পাঠাল, ইংরেজও আলাদা ভাবে পাঠাল। এতে ক্যান্টনের জনতা উত্তেজিত হল এবং সেখানে বিশাল বিশাল সভায় ক্যান্টন সরকারের কাজকে সমর্থন জানানো হল। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের জিনিস বয়কট করার আওয়াজ উঠল। সাম্রাজ্যবাদীরা টাকার এবং মিলিটারির চাপ—দুই অস্ত্রই ব্যবহার করল। তারপর ১৯২৪-এর আগস্টে তারা আরেক ধাপ এগোল। বিপ্লবী চীনের বিরুদ্ধে নতুন এক ষড়যন্ত্র করল।

"ক্যান্টন বণিক সেনা" সংক্রান্ত ঘটনা বলে এই ষড়যন্ত্র চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই "ক্যান্টন বণিক সেনা" মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সংগঠন। এর নেতা হচ্ছে চেন লিয়েন-পো নামে ইংরেজ মালিকের হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশনের একজন মুৎসুদ্দি। প্রথমে বণিক সেনা ভয় দেখাল যে, ক্যান্টন সরকারের সঙ্গে সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করে দেবে। তারপর এই সেনা সশস্ত্র দাঙ্গা করে ক্যান্টনের বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত করতে চেষ্টা করল। সুন ইয়াৎ-সেন লিখে গেছেন যে, বিদেশীরা কয়েক মাস আগে থেকেই বণিক সেনার সেনাপতি চেন লিয়েন-পোকে "চীনের ওয়াশিংটন" বলে তুলে ধরে এবং প্রচার করে যে শীগ্‌গিরই ক্যান্টনে একটা ফ্যাসিস্ট সরকার গঠিত হবে। বিদেশীদের কাগজে বলা হতে থাকে যে, বণিক সেনা যদি ক্যান্টন সরকারকে সময় থাকতে ধ্বংস না করে তবে এই সরকার দেশে কমিউনিজম নিয়ে আসবে। ডেনমার্কের একটি মাল-জাহাজে এই বণিক সেনার জন্যে প্রথম কিস্তি অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে এসে পৌঁছয়। ক্যান্টন সরকার শক্ত হাতে বিদ্রোহ দমন করে। এবার বিদেশীদের মুখোশ হঠাৎ খসে পড়ে। তারা বলে ক্যান্টনে যদি সরকার গুলিগোলা চালায়

তবে বৃটিশ নৌবহর সরকারের সঙ্গে লড়াইতে নামবে। বণিক সেনার বিদ্রোহ ১৯২৪-এর আগস্ট থেকে অক্টোবর অবধি চলে। ক্যান্টন সরকার শক্ত নীতি গ্রহণ করায় শেষ অবধি বিদ্রোহ চুপসে যায়। উল্লেখ করা ভাল যে, হোয়ামপোয়া সৈনিক স্কুলে ট্রেনিং পেয়েছে এমন সেনাপতিরা এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনীর একাংশ শ্রমিক ও কৃষক জনতার সাহায্যে এই বিদ্রোহকে গুঁড়িয়ে দেয়।

একই সময়ে উত্তর চীনে ফেংতিয়েন-আনহোয়েই আর চিহ্‌লি এই দুই যুদ্ধবাজ সর্দারদের দলের মধ্যে লড়াই লেগে যায়। এ লড়াই আসলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের লড়াই। ফেংতিয়েন আর আনহোয়েই দলের পেছনে জাপান আর চিহ্‌লির পেছনে আমেরিকা। জাপান জিতল, আনহোয়েইর যুদ্ধবাজ সর্দার তুয়ান চি-য়ুই পিকিং দখল করল এবং একটি "পকেট সরকার" চালু করল।

চীনের জনসাধারণ তখন দাবি তুলেছে একটি "জাতীয় আইনসভা" চাই—সেই আইনসভাতে একটি সংবিধান তৈরি করতে হবে এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চালু করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে এই দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন করবার জন্যে নানা জায়গায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে উঠল—সাংহাই, চেকিয়াং, কোয়াংতুং, হুনান এবং হুপেতে। আন্দোলনের চাপে পিকিং সরকার বাধ্য হল একটি সম্মেলন ডাকতে। সুন ইয়াৎ-সেনকে সম্মেলনে যোগ দিতে অনুরোধ করা হল এবং তিনি যেতে রাজি হলেন। উত্তর চীনে যাবার পথে সুন আওয়াজ তুললেন "সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব করলেন অন্যায় চুক্তিগুলোকে বাতিল করতে হবে এবং একটি জাতীয় কনভেনশন বা সম্মেলন ডাকতে হবে। সুনের আওয়াজ দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত প্রবল সাড়া জাগাল। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদীরা পিকিং সরকারকে অর্থাৎ জাপানের তাঁবেদার তুয়ান চি-য়ুইকে মেনে নিল এবং তার কাছে দাবি করল যে আগেকার সমস্ত চুক্তি (যেগুলোকে "অন্যায় চুক্তি" বলা হচ্ছে) মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিচ্ছি বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করে দিতে হবে। "তু" বললেই তুয়ান ছুটে আসে। তাই তুয়ান সরকার তক্ষুণি এক ঘোষণা প্রচার করে বলল যে বিদেশীদের আমরা যে কথা দিয়েছি তা যেন রক্ষা করে চলি। উত্তর চীনের যাত্রী সুন ইয়াৎ-সেনের উৎসাহের আগুনে এ ঘোষণা যেন জল ঢেলে দিল।

খোলাখুলি সুন-বিরোধী প্রচারের ভার নিল সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরা। *সুন যখন সাংহাইর ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তখন সাংহাইর বিদেশী পত্রিকাগুলো* তাঁকে গালাগাল দিয়ে অভ্যর্থনা করল। আমেরিকানদের পরিচালিত সাংহাইর "চায়না প্রেস" নামে কাগজ এই "দাবি"-গুলো ছাপাল। এক, সুন ইয়াৎ-সেনকে সাংহাই থেকে বার করে দাও। সে যেন এখানে শীত কালটা কাটাতে না পারে। দুই, সুন ইয়াৎ-সেন কতকগুলো পুরোনো চুক্তিকে "অন্যায় চুক্তি" বলে বাতিল করার প্রস্তাব করেছে, সে প্রস্তাবে কাণ দিয়ো না। তিন, পুরোনো সেই সব চুক্তি বহাল থাকবে, কারণ চীন দেশে এখন "শান্তি ও শৃঙ্খলা" বলতে কিছু নেই।

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে সাম্রাজ্যবাদীরা কি রকম ক্ষেপে গিয়েছিল। এমন বে-আব্রু কথাবার্তা কেউ বলে? বলে, বেকায়দায় পড়লে বলে। ভদ্রতার বাইরেকার পর্দা আর কদিন টেঁকে? সাম্রাজ্য চলে যাবে, চীনের বিপ্লবী আন্দোলন সাম্রাজ্যের শেকড় ধরে টান মারতে শুরু করেছে। এখন তাই সাম্রাজ্যবাদীরা সোজাসুজি আক্রমণ করতে তৈরি।

পিকিং-এর পথে সুন সর্বত্র জনসাধারণের কাছে বিপুল অভিনন্দন পেলেন। যখন পিকিং-এ গিয়ে পৌঁছলেন দেখলেন যে পিকিং সরকার গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সাহায্যে তৈরি জাতীয় আইন-সভার মারফৎ সারা দেশের জন্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। পিকিং সরকার সুনকে বলল সোভিয়েৎ রাশিয়ার সঙ্গে মিতালির নীতি ছেড়ে দিতে এবং যুদ্ধবাজ সর্দারদের সর্দারি মেনে নিতে। কিন্তু পিকিং সরকারের আশা ভঙ্গ হল, সুন তাঁর নীতি থেকে এক চুলও নড়তে রাজি হলেন না।

পিকিং-এ পৌঁছবার পর সুন ইয়াৎ-সেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানে লিভারের ক্যান্সার রোগে তিনি ১৯২৫-এর ১২ই মার্চ মারা যান। তাঁর পার্টির জন্যে যে "উইল" তিনি রেখে গেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে গত চল্লিশ বছর ধরে তিনি গণ-বিপ্লবের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে চীন স্বাধীন হোক এবং অন্য সব জাতির পাশে সমান আসন পাক। তিনি আরও বলেছেন, দেশের জন্যে এই সংগ্রামে তিনি পৃথিবীর সেই সব জাতির সাহায্য চান যারা চীনকে তাদের পাশে সমান আসন দিতে রাজি। ভবিষ্যতের সংগ্রাম সম্বন্ধে এই উইলে সুন বলেন যে বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি। জাতীয় আইন-সভার দাবি

আর অন্যায় চুক্তি বাতিলের দাবি নিয়ে, তিন মূল নীতি এবং তিন গণ-আদর্শকে রূপ দেবার আগ্রহ নিয়ে জনসাধারণ যেন এগিয়ে যায়। একই সময় তিনি সোভিয়েৎ সরকারকে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠিতে বলেন যে বিদায় নেবার সময় তিনি এই আশা করছেন যে এমন দিন আসবে যেদিন শক্তিশালী স্বাধীন চীনকে রাশিয়া বন্ধু এবং সাথী হিসেবে অভ্যর্থনা জানাবে এবং সেদিন এই দুই সাথী হাতে হাত মিলিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মুক্তি-আন্দোলনকে জয়ের পথে এগিয়ে দেবে।

স্তালিনের রাশিয়া শক্তিশালী স্বাধীন চীনকে বন্ধু এবং সাথী হিসেবে আপন করে নিয়েছিল আর এই দুই দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশে দেশে মুক্তি-আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল। আজকের অধঃপতিত রুশ নেতৃত্বের প্রতি আমাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা তাই ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য।

সুন ইয়াৎ-সেনের আদর্শের বিপ্লবী সারবস্তুকে মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বরাবর শ্রদ্ধা করেছেন এবং তাঁর স্বপ্নকে সফল করেছেন। তাঁর "আসল উত্তরাধিকারী" বলে যে কুয়োমিনতাং নিজেকে জাহির করে সে আজ চিয়াং কাই-শেককে কাঁধে নিয়ে আমেরিকান কামানের আড়ালে তাইওয়ান দ্বীপে গিয়ে লুকিয়েছে।

॥ প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু ॥

এক যুদ্ধবাজ সামন্ত সর্দারের দল আরেক যুদ্ধবাজ সামন্ত সর্দারের দলের সঙ্গে লড়ছে। এ রকমের যুদ্ধ আমরা চীনের ইতিহাসে বারবার দেখেছি। এ-ও এক রকমের গৃহযুদ্ধ। এখন আরেক রকমের গৃহযুদ্ধ দেখব, বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ —যে যুদ্ধ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলে। দেশের ভেতরকার শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের মুক্তির জন্যে যে লড়াই তাই হচ্ছে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ।

চীনের প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় বাকী পৃথিবীর চেহারা কি রকম এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা চারদিক থেকে সৈন্য পাঠিয়ে শিশুরাষ্ট্র সোভিয়েৎকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বেশ কিছুটা সফলও হয়েছে। যেমন ইউরোপের অন্যত্র তারা শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী আন্দোলনকে দাবিয়ে দিতে পেরেছে, আমেরিকা নড়বড়ে সাম্রাজ্যবাদকে অনেক জায়গায় সাহায্যের ঠেকনো দিয়ে

দাঁড় করাতে পেরেছে, জার্মানি এবং হাংগেরিতে বিপ্লবকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইতালিতে ফ্যাসিবাদকে প্রতিষ্ঠা করা গেছে।

পুঁজিবাদ ১৯২১-২২এ যে আর্থিক সংকটে পড়েছিল তা খানিকটা সামলে নিয়েছে এবং আরেকবার সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু তার আগে পূব আকাশে রক্ত মেঘে যে ঝড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার। চীনের ব্যাপারটা সামলে নেওয়া খুবই জরুরী।

চীনের দিকে তাকালে দেখি সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে তাদের কলকারখানা বাড়িয়েই চলেছে। জাপানী মালিকদের কাপড়ের কল তো দারুণ ভাবে বাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা খরচ কমাবার জন্যে বয়স্ক শ্রমিক ছাঁটাই করে শিশু শ্রমিক আমদানি করছে। শ্রমিকরা যেসব দাবি করে তার মধ্যে মাইনে বাড়ানো, ইউনিয়নকে মেনে নেওয়া, ছাঁটাই চলবে না ইত্যাদি দাবির পাশাপাশি আরেকটি করুণ দাবি থাকে—"চাবুক মারা বন্ধ করতে হবে।" এ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাঁতাকলে শ্রমিকদের কি হাল হয়েছে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। সাম্রাজ্যবাদীদের কলকারখানার জোর আর টাকার জোর আছে তাই তারা চীনের বাজার নিজেদের হাতের মুঠোয় পুরেছে এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের সামান্য ক'টি কলকারখানা আর কম আর্থিক শক্তি নিয়ে সে বাজারে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। তাদের খুবই কোণঠাসা অবস্থা।

বলা বাহুল্য, শ্রমিকরা চুপ করে থাকছে না। স্ট্রাইকের পর স্ট্রাইকের ঢেউতে দেশ দুলে দুলে উঠছে। সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধবাজ সর্দারদের সশস্ত্র শক্তির সঙ্গে মোকাবেলা চলছে। ১৯২৫-এর ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত শাংহাই এবং সিংতাওতে জাপানীদের কাপড়ের কলে যে স্ট্রাইক হয়েছে তাতে এক লাখেরও বেশি শ্রমিক যোগ দিয়েছে। কিছু কিছু দাবি যে আদায় হয়নি তাও নয়।

ক্যান্টনে মে মাসে দ্বিতীয় সারা চীন শ্রমিক কংগ্রেস হল। সেখানে পাঁচ লক্ষ চোদ্দ হাজার সংগঠিত শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা চীনের সব অঞ্চল থেকে এসে যোগ দিয়েছিল। এর পরে পরেই জাপান সরকার দাবি করল যে চীনের কর্তৃপক্ষ যেন শাহাংইর কাপড়কল শ্রমিক ইউনিয়নটা বাতিল করে দেন। সেই মাসেই চীনে শ্রমিকদের বরখাস্ত করার প্রতিবাদে শাংহাইর

একটি কাপড়ের কলে স্ট্রাইক হয়। স্ট্রাইকের দ্বিতীয় দিনে কারখানা-মালিকের লোকেরা গুলি চালিয়ে প্রায় বারো জনকে খুন করল, আরও প্রায় বারো জনকে জখম করল। শ্রমিক, ছাত্র ও জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে বিরাট প্রতিবাদ-আন্দোলনে শহর কাঁপিয়ে তুলল। শাংহাই চীনের সবচেয়ে বড়ো শহর, সাম্রাজ্যবাদীদেরও সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি এটা, শ্রমিকদেরও সবচেয়ে বড়ো জমায়েৎ এখানে—কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মুনাফার স্বার্থে বড়ো বড়ো কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিককে জড়ো করতে বাধ্য হয়—যেমন রাক্ষস রাজা রাবণের মৃত্যুবাণ তার নিজের আরামের প্রাসাদকে খাড়া রেখেছে এমন একটি থামের মধ্যেই লুকোনো ছিল।

শ্রমিক-হত্যার প্রতিবাদে মেহনতী মানুষ, ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ গর্জে উঠল একথা ইতিপূর্বে বলেছি। সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি শাংহাই শহরে এবারে সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো দল মোকাবেলার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছে। অন্যেরা তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। কমিউনিস্ট পার্টি সভা করে সিদ্ধান্ত করেছে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে আরো উঁচু স্তরে তুলতে হবে—শ্রমিকরাই হবে এই আন্দোলনের মেরুদণ্ড।

এই ঝোড়ো আবহাওয়ার মধ্যে এল ৩০এ মে। শাংহাইর ছাত্ররা লেখাপড়া বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ইস্তাহার বিলি করতে। সাম্রাজ্যবাদী জল্লাদরা চীনের মানুষকে হত্যা করছে। এই ইস্তাহারে তারই জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ইংরেজ পুলিশ অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। মিছিলের ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা যেন আগুনে ঘি ঢালার মতো হল। হাজারে হাজারে লোক ছুটে এসে মিছিলে সামিল হল। প্রায় দশ হাজার লোকের বিক্ষোভ মিছিল!

"সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!" "চীনের মানুষ এক হও!"—আওয়াজে আওয়াজে আকাশ কেঁপে উঠছে। ইংরেজদের খুন চেপে গেল। পুলিশবাহিনীর ইনস্পেক্টর এভারসন হুকুম করল জনতার ওপর গুলি চালাতে। শাং-হাইর বড়ো রাস্তা নানকিং রোড রক্তে ভিজে গেল। সাম্রাজ্যবাদীদের এই বীভৎস অত্যাচারকেই চীনের ইতিহাসে "৩০এ মে'র হত্যাকাণ্ড" বলা হয়েছে। এই গণহত্যার প্রতিবাদে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি শাংহাইর শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং ছাত্রদের ধর্মঘটের ডাক দিল।

১৯১৯-এর ৪ঠা মে, ১৯২৩-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী এবং এই ১৯২৫-এর ৩০শে মে—রক্তে লাল এই তিনটি তারিখ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় চীনে দেশ-জোড়া গণ-আন্দোলন ধাপে ধাপে কি ভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে! ৩০এ মে ছাত্র, শ্রমিক ও গণতন্ত্রী সাধারণ মানুষকে রক্তের রাখী পরিয়ে ঐক্যবদ্ধ করল—বিপ্লবের দিক থেকে এটাই হল মস্ত লাভ।

১লা জুন থেকে ধর্মঘটের ডাকে এক প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল। শ্রমিকরা কাজে গেল না, ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যোগ দিল না, ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করল। শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও ছাত্রদের যুক্ত কমিটি এই বিরাট ধর্মঘটের ব্যবস্থা করল। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও জাপান হোয়াংপু নদী দিয়ে তাদের যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে সৈন্য নাবাল এবং বিক্ষোভ-কারীদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করল। কিন্তু উল্টো ফল হল—বিক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। সবার মুখে একই জঙ্গী আওয়াজ "সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে হবে!"

গায়ের জোর দেখিয়ে জনতাকে দাবানো যাবে না। একথা বুঝতে পেরে সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য কৌশল চালাল। শাংহাইর মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সাহায্য নিয়ে তারা জাতীয় বুর্জোয়াদের যুক্তফ্রন্ট থেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগল। এই মুৎসুদ্দি দালালেরা ভয় দেখিয়ে আর লোভ দেখিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াদের হাত করার কাজে লেগে গেল। কারণ প্রভুদের আদেশ যুক্ত-ফ্রন্ট ভাঙ্‌তে হবে। দালালরা যুদ্ধবাজ সর্দারদের সংগে ষড়যন্ত্র করল যুক্তফ্রন্টের আন্দোলনকে কোথাও কোথাও হামলা করে ঘায়েল করবার জন্যে। শ্রমিকশ্রেণীর জোর যাতে অটুট থাকে সেই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি শেষ অবধি ধর্মঘট বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত নিল। অবশ্য তারা শর্ত করল যে শ্রমিকদের আর্থিক দাবি পূরণ করলেই কেবল ধর্মঘট তুলে নেওয়া যেতে পারে। আগস্ট মাসে সর্বত্র শ্রমিকরা কাজে ফিরে আসতে লাগল।

আবার নতুন ঢেউয়ের পর ঢেউ—বিপ্লবী-গৃহযুদ্ধ তো থামতে পারে না। গোটা দেশের ওপর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঘূর্ণিঝড় বইতে লাগল।

শাংহাইর জনতার সংগ্রামকে সমর্থন করবার জন্যে ১৯২৫-এর ১৯এ জুন কমিউনিস্ট পার্টি হংকং-এ প্রায় এক লাখের বেশি চীনে শ্রমিকদের দিয়ে এক ধর্মঘট করাল। এই গুরুতর অবস্থার মোকাবেলা করবার জন্যে হংকং-এর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ "সামরিক আইন" মানে "ধরো আর মারো আইন" জারী

করল। দলে দলে চীনে শ্রমিকরা হংকং ছেড়ে ক্যান্টনে চলে গেল। ২৩এ জুন সেখানে হংকং-এর ধর্মঘটীদের নিয়ে এক লক্ষ লোকের এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল হল—তাতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং সৈনিকরাও যোগ দিল। শাকী বলে একটা জায়গায় মিছিলের ওপর ফরাসী এবং বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ থেকে কামান দাগা হল। "শাকী হত্যাকাণ্ড" নামে পরিচিত এই ঘটনায় পঞ্চাশ জনের প্রাণ গেল। বিপ্লবের রাজধানী ক্যান্টনে বিদেশী-দের ঘাঁটি থেকে কামান চালিয়ে মানুষকে খুন করা হল—নাটকের ঘটনার মতো চমক-লাগানো এই ঘটনা যেন চীনের মানুষকে চেঁচিয়ে ডেকে বলল—"চীনের বুকে বিদেশী ঘাঁটি খতম কর!"

ঢেউয়ের শেষ নেই! এক লাখের পর দু'লাখ। শাকী হত্যাকাণ্ডের প্রতি-বাদে ক্যান্টন আর হংকং-এর মানুস রাগে ফেটে পড়ল। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে হংকং-এ দু'লাখ লোকের ধর্মঘট হল। ধর্মঘটীরা দলে দলে ক্যান্টনে চলে আসতে লাগল—মরা বন্দর হংকং খাঁ খাঁ করতে লাগল।

জুলাই মাসের গোড়ার দিকে ধর্মঘটীরা সশস্ত্র ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে সমুদ্রতীরে কয়েকটা জায়গায় পাহারা বসাল। বৃটিশ জাহাজকে তীরে ভিড়তে না দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। সাম্রাজ্যবাদী বাণিয়ারা ভয়ানক বিপদে পড়ল। ক্যান্টন আর হংকং-এর এই জঙ্গী ধর্মঘট আন্দোলন ষোল মাস ধরে চলেছিল। পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বড়ো বড়ো যত ধর্মঘট হয়েছে এটা তাদের মধ্যে একটা। ষোল মাস বৃটিশ উপনিবেশ হংকং দ্বীপ মড়ার মতো পড়ে রইল। খোদ চীনের সমুদ্রতীরে সাম্রাজ্য-বাদীরা সৈন্য নাবিয়ে দিল। তাইপিং বিদ্রোহের সময় যেমন হয়েছিল এবারেও তেমনি খুনে, ডাকাত, গুণ্ডা-বদমায়েশদের নিয়ে বাহিনী তৈরি করল "সভ্য" বিদেশীরা। এতে নানা দেশের বিদেশী শয়তানরা যোগ দিল। সমাজতন্ত্রী রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসা বড়লোকদের দালাল রুশ সৈন্যরাও এতে যোগ দিল। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রকে ঠেকাতে না পেরে এরা চীনে সমাজতন্ত্রকে বোধ হয় জন্মের আগেই মায়ের পেটে হত্যা করতে চায়। লক্ষ করবার জিনিস যে, এই গুণ্ডাবাহিনী নিজের নাম দিল "শাংহাই ফ্যাসিস্টি" মানে "সাংহাইর ফ্যাসিস্ট বাহিনী"। মনে রাখতে হবে বছর তিনেক আগে ইতালিতে ফ্যাসিস্ট সরকার গদিতে বসেছে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের একেবারে ন্যাংটা চেহারা—গণতন্ত্রের রংচং পোশাক নেই,

উগ্র জাতীয়তার নেশায় মাতাল জল্লাদের কুড়ুল হাতে গুণ্ডা সরকার। "নর্থ চায়না হেরাল্ড" বা "উত্তর চীনের সংবাদবাহক" নামের এক বৃটিশ পত্রিকা এই "ফ্যাসিস্ট" অনাসৃষ্টির সবচেয়ে বড়ো সমর্থক হয়ে উঠল। কাগজের মালিক বৃটিশ আর সম্পাদক হচ্ছে আমেরিকান—একেবারে সোনায় সোহাগা। সেই "সভ্য" সম্পাদক গিলবার্ট প্রচার করতে লাগল যে চীনে আর অন্য কোনও নীতি চলবে না, তার নিজের দেশ আমেরিকাতে তারা নিগ্রোদের যেভাবে যেখানে সেখানে ফাঁসিতে লটকেছে এখানেও সেই ভাবেই কাজ করতে হবে। সভ্য দেশের সম্পাদক বটে!

হংকং-ক্যান্টনের এই অসাধারণ ধর্মঘট আন্দোলনের ফলে ক্যান্টনের বিপ্লবী সরকার অনেকখানি জোর পেল। সুন ইয়াৎ-সেনকে ক্যান্টন থেকে তাড়িয়েছিল যে চেন চিউং মিং সে কিন্তু সৈন্য সংগ্রহ করে ক্যান্টন আক্রমণের ফন্দি আঁটতে লাগল। নিজের ঘাঁটি শক্ত করবার জন্যে ক্যান্টন সরকার কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্য নিয়ে তার পূর্বমুখী অভিযান বা যুদ্ধযাত্রা শুরু করল। এই যুদ্ধযাত্রা শুরু হল ১৯২৫-এর ১লা ফেব্রুয়ারী। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে হোয়ামপোয়ার সৈনিকই বেশি। যদিও তারা সংখ্যায় অল্প তবু সাহসী আর কর্মপটু বলে কোয়াংতুং-এর পূর্ব অঞ্চলে চেন চিউং-মিং-এর সৈন্যবাহিনীকে তারা মাত্র দু'মাসের মধ্যে সাবাড় করে দিল।

জুলাই মাসের আরম্ভে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ক্যান্টনের বিপ্লবী সরকারকে নতুন করে সংগঠিত করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হল। এই জাতীয় সরকার হোয়ামপোয়ায় শিক্ষিত সৈনিকদের ভিৎ হিসেবে নিয়ে জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ গড়ে তুলল। সোভিয়েৎ রাশিয়ার মিলিটারি কায়দাকানুন অনুযায়ী এই চীনে ফৌজ গড়া হল। কুয়োমিনতাং-এর এবং সরকারের রাজনীতি-দপ্তরের প্রতিনিধিদের এতে নেওয়া হল। কুয়োমিনতাংকে বিপ্লবের পথে চালাবার জন্যে অনেক কমিউনিস্ট কুয়োমিনতাং দলে যোগ দিয়েছিল। তাদের কুয়োমিনতাং-এর প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় ফৌজে নেওয়া হল অথবা রাজনীতি-দপ্তরের নানা স্তরের কাজের জন্যে নেওয়া হল। এই কারণেই জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ নতুন ধরনের এক জঙ্গী ফৌজ হয়ে উঠতে পেরেছিল।

এদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোয়াংতুং-এর সর্দার চেন চিউং-মিংকে নানা ভাবে সাহায্য করে আবার দাঁড় করাল। সে তার ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনীকে

আবার গুছিয়ে নিয়ে ক্যান্টন আক্রমণে উৎসাহী হল। জাতীয় বিপ্লবী ফৌজের দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযানের ফলে চেন চিউং-মিং-এর চরম হার হল। এ পর্যন্ত আমরা শহরে ছাত্র, শ্রমিক ও জনসাধারণের সংগ্রামী বিক্ষোভের কথাই বলেছি। এবারে গ্রামের কৃষকদের কথায় আসা যাক্। শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠছিল, সামন্ত জমিদার আর সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে হাত পাকাচ্ছিল। বারবার কোয়াংতুং-এর কথা বলছি। দক্ষিণ চীনে সমুদ্রের ধারের এই প্রদেশে রয়েছে বিপ্লবী জাতীয় সরকারের রাজধানী ক্যান্টন। এই কোয়াংতুং প্রদেশে ১৯২৫এ কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। কারণ গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতিগুলোর প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯২৬এ কৃষক সমিতিগুলোর মোট সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় লক্ষ। যখন ক্যান্টন-হংকং ধর্মঘট আন্দোলন চলছিল তখন চাষীরা আত্মরক্ষা বাহিনী তৈরি করে ঐ আন্দোলনকে মদৎ দিয়েছিল। এই প্রদেশের হাইফেং ও লুফেং-এর সংগঠিত চাষীরা জাতীয় বিপ্লবী ফৌজকে সাহায্য করেছিল চেন চিউং-মিং-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযানের সময়। সঙ্গে সঙ্গে তারা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে স্থানীয় জমিদারদের খাজনা এবং অন্যান্য জবরদস্তি আদায় কমাবার আন্দোলন এবং তাদের সশস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল। কোয়াংতুং প্রদেশের এই প্রবল কৃষক আন্দোলন ক্যান্টনের জাতীয় সরকারকে শক্তি জুগিয়েছিল। এই কৃষক আন্দোলনকে ঐ প্রদেশের নানা জায়গার বিপ্লবী ঘাঁটিগুলোর শক্ত খুঁটি বলা যেতে পারে।

কুয়োমিনতাং-কমিউনিস্ট সমঝোতা হয়ে যুক্ত সরকার আর যুক্ত সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছে। কোয়াংতুং প্রদেশে বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। কৃষক আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। চেন চিউং-মিংটা কিছু করতে পারল না—হেরে গেল। এসব দেখে শুনে সামন্ত-কর্তাদের আর সাম্রাজ্যবাদীদের মনে খুব বড়া দুঃখ। ভয়ও বেশ। এতদিনের রাজত্ব বুঝি টেঁকানো যায় না। তবু হাল না ছেড়ে তারা ষড়যন্ত্র চালাতে থাকল। যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরানো দরকার আর কোয়াংতুং-এর বিপ্লবী ঘাঁটিগুলো ধূলিসাৎ করা দরকার। কুয়োমিনতাং দলই ভরসা কারণ দলের মধ্যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি কিছু আছে। এই মেকী বিপ্লবী বা বিপ্লব-বিরোধীদের নেতা হচ্ছে চিয়াং কাই-শেক। চিয়াং অনেক আগে থেকেই

মুৎসুদ্দিদের খুব ঘনিষ্ঠ লোক ছিল কারণ সে ছিল সাহাংইতে শেয়ারের দালাল। ১৯১১-র বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় সে দালালি করত কিন্তু তার ব্যবসা ফেল পড়ে। চতুর লোক, তাই ছলাকলার সাহায্যে ভালোমানুষ সুন ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে জুটে পড়ে এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। ক্রমে ওপরের দিকে ওঠার মতলব তার বরাবরই প্রবল ছিল। তাই শেয়ারের দালালি থেকে হোয়ামপোয়া সৈনিক স্কুলের অধ্যক্ষের পদ পর্যন্ত সে উঠে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদীরা, সামন্ত জমিদাররা এবং বড়ো পুঁজিপতিরা চিয়াংকে "আপন জন" বলে চিনতে পারে। তখন থেকে এই চিয়াং বিদ্রোহী দলে স্বদেশী ও বিদেশী শোষকদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে থাকে! বেশ খানিকটা আড়াল রেখে চিয়াং এখন বিপ্লবী আন্দোলনকে আঘাত হানতে আরম্ভ করে। "চুং শান" নামে যুদ্ধজাহাজটির ঘটনা তার একটি উদাহরণ।
হোয়ামপোয়া সৈনিক স্কুলের ক্যান্টন আপিসের নাম করে চিয়াং কাই-শেক লি চিহ-লুং-কে একটি আদেশ পাঠায়। এই লি চিহ-লুং হচ্ছেন একজন কমিউনিস্ট এবং ইনি তখন নৌবাহিনীর আপিসের অস্থায়ী ডিরেক্টার বা পরিচালক। চিয়াং তাঁকে আদেশ করে যে, "চুং শান" যুদ্ধজাহাজটিকে হোয়ামপোয়াতে পাঠাতে হবে কারণ জাহাজটিকে বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা হবে। যুদ্ধজাহাজটি যখন হোয়ামপোয়াতে পৌঁছল তখন চিয়াং কাই-শেক হোয়ামপোয়া সৈনিক স্কুল এবং জাতীয় বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে যুক্ত বহু কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল। তাদের বিরুদ্ধে চিয়াং এই মিথ্যা অভিযোগ আনল যে, তারা "চুং শান" যুদ্ধজাহাজটির সাহায্য নিয়ে হোয়ামপোয়াতে দাঙ্গা বাধাবার ষড়যন্ত্র করছিল। অথচ চিয়াং নিজেই এ জাহাজটিকে এখানে আনিয়েছে। তাহলে ষড়যন্ত্রটা কার ?
"যুদ্ধজাহাজ চুং শানের ঘটনা" চীনের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী দালাল চিয়াং কাই-শেকের একটি কীর্তি। এই ঘটনাকে নিজের কাজে লাগিয়ে চিয়াং এর পর দালালির কাজে আরও এগোল। কুয়োমিনতাং-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির এক সভায় "পার্টির কাজের উন্নতির প্রস্তাব" বলে একটা প্রস্তাব পাশ করাল। প্রস্তাবটির আসল উদ্দেশ্য হল কুয়োমিনতাং দলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যে প্রভাব-প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছে তা কমিয়ে আনতে হবে এবং ধ্বংস করতে হবে। প্রস্তাবে বলা হল যে, চলতি সময়ে যেসব কমিউনিস্টরা কুয়োমিনতাং দলের সভ্য আছে তাদের একটি তালিকা কুয়োমিনতাং-এর

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভাপতির হাতে দিতে হবে। আরও বলা হল যে, কুয়োমিনতাং-এর উচ্চতর সংগঠনগুলোতে পরিচালকদের পদগুলোর তিন ভাগের এক ভাগ শুধু কমিউনিস্টরা পেতে পারে, তার বেশি নয়। তাছাড়া কুয়োমিনতাং-এর কোনও কেন্দ্রীয় দপ্তরের পরিচালকের পদে কোনও কমিউনিস্টকে নিযুক্ত করা হবে না। আর কুয়োমিনতাং-এর কোনও সভ্যকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। চিয়াংকে এই সব কায়দাকানুন করতে হল এই জন্যে যে, অত্যন্ত শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে খোলাখুলিভাবে ঝগড়া করা তখন বোকামি হত। বিপ্লবীদের মধ্যে যতদিন থাকা যায় যাক, কারণ তাহলে বিপ্লবের বিরুদ্ধে চোরা-গোপ্তা কাজ-কর্ম আরও ভালো ভাবে চালানো যাবে।

চিয়াং চরিত্র আপাতত এই পর্যন্ত। এবারে আমরা বিপ্লবী ফৌজের উত্তরমুখী অভিযানে যোগ দেব। তখন আবার চিয়াং-এর সঙ্গে দেখা হবে।

॥ গৃহযুদ্ধ চলল : উত্তরমুখী অভিযান ॥

ক্যান্টনের জাতীয় সরকার এবারে উত্তরমুখী অভিযানের জন্যে তৈরি হল। কোয়াংতুং অঞ্চলে জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ তার নিজের শক্তি পরীক্ষা করে খুশী হয়েছে, সাধারণ মানুষের জংগী ভাবকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বত্র এখন আওয়াজ উঠেছে যে ফৌজী আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদ আর উত্তর চীনের যুদ্ধবাজ সর্দারদের শাসন-শোষণকে ধ্বংস করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির উৎসাহে ক্যান্টনের জাতীয় সরকার ১৯২৭এর জুলাই মাসে উত্তরমুখী অভিযান ঘোষণা করে। এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য হবে লড়াই করে যুদ্ধবাজ সামন্ত সর্দারদের একেবারে দেশ থেকে মুছে ফেলা কারণ এই ব্যাটারাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়ার, দেশ-শোষণের কলকাঠি। এক ব্যাটাকে ইতি-মধ্যেই তাড়ানো হয়েছে—কোয়াংতুং-এর চেন চিউং-মিংকে। ১৯২৫-এর শেষের দিকে বিপ্লবী ফৌজ তার জারিজুরি খতম করে দেয়—সে ক্যান্টন সরকারকে আক্রমণ করবার জন্যে পাঁয়তারা করছিল। সেটা ছিল বিপ্লবী ফৌজের দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযান। এবারে শুরু হচ্ছে, উত্তরমুখী অভিযান

১৯২৬-এর ২৬এ জুলাই। পিকিং-কে কেন্দ্র করে যে সামন্ত সরকার গড়ে উঠেছে তাকে ধ্বংস করতে হবে।

কোয়াংতুং প্রদেশের উত্তরে হচ্ছে হুনান প্রদেশ। অভিযান প্রথমেই হুনানে প্রবেশ করল। সেখানে চিহ্‌লি দলের সর্দারদের ঘাঁটি অল্প সময়েই ধ্বংস করা গেল। এই হুনান মাও ৎসে-তুং-এর হুনান। তিনি সেখানে ১৯২৪ সাল থেকে কৃষকদের মধ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কাজের ফলে ১৯২৭-এর শুরুতে কৃষক সমিতির সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় বিশ লক্ষ এবং এপ্রিল মাস আসতে আসতেই সেই সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে পৌঁছয়! মাওর কৃষকরা বিপ্লবী সৈনিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করল—তাদের হাতিয়ার হচ্ছে চাষের যন্ত্রপাতি—খন্তা, পাখিমারা হালকা বন্দুক এবং ভার বওয়ার বাঁকের ডাণ্ডা। ক্যান্টন থেকে উত্তরে ইয়াংসি নদীর ধারে হ্যাংকাউ শহরে পৌঁছতে বিপ্লবী ফৌজের মাত্র তিন মাস সময় লাগে। ফৌজ যে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পেরেছিল তার কারণ পথে প্রত্যেক জায়গায় তারা জনসাধারণের সাহায্য পেয়েছে, বিশেষ করে সংগঠিত কৃষকরা তাদের দারুণভাবে সাহায্য করেছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। চিহ্‌লির সর্দারেরা তাদের সব ফৌজ একত্র করে তিংজেচিয়াও ঘাঁটি রক্ষা করছে। তিংজেচিয়াও ক্যান্টন-হ্যাংকাউ রেলপথের ওপর যুদ্ধের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তিন দিকে জল আর একদিকে পাহাড়—যেন এক দারুণ দুর্গ। প্রায় দশ-বারো বার প্রচণ্ড আক্রমণ করেও বিপ্লবী ফৌজ ঘাঁটিটির কিছুই করতে পারল না। কিন্তু ফৌজ যেই স্থানীয় চাষীদের সাহায্য পেল অমনি তারা শত্রুকে ঘেরাও করে ফেলল এবং শহর দখল করতে পারল। এ ঘটনা আগস্ট মাসের। সেপ্টেম্বরে ইয়াংসির ওপারে হ্যাংকাউ দখল হল। অক্টোবরে হ্যাংকাউর উল্টো পারে উচাং দখল হল। বিপ্লবী-ফৌজ শহরের পাঁচিল বেয়ে উচাং শহরে ঢুকে বিপ্লবী ঝাণ্ডা পুঁতল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৭-এর মার্চে নানকিং শহর দখল করে ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় বিপ্লবী ফৌজ তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল। উত্তরমুখী অভিযান এভাবে সফল হওয়ায় গোটা দেশে সাড়া পড়ে গেল।

অভিযানে চাষীরা সাহায্য করেছিল প্রচুর—এ কথা উল্লেখ করেছি। শুধু বিপ্লবী ফৌজের পাশাপাশি সর্দারদের বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা লড়েছিল তাই নয়, ফৌজকে অন্নজল জুগিয়েছিল কৃষক ও শ্রমিকরা, তা ছাড়াও

বোঝা বওয়ার ব্যাপারটাও তারাই করেছিল—তা সে কাঁধে করেই হোক আর যানবাহনের সাহায্যেই হোক। তা নইলে রসদ ও গোলাবারুদ সৈনিকদের সরবরাহ করা কঠিন হত, অভিযান ঘা খেত। এই বিপুল সাহায্য পেয়ে ফৌজের লোকদের মনের জোরও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে, যেসব শ্রমিকরা হংকং-ক্যান্টন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তারা বিপ্লবী ফৌজের মাল-বওয়ার ব্যাপারটা সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল। প্রচারের কাজও এই শ্রমিকরা নিয়েছিল আর নিয়েছিল প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ। মাল বওয়া, প্রচার এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে দলে দলে এই শ্রমিকরা ফৌজের সঙ্গে উত্তর চীনের দিকে মার্চ করে গিয়েছিল।

এই সময় শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলনও বেড়ে গিয়েছিল। ১৯২৬-এর অক্টোবর থেকে ১৯২৭-এর এপ্রিল—এই সাত মাসে উহানের শ্রমিকরা তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার জন্যে তিন শ'র বেশি ধর্মঘট করেছিল। ডাক ও তার বিভাগে স্ট্রাইক, ছাপাখানায়, কাপড়ের কলে, আর সিগারেট ফ্যাক্টরীতে স্ট্রাইক, ব্যাঙ্কে স্ট্রাইক, হাতের কাজের কারিগরদের কারখানা আর ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানে স্ট্রাইক—স্ট্রাইকের মরশুম। শ্রমিকরা ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরি করে উত্তরমুখী অভিযানের বিরোধীদের দাবিয়ে রাখার কাজও করেছিল। বিপ্লব-বিরোধীরা তাদের হাতে যথেষ্ট মারও খেয়েছে।

বিপ্লবী ফৌজ যেমন কৃষকদের সাহায্য পেল, কৃষক আন্দোলনও তেমনি এই অভিযানের সময় ঝড়ের বেগে হু হু করে বেড়ে গেল। মাও ৎসে-তুং-এর হুনানের কথা আগে বলা হয়েছে। আরও অনেক জায়গায় ঐভাবে কৃষক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে এবং জমিদাররা বাধ্য হয় খাজনা আর মহাজনী সুদের হার কমাতে, কারণ ঠেলার নাম বাবাজী। সঙ্গে সঙ্গে আরও হরেক রকম জবরদস্তি আদায় আর খাজনার চড়া হার সব বাতিল হয়ে যায়। প্রতিটি অঞ্চলে অত্যাচারী জমি-মালিকদের মুখ চূর্ণ—যুগ যুগ ধরে যে আরামের জমিদারী ছিল তার ভিৎ ধ্বসতে আরম্ভ করেছে যে!

শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক—তিন শক্তির স্রোত মিশে যে বন্যার সৃষ্টি হল তাতে অনেক বাধার দেয়াল ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এ বিশ্বাস জনসাধারণের মনে দেখা দিল।

সামন্তদের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরাও বিপদ গণল। উত্তর চীনের যুদ্ধ-বাজ সর্দারদের তারা সাহায্য তো করছিলই, এবারে আর থাকতে না পেরে নিজেরাই সরাসরি মাঠে নেবে পড়ল। উত্তরমুখী অভিযান উহানে এসে পৌঁছেছে। জনসাধারণ আন্তরিকভাবে তাদের অভ্যর্থনা করল। বিজয়-উৎসবের দিন স্থির হল— ৩রা জানুয়ারী, ১৯২৭। সেদিন বিরাট জমায়েৎ হবে উহানে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জনসাধারণকে ভয় দেখাবার জন্যে সৈন্যদল পাঠাল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উহানের মানুষ সভা করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই কাজের নিন্দা ও প্রতিবাদ করল। হ্যাংকাউর শ্রমিকরা প্রচণ্ড প্রতিবাদ-আন্দোলন করল। ৫ই জানুয়ারী ক্যান্টনের জাতীয় সরকার জনতার বিক্ষোভকে শান্ত করবার জন্যে এবং দীর্ঘ দিনের অন্যায়-অত্যাচারের একটি ঘাঁটিকে খতম করবার জন্যে হ্যাং-কাউর বৃটিশ "কনসেশন" বা বৃটিশের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা দখল করে নিল। এ এক দারুণ ঘটনা। প্রথম আফিং যুদ্ধের পর চীনের জনসাধারণ এই প্রথম বিদেশীর গ্রাস থেকে দেশের মাটির একটা টুকরো উদ্ধার করতে পারল। এর পর দক্ষিণ চীনের কিয়াংসি প্রদেশের কিউকিয়াং নামে জায়গায় যে বৃটিশ "কনসেশন" বা দখল ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে প্রথমে হ্যাংকাউ এবং তার পরে কিউকিয়াং কেড়ে নেওয়া চীনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে উল্লেখ করবার মতো জয়লাভ।

১৯২৭-এর জানুয়ারীতে জাতীয় সরকার ক্যান্টন থেকে উহানে তার দপ্তর সরিয়ে আনল। ইতিমধ্যে একটা ঘোরালো ব্যাপার ঘটতে লাগল। কিছু কিছু স্থানীয় সর্দার বিপ্লবের পক্ষে চলে এল। এদের মধ্যে দুটো ধারা ছিল। একটা সুস্থ, আরেকটা অসুস্থ। "খ্রীস্টান সেনানায়ক" ফেং ইউ-সিয়াং-এর দল উত্তর-পশ্চিম চীনের একটা অংশে খবরদারি চালাত। জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং ক্যান্টনের সঙ্গে এরা কিছুদিন সম্পর্ক রেখে চলেছিল। এই ফেং-এর সৈন্যদলে কুয়োমিনতাং-এর সভ্য ছিল আবার কমিউনিস্টও ছিল। এই রকমের সর্দার তখনকার অবস্থায় সুস্থ ধারার লোক। পরে অবশ্য সে বিগড়ে গিয়েছিল। আরেক ধারার সর্দার হল তারা, যারা বুদ্ধিমানের মতো ঠিক করল যে, জোয়ারের ঢেউ বুক পেতে নিয়ে মরণ ডেকে আনা তো ভালো নয়, বরং এখন স্রোত যেদিকে সেদিকেই সাঁতার কাটা ভালো অর্থাৎ ঘোষণা করা ভালো যে, আমরা বিপ্লবের পক্ষে। পরে মওকা

এলে আবার পুরোনো অবস্থাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যাবে, এখন "চাচা আপন বাঁচা" নীতিটাই ঠিক।

এর ফলে তখনকার মতো বিপ্লবী ফৌজের সুবিধে হল সন্দেহ নেই কিন্তু ফৌজের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজও বোনা হয়ে গেল। কারণ সামন্ত-জমিদারদের বেশ কিছু লোকজন ফৌজের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ১৯২৬-এর ডিসেম্বর এবং ১৯২৭-এর জানুয়ারীতে যারা বিপ্লবের পক্ষে যোগ দিল সেই সর্দারদের সৈন্যদলের ৫৬ জন সেনানায়কের মধ্যে ৫১ জনই ছিল জমিদার! সাধারণ কৃষক পরিবারের দখলে যে চাষের জমি ছিল তার আড়াই শ' গুণ কি তারও বেশি জমি ছিল এই জমিদার-সেনানায়কদের হাতে। এই জমিদার সেনানায়করা নিজ নিজ জমিদারীর এলাকাগুলোতে তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে বসে রইল। এলাকাগুলো হল মধ্য চীনের আনহোয়েই, হোনান, হুপে এবং দক্ষিণ চীনের কিয়াংসি এবং ফুকিয়েন।

১৯২৭-এর শুরুতে কুয়োমিনতাং পঞ্চাশ লক্ষ সভ্যের পার্টি হয়ে দাঁড়াল। এটা সম্ভব হল কমিউনিস্টদের আন্তরিক সমর্থনে এবং কৃষক-শ্রমিকের মধ্যে সভ্য-সংগ্রহের ফলে। ১৯২৫-এর ৩০এ মে'র শাংহাই হত্যাকাণ্ডের সময় যে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা ছিল ন' শ' এখন তাদের সেই সংখ্যা সাতান্ন হাজারেরও ওপরে উঠল। ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংহত হয়েছে এমন শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল ত্রিশ লক্ষ। কৃষক সমিতিগুলোর সভ্যসংখ্যা প্রায় এক কোটির কোঠায় পৌঁছল।

গণ-আন্দোলনের জোর দেখে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং সামন্তশ্রেণী তাদের কর্তব্য নির্ভুল ভাবে স্থির করে ফেলল। ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে যে এই শ্রেণীগুলো বেগতিক বুঝলে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু সব সময় তাদের মতলব থাকে জনতার ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতার সিংহাসনে পৌঁছবার। বিপ্লবী আন্দোলন হবে তাদের ঘোড়া আর তারা হবে বাহাদুর সওয়ার। চীনের শোষকশ্রেণী যে এই পথ নেবে তা ইতিপূর্বেই "চুং শান" জাহাজের ঘটনায় দেখা গেছে। সেখানে দেখা গেছে যারা কমিউনিস্ট অর্থাৎ খাঁটি বিপ্লবী তাদের কুয়োমিনতাং থেকে কায়দা করে হটিয়ে দেবার লাইন ধরেছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল চিয়াং কাই-শেক। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী থেকে কিছু কমিউনিস্ট অফিসারকে

চিয়াং মিথ্যা অজুহাতে সরিয়েছে—উদ্দেশ্য যাতে বিপ্লবী ফৌজের ওপর তার অখণ্ড কর্তৃত্ব বজায় থাকে। এসব ঘটনা ঘটেছে ১৯২৬-এর গোড়ার দিকে—বিপ্লবী ফৌজের উত্তরমুখী অভিযান শুরু হবার আগে। সুতরাং এখন ১৯২৭-এ পৌঁছে, বিপ্লবী ফৌজের শক্তি এবং শ্রমিক, কৃষক আর গণ-আন্দোলনের জঙ্গী চেহারা দেখে আর বিপ্লবের জয়যাত্রা দেখে চিয়াং যে খুশি নয় তা বলাই বাহুল্য। বিপ্লবী ফৌজের সর্বাধিনায়ক চিয়াং ভাবতে লাগল যে এখন কায়দা করে গণ-আন্দোলনকে "অহিংস" করতে হবে।

দুর্বল নেতৃত্বের দরুণ কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু এই সংকটমুহূর্তে তার কর্তব্য সঠিকভাবে স্থির করতে পারল না। চেন তু-সিউ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। তখন দুটো পথ: এক, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও এইভাবে চীনের অধিকাংশ মানুষকে সক্রিয় করে তোলা এবং যুক্তফ্রন্টে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম করা। দুই, বড়ো বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতাদের সরকারের মধ্যে এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করতে দেওয়া অর্থাৎ সময় বুঝে কৃষক-শ্রমিক জনতার কাজ ফুরিয়েছে বলে তাদের হটিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বুর্জোয়া নেতাদের নতুন বন্দোবস্তে আসতে দেওয়া। প্রথম পথটি হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার পথ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সে বিপ্লবকে ধ্বংস করার পথ। প্রথম পথটি কমিউনিস্ট পার্টির অবশ্যই ধরা উচিত ছিল কিন্তু যে কার্যসূচী তার তখন নেওয়া উচিত ছিল, দুর্বল নেতৃত্ব তা ঠিক করতে পারল না। দ্বিতীয় পথের বিপদ সম্বন্ধেও এতটুকু সতর্ক হল না। কিন্তু সফল বিপ্লবের পথ নেবার চমৎকার সুযোগ তখন ছিল। কারণ ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী দুর্বল ছিল এবং গণ-আন্দোলনের ঢেউ বেশ উঁচু অবধি উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি নতুন, অভিজ্ঞতাও বেশ কম, আর হাঁটুর জোর নেই এমন সুবিধাবাদী দক্ষিণপন্থী চেন তু-সিউ সেই পার্টির নেতা—এ অবস্থায় ব্যর্থতা ঠেকানো গেল না। আর চেন তু-সিউ-র ভুল কাজে উৎসাহ জুগিয়ে চলল শয়তান লিউ শাও-চি। কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে যে যুক্তফ্রন্ট তাতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নেতৃত্ব নিয়ে নিল চিয়াং-এর মতো মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার দালাল আর কুয়োমিনতাং-এর ভেতর তার সাকরেদরা। এদিকে গণসংগ্রাম, বিশেষ করে বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের লড়াই, শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চেন তু সিউ গণ-আন্দোলনকে

সমর্থন জানাল না এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও চেষ্টা করল না। ১৯২৪-২৭এ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আরেকটা দারুণ দুর্বলতা ছিল যে তার নিজের কোনও সশস্ত্র ফৌজ ছিল না।

কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা ঠিকই হয়েছিল কারণ অন্য কোনও উপায়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে দেশের সব রকমের সংগ্রামী শক্তিগুলোকে একত্র করা যেত না। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মতো কুয়োমিন-তাং-এর পেছনে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের জোর ছিল না। যুক্তফ্রন্টের কাঠামোর মধ্যে থেকে সেই জোরকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবী সরকারের নানা বিভাগে কমিউনিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করা উচিত ছিল এবং বিপ্লবী ফৌজ গণতান্ত্রিক ঢঙে নতুন করে সংগঠিত করে তার মধ্যে কমিউনিস্টদের ভালো করে ঘাঁটি গাড়া উচিত ছিল। বিপ্লবের ভবিষ্যৎকে কমিউনিস্ট পার্টির আয়ত্তে আনবার অন্য কোনও পথ ছিল না। কিন্তু চেন তু-সিউ কি করল? যুক্তফ্রন্টের যুক্ত থাকাটাকেই সে বড়ো করে দেখল, বিপ্লবকে নয়।

সেই জন্যে কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে যেসব বিপ্লব-বিরোধী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া এবং সামন্তপন্থী লোকেরা ছিল তাদের মন থেকে ভয় দূর করতে গিয়ে চেন তু-সিউ বিপ্লবী নেতার কর্তব্য মোটেই করল না। সে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন অস্তিত্বকে আমল দিল না, তাকে উদ্যোগ নিতে দিল না, মানে এগিয়ে গিয়ে কিছু করতে দিল না, উত্তরমুখী অভিযানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গড়ে তুলল না এবং বিপ্লবী ফৌজকে পার্টির কর্তৃত্বের মধ্যে আনল না। সেই ফৌজের আসল কর্তৃত্ব চলে গেল যে বিপ্লব-বিরোধীরা যুক্তফ্রন্টের মধ্যে লুকিয়ে ছিল তাদের হাতে। তাদেরই নেতা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের গুণী দালাল চিয়াং কাই-শেক। চেন তু-সিউ এত দুর্বলতা দেখাল যে বিপ্লবী ফৌজের চেষ্টায় যেসব এলাকা মুক্ত হল সেই সব এলাকাতে কৃষক ও শ্রমিকরা যখন বিপ্লবের স্লোগানগুলোকে কাজে পরিণত করতে গেল তখন সে পার্টির নাম করে তাদের বাধা দিল। অথচ মাও ৎসে-তুং এবং অন্যান্য নেতারা এই বলে পীড়াপীড়ি করছিলেন যে শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে জঙ্গী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে কারণ সেই ঐক্যই হবে যুক্তফ্রন্টের শিরদাঁড়া। এসব কথাকে তোয়াক্কাই করল না চেন তু-সিউ। অবশ্য গোড়া থেকেই

চেনের দুর্বলতা ছিল, সে জনসাধারণকে বিপ্লবী সংগ্রামে সামিল করতে অনিচ্ছুক ছিল, স্বপ্ন দেখত শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়াই চীন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে।

সুতরাং উত্তরমুখী অভিযানের উত্তর দেবার জন্যে জনশত্রুরা বিপ্লবী ফৌজের জয়যাত্রার আড়ালে আড়ালে তৈরি হচ্ছিল। তাদের আয়োজন বেশ খানিকটা দানা বেঁধে উঠল যখন বিপ্লবী ফৌজ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দুর্গ সমুদ্রতীরের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। সাম্রাজ্যবাদীরা আগের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে যে, এই বন্যার আক্রমণকে ঠেকাবার দুটি মাত্র পথ আছে। এক, সশস্ত্র আক্রমণ; দুই, মাঞ্চু আমলে যেমন দালাল নেতা ইউয়ান শিহ্-কাইকে পাওয়া গিয়েছিল এবারেও তেমনি এক দেশদ্রোহী বেইমান নেতাকে যোগাড় করা। দুটি পথের মধ্যে সশস্ত্র আক্রমণের পথটি নিরাপদ নয়, সে পথের ভবিষ্যৎ অজানা। এ পথে গেলে চীনেই যে শুধু বড়ো রকমের যুদ্ধ বেধে যেতে পারে তা নয়, উপনিবেশগুলোর এখানে ওখানেও যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে কারণ সেখানকার মানুষ শোষণের টানে শুকনো জ্বালানি হয়েই আছে, কোনও রকমে একটা ফুলকি উড়ে এলেই আর রক্ষে নেই। তা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের দেশেও গণতান্ত্রিক মানুষ আর শ্রমিকশ্রেণী পরের রাজ্য লুঠ করার নীতিকে সমর্থন করবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডে তখন সবে সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেছে এবং অনেক সাম্রাজ্যবাদী দেশে "সাম্রাজ্যবাদ চীন ছাড়ো" আওয়াজ তুলে আন্দোলন জমে উঠছে। সুতরাং দ্বিতীয় পথই ভালো, চোরা পথে বিপ্লবের বিরুদ্ধে সে দেশেরই এক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ হাসিল করা যাক।

তাই হ্যাংকাউর বৃটিশ এলাকা বিপ্লবী ফৌজের হাতে যখন ছেড়ে দিতে হল তখন ইংল্যাণ্ড হাসি-হাসি মুখ করে তার এত দিনের অধিকার ছেড়ে দিল—ভাবটা এই যেন খুশি হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য—কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে যারা বিপ্লব চায় না তাদের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তিপূর্ণ আপোসে রাজি আছে। চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা বিদেশীদের কব্জা থেকে মুক্তি চায় ঠিকই কিন্তু বিপ্লবী সরকার আর বিপ্লবী ফৌজের কাজকর্ম দেখে তাদের অনেকে এখন বিদেশীদের চেয়ে স্বদেশীদের বেশি ভয় করতে আরম্ভ করেছে। শ্রমিকদের প্রবল সংগঠন দেখে তারা ভাবতে

শুরু করেছে যে এই সংগঠন একদিন তাদের সঙ্গে লড়বে। এই ধরনের জাতীয় বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া ও সামন্ত পরিবারের অফিসাররা কুয়োমিনতাং-এর ভেতরে থেকে বিদেশীদের সাহায্য করবে—ইংরেজ এটা বুঝতে পেরেছিল। সৈনিকরা এসেছে কৃষক আর শ্রমিক শ্রেণী থেকে আর অফিসাররা সৈন্যদলে আসবার আগে ছিল জমিদার আর কলকারখানার মালিক এবং এরা জামিদারীর আয় থেকেই নিজেদের উচ্চশিক্ষার জন্যে আর কলকারাখানার জন্যে টাকা খরচ করেছে। প্রথমে বিপ্লবের কার্যসূচী মন্দ লাগছিল না। এখন মনে হচ্ছে এ পথে আর না এগোলেই ভালো হয়। সুতরাং কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে এরাই বিপ্লববিরোধী হয়ে উঠল। ইংরেজের মুচ্‌কি হাসি এদের মনে এই স্বপ্ন জাগাল যে ইংরেজের অর্থ ও কারিগরি সাহায্য পেলে ভবিষ্যৎ কি সুন্দরই না হবে।

মনে রাখতে হবে এসব কথা যখন তারা ভাবছে তখন বিপ্লবী ফৌজ শাংহাইতে এসে পৌঁছল বলে। শাংহাই বরাবরই লড়িয়ে। ইতিপূর্বে এখানে বার কয়েক বিদ্রোহ হয়ে গেছে। যেমন, বিপ্লবী ফৌজ উহান দখল করার ঠিক পরে পরেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শাংহাইর শ্রমিকরা তিন বার সশস্ত্র বিদ্রোহ করে বিপ্লবী ফৌজের জয়যাত্রায় নিজেদের সামিল করতে চেষ্টা করেছে। ভালো ভাবে প্রস্তুত হতে পারেনি বলে তাদের ১৯২৬-এর অক্টোবরের সশস্ত্র বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারীতে তিন লক্ষ 'ট হাজার শ্রমিকের এক সাধারণ ধর্মঘটে শাংহাই কেঁপে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং স্বদেশী শয়তানরা এক জোট হয়ে শ্রমিক হত্যার প্ল্যান করে। শ্রমিকদের নিজস্ব অস্ত্র নেই বলে তারা শত্রুসৈন্যের ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু এবারেও তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় কারণ বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগ তারা গড়ে তুলতে পারেনি। প্রতিশোধ নেবার জন্যে আর ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধবাজ সর্দাররা কমিউনিস্ট বন্দীদের মাথা কেটে শাংহাইর প্রধান প্রধান রাস্তার টেলিগ্রাফের থামের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তবু জনতার আন্দোলনে ভাঁটা পড়েনি। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি তৃতীয় বার বিদ্রোহের জন্যে ভাল করে প্রস্তুত হল—শ্রমিক ও জনসাধারণকে প্রচার ও সংগঠনের মধ্যে দিয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈরী করে নিল।

১৯২৭-এর ২১-এ মার্চ। বিপ্লবী ফৌজ তখন শাংহাইর শহরতলীতে এসে

পৌঁছেছে। উত্তরমুখী অভিযানের শহর দখলের পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শাংহাইর শ্রমিকরা আরেকটি সাধারণ ধর্মঘট করল—আট লক্ষ শ্রমিক এতে সামিল হল। তৃতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহের এই হল ইংগিত। শ্রমিকরা রেল বন্ধ করল, টেলিফোন আপিস দখল করল, বিরোধী সৈন্যবাহিনীর আর পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিল আর শাংহাইর রেল স্টেশনগুলো কব্জা করল। কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বে এবং শ্রমিকদের প্রচণ্ড প্রাণপাত লড়াইর ফলে শাংহাই শহর জনতার হাতে এসে গেল—সেখানে জনতার সরকার প্রতিষ্ঠা হল। এখানে বলা দরকার যে শাংহাইর মুক্তি-যুদ্ধে চৌ এন-লাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

প্রায় একই সময়ে নানকিং-এ কি ঘটছিল দেখা যাক। বিপ্লবী ফৌজ যখন সেখানে ঢুকছিল তখন বেশ কয়েক জন বিদেশী জখম হল এবং মারাও গেল। এই ছুতো পেয়ে ইয়াংসি নদীতে যে আমেরিকান ও বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ ছিল তা থেকে ১৯২৭-এর ২৪এ মার্চ কামান দাগা শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালী এক চরমপত্র পাঠাল, মানে, বলল বিপ্লবী ফৌজকে থামাও তা না হলে আমাদের যা করবার করব। কামান দাগা আর পত্রাঘাত দুটোরই উদ্দেশ্য হচ্ছে চিয়াং কাই-শেক এবং কুয়োমিনতাং-এর মধ্যেকার নরমপন্থীদের ইংগিতে বলা যে কোন্ দিকে যোগ দেবে এই মুহূর্তে ঠিক করে ফেল—বিপ্লবী ফৌজের পক্ষে যাবে, না সাম্রাজ্যবাদীদের কথা শুনে চলবে ?

শাংহাই শহরের ব্যাঙ্ক-মালিকরা এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ-সাজস করে জাতীয় বুর্জোয়া অর্থাৎ শিল্পপতিদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল। এই জাতীয় বুর্জোয়ারা ভয়ে শাংহাইর জনতা-সরকারে যোগ দিল না। জয়ের আনন্দে শ্রমিকরা বিপ্লবী ফৌজকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। এদিকে ব্যাঙ্ক-মালিকরা চিয়াং কাই-শেকের কাছে গোপনে চর পাঠাল। চর মারফৎ ব্যাঙ্ক-মালিকরা চিয়াংকে বলল সে যেন গণ-আন্দোলনকে ধ্বংস করে এবং আরও বলল যে যদি সে তা করে তবে তারা প্রতিজ্ঞা করছে যে প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্য করবে এবং ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্থানীয় সৈন্যবাহিনী অনুগ্রহ করে "নিরপেক্ষ" হয়ে থাকবে।

একই সঙ্গে আরেক জন গুণী লোকের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ হল

ব্যাঙ্ক-মালিকদের। এই গুণ্ডাটি হচ্ছে খুনি তু ইউএহ্‌-সেন, স্থানীয় গুণ্ডাদলের সর্দার—আফিং-এর কারবারে বেশ কিছু কামিয়েছে। তু বলল যে পাঁচ হাজার রাইফেল আর অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পেলে সে তার সব চেলাদের লেলিয়ে দেবে—দারুণ তাদের হাতের টিপ। সমাজের নীচের তলার এই গুণ্ডাবদমায়েসদের পাঁচ হাজার বিদেশী রাইফেল এবং দরকারী সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া হল। ওদিকে অপর গুণ্ডা চিয়াং কাই-শেকও এই বিরাট ষড়যন্ত্রে যোগ দিল।

ইংরেজ আর আমেরিকানরা শাংহাইর যে এলাকাটা দখল করেছিল তার ভেতর দিয়ে কোনও সশস্ত্র চীনে নাগরিক যেতে পারত না—"অন্যায় চুক্তি" চীনের ওপর চাপিয়ে দেবার সময় বিদেশীরা এই ব্যবস্থাটা করে নিয়ে-ছিল। কিন্তু তু ইউএহ্‌-সেনকে তার গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে বিদেশীদের এই দখলী এলাকার মধ্যে দিয়ে অবাধ যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হল। শুধু কি তাই, তাদের যাতে যেতে কষ্ট না হয় তাই এই নাতজামাইদের জন্যে মোটর ট্রাক পাঠানো হল। ফল হল এই যে, এই শয়তানের দল বিদেশী এলাকার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ গিয়ে পেছন থেকে শ্রমিকবাহিনীর ওপর আচমকা আঘাত হানল। শ্রমিকরা হকচকিয়ে গেল কারণ পেছনের বিদেশী এলাকা সম্বন্ধে তারা নিশ্চিন্ত কারণ তার মধ্যে দিয়ে কোনও সশস্ত্র চীনে ফৌজ আইনত আসতে পারে না এই তাদের ধারণা ছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্রের সঙ্গে তখনও তাদের পরিচয় ভাল করে হয়নি। হঠাৎ আক্রমণে হাজার হাজার শ্রমিক সেদিন মারা গেল। ১৯২৭-এর ১২ই এপ্রিল চিয়াং কাই-শেক তার নিজের সৈন্য পাঠিয়ে কয়েক হাজার শ্রমিককে হত্যা করল। তার গোপন হুকুম অনুযায়ী বিপ্লববিরোধী কুয়োমিনতাং অফিসাররা নানকিং ও ক্যান্টন শহরেও একই রকম শ্রমিক হত্যার উৎসবে মেতে উঠল। বিপ্লবের সমর্থক বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লবের সংগঠক কমিউনিস্টদের হাজারে হাজারে ধ্বংস করা হল। গ্রামাঞ্চলে আগুণতি কৃষকের প্রাণ গেল। দেশের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করার পর চিয়াং সারা পৃথিবীর বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় দারুণ প্রশংসা পেতে লাগল। আগে যেসব খবরের কাগজ চিয়াং-এর মাথায় পচা নর্দমার কাদার মতো গালাগলি ছুঁড়ে তাকে "লাল ডাকাত" বলত তারা এখন সুর পাল্টে ফেলল। "সভ্য" কিনা তাই!

১৮ই এপ্রিল শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীর রক্তঝরানো হাতে চিয়াং এক

ফতোয়া সই করে জানিয়ে দিল "জাতীয় সরকার" বাতিল হল এবং "জাতীয়তাবাদী সরকার" নামটা চালু হল। "জাতীয়তাবাদী" নামটা লক্ষ করবার মতো। এটা খাঁটি "স্বদেশী" সরকার। আগেরটা "স্বদেশী" ছিল না কারণ সোভিয়েৎ রাশিয়ার সঙ্গে তার যোগ ছিল। বিপ্লবী অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে যোগ থাকাটা ভালো নয়—তাতে দেশের "স্বদেশীয়ানা" উবে যায়! কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের চাকররা যদি সরকার গঠন করে তাহলে সেটা দিব্বি "স্বদেশী"!

এই সরকারের রাজধানী হল নানকিং এবং এতে যোগ দিল কুয়োমিনতাং দলের দক্ষিণপন্থী বা বিপ্লব-বিরোধীরা এবং যুদ্ধবাজরা, উহানের বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চিয়াং নতুন সরকার গঠন করল অথচ সে তো ছিল সেই সরকারের একজন অফিসার। সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, দেশের মানুষের হত্যাকারী, তু ইউএহ্-সেনের গুণ্ডাদলের সাঙ্গাৎ এই চিয়াং আমেরিকার সমর্থনের জোরে আজ রাষ্ট্রসংঘে সারা চীনের হয়ে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। "সভ্য" সমাজের "সভ্যতার" বলিহারি!

চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার পর উহানের বিপ্লবী সরকারের মধ্যে যুক্তফ্রণ্ট তিন মাস টিঁকেছিল। এই যুক্তফ্রণ্টে এখন ছিল কুয়োমিনতাং-এর "বামপন্থীরা" এবং কমিউনিস্টরা। কুয়োমিনতাং "বামেরা" হচ্ছে মধ্য বুর্জোয়া ও ক্ষুদে বুর্জোয়ার প্রতিনিধি এবং কমিউনিস্টরা হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি। উহানের বিপ্লবী সরকার চিয়াং কাই-শেককে বরখাস্ত করল। চিয়াং তার প্রতিশোধ নিল। উহান সরকারকে এক হিসেবে "ঘেরাও" করল, তার অর্থনৈতিক ব্যাপারে অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনে লেনদেন, রসদ সংগ্রহ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপারে অচল অবস্থা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করল। প্রধান কৌশলটা হল এই, উহান থেকে পূবে সমুদ্র পর্যন্ত ইয়াংসি নদীপথটি চিয়াং উহান সরকারকে ব্যবহার করতে দিল না। এই সময় উহান এবং তার অধীন এলাকায় গণ-আন্দোলন খুবই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকেরা দলে দলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে যোগ দিচ্ছে, চাষীরা নতুন নতুন সমিতি করেই চলেছে। শ্রমিক এবং কৃষক দুই দলই "অস্ত্র চাই" বলে উহান সরকারের মাথা খেয়ে ফেলছে। তাদের উৎসাহ এখন চরমে উঠেছে।

আমরা ১৯২৪ থেকে ১৯২৭—এই সময়ের বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা করছি। ১৯২৪-২৫-এর বড়ো বড়ো ধর্মঘট, ৩০এ মে'র শাংহাই হত্যাকাণ্ড,

ষোল মাসের হংকং-ক্যান্টন ধর্মঘট, তারই মধ্যে শাকী হত্যাকাণ্ড, তারপর জাতীয় সরকারের পূর্বমুখী অভিযান—এই সব নিয়ে গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্ব। "চুং শান" যুদ্ধজাহাজের ঘটনা থেকে শুরু করে বিপ্লবী ফৌজের শাংহাই দখল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব। চিয়াং-এর বিশ্বাসঘাতকতা ও নানকিং-এ জাতীয়তা-বাদী সরকার প্রতিষ্ঠা থেকে গৃহযুদ্ধের তৃতীয় পর্ব শুরু। আমরা এখন এই তৃতীয় পর্বে আছি। এই তৃতীয় পর্বে ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবের চরম সংকটের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। উহানে কুয়োমিনতাং বামপন্থীদের নেতা ওয়াং চিং-ওয়েই এবং তাঁর গ্রুপের মনটা স্থির নয়, এদিক-ওদিক করছে, যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছে। তাদের চেষ্টা হচ্ছে এই যে, চিয়াং কাই-শেকের হাত থেকে বাঁচতে হবে আর বিপ্লবী জনতার হাত থেকেও বাঁচতে হবে। সুতরাং তারা তাদের কুয়োমিনতাং দলের মিলিটারি অফিসারদের ওপর ক্রমশ বেশি নির্ভর করতে লাগল কারণ এরাই তাদের দুদিককার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে। জনসাধারণ বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে উত্তেজিত, তারা ব্যাকুলভাবে অস্ত্র চাইছে। বিপ্লবকে বাঁচাবার ঐ হচ্ছে একমাত্র উপায়। কিন্তু এই কুয়োমিনতাং বামরা জনতার হাতে অস্ত্র দেবার কথা কল্পনাই করতে পারে না।

কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা কি? পার্টির মধ্যে সেই চেন তু-সিউ এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থীরাই প্রবল, তারাই পার্টি কোন্ নীতি নিয়ে চলবে তা ঠিক করে দিচ্ছে—তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা।

স্তালিন কিন্তু সময়মতো চীনের কমিউনিস্টদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের ৩০-এ নভেম্বর এক বক্তৃতায় তিনি বললেন, চীনে জাতীয় বুর্জোয়ার চরিত্র বড়ো দুর্বল। তাই "চীন বিপ্লবের উদ্যোক্তা এবং পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা, চীনের কৃষকশ্রেণীর নেতার ভূমিকা, অনিবার্যভাবে চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির ওপর বর্তাবেই।" গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের দিকে চীনের কমিউনিস্টদের চোখ ফেরাতে হবে। তিনি বললেন যত তাড়াতাড়ি ও যত বেশি কৃষককে বিপ্লবে টেনে আনা যাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চা তত মজবুত হবে। তিনি এ কথাও বললেন যে, "চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছে।" তাই বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর প্রশ্নটাকে ছোটো করে দেখা উচিত নয়। সৈন্য-বাহিনীর ভেতরে কাজের ব্যাপারে চীনের কমিউনিস্টদের তিনি বিশেষ

নজর দিতে বললেন। বললেন, এক নম্বর কর্তব্য হচ্ছে চীনের কমিউনিস্টদের সৈন্যবাহিনীর ভেতর রাজনৈতিক কাজ সব রকম উপায়ে বাড়িয়ে তোলা। দুই, তাদের যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্যে যত্ন নিতে হবে। এ প্রশ্নকে খাটো করে দেখলে চলবে না। চীনের কমিউনিস্টদের যুদ্ধবিদ্যা রপ্ত করে ক্রমে বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর আসল আসল পদগুলো কব্জা করতে হবে। পরেও বার বার স্তালিন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক চীনের কমিউনিস্টদের অনেক জরুরী পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু চেন তু-সিউ ও তার সমর্থকরা সে সব পরামর্শকে পাত্তাই দেয়নি। চেন কৃষিবিপ্লবের বিরোধিতা করার জন্যে একটা ছুতো হিসেবে "সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে হবে" এই গরম আওয়াজ তুললো। কিন্তু ১৯২৭-এর ২৪-এ মে স্তালিন জানালেন, "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মতে সামন্তপ্রথার অবশিষ্ট অংশগুলোই এই মুহূর্তে চীন দেশে উৎপীড়নের ব্যাপারে একটা প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে—যে শক্তি কৃষিবিপ্লবকে উস্কে দিচ্ছে।" মাও ৎসে-তুং এড্‌গার স্নোকে বলেছেন, "সে (চেন তু-সিউ) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশগুলো পার্টির অন্যান্য নেতাদের দেখাতো না, এমন কি আমাদের সঙ্গে সেগুলো নিয়ে আলোচনাও করত না।"

চীন বিপ্লবের এই সঙ্কটের যুগে একমাত্র মাও ৎসে-তুংই সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। চীনে তিনিই প্রথম আবোল তাবোল হাতড়ে না বেড়িয়ে মার্কসবাদী কায়দায় দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক খুঁটিয়ে বিচার করলেন। ১৯২৬-এর মার্চে লেখা তাঁর "চীন সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ" রচনাটি অমর হয়ে রয়েছে। এখানে তিনি প্রথমেই বললেন বিপ্লবের সবচাইতে দরকারি প্রশ্নই হল কে বিপ্লবের মিত্র আর কে বিপ্লবের শত্রু তা ঠিক করা। আসল শত্রুদের আক্রমণ করার জন্যে আসল বন্ধুদের সঙ্গে ঐক্য গড়তে হবে। এটা করতে পারা যায়নি বলেই আগের কোনও বিপ্লবী সংগ্রাম বড় একটা সফল হয়নি। তারপর মাও ৎসে-তুং প্রমাণ করলেন যে, বিপ্লবের শত্রু হচ্ছে তারা সবাই "যারা সাম্রাজ্যবাদের সাঙ্গাৎ—যুদ্ধবাজ সর্দার, আমলা, মুৎসুদ্দি শ্রেণী, বড়ো জমিদার শ্রেণী, আর তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ।"

বিপ্লবের নেতা এবং মিত্রদের সম্বন্ধে মাও ৎসে-তুং বললেন, "আমাদের বিপ্লবে নেতা হচ্ছে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী। আমাদের ঘনিষ্ঠতম মিত্র হচ্ছে গোটা আধা-সর্বহারা আর ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী।" আধা-সর্বহারা বলতে তিনি

বোঝাচ্ছেন এই পাঁচ ধরনের মানুষকে : আধা-মালিক কৃষকের বেশির ভাগ, গরীব কৃষক, হাতের কাজের ছোটো কারিগর, দোকানের কর্মচারী আর ফেরিওয়ালা। ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী বলতে মাও ৎসে-তুং বোঝাচ্ছেন মালিক-কৃষক, অর্থাৎ মধ্যকৃষক, হাতের কাজের দক্ষ কারিগর, বুদ্ধিজীবীদের নীচের স্তর—ছাত্র, প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, ছোটো সরকারী কর্মচারী, আপিসের কেরানী, ছোটো উকিল আর ছোটো ব্যবসাদার। আধা-সর্বহারা হিসাবে যে গরীব কৃষকদের কথা বলা হল তাদের কোনও জমি নেই। তাদের একটা অংশের অবশ্য কিছু চাষের উপকরণ আর টাকাকড়ি থাকে। কিন্তু অন্য অংশের চাষের যন্ত্রপাতি, টাকাপয়সা, সার ইত্যাদি কিছুই নেই। ঋণের বোঝা তাদের বেড়েই চলে। মাও ৎসে-তুং বলেছেন কৃষকদের মধ্যে এই গরীব কৃষকদের অবস্থা সবচাইতে খারাপ আর বিপ্লবী প্রচারে তারা খুব ভাল সাড়া দেয়। তিনি আরও বলেছেন যে, দোমনা মধ্যশ্রেণীর অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী অংশ বিপ্লবের শত্রু হয়ে যেতে পারে আর বামপন্থী অংশ বিপ্লবের মিত্র হতে পারে, তবে তাদের সম্বন্ধে বিপ্লবীদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করতে পারে।

এইভাবে মাও ৎসে-তুং পার্টির মধ্যে চালু দুটো ভুল লাইনের বিরোধিতা করলেন। এক দিকে চ্যাং কুয়ো-তাও একপেশে ভাবে শুধু শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে ছিল। বিপ্লবেব শক্তি হিসেবে কৃষক তার চোখে পড়েনি। এটা ছিল তার এবং তার সমর্থকদের "বামপন্থী" ভুল। অন্য দিকে চেন তু-সিউ করল দক্ষিণপন্থী ভুল। তার চোখে চীনের বুর্জোয়া আর কুয়োমিন-তাংই একমাত্র ভরসা, শ্রমিক শ্রেণী নেতা হওয়ার যোগ্য নয় আর কৃষকরা তার দৃষ্টি এড়িয়েই গেল। "আমরা কিসের জন্যে এখন লড়াই করছি" নামের একটি লেখায় চেন তু-সিউ বলেই বসল, "চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী যদি গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা না নেয় তাহলে চীনের জাতীয় বিপ্লব দারুণ অসুবিধায়, এমন কি বিপদের মধ্যে পড়বে।" সে বলতো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণী একটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। শ্রমিকদের ভাগ্যে জুটবে "খানিকটা স্বাধীনতা ও অধিকার।" এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের লড়াই চালানো উচিত নয়। শ্রমিক শ্রেণীকে অপেক্ষা করতে হবে। পরে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ

করার জন্যে যে বিপ্লব হবে তাতে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে। তখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এখন এতো অস্থির হলে চলে? এই ছিল চেন তু-সিউ ও তার সমর্থকদের "দুই বিপ্লব"-এর সম্পূর্ণ ভুল তত্ত্ব।

এদিকে উত্তরমুখী অভিযানের সময় থেকে কৃষক আন্দোলন বেড়েই চলল। কৃষক সংগ্রামকে জোরদার করে তোলার প্রয়োজন আরও বেশি করে দেখা দিল! তাই বত্রিশ দিন হুনানে অনুসন্ধান চালানোর পর ১৯২৭-এর মার্চে মাও ৎসে-তুং তাঁর বিখ্যাত "হুনান কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট" পেশ করলেন। এই রিপোর্টে তিনি চীন বিপ্লবে কৃষকের গুরুত্ব সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। মাও ৎসে-তুং দেখালেন যে, কৃষকরা সেই সামন্ততন্ত্রকে খতম করছে, যে সামন্ত ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদ চীনের ওপর খবরদারি চালাচ্ছে। তিনি দেখালেন গ্রামাঞ্চলে কৃষকের রাজনৈতিক শক্তি ও সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন কত জরুরী। জনগণের ওপর ভরসা রেখে তাদের সক্রিয় করে তুলতে হবে। তিনি দেখিয়ে দিলেন চীনের জনগণের সব চাইতে বড়ো অংশ যে গরীব কৃষক তারাই হচ্ছে কৃষকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি। মাও ৎসে-তুং ঐ রিপোর্টে লিখলেন "গ্রামাঞ্চলে যে প্রধান শক্তি বরাবর তীব্রতম সংগ্রাম করে আসছে তা হল গরীব কৃষকরা। গোপন সংগঠন ও খোলাখুলি সংগঠনের দুই যুগ জুড়েই গরীব কৃষকরা আগাগোড়া জঙ্গী মনোভাব নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে নেয়। গ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ এই বিপুল গরীব কৃষক-জনতা হচ্ছে কৃষক সমিতির মেরুদণ্ড, সামন্ত শক্তিকে উৎখাত করবার অগ্রগামী ফৌজ এবং সেই সবার সেরা বীরের দল যারা বহু বছরের অসমাপ্ত মহৎ বিপ্লবী কর্তব্য সম্পূর্ণ করেছে। এই গরীব কৃষকদের ছাড়া (যাদের বাবুরা বলে "ওঁছা লোক") গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বর্তমান অবস্থা সৃষ্টি করা, স্থানীয় গুণ্ডা ও বদবাবুদের উৎখাত করা অথবা গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা কখনও সম্ভব হত না। সবচাইতে বেশি বিপ্লবী বলে গরীব কৃষকরা কৃষক সমিতির নেতৃত্ব দখল করতে পেরেছে।...গরীব কৃষকদের এই নেতৃত্ব একান্তই প্রয়োজন। গরীব কৃষকদের বাদ দিয়ে কোনও বিপ্লব হবে না। তাদের ভূমিকা অস্বীকার করার মানে হচ্ছে বিপ্লবকে অস্বীকার করা। তাদের আক্রমণ করার মানে বিপ্লবকে আক্রমণ করা। বিপ্লবের সাধারণ গতিপথ সম্পর্কে তারা কোনও দিন ভুল করেনি।"

মাও ৎসে-তুং হুনানের কৃষক আন্দোলনের দুটো স্তরের কথা বলেছেন। প্রথম স্তরে হল সংগঠন গড়ার কাজ—শুরুতে গোপনে, তারপর প্রকাশ্যে। তখন কৃষক সমিতির সদস্যসংখ্যা এবং জনসমর্থন খুব বেশি থাকে না। দ্বিতীয় স্তব হল বিপ্লবী অ্যাকশনেব স্তর—কৃষক সমিতির সদস্যসংখ্যা আর জনসমর্থন এক লাফে অনেক গুণ বেড়ে যায়।

হুনানেব সশস্ত্র কৃষকবা জমিদাব শ্রেণীব বাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক গৌবব সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দিল। তাবা প্রতিষ্ঠা করল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সমিতির কর্তৃত্ব। কিছু অতি বদমাযেস উৎপীড়ক আর বদবাবুকে তারা হত্যা করল। অন্যদেব অপবাধ অনুযায়ী জরিমানা, গাধার টুপি পবিয়ে গ্রাম ঘোবানো, জেল অথবা নির্বাসন ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হল। গ্রামের উৎপীড়ক ও বদবাবুবা সবচাইতে ভয় পেত গাধাব টুপি পবে গ্রাম ঘোবাব আদেশ পেলে। অনেক শয়তানকেই এ শাস্তি দেওয়া হত। টুপিব মাথায় লেখা থাকত "অমুক উৎপীড়ক" অথবা "তমুক বদবাবু"। দড়িবাঁধা অবস্থায় তাকে রাস্তা দিয়ে নিযে যাওয়া হত। সামনে পেছনে বিবাট জনতা। কখনও কখনও কৃষকবা কাঁসব ঘণ্টা বাজাতো আর পতাকা ওড়াতো যাতে লোকের চোখ সেদিকে পড়ে। তাই এই শাস্তির ভয়ে বদবাবুবা কাঁপতো। একবাব যে এই শাস্তি পেত সে আর কোনও দিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পাবতো না। অনেক ধনী এই শাস্তি এড়া নার জন্যে জরিমানা দিতে চাইতো। কিন্তু কৃষকবা এই শাস্তি দিতে চাইলে এড়াবার কোন উপায় ছিল না। একবাব তো এক বদবাবু এই শাস্তিব কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তখনকার মতো কৃষকবা তাকে বাড়ি ফিরে যেতে দিল যাতে সে অনুতাপ কবাব সুযোগ পায়। কিন্তু তাবা বলল যে, ভবিষ্যতে কোনও এক দিনের জন্যে এই শাস্তি মুলতুবী রাখা হল। কবে যে আবার ডাক আসে এই ভয়ে লোকটা ঘব থেকে বেরোত না, ঘুমোতো না আর সব সময় ছটফট করত। কোনও আওয়াজ শুনলেই চমকে উঠতো।

এব চেয়ে বড়ো কথা কৃষকবা জমিদারদেব সশস্ত্র বাহিনী উচ্ছেদ কবে কৃষকেব সশস্ত্র ফৌজ গড়ে তুললো। এক কথায় সামন্তশক্তি ধ্বংস হল। মাও ৎসে-তুং তাই বলেছেন, সুন ইয়াৎ-সেন চল্লিশ বছর চেষ্টা করেও যে কাজ কবতে পারেননি তা কয়েক মাসেব মধ্যেই কৃষকরা করে ফেলল। কৃষকরা এলাকার বাইরে শস্য পাঠাতে দিল না আব তাব দাম বাড়ানো বন্ধ রাখল। খাজনা

বাড়াতে তো দিলই না, বরং কমানোর পক্ষে প্রচার চালালো। সুদও কমলো। জমির লীজ বাতিল করা বন্ধ হল। তাছাড়া রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, গোষ্ঠীর আধিপত্য ধর্মীয় জুলুম এবং নারীসমাজের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব বরবাদ হল।

মাও ৎসে-তুং এই আশা প্রকাশ করলেন, "কৃষক আন্দোলনের বর্তমান জোয়ার একটা বিরাট ঘটনা। খুব অল্পদিনের মধ্যেই চীনের মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের প্রদেশগুলোতে কোটি কাটি কৃষক বিদ্রোহে ফেটে পড়বে একটা প্রবল ঝড়ের মতো, একটা ঘূর্ণিবায়ুর মতো—সে শক্তির এত বেগ এবং তা এত প্রচণ্ড যে অন্য কোনও শক্তি, তা সে যত বিরাটই হোক, তাকে আটকে রাখতে পারবে না। তাদের বেঁধে রাখে যে বেড়াজাল এই কৃষকরা সেগুলোকে ছিন্নভিন্ন করবে এবং মুক্তির পথে ছুটে এগিয়ে যাবে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের, যুদ্ধবাজ সর্দারদের, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের, স্থানীয় উৎপীড়কদের এবং বদবাবুদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে কবরে ঢুকিয়ে দেবে।" এ অবস্থায় কে বিপ্লবী তার একটা মস্ত পরীক্ষা হয়ে যাবে। পরীক্ষক হল এই জেগে ওঠা কৃষক সমাজ। মাও ৎসে-তুং বললেন, "প্রত্যেক বিপ্লবী পার্টি এবং প্রত্যেক বিপ্লবী কমরেডের পরীক্ষা হবে—গ্রহণ করা হবে না বাতিল করা হবে তা তারাই সিদ্ধান্ত করবে। তিনটি পথ আছে। কৃষক জনতার সামনে থেকে তাদের নেতৃত্ব দেবে? ভেংচি কেটে আর সমালোচনা করতে করতে তাদের পেছনে পেছনে লেজুড় হিসেবে চলবে? অথবা তাদের পথের বাধা হয়ে তাদের বিরোধিতা করবে? চীনের প্রতিটি লোকের বেছে নেবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ঘটনাস্রোত আপনাকে তাড়াতাড়ি বেছে নিতে বাধ্য করবে।"

চেন তু-সিউ আর তার দলবলের পথ ঠিক করতে দেরি হল না। তারা মাও ৎসে-তুং-এর কোনও কথাই কানে তুললো না। আসল কথা হচ্ছে কুয়োমিনতাং-এর ভেতরকার বিপ্লব-বিরোধী ঝোঁক দেখে তারা ভয়ে চুপসে গেল। কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে সাহসই পেল না। কুয়োমিনতাং-এর মন যোগানোর জন্যে বিপ্লবের প্রধান মিত্র বিপুল কৃষক-জনতাকে ছেড়ে পালাতে তারা দ্বিধা করল না। তার ফলে শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তাকে সাহায্য করার কেউ রইল না। এই জন্যেই চিয়াং কাই-শেক বিশ্বাসঘাতকতা করে কমিউনিজম এবং জনগণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে সাহস পেল। চিয়াং-এর বিশ্বাসঘাতকতার

পর এপ্রিলেই পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস বসল। সেখানে এই আত্মসমালোচনা হল যে, বিপ্লবকে সমাজের আরও গভীরে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কৃষিক্ষেত্রের সংগ্রামকে আরও বিপ্লবী করে তোলা উচিত ছিল। দক্ষিণপন্থীরা চালাক। তারা হ্যাঁ হ্যাঁ করে এই সমালোচনা মেনে নিল কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের কোনও পরিবর্তন হল না। এই কংগ্রেসে মাও ৎসে-তুং উপস্থিত ছিলেন। তিনি সদ্য হুনানে সফল আন্দোলন করে এসেছেন। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বললেন যে, জমিদার-বিরোধী আন্দোলনে পার্টিকে এগিয়ে গিয়ে জঙ্গী কৃষকদের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে লড়তে হবে এবং এই লড়াইতে জনতাকে সশস্ত্র করে তুলতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসে মাও ৎসে-তুংকে চেন তু-সিউ ও তার লোকেরা ভোট দেবার অনুমতি পর্যন্ত দিল না। চেন তু-সিউ কখনও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া এবং জমিদারদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাইত না। সে কোনও কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচী কখনও প্রচার করেনি। তার বদলে সে উপস্থিত করেছিল কিছু সংস্কার বা জোড়াতালির কর্মসূচী, যেমন— "খাজনার একটা সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দাও", "মহাজনদের সুদখোরী জবরদস্তি কমাও।" তাই শ্রমিক-কৃষকের গণ-আন্দোলন বাড়তে দেখে সে আঁৎকে উঠল। যখন কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে জমিদারেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাতে লাগল চেন তু-সিউ তখন কৃষকদের "বাড়াবাড়ি"র নিন্দা করতে লাগল। মাও ৎসে-তুং তাঁর হুনান রিপোর্টে চেন তু-সিউর জবাবে লিখলেন, "একটা অন্যায়ের প্রতীকার করতে হলে বাঁধাধরা সীমা পার হয়ে যেতেই হয়, এবং বাঁধাধরা সীমা পার না হয়ে অন্যায়টির প্রতীকার করা যায়ই না।" উহানের বিপ্লবী সরকারের কৃষিমন্ত্রী তান পিং-শান ছিল আরেকজন দক্ষিণপন্থী "কমিউনিস্ট"। সে প্রাণপণ চেষ্টায় কৃষক আন্দোলনের জোয়ারকে থামাতে চাইল। বিপ্লবী শিক্ষায় ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে এমন যথেষ্ট সংখ্যায় অফিসার নিয়োগ করা এবং যথেষ্ট কমিউনিস্ট নিয়ে সৈন্যদলের মধ্যে ইউনিট গঠন করা পার্টির উচিত ছিল—শান্তিবাদী পার্টির নেতা চেন তু-সিউ সে রাস্তায় গেল না কারণ যুক্তফ্রন্টকে বাঁচাতে হবে। বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্যে সে শ্রমিক-কৃষককে ফৌজী ঢঙে সংগঠিত করল না। বরং যুক্তফ্রন্টের বদ লোকদের দাবি মেটাতে গিয়ে চেন কৃষক আন্দোলনকে "নিষিদ্ধ" বলে ঘোষণা করল।

চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার পর চেন তু-সিউ উহানের সশস্ত্র

বাহিনীকে হুকুম দিল তাদের হাজার হাজার রাইফেল কুয়োমিনতাং-এর হাতে তুলে দিতে। লিউ শাও-চিও ঐ একই কথা ফেরি করতে লাগল। কুয়োমিনতাং-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এক সভার আয়োজন করল আর বিশ্বাস-ঘাতক লিউ সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দিল। তার বক্তৃতার বিষয় হল, "ট্রেড ইউনিয়নগুলোর হুপে প্রাদেশিক সাধারণ পরিষদ দ্বারা স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার তাৎপর্য ও পদ্ধতি" (হ্যাংকাও মিংকুয়ো ডেইলী, জুলাই ৫, ১৯২৭)। শত্রুর আক্রমণের মুখে শ্রমিককে এইভাবে নিরস্ত্র হবার পরামর্শ দিল এই ছদ্মবেশী দালাল। চেন তু-সিউ আর লিউ শাও-চির দল গণসংগ্রামকে সম্পূর্ণ কুয়োমিনতাং-এর হাতের মুঠোয় পুরে দিল। বিপ্লবের শক্তি কমল, পাল্টা শক্তি বাড়বার সুযোগ পেল।

এইসব দুর্বলতার জন্যে উহানের বিপ্লবী ফৌজের মধ্যে যেসব সুবিধাবাদী ও বিপ্লব-বিরোধীরা ছিল তাদের চিয়াং কাই-শেকের রাস্তা ধরতে সুবিধে হল। ১৯২৭-এর মে মাস থেকে তারা কৃষক সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করল এবং তাদের নেতাদের আর জঙ্গী কর্মীদের খুন করতে লাগল। এজন্যে তারা বিশেষ করে বেছে নিল মাও ৎসে-তুং-এর হুনান প্রদেশকে। জুন এবং জুলাই মাসে বিপ্লবী ফৌজের কিছু লোক সোজাসুজি চিয়াং কাই-শেকের দলে গিয়ে ভিড়ল—এর মধ্যে ছিল ইয়াংসি নদীর উত্তরের অঞ্চলের সেই যুদ্ধবাজ সর্দার যার নাম ফেং ইউ-সিয়াং। ১৫ই জুলাই বিদেশীদের ছত্রিশটি যুদ্ধজাহাজকে ইয়াংসি দিয়ে এগোতে দেওয়া হল এবং তারা বিনা বাধায় উহানে এসে নোঙ্গর করল। ঠিক সেই সময় সাম্রাজ্যবাদী বৃদ্ধ শকুনের বিরাট ডানার ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে উহানের ক্ষুদে শকুনেরা আক্রমণ শুরু করল। কুয়োমিনতাং-এর "বামপন্থী"দের নেতা ওয়াং চিং-ওয়েই শ্রমিক, কৃষক, ও ছাত্রদের, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের, এক ধার থেকে খুন করে চলল। শাংহাইতে চিয়াং কাই-শেক যে ঢালাও হত্যার ব্যাপার করেছে ওয়াং-এর দলের হত্যাকাণ্ড তার চেয়েও বীভৎস। গণ-আন্দোলনের সামান্য চিহ্নও তারা বাকি রাখবে না, "ছোটোলোকদের" উচিতমত শিক্ষা দেবে তাই এই বিপ্লব-বিরোধীরা কয়েকশ' রিক্সাওয়ালাকেও গুলি করে মারল। তাদের অপরাধ এই যে, তারা বিপ্লবের আবহাওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে চরম স্পর্দ্ধা দেখিয়েছে।

উহান সরকারের আর অস্তিত্ব রইল না। চিয়াং কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী

নানকিং সরকার এখন থেকে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হল। চিয়াং-এর কুয়োমিনতাং সুন ইয়াৎ-সেনের সমস্ত আদর্শকে পায়ে মাড়াল। কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে যে দু'চারজন এখন সুনের আদর্শ আঁকড়ে থাকলেন তাঁদের আর দেশে থাকতে হল না। তাঁরা বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুন ইয়াৎ-সেনের বিধবা স্ত্রী সুং চিং লিং। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ এখানে এসে শেষ হল।

এডগার স্নো মাও ৎসে-তুংকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ১৯২৭-এ কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতার জন্যে, উহানে সংযুক্ত সরকারের পরাজয়ের জন্যে এবং নানকিং একনায়কত্বের সম্পূর্ণ জয়লাভের জন্যে তিনি কাকে সবচেয়ে বেশি দায়ী মনে করেন। মাও ৎসে-তুং উত্তরে বলেছিলেন চেন তু সিউ-র দোমনা সুবিধাবাদী নেতৃত্বই এর জন্যে প্রধানত দায়ী। তিনি বললেন চেন শ্রমিক ও বিশেষ করে সশস্ত্র কৃষকদের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। অথচ চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে তখন তার ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। কেন্দ্রীয় কমিটিকেও সে তোয়াক্কা করে না। চেনের পরেই যে লোকটি সেই পরাজয়ের জন্যে দায়ী সে হল প্রধান রুশ রাজনৈতিক উপদেষ্টা বরদিন। এডগার স্নোকে মাও ব্যাখ্যা করে বললেন যে বরদিন তার নীতি সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছে—১৯২৬-এ সে বৈপ্লবিক ভূমি পুনর্বণ্টন সমর্থন করেছিল কিন্তু ১৯২৭-এ প্রবল-ভাবে তার বিরোধিতা করছে। তার মত পরিবর্তনের সপক্ষে কোনও যুক্তি নেই। মাও ৎসে-তুং বললেন, "বরদিন ছিল চেন তু সিউ-র সামান্য একটু ডাইনে এবং সে বুর্জোয়া শ্রেণীকে খুশি করবার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল, এমন কি শ্রমিকদের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে নেওয়া পযন্ত—যে নির্দেশ সে শেষ পর্যন্ত দিয়েছিল।" মাও বললেন যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভারতীয় প্রতিনিধি এম. এন. রায় চেন ও বরদিন এ দুজনেরই "সামান্য একটু বাঁয়ে ছিল কিন্তু শুধু নামেই ছিল।" মাও-এর মতে "কথাকে কাজে পরিণত করার কোনও উপায় না বাৎলে দিয়ে সে বড়ো বেশি কথা বলতো।" শেষ পর্যন্ত রায়ের জন্যে কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে কমিউনিস্টদের ছাড়াছাড়ি হল।–বরদিনের কাছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নির্দেশ পাঠাল—পার্টিকে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা শুরু করতে হবে। রায় সেই নির্দেশের একটা নকল যোগাড় করল এবং বামপন্থী উহান সরকারের সভাপতি ওয়াং

চিং-ওয়েইকে তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিল। ফলে উহান সরকার কমিউনিস্টদের কুয়োমিনতাং থেকে বার করে দিল। সে সরকারের শক্তি গেল ধূলিসাৎ হয়ে এবং অল্প দিনের মধ্যেই চিয়াং কাই-শেক উহানকে ধ্বংস করে ফেলল। মাও ৎসে-তুং মনে করতেন যে, নিরপেক্ষ বিচারে রায় ছিল আহাম্মক, বরদিন কেবল ভুল করত, আর চেন ছিল নিজের অজানৃতে দেশদ্রোহী। আজকে হলে অবশ্যই এই তালিকায় লিউ শাও-চির নাম পাওয়া যেত। তবে সে আহাম্মক নয় অথবা সাধারণ ভুল করবার লোকও নয় বা না জেনে দেশদ্রোহিতা করবে এমনও নয়, সে এক পুরোনো ঝানু আসামী।

যা হোক, প্রথম বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যর্থ হলেও চীনের জনগণ কতকগুলো মূল্যবান্ শিক্ষা পেল।

এক, ভাল করে প্রমাণ হয়ে গেল যে, চীনের বড়ো বুর্জোয়ারা বিশ্বাসঘাতক এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা দুর্বল ও দোমনা। তাই চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হলে যুক্তফ্রণ্টে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম করতেই হবে। নইলে বিপ্লব কিছুতেই সফল হবে না।

দুই, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল সমস্যাই হল কৃষক সমস্যা। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকদের বিপ্লবী লড়াইতে সামিল করার ওপরই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

তিন, চীনে সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব। তাই বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া বিপ্লবে জয় অসম্ভব। ১৯৩৮এ লেখা তাঁর "যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা"-তে মাও ৎসে-তুং বলেছেন যে চীনের পার্টি তার প্রতিষ্ঠার পাঁচ কি ছ' বছর অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯২৬-এর উত্তরমুখী অভিযান পর্যন্ত "চীনে সশস্ত্র সংগ্রামের চরম গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, কিংবা গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়নি এবং সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেনি অথবা রণনীতি আর রণকৌশলও মনোযোগ দিয়ে চর্চা করেনি। উত্তরমুখী অভিযানের সময় পার্টি সৈন্যবাহিনীকে তার পক্ষে টানবার ব্যাপারে অবহেলা দেখায়, কিন্তু গণ-আন্দোলনের ওপর একতরফা জোর দেয়—ফলে কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা গণ-আন্দোলন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।"

চার, ১৯২৭-এর পর চীনের কমিউনিস্টরা মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে শহর দখলের পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে প্রথমে গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়বার দিকে নজর

দিল। সেখানে শহরের তুলনায় শত্রু দুর্বল। বিপ্লবী কাজের ভারকেন্দ্র শহর থেকে গ্রামে সরে গেল।

পাঁচ, প্রমাণ হল, এই মুহূর্তে শত্রুকে শহরে ঘায়েল করা যাবে না। ১৯২৭-এ বিপ্লবী যুদ্ধের ব্যর্থতার পর চিয়াং প্রথম আক্রমণ করল শহরের শ্রমিকদের। কমিউনিস্টদের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ওপর সে সবচাইতে বেশী বর্বর আক্রমণ চালাল। বাধ্য হয়ে সেগুলো আত্মগোপন করে কাজ চালাতে লাগল। সারা চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রকাশ্য কাজ বন্ধ করে দিল। গোটা দেশে মুক্তি ফৌজের বিজয়ের ঠিক আগে ১৯৪৮-এর আগস্ট মাসে মুক্ত শহর হারবিনে ষষ্ঠ সারা চীন শ্রমিক কংগ্রেসে ঐ ফেডারেশন আনুষ্ঠানিক ভাবে আবার প্রতিষ্ঠা করা হল। শহরে গা ঢাকা দিয়ে গোপন কাজ কিন্তু চলছিল। চিয়াং-এর অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যে ১৯২৮এ শাংহাইয়ে ১৪০ টা ধর্মঘট হয়। শতকরা ৩৭টি ধর্মঘট হয়েছিল কমিউনিস্টদের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে। ১৯২৯-এর নভেম্বরে শাংহাইতে গোপনে সারা চীন শ্রমিক কংগ্রেস বসল। এক শ' প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত হল। এই কংগ্রেস চিয়াং-এর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হতে শ্রমিক-শ্রেণীকে আহ্বান জানাল। পঞ্চম আর ষষ্ঠ শ্রমিক কংগ্রেসের মাঝখানে উনিশ বছর ধরে কুয়োমিনতাং অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণী গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে, অনাহার, অত্যাচার, বিদেশী আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেল। তারা মুক্তিযুদ্ধে মুক্তি ফৌজের কাজে নানাভাবে সাহায্য করল। জাপান আক্রমণ শুরু করলে সারা চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতারা মুক্ত অঞ্চল এবং জাপান ও কুয়োমিনতাং যে অঞ্চল দখল করে নিয়েছে সেখানে গিয়ে লড়াই চালাল। ১৯২৭এ বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে প্রধান লড়াই চলল গ্রামে। তাই শহরের সবচাইতে সচেতন শ্রমিক গ্রামে গিয়ে কৃষকের লড়াইতে নেতৃত্ব দিল। কারণ কৃষি বিপ্লব সফল করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রসর অংশকে গ্রামাঞ্চলে যেতেই হবে। সেখানে কৃষকের সঙ্গে স্থায়ী বিপ্লবী মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে এবং রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘাঁটি তৈরি করতে হবে।

॥ ভুলের মাশুল ও সঠিক পথ ॥

দুঃস্বপ্ন সত্য হল। ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘোরাবার জন্যে চিয়াং কাই-শেক তার অত্যাচারের রথের চাকা দেশের মানুষের বুকের ওপর চালিয়ে দিল। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের স্বার্থে চরম অত্যাচার চালাল। কুয়োমিনতাং দলের কিছু বড়ো অফিসার বা আমলারা ছিল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া, চিয়াংও তাদের একজন। এই মুৎসুদ্দিরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ সরকারী ক্ষমতার বলে ক্রমে ক্রমে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বা তাদের পরিবারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। শোষকশ্রেণীর স্বার্থে চিয়াং-এর দল ১৯২৭ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কমিউনিস্ট, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত মোট হিসেব ধরলে শহীদদের সংখ্যা দাঁড়াবে দশ লক্ষ। চিয়াং-এর সৈন্যেরা যুদ্ধে যাদের হত্যা করেছিল তাদের কিন্তু এই হিসেবের মধ্যে ধরা হচ্ছে না। সুতরাং হত্যার মহোৎসব! এই বলিদানের প্রধান পাণ্ডাদের মধ্যে একজন ছিল সেই কুয়োমিনতাং-এর "বামপন্থী"দের নেতা বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই। এই পাণ্ডা খোলাখুলি ঘোষণা করেছিল—কে কমিউনিস্ট তা ধরা যাচ্ছে না; কিন্তু পাছে একজন কমিউনিস্টও রেহাই পায় সেই জন্যে একহাজার নির্দোষ লোককে মেরে ফেলাও ভালো। চীনের নানা অঞ্চলে যে বিদেশী "কনসেশন" ছিল সেখানকার কর্তৃপক্ষ সেসব এলাকার বিপ্লবীদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করে চীনে ঘাতকদের হাতে তুলে দিল।

যেসব পেতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পার্টিতে যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভয় পেয়ে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করল যে, তারা আর পার্টির কেউ নয়। বিপ্লবের সময় মেহনতী মানুষেরা যেসব রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধে পেয়েছিল চিয়াং সরকার সেগুলো কেড়ে নিল। জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতিগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের নেতাদের ওপর চরম অত্যাচার চালানো হল। অসহ্য দুর্গতির মধ্যে অত্যন্ত কম মজুরীতে আধপেটা খেয়ে শ্রমিকরা দিন কাটাতে লাগল। দলে দলে চাষীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে রুজি-রোজগারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল কারণ জমিদারের খাজনার বোঝা, সরকারের ট্যাক্স, ঘন ঘন

যুদ্ধ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের পক্ষে চাষবাস অসম্ভব করে তুলল। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এতে দমল না, জনসাধারণও হতাশায় ভেঙে পড়ল না। বিপ্লবের ওপর বিশ্বাস স্থির রেখে কমিউনিস্টরা জনতার মধ্যে কাজ করে চলল। মাও ৎসে-তুং পরে লিখেছিলেন যে, কমিউনিস্টরা "ভয় পেল না, হার মানল না, ধ্বংসও হল না। তারা আবার উঠে দাঁড়াল, রক্তের দাগ মুছে ফেলল, মৃত কমরেডদের কবর দিল এবং লড়াই চালাতে লাগল।"

"চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে" লেখাটিতে ১৯২৮-এর অক্টোবরে মাও ৎসে-তুং চিয়াং কাই-শেকের রাজত্বের আসল চেহারা তুলে ধরেছেন: কুয়োমিনতাং-এর নতুন যুদ্ধবাজ সর্দারদের বর্তমান শাসনটা আগের মতোই শহরে কম্প্রাডর বা মুৎসুদ্দি শ্রেণীর শাসন আর গ্রামাঞ্চলে জমিদার শ্রেণীর শাসন। এই শাসন বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে আর দেশের ভেতরকার ব্যাপারে পুরোনো যুদ্ধবাজ সর্দারদের জায়গায় নতুন যুদ্ধবাজ সর্দারদের বসিয়েছে। ফলে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষক সমাজ আগের চাইতেও নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়নের শিকার হয়েছে। কোয়াংতুং প্রদেশে শুরু হয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সবে অর্ধেক পথ এগিয়েছে, অমনি মুৎসুদ্দি ও জমিদার শ্রেণী জোর করে নেতৃ দখল করে নিল এবং তৎক্ষণাৎ আন্দোলনের গতি বদলে দিল—প্রতিবিপ্লবের পথে চালিয়ে দিল। সারা দেশময় শ্রমিক, কৃষক এবং জনসাধারণের অন্যান্য অংশ এমন কি বুর্জোয়া শ্রেণীও অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ারাও আগের মতোই এই প্রতিবিপ্লবী শাসনের অধীনে থেকে গেছে এবং রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক মুক্তির সামান্যতম কণাও তারা পায়নি।

মাও ৎসে-তুং এইভাবে চিয়াং-এর ফ্যাসিস্ত শাসনের বর্ণনা দিয়েছেন। সে চাইল বিপ্লবকে ঠেকাতে। কিন্তু যে দ্বন্দ্বগুলো বর্তমান চীনে বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল সেগুলোর কোনও সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বরং সেগুলো বেড়েই চলল। চীন দেশে অল্প দিনের মধ্যেই বিপ্লবের প্রবল জোয়ার দেখা দেবে কি? এই প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৩০-এর জানুয়ারীতে মাও ৎসে-তুং "একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে" লেখাটিতে বললেন: পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে

দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশ আর তাদের উপনিবেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্য-বাদীদের আর তাদের নিজেদের দেশের সর্বহারাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেড়ে চলেছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে চীনের ওপর আধিপত্য করবার জন্যে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আগের চাইতে তীব্র হয়েছে। এক দিকে চীনকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে, আরেক দিকে গোটা চীন দেশ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আর সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দুই-ই একসঙ্গে চীনের বুকের ওপর বেড়ে উঠছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে জটিল যুদ্ধবিগ্রহ। সে যুদ্ধ রোজই ছড়াচ্ছে আর আগের চাইতে তীব্র হচ্ছে এবং চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের নানা দলীয় চক্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের নানা দলীয় চক্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধবাজ সর্দারদের মধ্যে জটিল যুদ্ধবিগ্রহের দরুন ট্যাক্সের বোঝা বাড়ছে। তাতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের আর ট্যাক্সদাতা বিপুল জনসাধারণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের জাতীয় শিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে চীনে শিল্পপতিরা সাম্রাজ্যবাদী-দের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধে চেয়ে পায় না। তাতে চীনের পুঁজিপতিরা ক্ষ্যাপার মতো শ্রমিকদের শোষণ করে নিজেদের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে আর শ্রমিকরা প্রতিরোধ চালায়। সুতরাং চীনে বুর্জোয়া শ্রেণী ও চীনে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। ব্যবসার মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ, চীনে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের জবরদস্তি টাকা রোজগার, আগের চাইতে বেশী সরকারী ট্যাক্সের বোঝা ইত্যাদির ফলে জমিদার শ্রেণী ও কৃষক জনতার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব গভীরতর হয়। অর্থাৎ খাজনা ও মহাজনী সুদখোরি ভীষণ বেড়ে যায় এবং জমিদারদের প্রতি কৃষকদের ঘৃণা বাড়ে। বিদেশ থেকে আসা জিনিসপত্রের চাপের ফলে, শ্রমিক ও কৃষক জনতার কেনবার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে এবং সরকারী ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্যে চীনে তৈরি অর্থাৎ স্বদেশী জিনিসপত্রের কারবারী আর স্বাধীন উৎপাদকরা বেশি বেশি সংখ্যায় দেউলিয়া হতে চলেছে। রসদ নেই, টাকা নেই, তবু প্রতিক্রিয়াশীল সরকার তার সৈন্যবাহিনী অনবরত বাড়িয়েই চলেছে এবং যুদ্ধও নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে সাধারণ সৈনিকরা প্রতিমুহূর্তে অভাবের তাড়নায় কষ্ট পায়। সরকারী ট্যাক্স বৃদ্ধি, জমিদারী খাজনা ও সুদ বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের

ফলে প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশার দৈনিক বিস্তারের ফলে সর্বত্র দুর্ভিক্ষ এবং ডাকাতি দেখা দিয়েছে এবং কৃষক জনতার ও শহর অঞ্চলের গরীবদের প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্কুলগুলোর টাকা নেই বলে অনেক ছাত্রের আশঙ্কা হচ্ছে যে, তাদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উৎপাদন পিছিয়ে আছে বলে অনেক গ্র্যাজুয়েট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ছেলেমেয়ে চাকরী সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ। আমরা যদি একবার এইসব দ্বন্দ্বগুলোকে ভালো করে বুঝি তাহলে দেখতে পাব চীন দেশ কি মরীয়া অবস্থায় পড়েছে, কি চরম বিশৃঙ্খলা সেখানে। আমরা আরও লক্ষ করতে পারব যে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে. যুদ্ধবাজ সর্দার আর জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রবল জোয়ার আসবেই আসবে এবং খুব শীগ্‌গিরই আসবে। সারা চীন জুড়ে যে জ্বালানি কাঠ ছড়িয়ে আছে তা শীগ্‌গিরই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। "একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে" এই প্রবাদটি সঠিক ভাবে বর্ণনা করছে কেমন করে বর্তমান অবস্থাটা ক্রমে এগিয়ে যাবে। আমরা যদি শুধু অনেক জায়গায় যে শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষকদের ও সৈনিকদের বিদ্রোহ এবং ছাত্র-ধর্মঘট বেড়ে চলেছে সেগুলোকেই লক্ষ করি তাহলে বুঝব একটি স্ফুলিঙ্গ যে দাবানল সৃষ্টি করবে তার আর বেশি বাকি নেই।

বিপ্লবের প্রবল জোয়ার আসবেই আসবে এবং খুব শীগ্‌গিরই আসবে—এ কথা মাও ৎসে-তুং বললেন। "শীগ্‌গিরই" কথাটার ব্যাখ্যা কি? মাও ৎসে-তুং ঐ লেখাতেই বলেছেন: এই প্রশ্নটা কমরেডদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রশ্ন। মার্কসবাদীরা গণৎকার নয়। তারা শুধু ভবিষ্যতের এগিয়ে যাওয়ার এবং পরিবর্তনের সাধারণ গতিপথ বাৎলে দিতে পারে এবং তাই তাদের করা উচিত। তার বেশী করা উচিত হবে না। যান্ত্রিকভাবে দিন-ক্ষণ স্থির করা তাদের উচিত নয়, তারা তা করতে পারেও না। "কিন্তু আমি যখন বলি চীনে শীগ্‌গিরই বিপ্লবের প্রবল জোয়ার আসবে, তখন কিন্তু আমি (আমি জোর দিয়ে একথা বলছি) এমন একটা কিছুর কথা বলি না যা 'সম্ভবত আসছে' বলে কিছু লোক বর্ণনা করে, যা একান্তই কাল্পনিক, যা কখনও পাওয়া যাবে না এবং কর্মের ক্ষেত্রে যার কোনও গুরুত্ব নেই। আমি যে জিনিসের কথা বলি সেটা হচ্ছে দূর সমুদ্রের সেই জাহাজটার মতো যার মাস্তুলের চূড়া ইতিমধ্যেই তীর থেকে দেখা যাচ্ছে; সেটা পূব আকাশে সেই ভোরের সূর্যের মতো যার ঝিকিমিকি আলো উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা যায়; সেটা

জন্ম হয় হয় এমন একটি শিশুর মতো যে চঞ্চল হয়ে মায়ের গর্ভে নড়ে নড়ে উঠছে।" ১৯৩০-এর জানুয়ারীর গোড়ার দিকে এই কথাগুলো মাও ৎসে-তুং বললেন কোন্ ভরসায় ? একটু পেছনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

১৯২৭-এর ১লা আগস্টের ভোর চীনদেশে নিয়ে এল এক আনন্দের খবর। মাও ৎসে-তুং-এর হুনানের পাশেই পূবে কিয়াংসি প্রদেশ। সেই কিয়াংসির রাজধানী নানচাং-এ ১লা আগস্টের ভোর আসতে না আসতেই ত্রিশ হাজার শ্রমিক কৃষক এবং উত্তরমুখী অভিযানের কমিউনিস্ট-ঘেঁষা সৈনিকরা সশস্ত্র বিদ্রোহে ফেটে পড়ল। এই বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে ছিলেন চৌ এন-লাই আর চু তে। লিন পিয়াও তাঁর বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। মাত্র তিন ঘণ্টা লড়াই করে বিদ্রোহীরা নানচাং দখল করে ফেলল। এই ১লা আগস্ট চীনের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন কারণ কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ এই দিনই শুরু হয়। সেদিনই চীনের জনগণের সশস্ত্র ফৌজের জন্ম হল।

৫ই আগস্ট এই বিপ্লবী বাহিনী আগের প্ল্যান অনুযায়ী নানচাং থেকে দক্ষিণে ক্যান্টন শহরের দিকে রওনা হয়—শহরটি দখল করবে বলে। কুয়োমিনতাং সৈন্যদের বার বার আক্রমণ হটিয়ে দিয়ে বিপ্লবী বাহিনী প্রথমে পূবে ফুকিয়েন প্রদেশে ঢোকে, তারপর লড়তে লড়তে ফুকিয়েন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোয়াং-তুং প্রদেশে ঢোকে। এই কোয়াংতুং-এরই রাজধানী হচ্ছে ক্যান্টন—লাল ফৌজের অভিযানের লক্ষ্য। কিন্তু তারা ক্যান্টন অবধি যেতে পারল না। স্থানীয় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় বিরাট এক জনতার সাহায্য তারা পেল না কোয়াংতুং-এর পূর্বাঞ্চলে শত্রুর আক্রমণে তাদের অনেকে জখম হল এবং অনেকে মারা গেল। ফৌজের লোকদের একটা অংশ তখন হাইফেং আর লুফেং-এর কৃষক আন্দোলনে যোগ দিল, আরেকটা অংশ উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে কোয়াংতুং-এর সীমানা পার হয়ে তার পরের প্রদেশ হুনানের দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ল। এই দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন চু তে। পরে চু তে, চেন্‌ঈ এবং লিন পিয়াও-এর নেতৃত্বে নানচাং-এর বিদ্রোহী সৈন্যদের একটা অংশ চিংকাং পাহাড়ে যায়। সে কথায় পরে আসছি।

আমরা একটু আগেই বলেছি যে, নানচাং-এর বিদ্রোহীরা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। অথচ সশস্ত্র সংগ্রামের লক্ষ্য যদি কৃষি বিপ্লব না হয় তবে

সে সশস্ত্র সংগ্রাম দিয়ে আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশের কোন্ মঙ্গলটা হবে? তা ছাড়া চেন পো-তা তাঁর "দশ বছরের গৃহযুদ্ধ" লেখাটিতে ঐ ধরনের বিদ্রোহের আরেকটা দুর্বলতার কথা বলেছেন। তিনি লিখছেন, "যখন বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা তৈরি হয়নি তখন যদি সশস্ত্র বাহিনী কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্তও হয় তবু তখন কৃষি বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া যায় না এবং তাকে সুদৃঢ় করা যায় না। ঘাঁটি এলাকা না থাকলে সশস্ত্র বাহিনী বাধ্য হবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে অসুবিধায় পড়বে। এর ফলে শত্রুর হঠাৎ আক্রমণে হেরে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে। এটা নানচাং বিদ্রোহের ব্যর্থতা থেকে যে শিক্ষাগুলো নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি।" আমরা আরেকটু এগোলেই দেখতে পাব ঘাঁটি এলাকা গড়ার প্রশ্নকে মাও ৎসে-তুং কত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯২৭-এর ৭ই আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী সম্মেলনে চেন তু-সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতির, এবং সশস্ত্র ফৌজ ও কৃষি বিপ্লব সম্বন্ধে তার ভুল ধারণাগুলোর তীব্র সমালোচনা করা হল। চেন তু-সিউকে পার্টি-নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এটা এই জন্যে সম্ভব হয়েছিল যে, মাও ৎসে-তুং চেন তু-সিউর সুবিধাবাদী নীতির মুখোশ খুলে ফেলেছিলেন। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটাকে সামনে নিয়ে এলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি এ সিদ্ধান্তও নিল যে, ভূমি সংস্কার করতে হলে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে কৃষকদের সক্রিয় করতে হবে এবং কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সর্বস্ব পণ করে লড়তে হবে। ঠিক হল একটি শ্রমিক কৃষকের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা হবে। একটি বিপ্লবী কমিটির ওপর বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবার ভার পড়ল। পরে বিদ্রোহ সফল হলে সে কমিটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কাজ চালাবে। এই সম্মেলন বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্যে কৃষকদের শরৎকালে ফসলের লড়াইয়ে সামিল হতে আহ্বান জানালো। মাও ৎসে-তুংকে হুনানে ঐ ফসলের লড়াই গড়ে তোলার জন্যে পাঠানো হল। ঐ লড়াইয়ের জন্যে তিনি যে কর্মসূচী নিলেন তা এই রকম: এক, প্রাদেশিক পার্টি কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ছেদ করবে। দুই, একটা কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবী ফৌজ গড়া হবে। তিন, ছোট, মাঝারি এবং বড় জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। চার, হুনানে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ ব্যাপারেও

কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে কোনও সম্পর্কও থাকবে না। পাঁচ, সোভিয়েৎ প্রতিষ্ঠা করা হবে। মাও ৎসে-তুং আনিউয়ান কয়লাখনির মজুর, চাষী এবং উত্তর অভিযানের কিছু সৈনিকদের নিয়ে এই বিদ্রোহের আয়োজন করলেন। সেপ্টেম্বরে তারা বিদ্রোহে ফেটে পড়ল। বিদ্রোহ এমন প্রচণ্ড হয়েছিল যে, হুনানের রাজধানী চাংশায় বসে বিপ্লব-বিরোধীরা থেকে থেকে চমকে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ সফল হল না। কিন্তু এই বিদ্রোহ পার্টিকে জনতার মধ্যে নিয়ে এলো, কৃষি বিপ্লবের ধারণা লোকের মনে শেকড় গাড়লো। মাও ৎসে-তুং বিদ্রোহীদের একটা অংশকে নিয়ে গড়ে তুললেন চীনের শ্রমিক-কৃষকের লাল ফৌজ—ভবিষ্যতের গণমুক্তি ফৌজের অগ্রদূত। মাও ৎসে-তুং-এর ফসলের লড়াই-এর কর্মসূচী আর এই সৈন্য-বাহিনী গড়ার ব্যাপারে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও ৎসে-তুং-এর বিরোধিতা করল। তবে প্রথমটা কোন হৈ চৈ করল না। দেখা যাক কি হয় এই রকম ভাব। এই সৈন্যবাহিনী যখন তিনি গড়ে তুলছেন তখন মাও ৎসে-তুং একবার ভয়ানক বিপদে পড়লেন। কয়লাখনির শ্রমিক আর কৃষকদের মধ্যে যখন তিনি ঘোরাঘুরি করছিলেন তখন একদিন কুয়োমিনতাং-এর লোকেরা তাঁকে ধরে ফেলে। তখন দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে—কমিউনিস্ট-দের ধরে ধরে গুলি করা হচ্ছে। মাও ৎসে-তুংকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হত্যা করার জন্যে। নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ল দুজন ভাড়াটে সৈনিকের ওপর। মাওকে অবশ্য তখনও শত্রুরা কেউ চিনতে পারেনি। মাও ঐ দুজন সৈন্যের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলেন যে তারা গরীব ঘরের ছেলে। পথে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে কথা চলল। ওরা একটু নরম হল। তখন আর মাত্র ২০০ গজের মতো বাকি। মৃত্যু এগিয়ে আসছে। হঠাৎ বাঁধন ছিঁড়ে মাও ৎসে-তুং ছুটে পাশের ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়লেন। একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছে লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে মাও লুকোলেন। সৈনিকরা খুঁজতে এল। দুয়েকবার তারা এত কাছে এল যে মাওকে ছুঁয়ে ফেলে আর কি। তবু তিনি রক্ষা পেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই সৈনিকরা খোঁজা বন্ধ করে চলে গেল। মাও সারা রাত ধরে পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছলেন। চীন-বিপ্লব আর বিশ্ব-বিপ্লব এক বিরাট সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পেল!

মাও ৎসে-তুং-এর নতুন ভাবে গড়ে তোলা সৈন্যবাহিনী চিংকাং পাহাড়ে এলে

পৌঁছাল। চিংকাং পর্বতমালা ১৬৩ মাইলের কিছু বেশি জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হুনান আর কিয়াংসি প্রদেশের সীমানা বরাবর। শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করবার ব্যাপারে এত ভালো জায়গা কমই পাওয়া যায়। জায়গাটা অত্যন্ত দুর্গম এবং জঙ্গলে ভরা—গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে আদর্শ জায়গা। পাহাড়ী নদীর জলস্রোতের ধাক্কায় পাহাড় ক্ষয়ে ক্ষয়ে সবশুদ্ধ পাঁচটি গিরিপথ তৈরি হয়েছে। এই পাঁচটি সরু সরু দুর্গম পথ ছাড়া সেই পাহাড়ী অঞ্চলে ঢোকবার-বেরুবার আর কোনও রাস্তা নেই। ১৯২৭-এর অক্টোবর মাসে মাও ৎসে-তুং সৈন্যবাহিনী নিয়ে চিংকাং পাহাড়ে গেলেন এবং সেখানে এক শ্রমিক-কৃষকের সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর দলে হাজারের চেয়েও কম লোক, তবু এই বিপ্লবী বাহিনী শত্রুর অসংখ্য আক্রমণ হটিয়ে দিতে পেরেছিল। চীনের প্রথম শক্ত বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি হল। চিংকাং পাহাড়ের চূড়ায় লাল পতাকা উড়ল। বিপ্লবের অগ্রগতির একমাত্র পথ খুলে দিল এই চিংকাং অভিযান। ১৯২৭-এর বিপ্লবের ব্যর্থতার পর এই স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করবে।

কুয়োমিনতাং হত্যাকারীদের রুখবার জন্যে ১৯২৭-এর ১১ই ডিসেম্বর পার্টির নেতৃত্বে ক্যান্টনে শ্রমিক ও সৈনিকরা এক বিদ্রোহ করল। তারা "ক্যান্টন কমিউন" বলে পরিচিত শ্রমিক-কৃষকের এক সরকার প্রতিষ্ঠা করল। অনেক-গুণ বেশি শক্তিশালী কুয়োমিনতাং বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বিদ্রোহীদের ওপর। বিদ্রোহীরা এমনিতেই দুর্বল ছিল। কারণ তারা কৃষক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। তাদের খুব তাড়াতাড়ি পরাজয় হল। আট হাজারের মতো বিপ্লবীর প্রাণ গেল। প্রমাণ হল বিপ্লব যখন পিছু হটছে তখন বড়ো বড়ো শহর দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এদিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সোজাসুজি মাও ৎসে-তুং-এর নীতির বিরোধিতা করল। তাঁকে পলিটব্যুরো এবং পার্টির ফ্রন্ট কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। হুনান প্রাদেশিক কমিটিও মাও ৎসে-তুং এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের কাজকে "রাইফেল মার্কা আন্দোলন" বলে টিটকিরি দিল। কিন্তু মাও ছাড়বার পাত্র নন। চিংকাং-এর পাহাড়ে জঙ্গলে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেন। মাও-এর বিশ্বাস যেহেতু তাঁদের পথ নির্ভুল, জয় তাঁদের হবেই। এদিকে বামপন্থী রোগে যারা ভুগছিল তারা মাও ৎসে-তুংকে "সংস্কারবাদী" বলে গাল দিল। এডগার স্নো তাঁর

"রেড স্টার ওভার চায়না"তে লিখেছেন যে মাও ৎসে-তুং তাঁকে বলেন, "১৯২৭-এর শীতকাল থেকে ১৯২৮-এর শরৎকাল পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর প্রথম ডিভিশন চিংকাং পাহাড়ে তার ঘাঁটি আগলে রইল। ১৯২৭-এর নভেম্বরে হুনান সীমান্তে চ'আলিন-এ প্রথম সোভিয়েৎ প্রতিষ্ঠা হল এবং প্রথম সোভিয়েৎ সরকার নির্বাচিত হল। তার চেয়ারম্যান হলেন তু সুং-পিং। এই সোভিয়েতে এবং পরে আমরা একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচী চালু করলাম—সংযত নীতি অনুসরণ করে, ধীরে অথচ নিয়মিত এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে। এর ফলে চিংকাং পাহাড়কে পার্টির মধ্যেকার 'পুটশিস্টদের (হঠকারীদের) কাছ থেকে নিন্দা কুড়োতে হয়েছিল যারা জমিদারদের মনের জোর ভাঙবার জন্যে তাদের আক্রমণ করা, পোড়ানো এবং হত্যা করার সন্ত্রাস-বাদী নীতি দাবি করছিল। প্রথম সৈন্যবাহিনীর ফ্রন্ট কমিটি ঐ ধরনের রণকৌশল গ্রহণ করতে আপত্তি করল এবং সেই জন্যে মাথা-গরমরা তাদের নিন্দা করে 'সংস্কারবাদী' নাম দিল। আরও 'উগ্র' নীতি অনুযায়ী কাজ করলাম না বলে আমাকে তারা তীব্র আক্রমণ করল।"

আমরা ইতিপূর্বে আরেকজন নেতাকে দেখেছি তাঁর বাহিনী নিয়ে কোয়াংতুং থেকে দক্ষিণ হুনানে যেতে। ইনি চু তে। হুনানে তিনি খুব বড়ো বড়ো কৃষক বিদ্রোহ ঘটালেন এবং এই বিদ্রোহের সময় অনেক কৃষক বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল। এসব ১৯২৮-এর গোড়ার দিককার ঘটনা। সে বছর এপ্রিল মাসে চু তে তাঁর বাহিনী নিয়ে চিংকাং পাহাড়ে মাও-এর সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ৪ঠা মে এক মস্ত সভার আয়োজন হল। সে এক বিরাট উৎসবের দিন। প্রকৃতি আর মানুষ উৎসবে মেতেছে। বসন্ত এসেছে। প্রকৃতির অপরূপ সাজ। পাখির গান আর মানুষের আনন্দে আকাশ মুখর। সময়টা ফসল তুলবার। কিন্তু কেউ মাঠে গেল না। সভার জন্যে বাঁশ-কাঠের এক মস্ত মঞ্চ তৈরি হল। লাল পতাকায় আকাশ ছেয়ে গেল। স্টেজের ওপর বিরাট বিরাট চীনে হরফে লেখা হল "লাল ফৌজের সফল মিলন দিনটিকে পালন কর। কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম কর।" ভোর হতে না হতে ছেলে-বুড়ো এসে ভিড় করল। নানা এলাকা থেকে লাল সেনারা এল। বেলা ১০টা না হতেই মাঠ কানায় কানায় ভর্তি। এই মানুষের সমুদ্রে এসে মিশল চু তে আর মাও ৎসে-তুং-এর মুক্তি ফৌজ। হাসি, ঠাট্টা আর গানে উৎসব জমে উঠল। উঠবেই তো, বিপ্লবই যে

জনতার উৎসব। এই সভাতেই চেন ঈ ঘোষণা করলেন যে, সশস্ত্র বাহিনী-গুলোকে নিয়ে "চতুর্থ বাহিনী" গড়া হল। সে বাহিনী চীনের শ্রমিক-কৃষকের লালফৌজের অধীনে কাজ করবে। মাও ৎসে-তুং সভায় বললেন, শত্রু সৈন্যের চেয়ে কমিউনিস্টদের সৈন্য সংখ্যায় অনেক কম। তবু শত্রুকে পরাজিত করা নিশ্চয়ই সম্ভব। শত্রুর দুর্বল জায়গাগুলো বার করতে হবে আর সর্বশক্তি দিয়ে সেখানে আঘাত হানতে হবে। শত্রুকে সবদিক থেকেই শক্তিশালী ভাবলে চলবে না। পরে "চতুর্থ বাহিনী" নানচাং বিদ্রোহকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এক স্মৃতিসভার আয়োজন করে। সেখানে মাও ৎসে-তুং বললেন যে অনেকে তখনও বিপ্লবী এলাকা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্ক ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। তিনি বললেন ঘাঁটি না গড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় না। তিনি চিংকাংকে ভালবাসতে বললেন। বললেন চিংকাং পাহাড় বিপ্লবকে রক্ষা করেছে আবার এগিয়ে নিতেও সাহায্য করেছে। মাও ৎসে-তুং চিংকাং-এর লাল সেনাদের তিনটি শৃঙ্খলা মেনে চলতে বললেন। এক, তোমাদের আক্রমণের সময় নির্দেশ মেনে চলবে। দুই, শ্রমিক ও কৃষকদের কাছ থেকে কিছুই নেবে না। তিন, স্থানীয় উৎপীড়ক-দের কাছ থেকে যা কিছু নেবে সব জমা দেবে। ১৯২৯-এর পর মাও ৎসে-তুং দু'নম্বর নিয়মটা এইভাবে বদলে দিলেন, "জনসাধারণের কাছ থেকে একটি ছুঁচ বা এক টুকরো সুতোও নেবে না।" তিন · নম্বর নিয়ম প্রথম বদলে হল, "যে টাকা তুলেছ সব জমা দাও" এবং তারপর আবার বদলে দাঁড়াল—"যা কিছু কব্জা করেছ সব জমা দাও।" "শৃঙ্খলার তিনটি নিয়ম" ছাড়াও মাও ৎসে-তুং "মনোযোগ দেবার ছ'টি বিষয়" ঠিক করে দিলেন। এক, বিছানা পেতে শোবার জন্যে যে দরজার পাল্লা খুলে নিয়েছ সেগুলোকে আবার ঠিক জায়গায় রেখে দাও। দুই, বিছানা হিসেবে যে খড় ব্যবহার করেছ তা আবার ঠিক জায়গায় রেখে দাও। তিন, নম্রভাবে কথা বল। চার, যা কিনবে তার ন্যায্য মূল্য দাও। পাঁচ, যা ধার করবে তা ফিরিয়ে দাও। ছয়, কোনও কিছু নষ্ট করলে তার দাম দেবে। ১৯২৯-এর পর মাও ৎসে-তুং এর সঙ্গে আরও দুটো জুড়ে দিলেন। সাত, মেয়েদের চোখে পড়ে এমন জায়গায় চান করবে না। আট, যুদ্ধবন্দীদের পকেট তল্লাসি করবে না। তিন নম্বর বিষয়টি লিন পিয়াও জুড়ে দিয়েছিলেন।

মাও ৎসে-তুং শেখালেন যে বিপ্লবী সেনাবাহিনী এবং জনগণের মধ্যে ঐক্য

গড়ে তুলতে হবে। লাল ফৌজ শুধু যুদ্ধই করবে না, প্রচার চালাবে। জনগণকে সে-ই সংগঠিত করবে। যেখানেই লাল ফৌজ গেছে সেখানেই শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে সভা করেছে। যেখানেই লাল ফৌজ বিশ্রামের জন্যে থেমেছে সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের কথা প্রচার করেছে। জনগণের সেবা করেছে—উঠোন ঝাঁট দিয়েছে, জল তুলেছে, চাষ করেছে। চলতি রীতিনীতির প্রতি কোথাও এতটুকু অশ্রদ্ধা দেখায়নি। কোনও সৈনিক অশোভন আচরণ করলে তার কঠোর সমালোচনা হয়েছে। লাল ফৌজ আর জনগণের সম্পর্ক ছিল মাছ আর জলের মতো। তাই তাদের শত্রুরা হারাতে পারেনি। বরং তারাই শত্রুকে বার বার হারিয়ে দিয়েছে। অথচ তাদের সঙ্গে ছিল বর্শা, সামান্য কিছু ছোটোখাটো অস্ত্র আর অল্প কিছু রাইফেল। তাছাড়া শত্রুর বার বার আক্রমণের ফলে রোজকার প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসেরই ভীষণ অভাব ছিল। চাল নেই। নুন নেই। কুমড়ো খেয়ে পেট ভরাতে হত। সৈনিকরা নিজেরাই একটা মজার স্লোগান দিত, "পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক, আর কুমড়ো খাও!" মাও ৎসে-তুং এডগার স্নোকে বলেছিলেন, সৈনিকরা "পুঁজিবাদ" কথাটা দিয়ে বোঝাতে চাইতো জমিদার আর জমিদার বলতে বোঝাতো কুমড়ো। তুলনাটা মন্দ নয়। কুমড়োগুলো খাবার সময় সেগুলোকে জমিদারের মুণ্ডু বলে হাসি তামাসা করে বোধ হয় তারা মজা পেত। ভীষণ শীত। অথচ গরম কাপড় বলতে কিছুই নেই। তাই লাল সেনারা দিনে ঘুমোতো। রাতে দৌড় ঝাঁপ করে শরীর গরম রাখতো। এমনি করে রাত কেটে যেত। তার ওপর আবার মশার উৎপাত। মশারি নেই। তাই ধোঁয়া দিয়ে মশা তাড়াতে হত। ধোঁয়ায় ভীষণ কষ্ট হত। ওষুধপত্তর, খবরের কাগজ, বই—কিছুই পাওয়া সহজ ছিল না। অনেকগুণ বেশি দামে আশে পাশের গ্রাম থেকে জোগাড় করতে হত। তাও জুটতো পুরোনো বইপত্তর। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও লাল সেনারা এক মুহূর্তের জন্যেও ভেঙ্গে পড়ল না। এরই মধ্যে তারা লিখল আগুন ঝরানো কবিতা আর গান। অন্য দিকে চলল সশস্ত্র লড়াই। শত্রুর চেয়ে তাদের সাহস আর মনের জোর ছিল অনেকগুণ বেশি। চু তে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই চালাতেন। শত্রুর বুলেট কখনও তাঁর টুপি, কখনো তাঁর উর্দি ভেদ করে গেছে। তিনি বেঁচে গেছেন আশ্চর্যভাবে। তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁকে ঠাট্টা করে বলতো "ভাগ্যবান্"। লাল সেনাদের

সাহস ছিল বলে কিন্তু তারা অকারণ ঝুঁকি নিত না। শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে কখনও তারা বোকার মতো লড়তো না। এ ব্যাপারে মাও ৎসে-তুং তাদের যা শিখিয়েছিলেন তা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে চিংকাং-এর ফ্রন্ট কমিটির লেখা ১৯২৯-এর এপ্রিলের একটি চিঠিতে পাই : "আমাদের গেরিলা রণকৌশল। প্রধানত সেগুলো হচ্ছে এই : আমাদের বাহিনীকে ভাগে ভাগে ছড়িয়ে দাও জনগণকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে; আমাদের বাহিনীকে এক জায়গায় জড়ো কর শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্যে।
শত্রু এগোয়, আমরা পিছু হটি; শত্রু তাঁবু গেড়ে বসে, আমরা তাদের হয়রান করি; শত্রু ক্লান্ত হয়, আমরা আক্রমণ করি; শত্রু পিছু হটে, আমরা পিছু নিই।
শত্রু ঘাঁটি এলাকাগুলোকে বাড়াবার জন্যে ঢেউয়ের মতো এগোবার নীতি নাও; শক্তিশালী শত্রু যদি পিছু নেয়, চক্রপথে চলার নীতি নাও।
যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব, এবং সবচেয়ে ভালো পদ্ধতিতে সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় জনগণকে জাগিয়ে তোলো।"

॥ খাটি ইস্পাত ॥

"গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকে না।" তাই মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে চিংকাং পাহাড়ের যুগ থেকেই চীনের কমিউনিস্টরা সেনাবাহিনীকে বিপ্লবী কায়দায় গড়ে তোলার সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। এ ব্যাপারে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের কুতিয়েন সম্মেলনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মাও ৎসে-তুং নিজে সে সম্মেলনে এ সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।
কুতিয়েন সম্মেলনে সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্পর্কে যে নীতিগুলো আলোচনা করা হয়েছিল চেন পো-তা তাঁর "দশ বছরের গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে" লেখাটিতে তা এইভাবে সংক্ষেপে দিয়েছেন : এক, সেনাবাহিনীকে মানতে হবে যে রাজনৈতিক কাজ সামরিক কাজকে পথ দেখায় এবং পার্টিই সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সেনাবাহিনী পার্টিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় না। আরও বুঝতে হবে যে সামরিক কাজকর্ম থেকে পার্টিকে

আলাদা করা যায় না। দুই, এই সেনাবাহিনীকে জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হবে। এই বাহিনী একই সঙ্গে লড়বে, প্রচার করবে এবং জনসাধারণকে সংগঠিত করবে। নিজেকে কখনও তাদের থেকে দূরে সরিয়ে আনবে না অথবা তাদের উপর খবরদারি করবে না। তিন, এই বাহিনীকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতেই হবে এবং তাকে মনে করতে হবে যে স্থানীয় জনসাধারণকে সশস্ত্র করে তোলা তার জরুরী কর্তব্যগুলোর মধ্যে একটা। চার, কুয়োমিনতাং-এর সেনাবাহিনীকে তার অফিসাররা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে একচেটিয়া করবার জন্যে ব্যবহার করে, কিন্তু লাল ফৌজকে অন্য রকম হতেই হবে। পাঁচ, এই বাহিনীতে যে কমরেডরা সামরিক কাজের ভার নেবেন তাঁদের কুয়োমিনতাং সেনাবাহিনীর অফিসারদের মতো হলে চলবে না, সম্পূর্ণ অন্য রকম হতে হবে। কারণ কুয়োমিনতাং বাহিনীর অফিসাররা কুয়োমিনতাং পার্টির বিশেষ সুবিধাভোগী সদস্য হয়ে দাঁড়ায়। ছয়, এই বাহিনীকে নিজের ভেতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে মাও ৎসে-তুং চতুর্থ লাল ফৌজের কুতিয়েন সম্মেলনের পার্টি প্রতিনিধিদের জন্যে যে প্রস্তাব তৈরি করেছিলেন সেটি মিলিটারি লাইন সম্পর্কে দলিলগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সে দলিলটি এখন "পার্টির মধ্যেকার ভুল ধারণা সংশোধন প্রসঙ্গে" এই নামে পরিচিত। সেনাবাহিনী সম্বন্ধে একটা অনেক কালের পুরোনো ধারণা ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে, সেনাবাহিনী "শুধু সামরিক ব্যাপার নিয়ে" মাথা ঘামাবে। মাও ৎসে-তুং তাঁর কুতিয়েন প্রস্তাবে এই ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দেন। তিনি দেখান যে, রাজনীতির সঙ্গে সামরিক ব্যাপারের বিরোধ আছে একথা বলা ভুল, সামরিক কাজের একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকবেই থাকবে, কারণ "সামরিক কাজ রাজনৈতিক কাজ সম্পূর্ণ করবার একটা উপায় মাত্র"। "যদি তুমি সামরিক দিক থেকে ঠিক থাকো, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তুমি রাজনীতির দিক থেকেও ঠিক আছ; যদি তুমি সামরিক দিক থেকে ঠিক না থাকো, রাজনীতির ব্যাপারে তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না"—সংক্ষেপে-বলা এই নীতিটি ভুল এবং মাও ৎসে-তুং এটিকে বাতিল করে দিলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিকে কখনই সামরিক কাজকর্মের অধীন করে তোলা উচিত নয় এবং এসম্পর্কে মাওর নীতি হল—পার্টি

বন্দুককে চালায়, বন্দুক পার্টিকে চালায় না। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, চীনের লাল ফৌজকে দেখা উচিত "বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্যগুলো পালন করবার জন্যে একটি সশস্ত্র দল" হিসেবে এবং সেই ভাবেই তাকে কাজে লাগানো উচিত। লড়াইয়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে রাজনীতি শিক্ষা দেবার, তাদের সংগঠিত করবার, সশস্ত্র করে তুলবার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবার এবং পার্টি সংগঠন গড়ে তুলবার ভার লাল ফৌজকে দেওয়া হল। তিনি বললেন "এই সব লক্ষ্য না থাকলে সংগ্রাম অর্থহীন হয়ে ওঠে এবং লাল ফৌজের বেঁচে থাকার কোনও মানেই থাকে না।" চিংকাং পাহাড়ের যুগে তাঁর লেখাগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, মাও ৎসে-তুং শুরু থেকেই পার্টি এবং সেনাবাহিনীকে কেমন করে গড়ে পিটে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। কুতিয়েন সম্মেলনের ঐ প্রস্তাবেই মাও ৎসে-তুং বলেন যে, চতুর্থ লাল ফৌজের পার্টি সংগঠনের মধ্যে এমন চিন্তাধারা রয়েছে যা সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসেনি। ফলে পার্টির সঠিক লাইন কাজে খাটাবার ব্যাপারে বাধা আসছে। এর কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, ঘাঁটি অঞ্চলে পার্টির মূল ইউনিটগুলো প্রধানত "কৃষক এবং অন্যান্য পেতিবুর্জোয়া লোক নিয়ে তৈরি।" সৈন্যবাহিনীও প্রধানত কৃষক নিয়েই গঠিত ছিল। কিন্তু এই অসুবিধে সত্ত্বেও চীনের কমিউনিস্টরা যে খাঁটি বিপ্লবী পার্টি এবং বিপ্লবী ফৌজ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তার কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। চেন পো-তা তাঁর "দশ বছরের গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে" লেখাটিতে লেছেন, "আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং বেড়ে উঠেছিল প্রধানত শক্তিশালী এবং একত্র সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকদের ভিত্তি করে। সেই পার্টি ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবে মজবুত হয়ে উঠেছিল এবং মূল্যবান্ রাজনৈতিক ও সংগঠনগত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল। আমাদের পার্টির নেতারা এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন এমন সংগঠক কর্মীরা, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাও ৎসে-তুং এবং অন্যান্য কমরেডরা, তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্মের একেবারে গোড়া থেকেই নিজেদের শ্রমিকশ্রেণী আর তার সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছিলেন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পুরোপুরি রপ্ত করেছিলেন।" চেন পো-তা আরও বলেছেন যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঠিক নেতৃত্ব এবং রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা চীনের কমিউনিস্টদের শিক্ষিত করে তুললো। মাও ৎসে-তুং সব সময় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটাকে গুরুত্ব দিতেন। ১৯২৮-এর

ডিসেম্বরে তাঁর "চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম" লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং খুব জোর দিয়ে বলেছেন, "সর্বহারার আদর্শগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি বলেছেন, "সীমান্ত অঞ্চলের জেলাগুলোর পার্টি সংগঠনগুলো প্রায় পুরোপুরি কৃষকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত নেতৃত্ব না পেলে সেগুলো বিপথে যাবে। ·······সমস্ত স্তরে পার্টির সামনের সারি সংগঠনগুলোতে শ্রমিক এবং গরীব কৃষকের অনুপাত বাড়িয়ে তোলা উচিত।" তিনি আদর্শগত শিক্ষাকে কখনও ছোট করে দেখেন নি। ১৯২৯-এর কুতিয়েন সম্মেলনে তিনি বললেন, "লাল ফৌজের মধ্যে পার্টি সংগঠনকে সবচেয়ে জরুরী যে সমস্যাটির মোকাবেলা করতে হচ্ছে তা হল শিক্ষা। লাল ফৌজকে মজবুত করে এবং বাড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে এমন একটি শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পার্টির মধ্যে প্রথমেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। যদি পার্টির রাজনৈতিক মান উন্নত না করা হয়, যদি পার্টির মধ্যে বিচ্যুতি-গুলোকে নির্মূল না করা হয়, তাহলে লাল ফৌজকে জোরদার করা ও বাড়িয়ে তোলা নিশ্চয়ই অসম্ভব হবে, আর গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেওয়া আরও অসম্ভব হবে।" কুতিয়েন সম্মেলনে তাঁর প্রস্তাবে মাও ৎসে-তুং রাজনৈতিক অবস্থা এবং শ্রেণীশক্তিগুলোকে ভালভাবে বুঝবার জন্যে মনগড়া চিন্তার ওপর নির্ভর না করে পার্টি-সভ্যরা যাতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শেখে সে দিকে নজর দিতে বললেন। এই সমস্যা চীনের পার্টি-জীবনের সব সময়কার কঠিন সমস্যা। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৫-এর ২০এ এপ্রিল পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটি যে কথাগুলো বলেছিল তা মনে রাখার মত, "আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন এক বিপুল আকারের পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীর দেশ। এই বিশাল স্তর যে শুধু আমাদের পার্টিকে ঘিরে রয়েছে তাই নয়, পার্টির ভেতরেও পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা সভ্যদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি।·· যদি সর্বহারা শ্রেণীর এগিয়ে থাকা লোকেরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ এবং যে পার্টি-সভ্যরা পেতিবুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এসেছে তাদের আগেকার মতাদর্শের মধ্যে দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট সীমারেখা না টানে, তাদের শিক্ষিত করে না তোলে এবং তাদের সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে অথচ সঠিকভাবে এবং ধৈর্য ধরে সংগ্রাম না করে, তবে তাদের পেতিবুর্জোয়া মতাদর্শকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে, এবং এর চেয়েও বড়ো কথা, এই সভ্যরা নিজেদের আদর্শে সর্বহারা শ্রেণীর সামনের সারির লোকদের নতুন

করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেই করবে এবং পার্টি-নেতৃত্ব অন্যায়ভাবে দখল করবে—এই ভাবে পার্টি ও জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতি করবে।"
চিংকাং পাহাড়ের যুগ থেকেই মাও ৎসে-তুং এই বিপদ সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্টদের সতর্ক করে দিয়ে আসছিলেন। সে যুগে বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী ফৌজ গড়ার ব্যাপারে তাঁর নির্দেশগুলো এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রাম আগামী দিনের জয়লাভের পথ করে দিয়েছিল।

॥ ভুলের বিরুদ্ধে লড়াই ॥

চিংকাং পাহাড়ে আশ্চর্য মানুষ তৈরি হল। লাল সেনারা পেল শুধু শত্রুকে ধ্বংস করার শিক্ষা নয়, পুরো রাজনৈতিক শিক্ষা। তাদের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই তবু তারা সংগ্রামে অটল। চিয়াং কাই-শেক বার বার সৈন্য পাঠিয়ে এই লালদের লাল কেল্লা তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হল না। কেল্লা শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েই রইল না, তার এলাকা ক্রমশ বাড়িয়ে চলল।
১৯২৮-এর শরতে হুনান, হুপে আর কিয়াংসি এই তিন প্রদেশের সীমানা যেখানে মিশে গেছে সেখানে একটি বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি হল।
১৯২৯-এ লাল ফৌজ দক্ষিণ কিয়াংসি আর পশ্চিম ফুকিয়েনে প্রবেশ করল। সেখানে দুটো নতুন বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি হল। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই দুটো ঘাঁটিকে একত্র করে কেন্দ্রীয় বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে উঠল। কিয়াংসির যুই-চিন হল এই কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকার মূলকেন্দ্র। একই সময়ে হুপে, হুনান, কিয়াংসি, ফুকিয়েন, কোয়াংসি, শেনসি ইত্যাদি প্রদেশে আরও কতকগুলো বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৯৩০-এ পৌঁছে দেখা যায় যে, পনেরটি বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি হয়েছে এবং লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা হয়েছে ষাট হাজার। দেখতে দেখতে তা লক্ষের কোঠায় এসে দাঁড়াল।
যে পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনগণের এই বিরাট বিরাট জয় সম্ভব হল সে পার্টির ভেতরেও চলছিল ভুল লাইনের বিরুদ্ধে সঠিক লাইনের তুমুল লড়াই। এই তো নিয়ম। সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, পুরোনোর সঙ্গে

নতুনের যে দ্বন্দ্ব চলে তার ছায়া পার্টির মধ্যে পড়বেই। এই লড়াইয়ে মাও ৎসে-তুং এর নেতৃত্বে সঠিক লাইনের জিৎ হচ্ছিল বলেই বিপ্লব এগিয়ে চলল।

আমরা দেখেছি ১৯২৭-এর ৭ই আগস্ট এক জরুরী সম্মেলনে দক্ষিণপন্থী চেন তু-সিউ-কে নেতৃত্ব থেকে হটিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ঐ সম্মেলনই আবার বামপন্থী বিচ্যুতি ডেকে আনল। বিপ্লবী শক্তিকে রক্ষা করার জন্যে কোথায় কখন পাল্টা আক্রমণ অথবা পিছু হটার কৌশল নিতে হবে তা কিছুই চিন্তা করা হল না। বরং হুকুমবাজী ও হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হল। এই সম্মেলন জোর করে শ্রমিকদের ধর্মঘটে ঠেলে দেবারও উৎসাহ জোগাল। সংগঠনের দিক থেকে সংকীর্ণ দলীয় মনোভাবকে প্রশ্রয় দিল। পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা শ্রমিক শ্রেণী থেকে আসছে কিনা এর ওপরই একতরফা জোর পড়ল। শ্রমিকশ্রেণী থেকে এলেই হল—অন্য দিক হিসেবের মধ্যেই ধরা হল না। পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের নামে ঢালাও স্বাধীনতা চালু হল—শৃঙ্খলার বালাই রইল না। ঐ বছরই নভেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় হঠকারীদের জয় জয়কার হল। কেন্দ্রীয় কমিটিকে তারা কব্জা করল। চু চিউ-পাই এবং পার্টির অন্যান্য নেতারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে গুলিয়ে ফেলল। তারা স্বীকার করতে চাইল না যে, বিপ্লব ধাপে ধাপে এগুবে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। প্রথম স্তরের অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলো সারা হলে পরই দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজে হাত দেওয়া চলে। কিন্তু চু চিউ-পাই আর তার সমর্থকেরা ভাবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই আগে ভাগে সেরে ফেলা যাবে। বিপ্লব যে ১৯২৭-এ একটা বড়ো ধাক্কা খেয়েছে তা বেমালুম ভুলে গিয়ে এই বামপন্থী রুশীগুলো "স্থায়ী বিপ্লব"-এর নামে "অবিরাম বিদ্রোহের"-কর্মসূচী প্রচার করল। তারা বুঝল না যে জনগণ সবে ঘা খেয়েছে আর বিপ্লবের শত্রুরা জোর পেয়েছে। তখন পিছু হটে আসা দরকার। উল্টে তারা প্রচার করল যে কৃষক জনতা নাকি এখন কয়েকটি প্রদেশে এমন কি শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারে। শহর আর গ্রামকে এক করে দেখে তারা পার্টির কর্মী আর সমর্থকদের শহরে বিদ্রোহে উস্কে দিল। তারা গ্রামাঞ্চলের কৃষক সংগ্রামের চূড়ান্ত তাৎপর্য বুঝল না। শহরের

লড়াইতেই মশগুল হয়ে রইল। মাও ৎসে-তুং এই বাম বিচ্যুতির জোর বিরোধিতা করলেন। ১৯২৮-এর গোড়ার দিকেই এই ভুল লাইন অনেক এলাকায় বাতিল হল। আর এপ্রিলে প্রায় গোটা দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হল। এই ভাবে চীন বিপ্লবের ইতিহাসে প্রথম "বামপন্থী" লাইনের হার হল।

১৯২৮-এর জুলাই মাসে পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস শুরু হয়। এই কংগ্রেসে মূলত সঠিক লাইনেরই জিৎ হল। চীনের কমিউনিস্টরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, ১৯২৭-এর ব্যর্থতার পরও চীন বিপ্লবের স্তর পাল্টে যায়নি—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকই রয়েছে। এই কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবার ডাক দিল। সেখানে চেন তু-সিউর দক্ষিণপন্থী নীতির কঠোর সমালোচনা হল। চেন কিন্তু তার ভুল স্বীকার করল না। বলল, বিপ্লবের ব্যর্থতার জন্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকই দায়ী। সে নিজে ধোয়া তুলসী পাতা! চেন তু-সিউ আর তার সমর্থকরা বিজ্ঞের মতো বলল, ১৯২৭-এর পর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ চীনে শেষ হয়ে গেছে। বুর্জোয়ারা নাকি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে হারিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। তারা বলল, চীনের সমাজে পুঁজিবাদই সর্বেসর্বা। তাই সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের স্তর আর নেই। চীনের ট্রস্কি পন্থীরাও তাই বলছিল। তারা বলতো যে, ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবের পর বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় এসেছে। তাই বিপ্লবের স্তর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নয়। এখন চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। চেন ও তার লোকেরাও তাই বলল। বলল, চীনে পুঁজিবাদ শান্তিপূর্ণ পথে বেড়ে চলবে এবং শ্রমিকশ্রেণী এখন বিপ্লবী সংগ্রামের বদলে আইনী কাজ চালাবে আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে অপেক্ষা করবে। এতই যখন মনের মিল তখন আর দূরে থেকে কষ্ট পাওয়া কেন! চেন তু-সিউ ট্রস্কি-পন্থীদের সঙ্গে নিয়ে একটা পার্টি-বিরোধী গ্রুপ গড়ল। দেখতে দেখতে লোকটা পুরোপুরি প্রতিবিপ্লবী বনে গেল। তাই ১৯২৯-এ তাকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে "বামপন্থী" বিচ্যুতির তীব্র সমালোচনা হল। হঠকারিতা এবং হুকুমবাজীকে পার্টির সবচেয়ে বড় বিপদ বলে দেখানো হল। ঐ ধরনের কাজের জন্যে পার্টি জনগণ থেকে দূরে সরে আসছে। এখন শহরে বিদ্রোহ ঘটানো উচিত নয়। আক্রমণ শুরু করার সময় হয়নি। কারণ বিপ্লব এই

সেদিন ধাক্কা খেয়েছে। এখন দুই বিপ্লবী জোয়ারের মাঝখানের অবস্থা। আপাতত বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে। তবে নতুন বিপ্লবী জোয়ার আসবেই। কারণ যেসব দ্বন্দ্বের ফলে বর্তমান চীন বিপ্লব শুরু হয়েছে সেগুলোর কোনওটারই মীমাংসা হয়নি। সামনের বিপ্লবী লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে জনগণকে বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনাই হল আজকের কাজ।

কিন্তু ষষ্ঠ কংগ্রেসের কতকগুলো গুরুতর দুর্বলতা ছিল। এই কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়বার প্রয়োজন ভালো করে বুঝতে পারেনি। গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ব্যাপার তাও বুঝে ওঠেনি। কৌশল হিসেবে পার্টির পিছু হটার প্রয়োজনও স্পষ্ট হয়নি। বিশেষ করে পার্টির কাজের কেন্দ্র যে শহর থেকে গ্রামে নিয়ে যেতেই হবে এই মূল বিষয়টিও তাদের মাথায় ঢোকে নি। তাই পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন শহরেই পড়ে রইল। আর প্রধানত শহরকে কেন্দ্র করেই পার্টির কাজ চলল। তাছাড়া মাঝামাঝি শ্রেণীগুলো সম্বন্ধেও কংগ্রেসের ধারণা ভুল ছিল। তাই বলা হল যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা হচ্ছে "বিপ্লবের জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে এমন মারাত্মক শত্রুদের একটি।" আসলে তাঁরা জাতীয় বুর্জোয়ার দোমনা চরিত্র বুঝতে পারল না। এও বলা হল যে, "কুয়োমিনতাং-এর সব অংশই প্রতিক্রিয়াশীল।" তাই তারা কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করতে পারল না। তাছাড়া বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস সঠিক আদর্শের লড়াই করতে পারল না। এই বিচ্যুতির শেকড় খুঁজে বার করা হল না। মাও ৎসে-তুং ষষ্ঠ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়। পরে তিনি এই কংগ্রেসের সঠিক নীতিগুলোকে তুলে ধরলেন এবং কাজে পরিণত করলেন। আর যে সব সমস্যার সমাধান কংগ্রেস করতে পারেনি তা মাও ৎসে-তুং-এর তত্ত্ব এবং কাজ সমাধান করে দিল। চিংকাং পাহাড় তার সাক্ষী।

মাও ৎসে-তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্টরা ষষ্ঠ কংগ্রেসের ভাল দিকটা কেমন করে সামনে নিয়ে এলেন তা লক্ষ্য করার মতো। মাও ৎসে-তুং তাঁর "একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে" লেখাটিতে ১৯২৯-এর ৫ই এপ্রিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ফ্রন্ট কমিটির লেখা একটা চিঠির অংশ তুলে দিয়েছেন। সে চিঠিতে বলা হয়েছিল, "পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস যে রাজনৈতিক ও সংগঠনগত লাইন দিয়েছিল তা নির্ভুল, অর্থাৎ, বর্তমান

স্তরে বিপ্লব হচ্ছে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয় এবং পার্টির বর্তমান কর্তব্য [এখানে "বড়ো বড়ো শহর" কথাগুলো যোগ করে দেওয়া উচিত ছিল]* হচ্ছে জনসাধারণকে পক্ষে নিয়ে আসা এবং এখনই বিদ্রোহ না করা। তা সত্ত্বেও বিপ্লব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে এবং আমাদের প্রচারে আর সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।...বিপ্লবে জয়লাভের একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব। বর্তমানে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনগত কর্তব্য হচ্ছে পার্টির জন্যে সর্বহারা শ্রেণীর একটা ভিৎ তৈরি করা এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পার্টির শাখা গড়ে তোলা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শহরগুলোর লড়াইতে সাহায্য করবার জন্যে এবং বিপ্লবী জোয়ারকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবার জন্যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামকে বাড়িয়ে তোলা, ছোটো ছোটো এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং লাল ফৌজ গড়া এবং বাড়িয়ে তোলা। সুতরাং শহরগুলোতে সংগ্রাম না করা ভুল হবে। কিন্তু আমাদের মতে কৃষকদের শক্তি বৃদ্ধি পাছে শ্রমিকদের শক্তিকে ছাড়িয়ে যায় এবং বিপ্লবের ক্ষতি করে আমাদের পার্টির মধ্যে কারও এরকম আশঙ্কা করাও ভুল হবে। কারণ আধা-ঔপনিবেশিক চীনের বিপ্লবে কৃষক সংগ্রাম সব সময়ই ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না তা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব পায়, কিন্তু বিপ্লব কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যদি কৃষক সংগ্রাম শ্রমিকদের শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়।"

মাও ৎসে-তুং অন্যত্র বলেছেন, "একথা বলা উচিত যে, ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের লাইনটি মূলত সঠিক ছিল কারণ সেই কংগ্রেস বর্তমান বিপ্লবের চরিত্রকে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' এই নাম দিয়েছিল, সেই সময়কার অবস্থাকে দুটি বিপ্লবী জোয়ারের মধ্যেকার সময় বলে বর্ণনা করেছিল, সুবিধাবাদ এবং "পুট্‌শ্‌-ইজম্"-কে (হঠকারিতাকে) বাতিল করেছিল এবং দশ দফা কর্মসূচী প্রচার করেছিল। এই সবই সঠিক হয়েছিল। এই কংগ্রেসের ত্রুটিও ছিল, চীন বিপ্লবের অসাধারণ দীর্ঘ সংগ্রামের ব্যাপারটা এবং গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটি এলাকার বিশেষ গুরুত্ব দেখাতে ব্যর্থতা তার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তা সত্ত্বেও ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস আমাদের পার্টির ইতিহাসে একটি

* ব্র্যাকেটের অংশ মাও ৎসে-তুং পরে জুড়ে দিয়েছিলেন—লেখক

প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে।" ("আমাদের মূল্যায়ন এবং চলতি অবস্থা", ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪)

ষষ্ঠ কংগ্রেসেব দশ দফা কর্মসূচী হচ্ছে এই : এক, সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত কর। দুই, বিদেশী পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কগুলোকে বাজেয়াপ্ত কর। তিন, চীনকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার কর। চার, কুয়োমিনতাং-এব যুদ্ধবাজ সর্দাবদের সরকাবকে উৎখাত কর। পাঁচ, শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের সমিতিগুলোর সরকার প্রতিষ্ঠা কর। ছয়, আট ঘণ্টা কাজের দিন চালু কর, মজুরী বাড়াও, বেকার ভাতা এবং সামাজিক বীমা চালু কর। সাত, সব জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত কর এবং সেই জমি চাষীদের মধ্যে বিলি কর। আট, সৈনিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত কব এবং অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদের জমি এবং কাজ দাও। নয়, সব রকমেব চডা ট্যাক্স ও নানা রকমের আদায় বাতিল কর এবং এক সঙ্গে থোক আদায় করা হয় এমন প্রগতিশীল ট্যাক্স-ব্যবস্থা চালু কর। দশ, বিশ্ব সর্বহারার সঙ্গে ঐক্য গডে তোল, ঐক্য গডে তোল সোভিয়েৎ ইউনিয়নেব সঙ্গে।

ষষ্ঠ কংগ্রেসের সঠিক দিকটাকে সামনে রেখে মাও ৎসে-তুং এবং তাঁর সহযোদ্ধারা কাজ চালিয়ে গেলেন। তাঁর প্রভাবে এবং নেতৃত্বে ক্রমে গ্রামাঞ্চলে লাল শাসন জন্ম নিল। এমন কি কুয়োমিনতাং এলাকাতেও পার্টির সংগঠন নতুন করে গড়ে উঠল এবং কিছু কাজ শুরু হল।

কিন্তু "বামপন্থী" বিচ্যুতি আবার পার্টির এগোবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ১৯৩০-এর মে মাসে চিয়াং কাই-শেক বনাম ফেং ইউ-সিয়াং এবং ইয়েন সি-শান্-এর মধ্যে লড়াই বাধল। ফলে দেশের ভেতরের অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে ভাল হল আর বিপ্লবীরাও তার সুযোগ নিয়ে তাদের কাজ খানিকটা এগিয়ে নিল। অমনি বামপন্থী ক্লগীগুলো অস্থির হয়ে উঠল। এবার তাদের নেতা হল লি লি-সান। লি লি-সানের পাশে ছায়ার মতো ছিল শয়তান লিউ শাও-চি। এই লোকটা বিপ্লবের পথে মেরুদণ্ড সোজা করে চলতে জানে না। কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে হেলে পড়ে। মেরুদণ্ড তো নয় যেন মেরুলতা। চীনের ইতিহাসে দেখা দিল দ্বিতীয় "বামপন্থী" সুবিধাবাদী লাইন। এই "বামপন্থীরা" শহর আর গ্রামের লড়াইয়ের মধ্যে কোনও তফাৎ খুঁজে পেল না। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামের সামন্তবাদ-

বিরোধী কৃষক সংগ্রামের চূড়ান্ত গুরুত্ব বুঝতে চাইল না। মাও ৎসে-তুং-এর গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী ঘাঁটি গড়া আর মুক্ত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করার লাইনকে তারা "সম্পূর্ণ ভুল" বলে উড়িয়ে দিল। গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়, দীর্ঘ লড়াইয়ের ব্যাপার তা একদম বুঝল না। বলল, একটা বা তার বেশি প্রদেশে জয় হলেই চীন বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে পা বাড়াবে। গণতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে তারা এক করে ফেললো। মাঝামাঝি শ্রেণীগুলোকে তারা পুরোপুরি প্রতিবিপ্লবী ভেবে বসল। জাতীয় বুর্জোয়াদের সমস্ত কারখানা আর ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করার আওয়াজ তুললো। তারা লাগাতার বিদ্রোহের উস্কানি দিতে লাগল। জনগণ নাকি ছোটো ছোটো নয়, বড়ো বড়ো অ্যাকশনের জন্যে হাত গুটিয়ে তৈরি রয়েছে। বলল, বিপ্লবী সংকট সারা দেশে একই হারে বেড়ে উঠেছে। তাই দেশ জুড়ে এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করার জন্যে প্রস্তুতি করতে হবে। বিশেষ করে প্রধান শহরগুলোকে এই বিদ্রোহের কেন্দ্র হতে হবে।

তারা এমন কথাও বলল যে, চীন বিপ্লব শুরু হলে বিশ্ব বিপ্লবও শুরু হবেই হবে। ফলে চীন বিপ্লব সফল হবে। চীন বিপ্লব বা বিশ্ব বিপ্লব যে সমানভাবে বেড়ে ওঠে না তা তারা বুঝতেই চাইল না। ১৯৩০-এর জুনে তারা সারা দেশ জুড়ে প্রধান প্রধান শহরে বিদ্রোহ করার ফন্দি আঁটল। আর লালফৌজ যাতে শহরগুলো আক্রমণ করে তার প্ল্যান তৈরি করল। পরে তারা পার্টি, যুব লীগ আর ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতাদের নিয়ে অ্যাকশন কমিটি গড়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হতে হুকুম দিল। অন্য সব কাজ বন্ধ হয়ে রইল। কিন্তু এই ভুল লাইন বেশিদিন টিঁকল না। লি লি-সানের "বামপন্থী" লাইনের আয়ু ছিল চার মাসেরও কম—১৯৩০-এর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চাংশাতে ঘাঁটি গড়বার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় লি লি-সানের পতন সহজ হল। এই চেষ্টা ব্যর্থ না হলে লি লি-সানের লাইন ধরে লাল ফৌজের ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারতো। কারণ লি লি-সানের প্ল্যান ছিল লাল ফৌজকে দিয়ে শত্রুর শক্ত ঘাঁটি উহান আক্রমণ করানো।

ভুল লাইন বারবার ব্যর্থতা এনে দিচ্ছিল। তাই অধিকাংশ সাধারণ কর্মী এ লাইনকে বাতিল করবার দাবি জানাল। ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণ অধিবেশনে এবং তার পরে কাজের মধ্যে

দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি লি লি-সানের ভুলগুলো দূর করতে চেষ্টা করল। যে চু চিউ-পাই অত "বামপন্থী" ভুল করেছিল সে এগিয়ে এসে ঐ অধিবেশন পরিচালনা করল। ক্রমে সে নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিল। খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে শাংহাইয়ে সে লু সুনের পাশে থেকে বিপ্লবী সংস্কৃতি আন্দোলনের ভালো কর্মী হয়ে উঠল। ফুকিয়েনের গেরিলা অঞ্চলে ধরা পড়ার পর ১৯৩৩-এর জুনে চিয়াং-এর জল্লাদদের হাতে তার প্রাণ যায়। সেপ্টেম্বরের পূর্ণ অধিবেশনে লি লি-সান নিজেও তার ভুল স্বীকার করে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতার পদ থেকে সরে আসে। পরেও বহুবার লি লি-সানকে তার ভুল স্বীকার করতে দেখা গেছে। ১৯৫৬ সালে পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে লি লি-সানের বক্তৃতা থেকে একটা অংশ তুলে দিচ্ছি : "আমি দ্বিতীয় "বামপন্থী" সুবিধাবাদী লাইনের ভুলগুলোর জন্যে দায়ী ছিলাম...এবং প্রথম "বামপন্থী" সুবিধাবাদী লাইনকে কাজে খাটানোর ব্যাপারে আমি বেশ সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম। ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে পার্টি খুব স্পষ্ট ভাষায় প্রথম "বামপন্থী" সুবিধাবাদী লাইনের ভুলগুলোকে বাতিল করে এবং দেখিয়ে দেয় যে, পার্টির মধ্যে প্রধান বিপদ আসছে 'পুট্‌শ্‌-ইজম' (বা হঠকারী কায়দায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা), সামরিক হঠকারিতা এবং হুকুমবাজি থেকে। ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের অল্প দিন পরেই কেন আমি আবার এই ভুলগুলো করলাম? কেন আমার এই ভুলগুলো আগের চাইতেও বড়ো এবং গুরুতর রূপ নিল? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই যে, যদিও আমি "পুট্‌শ্‌-ইজম"-এর ভুলগুলো নামে মাত্র স্বীকার করেছিলাম, আমি তাদের মতাদর্শগত শেকড় খুঁজে বার করিনি। আমি কেবলমাত্র আমার ভুলগুলোর কয়েকটি সহজে ধরা যায় এমন প্রকাশ্য রূপকে বাতিল করেছিলাম কিন্তু তাদের মূল চরিত্র ও মতাদর্শগত শেকড় সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবার কাজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছি এবং জানতাম না কি করে তা ব্যবহার করতে হয়। এবং সেই জন্যেই আমি আমার পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর গভীরভাবে শেকড়-গাড়া খারাপ চরিত্র-লক্ষণগুলোকে এবং সেগুলো থেকে যে নিছক মনগড়া চিন্তাধারা জন্মায় তাকে বদলাতে ব্যর্থ হয়েছি—যে চিন্তাধারা একজন লোককে বাস্তব সত্য এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে নিয়ে যায়। বিপ্লবের পক্ষে যখন আগের চাইতে অবস্থাটা ভালো হল আমার এই

খারাপ চরিত্র-লক্ষণগুলো, যা পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীর স্বভাবের মধ্যেই থাকে, আরেকবার আগের চাইতেও খারাপ "বিপ্লবী" ক্যাপামির রূপ নিল। একই সঙ্গে আমার নিছক নিজের মনগড়া, অবাস্তব এবং গোঁড়া ধারণাগুলো ক্রমশই বেশি বেশি ক্যাপামির পথ ধরল।

এই রকমের লাগাম-ছাড়া নিছক নিজের মনগড়া ধ্যানধারণা রাজনীতিতে যে রূপ নিল তা হল এই—নিজেকে সাময়িক আবেগের হাতে ছেড়ে দেওয়া, নিজের মনের ইচ্ছাকে বাস্তব সত্য বলে মেনে নেওয়া, খেয়ালখুশিমতো এক-তরফা হুকুম জারি করা, নম্রতা বা বিবেচনা ছাড়া কাজ করা অথবা ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা না করে কাজ করা।...যেখানে শ্বেত সন্ত্রাস (মানে, প্রতিক্রিয়া-শীলদের চরম অত্যাচার উৎপীড়ন—লেখক) শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে সেই বড়ো বড়ো শহরগুলোতে কষ্ট করে জনগণের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের কাজ না করে একটু একটু করে বিপ্লবী শক্তিগুলোকে গড়ে না তুলে তার উল্টোটাই করা হত : ঘন ঘন স্ট্রাইক ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দেওয়া হত এবং বার বার বিদ্রোহ ঘটানো হত। গ্রামাঞ্চলে ভূমি-সংস্কারের জন্যে বিপ্লবী সংগ্রামে নাবতে, গেরিলা যুদ্ধ বাড়িয়ে তুলতে এবং ক্রমে বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি করতে কৃষক জনতাকে সক্রিয় করে না তুলে যে সশস্ত্র বাহিনীগুলো সে সময় ছিল বেশ কাঁচা এবং সংখ্যায় ছোটো সেগুলোকে প্রধান প্রধান শহর সরাসরি আক্রমণ করতে বার বার হুকুম করা হতে লাগল। তারপর, বার বার এবং প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে ফিরে না এসে বরং লড়াইটাকে চরমে নিয়ে যাবার জন্যে মরীয়া ও খামখেয়ালী চেষ্টা চালানো হল। ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলোর গুরুতর ক্ষতি হল। যখনই আমি এসব কথা স্মরণ করি, নিজের মনগড়া ধ্যানধারণার বিষ মানুষকে মূর্খতার কি ভয়ানক চরমে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে তা ভেবে লজ্জায় মরে যাই। সংগঠন-সংক্রান্ত ব্যাপারে এরকম উগ্র মনগড়া ধ্যানধারণা দলীয় সংকীর্ণতার বাড়াবাড়ির রূপ নিল। ফলে মাথা ঠাণ্ডা রাখা এবং অন্যের মতামত মনোযোগ দিয়ে শোনা প্রায় হতই না। যে কমরেডরা অন্য মত তুলে ধরত কোনও যুক্তি না দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদ অথবা ভুল আপোষের পথে যাওয়ার অভিযোগ আনা হত। তাদের সঙ্গে একপেশে ব্যবহার করা হত এবং তাদের কুৎসা করা হত। এইভাবে পার্টির মধ্যে একটা চরম অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিল। এমন কি তা কয়েকজন চমৎকার সংগঠক কর্মীর মৃত্যু ঘটাল।"

মাও ৎসে-তুং-এর তত্ত্ব এবং কাজ চীনের কমিউনিস্টদের চোখ খুলে দিল। তারা দেখতে পেল যে, লি লি-সানের পথ ধরে এল একের পর এক ব্যর্থতা। আর অন্য দিকে কিয়াংসিতে লাল ফৌজের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ল না আর সংখ্যায় তারা বেড়েই চলল। মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে কিয়াংসির ঘাঁটি অঞ্চল অজেয় দুর্গের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

লাল হাতুড়ির মার ॥

এবারে চিয়াং কাই-শেকের দিকে কিছুক্ষণ মুখ ফেরানো যাক। চিয়াং কথা দিয়েছিল "দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবে" কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সে নতুন নতুন যুদ্ধবাজ সর্দারদের সঙ্গে লড়েই যাচ্ছে। চিয়াং বলেছিল বিদেশীদের চাপিয়ে দেওয়া "অন্যায় চুক্তিগুলো" সে পছন্দ করে না, কিন্তু দেখা গেল সেগুলোর বিরুদ্ধে সে কিছুই করল না, বরং ১৯২৭-এর শেষের দিকে চিয়াং-এর সৈন্যেরা সোভিয়েৎ রাশিয়ার বাণিজ্য-প্রতিনিধির ক্যান্টন আপিসের কর্মচারীদের হত্যা করল অথচ এই সোভিয়েৎই হচ্ছে একমাত্র দেশ যে দেশ চীনের ওপর জারের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় চুক্তিগুলো অক্টোবর বিপ্লবের পর কলমের এক খোঁচায় উড়িয়ে দিয়েছিল। ক্যান্টনের এই হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি একই সময়ে আরেকটি কুৎসিত ঘটনা ঘটে। যুদ্ধবাজ সর্দার চাং সো-লিন তখনও পিকিং-এ গদীয়ান হয়ে বসে আছে। আমেরিকান, ইউরোপীয় এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে এই চাং সো-লিন পিকিং-এর সোভিয়েৎ দূতাবাস আক্রমণ করে। তার মানে বিপ্লববিরোধীরা যে যেখানেই থাক বিপ্লবী সোভিয়েৎকে কেউই সহ্য করতে পারছিল না এবং তাই তাদের চেষ্টা ছিল চীনের সঙ্গে সোভিয়েতের সব রকমের সম্পর্ক ধ্বংস করা।

মুনাফা-শিকারী সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা ছিল প্রবল। আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডের তাঁবেদার চিয়াং কাই-শেক জাপানের এত সাধের এলাকা উত্তর চীনে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এ জিনিস জাপানের পক্ষে অসহ্য। তাই জাপানী সৈন্য ১৯২৮-এ শানতুং প্রদেশে চিয়াং-এর সৈন্য-বাহিনীর পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল—আর এগোতে দেবে না তাদের।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে পারে না। চিয়াং-এর সৈন্যকে জাপানী সৈন্যরা গুলি করে মারল। আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে যখন চিয়াং দূত পাঠাল তখন জাপানীরা সেই দূতদেরও হত্যা করল। কিন্তু "জাতীয়তাবাদী" সরকারের ধ্বজা উড়িয়েছিল যে চিয়াং সে চীনের স্বাধীনতার ওপর বিদেশীর এই জঘন্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়ল না, জনসাধারণকেও এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল না। বরং এই চাকর মহারাজ জাপানের রাজধানী টোকিওতে তীর্থযাত্রা করাই ভালো মনে করল। সেখানে গিয়ে চিয়াং জাপানের যুদ্ধদেবতার চেলাচামুণ্ডাদের প্রণাম করে বলল, "আমাকে ভুল বুঝবেন না হুজুরেরা। আমি আপনাদের কোনও স্বার্থের বিরুদ্ধে যাব না।"

সত্যি দেখা গেল যে, চিয়াং এক নতুন দ্রৌপদী। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালী এবং জাপান—এই পঞ্চ স্বামীকে খুশি করবার জন্য সে সব করতে পারে। "নিরপেক্ষ" সেবার কাজ নিয়েছে সে। ১৯২৯-এ সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়ার স্থানীয় সরকার বেআইনীভাবে মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়ানদের তৈরি যে রেলপথ পূর্ব চীনে গেছে সেটাকে জবরদখল করে, রুশ সীমান্তে লড়াই বাধায়, এবং রেলপথের রুশ অফিসারদের গ্রেপ্তার করে। অথচ সোভিয়েৎ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই জারের আমলের সমস্ত বিশেষ সুবিধা বাতিল করে দিয়ে চীনের সঙ্গে চুক্তি করে এই রেলপথকে বাণিজ্যের দিক থেকে পরিচালনা করছিল চীনের সরকারের সঙ্গে যুক্তভাবে এবং চীনের আইনের আওতার মধ্যে। চীনের [illegible] আক্রমণের পর সোভিয়েৎ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে রেল লাইন পাহারার ব্যবস্থা করে। সীমান্তের গণ্ডগোল বন্ধ করে এবং আগেকার শর্ত অনুযায়ী রেল চালাতে চীন সরকারকে বাধ্য করে। তার পরেই রুশ সৈন্যদল নিজের দেশে ফিরে যায়, কোনও জায়গা দখল করে না, কোনও "ক্ষতিপূরণ" চায় না, অন্য কোনও শাস্তির দাবিও করে না। সাম্রাজ্যবাদীরা যে এই ঘটনা ঘটাল তার কারণ হচ্ছে তারা একটা চিমটি কেটে পরীক্ষা করে দেখল উত্তর-পূর্ব চীন থেকে রুশবিরোধী কাজকর্ম চালানো কতদূর সম্ভব। দু' বছর পর চীনের মানুষ চিয়াং-এর এই বিদেশীর পা-চাটামোর [illegible] ভোগ করল। কারণ ১৯৩১-এ জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে বসল। পরে আমরা সে কাহিনী বলব। এখন বিপ্লবের খবর নেওয়া যাক।

বিপ্লব এগোচ্ছে। মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব এগিয়ে চলেছে।

১৯৩০-এ লাল ফৌজকে কেন্দ্র করে দিকে দিকে কৃষি বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। যেসব অঞ্চল দিয়ে লাল ফৌজ গেছে সেসব অঞ্চলে কৃষকরা বিপ্লবে সামিল হয়েছে। ফল—জমিদারী উৎখাত, কৃষকের জীবনে নতুন দিন। হাজার হাজার বছরের জন্যে তারা এই দিনের অপেক্ষায় ছিল। ইতিপূর্বে যে বিপ্লবী আন্দোলন হয়ে গেছে তার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে মাও ৎসে-তুং কৃষি বিপ্লবের ছক তৈরি করলেন। এবারে যে লাইন বা কার্যসূচী ঠিক হল তা এই। কৃষি বিপ্লবের ভিৎ হবে ক্ষেতমজুর আর গরীব চাষী—প্রধান নির্ভর এরাই। মধ্য চাষীদের সাথী করে নিতে হবে। তারা সাধারণত অন্যকে শোষণ করে না। বরং সাম্রাজ্যবাদী, জমিদার এবং মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা তাদের শোষণ করে। ধনী চাষীদের কড়া শাসনের মধ্যে হাত-পা বাঁধার মতো করে রাখতে হবে। মধ্য চাষীরা নিজেরা মেহনত করেই রোজগার করে। কিন্তু ধনী চাষীরা নিজেরা মেহনত করলেও প্রধানত নির্ভর করে ভাড়াটে ক্ষেতমজুর, সুদখোরি এবং জমির খাজনার ওপর। তাই তারা শোষক। তারা বিপ্লবের পক্ষে কখনও কখনও আসতে পারে। তবে বিপ্লবীদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। মাঝারি আর ছোটো শিল্পের মালিকদের এবং মাঝারি আর ছোটো ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, জমিদার শ্রেণীকে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। মাও ৎসে-তুং-এর এই নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিপ্লব জোরদার হয়ে ওঠে এবং বহু যুগের সামন্তশোষণের জাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং নতুন করে বিলি করার ব্যাপারে যেসব ভুল হচ্ছিল তা মাও ৎসে-তুং শুধরে দিলেন। এ কাজে যাতে অধিকাংশ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় তাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। "সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত কর" নীতিটা তিনি তাই পাল্টে দিতে বললেন। পরে দাঁড়াল, "সমস্ত সরকারী জমি এবং জমিদার শ্রেণীর জমি বাজেয়াপ্ত কর।" জমিদাররা যেসব জমি চাষীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেগুলো গরীব চাষী আর ক্ষেত-মজুরদের দেওয়া হল। মহাজনদের কাছে চাষীদের কয়েক পুরুষের ঋণ সুদে-আসলে বেড়ে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবী সরকার এক ফুঁয়ে সে ঋণের বোঝা উড়িয়ে দিল—কোনও ঋণ আর থাকল না। অধিকাংশ মধ্য-চাষী আরও জমি পেল এবং বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে সামিল হল। মাঝারি আর ছোটো শিল্প-মালিক আর ব্যবসায়ীরা নানা রকমের অন্যায় ট্যাক্সের

হাত থেকে রেহাই পেয়ে উন্নতি করতে লাগল। সুতরাং তারা আনন্দের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকারের পেছনে এসে দাঁড়াল। কৃষি বিপ্লবের ফলে চাষীদের চাষের উৎসাহ চরমে উঠল। জমিদারী স্বার্থে যেসব জমি নষ্ট করা হয়েছিল সেগুলোতে আবার চাষ হল আর অনেক পোড়ো জমি উদ্ধার করে চাষ করা হল। ফলন হু হু করে বেড়ে গেল। গ্রামকে যেন আর চেনা যায় না। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার গ্রামগুলোতে জমিদারী শোষণ শেষ হয়ে গেছে, বিপ্লববিরোধীদের ঠাণ্ডা করা হয়েছে, লাল ফৌজ প্রবল হয়ে উঠেছে। নতুন দিন, নতুন গ্রাম, নতুন জীবন—এই হল বিপ্লবের দান। কিন্তু পুরোনো চিয়াং এবং আরও পুরোনো সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের মুৎসুদ্দিরা রয়েছে—শহরগুলোতে যাদের ঘাঁটি। এই পুরোনো শয়তানরা কি চুপ করে বসে থাকতে পারে? চিয়াং-এর নেতৃত্বে কুয়োমিনতাং ঠিক করল বিপ্লবী ঘাঁটিগুলোকে সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে বোলতার বাসার মতো পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলতে হবে। তার মানে কুয়োমিনতাং রীতিমত ভয় পেয়েছে।

১৯৩০-এর শেষাশেষি এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে কেন্দ্রীয় বিপ্লবী ঘাঁটির বিরুদ্ধে এক "ঘেরাও" যুদ্ধ শুরু করল। সেখানে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা চল্লিশ হাজারের বেশি নয়। অর্থাৎ চিয়াং সৈন্য লালদের ডবলেরও বেশি। কিন্তু দক্ষিণ চীনের কিয়াংসি প্রদেশে নিংতু নামে একটি জায়গায় মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে লাল ফৌজ আচমকা আক্রমণ করে চিয়াং-ফৌজের ন' হাজার লোককে বন্দী করে ফেলল। এর মধ্যে বেশ কিছু অফিসারও ছিল। শত্রু ছত্রভঙ্গ হয়ে লাল ফৌজের তাড়া খেয়ে পালাতে আরম্ভ করল। "ঘেরাও" খতম।

চিয়াং দমবার নয়, দমলেও প্রভুরা তাকে দম ফেলতে দেবে না। ১৯৩১-এর এপ্রিলে চিয়াং আবার "ঘেরাও" যুদ্ধের জন্যে সৈন্যদল পাঠাল। আগের বার পাঠিয়েছিল এক লাখ, এবার পাঠাল দুই লাখ। এবারেও সেই একই জায়গায় লড়াই—দক্ষিণ চীনে কেন্দ্রীয় বিপ্লবী ঘাঁটিকে ঘিরে। চোদ্দ দিনের লড়াইতে লাল ফৌজ দু'লাখকেও চূড়ান্ত ভাবে হারিয়ে দিল। অবশ্য লাল ফৌজের অনেককে এই সব লড়াইতে শহীদ হতে হল। চল্লিশ হাজারের ফৌজ ত্রিশ হাজারে নেমে এল। শহীদের রক্তের দামেই স্বাধীনতা কিনতে হয়।

লাল ফৌজকে অন্য জায়গা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করার এবং বিশ্রাম করার সুযোগ না দিয়ে চিয়াং আবার আক্রমণ করল। আমরা এক লাখের পর দু'লাখ দেখেছি, এবারে তিন লাখ। ১৯৩১-এর জুলাইতে এই তিনলাখী হামলা শুরু হয়। এবারে আর অন্যের ওপর ভরসা না করে স্বয়ং চিয়াং সেনাপতি হয়ে এসেছেন, সঙ্গে বৃটিশ, জার্মান এবং জাপানী পরামর্শদাতার দল—এঁরা যুদ্ধবিদ্যার বড়ো বড়ো পণ্ডিত। লাল ফৌজ গোঁড়া পদ্ধতিতে লড়াই করে না, তাদের সামনা-সামনি পাওয়া মুস্কিল, কখন কোত্থেকে এসে যে হঠাৎ আঘাত হানবে কিছু বলা যায় না। সুতরাং তাদের সঙ্গে চিয়াং বাহিনী পারবে কেন? চিয়াং-এর মূল বাহিনীকে এড়িয়ে গিয়ে লাল ফৌজ অন্যত্র তার ছোটো ছোটো দলকে বেকায়দায় পেয়ে সাবাড় করে দিল। তিনটি যুদ্ধের তিনটিতেই লাল ফৌজের জয় হল, ত্রিশ হাজারেরও বেশি চিয়াং সৈন্য মারা পড়ল, বাকীরা লাল হাতুড়ির প্রচণ্ড মারের চোটে আতঙ্কে পিছু হটল। শুধু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাল্টা 'ঘেরাও' অভিযানেই লাল সেনারা কেড়ে নিল শত্রুর তিরিশ হাজার রাইফেল। চিয়াং-এর তৃতীয় অভিযান এই ভাবে শেষ হল।

॥ লাল ঘাঁটি ॥

চীন বিপ্লবের শত্রুরা খুব শক্তিশালী। এই শত্রুরা কারা? শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদীরা আর প্রবল সামন্তশ্রেণীর লোকেরা তো আছেই, কখনও কখনও তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা এসে যোগ দেয় এবং জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সুতরাং কেউ যদি চীনের বিপ্লবী জনগণের শত্রুদের ক্ষমতাকে খাটো করে দেখে তাহলে ভুল হবে। কথাগুলো বলেছেন মাও ৎসে-তুং তাঁর "চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" লেখাটিতে।

তিনি আরও বলেছেন, এহেন শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চীন বিপ্লবকে দীর্ঘস্থায়ী এবং নিষ্ঠুর হতেই হবে। অন্য কোনও পথ নেই। শত্রু শক্তিশালী হওয়ার দরুন বিপ্লবী শক্তিগুলোকে গড়ে তোলা এবং শত্রুকে ধ্বংস করবার মতো শক্ত করে তোলা দু'চার দিনের কাজ নয়। এ কাজের জন্যে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করতে হবে। এই শত্রুরা এমন নিষ্ঠুরভাবে বিপ্লবকে দাবিয়ে দেয়

যে, বিপ্লবী শক্তিগুলো শত্রুর ঘাঁটি দখল করা দূরে থাকুক নিজেদের ঘাঁটিই রক্ষা করতে পারবে না যদি না তারা নিজেদের ইস্পাতের মতো শক্ত করে গড়ে তোলে এবং চরম নাছোড়বান্দা হয়ে লড়ে। তাই চোখের নিমেষে চীন বিপ্লবের শক্তিগুলোকে গড়ে তোলা যাবে এ কথা ভাবা ভুল। রাতারাতি চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম সফল হবে এই ধারণাও ভুল।

মাও ৎসে-তুং বলেছেন, এহেন শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চীন বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার বা রূপ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম নয়। কারণ আমাদের শত্রুরা চীনের জনগণের পক্ষে শান্তিপূর্ণ কাজকর্ম অসম্ভব করে তুলেছে এবং তাদের সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। 'চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে লড়ছে। চীন বিপ্লবের বিশেষ লক্ষণগুলোর মধ্যে এবং সুবিধেগুলোর মধ্যে এটা একটা।'*

মাও ৎসে-তুং বললেন, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল। সুতরাং সশস্ত্র সংগ্রাম, বিপ্লবী যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ এবং সেনাবাহিনীর কাজকে খাটো করে দেখানো ভুল হবে। তিনি আরও বললেন, এহেন শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে প্রশ্নটার মোকাবেলা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার প্রশ্ন। চীনের প্রধান প্রধান শহরগুলো অনেক দিন ধরে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদীদের এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চীনে সাঙ্গাৎদের দখলে আছে। এই অবস্থায় বিপ্লবী কর্মীদের কর্তব্য কি? তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পিছিয়ে থাকা গ্রামগুলোকে এগিয়ে চলা, ঐক্যবদ্ধ ঘাঁটি এলাকায়, বিপ্লবের বিরাট সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্গে পরিণত করা। এই দুর্গ থেকে সেই চরম বজ্জাত শত্রুদের সঙ্গে লড়তে হবে যারা গ্রামাঞ্চলকে আক্রমণ করবার জন্যে শহরগুলোকে ব্যবহার করছে। এইভাবে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে বিপ্লবকে সম্পূর্ণ সফল করতে হবে। এটা তাদের অবশ্য করণীয় কাজ যদি তারা সাম্রাজ্যবাদ ও তার গোলামদের সঙ্গে আপোষ করতে না চায়, বরং চায় সংকল্পে স্থির থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যদি তারা চায় তাদের শক্তিগুলোকে গড়ে তুলতে ও মজবুত করতে এবং নিজেদের শক্তি যখন উপযুক্ত নয় তখন শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা এড়িয়ে যেতে।

* স্তালিন: 'চীন-বিপ্লবের ভবিষ্যৎ"।

এই যখন অবস্থা তখন চীন বিপ্লবে জয়লাভ করা যাবে প্রথমে গ্রামাঞ্চলে। সেটা এই জন্যে সম্ভব হবে যে, চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ অসম অর্থাৎ সব জায়গায় সমানভাবে হয়নি। কারণ চীনেব অর্থনীতি ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়। তাছাড়া তার এলাকা বিশাল। ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলো তাদের কায়দামতো ঘোরাফেরার ব্যাপারে যথেষ্ট জায়গা পাবে। আর প্রতিবিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচুর দ্বন্দ্ব আছে এবং যে কৃষকরা বিপ্লবের প্রধান শক্তি তাদেব সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু এর আরেকটা দিক আছে। এই সব কারণ বিপ্লবকে করে অসম এবং পূর্ণ জয়লাভের কাজকে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর পরিশ্রমের ব্যাপার করে তোলে। তাহলে পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা-গুলোতে দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রাম হচ্ছে প্রধানত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ। সেই জন্যে গ্রামাঞ্চলকে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করা, কৃষকদের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের কাজকে অবহেলা করা এবং গেরিলা যুদ্ধকে অবহেলা করা ভুল। কিন্তু মাও ৎসে-তুং বলেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের ওপব জোর দেওয়া মানে এই নয় যে অন্য ধরনের সংগ্রাম বাতিল করতে হবে। বরং সশস্ত্র সংগ্রাম সফল হতে পারে না যদি না তাকে অন্য ধরনের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আর গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকার কাজের ওপর জোর দেওয়া মানে এই নয় যে বড়ো বড়ো শহরে এবং শত্রুর অধীনে আছে এমন অন্যান্য বিশাল গ্রামাঞ্চলগুলোতে কাজ করা ছেড়ে দিতে হবে। বরং বড়ো বড়ো শহরে এবং এই সব অন্যান্য গ্রামাঞ্চলগুলোতে কাজ না করলে গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটি এলাকাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বিপ্লবের হার হবে। তাছাড়া বিপ্লবের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুর প্রধান ঘাঁটি বড়ো শহরগুলো দখল করা। ঐ শহরগুলোতে যথেষ্ট কাজ না করলে সে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে না। "চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম" লেখাটিতেও মাও ৎসে-তুং বলেছিলেন, "জেলা শহরগুলো এবং অন্য বড়ো বড়ো শহরের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে।"

মাও ৎসে-তুং-এর ওপরের কথাগুলো থেকে চীন বিপ্লবের একটা ছবি পাই। সে ছবিতে ঘাঁটি অঞ্চলগুলো জ্বল জ্বল করছে। বিপ্লবের দেশজোড়া জয়ের সূচনা হিসেবে বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতেই হবে। ১৯২৪-২৭-এর প্রথম

বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আমলে কুয়োমিনতাং-কমিউনিস্ট যুক্ত সরকার তৈরি হয়েছিল। তখন ঘাঁটি এলাকাগুলোর কেন্দ্র ছিল কতকগুলো বড়ো বড়ো শহর। তবুও ঘাঁটি এলাকাগুলো জোরদার করে তোলবার জন্যে শ্রমিক শ্রেণীব নেতৃত্বে প্রধানত কৃষকদের নিয়ে গণফৌজ গড়ে তোলা এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমি সমস্যার সমাধান কবা প্রয়োজন ছিল। ১৯২৭-এর পর কৃষি বিপ্লবের যুদ্ধের সময় দেখা গেল শহরগুলো সবই প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পরে পড়েছে। তাই কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধের ওপব নির্ভর করে গ্রামাঞ্চলেই প্রথম ঘাঁটি গডতে হল এবং সেগুলোকে বাড়িয়ে তুলতে হল। কারণ শত্রু গ্রামেই দুর্বল।

ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে না পারলে সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে এক জায়গা থেকে অ..ন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। স্থানীয় জনগণের সঙ্গে তাদের ঐক্য গড়ে উঠবে না। তাই শত্রুর হঠাৎ আক্রমণের মুখে তাদের হার মানতে হবে। সেই জন্যে মাও ৎসে-তুং তাঁর "চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম" লেখাটিতে বলছেন : অ.মাদেব অবশ্যই কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে খুব শক্ত ভিৎ গাড়বার চেষ্টা করতে হবে যাতে যখন শ্বেত সন্ত্রাস আঘাত হানবে তখন যেন নির্ভর কববার মতো নিরাপদ কিছু ব্যবস্থা আমাদের জন্যে থাকে—যাতে আমরা জয়লাভ করবই এমন একটা অবস্থায় নিজেদের এনে ফেলতে পারি।

চারদিকে সন্ত্রাস বা চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজত্ব। এই শয়তানী বেড়াজালের মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিসের ওপর নির্ভর করে শ্রমি · কৃষকের স্বাধীন সবকার বা লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম সম্ভব তা তিনি ঐ লেখাতেই বলেছেন। পাঁচটি জিনিস চাই : এক, একটা শক্ত গণভিত্তি অর্থাৎ জনগণের মধ্যে শক্ত ঘাঁটি। দুই, একটা শক্ত পার্টি সংগঠন। তিন, যথেষ্ট শক্তিশালী একটি লাল ফৌজ। চার, সামরিক অভিযানকে সাহায্য করে এমন "টেরেইন" বা ভূ-পৃষ্ঠ। অর্থাৎ দেখতে হবে জমির পিঠ কেমন। পাঁচ, বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধে।

চিংকাং পাহাড়কে ঘাঁটি এলাকা হিসেবে বেছে নেওয়াব কারণগুলো খুব পরিষ্কার। এই অঞ্চলে অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি শক্ত পার্টি সংগঠন ছিল। এলাকার জনগণ এবং বহু সংগ্রামে অভিজ্ঞ আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনীর ওপরও পার্টির প্রবল প্রভাব ছিল। চিংকাং পাহাড় অঞ্চলটা ছিল দুর্গের মতো—শত্রুর সেখানে ঢোকা অসম্ভব। কারণ খাড়া আকাশে উঠে গেছে

এমন পাহাড় আর ঘন বন অঞ্চলটাকে প্রহরীর মতো রক্ষা করছিল। ভূপৃষ্ঠ বা জমির পিঠের দিক থেকে চিংকাং-এর অবস্থা এই রকম ছিল। মাত্র পাঁচটি সরু পথ দিয়ে চিংকাং বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। তা ছাড়া এই অঞ্চলের জমি ছিল উর্বর এবং আশেপাশের অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধে ছিল অনেক। তাই লাল ফৌজের পক্ষে টাকাকাড়ি তোলা ও রসদ যোগাড় করা সহজ হয়েছিল। পরে অবশ্য অনেক ফৌজ এসে জড়ো হওয়াতে এবং শত্রুর ঘন ঘন আক্রমণের ফলে লাল সেনাদের প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাড করতে খুব কষ্ট হত। একটা বড়ো কথা হল যে চিংকাং এমন জায়গায় ছিল যে সেখানকার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব হুনান, হুপে এবং কিয়াংসি এই তিনটি প্রদেশের জনগণের ওপর পডবে।

মাও ৎসে-তুং-এর মতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব, সশস্ত্র ফৌজ এবং বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা—এই তিনটি দিক মিলে "শ্রমিক ও কৃষকের একটি সশস্ত্র স্বাধীন সরকার"-এব সাধারণ ধাবণা অথবা লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ধারণা রূপ নেয়। চেন পো-তা তাঁর "দশ বছরেব গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে" লেখাটিতে বলেছেন, আমরা লক্ষ্য করছি যে মাও ৎসে-তুং যখন কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে হুনানের রিপোর্ট লিখেছিলেন তখনকার তুলনায় মাও ৎসে-তুং এর চিন্তা বিরাট পা ফেলে সামনেব দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মাও ৎসে-তুং দেখালেন যে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাব ধারণাকে রূপ দেবার জন্যে "পুট্শ্-ইজম" বা হঠকারী কায়দায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা এবং "লিকুইডেশন-ইজম" বা পার্টিকে তুলে দেওয়া অর্থাৎ বরবাদ করা এই দুটোরই বিরোধিতা করা দরকার। "লোক্যাল-ইজম" বা আঞ্চলিক সংকীর্ণতা এবং ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এমন বিদ্রোহী দলের মনোভাব এই দুটোরও বিরোধিতা করা দরকার। মাও ৎসে-তুং ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে কুতিয়েন সম্মেলনে তাঁর প্রস্তাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এমন বিদ্রোহী বাহিনীর মতাদর্শ সম্বন্ধে বললেন, "এই মতাদর্শ এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে: এক, কিছু লোক কেবল ঘুরে ঘুরে গেরিলা 'অ্যাকশন' করে আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে চায় কিন্তু ঘাঁটি এলাকা গড়ার পরিশ্রমের কাজের এবং জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে এই প্রভাব বাড়াতে অনিচ্ছুক। দুই, লাল ফৌজকে বাড়াবার ব্যাপারে স্থানীয় লাল রক্ষীদের

আর আঞ্চলিক সেনাবাহিনীকে বাড়ানো এবং এই ভাবে লাল ফৌজের মূল বাহিনীকে বাড়িয়ে তোলার লাইন না নিয়ে কিছু লোক "মানুষ ভাড়া করা আর ঘোড়া কেনা"-র আর সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছে এমন লোকদের "রংরুট হিসেবে নেওয়া আর বিদ্রোহীদের গ্রহণ করা"-র লাইন নেয়। তিন, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ধৈর্য কিছু লোকের থাকে না এবং তারা প্রাণ ভরে খানাপিনা করবার জন্যে শুধু বড়ো বড়ো শহরে যেতে চায়। এই সব ঘটনা—যা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এমন বিদ্রোহী বাহিনীর মতাদর্শ থেকে জন্ম নেয়—লাল ফৌজকে তার নির্দিষ্ট কর্তব্য করার ব্যাপারে বাধা দেয়। ফলে এই মতাদর্শকে নির্মূল করা লাল ফৌজের পার্টি সংগঠনের মধ্যেকার মতাদর্শের সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।" মাও ৎসে-তুং দেখিয়ে দিলেন, "সংশোধনের উপায়গুলো এই : এক, শিক্ষা দেওয়ার কাজকে আবও বাড়িয়ে তোলো, ভুল ধারণাগুলোর সমালোচনা কর, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এমন বিদ্রোহী বাহিনীর মতাদর্শকে নির্মূল কর। দুই, ভবঘুরে মনোভাবের পাল্টা হিসেবে লাল ফৌজের মূল বিভাগ-গুলোতে এবং সম্প্রতি ফৌজে ভর্তি করা হয়েছে এমন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার কাজকে আরও বাড়িয়ে তোলো। তিন, লাল ফৌজের গঠন বদলাবার জন্যে সংগ্রামে অভিজ্ঞ সক্রিয় শ্রমিক ও কৃষকদের সাধারণ সৈনিক হিসেবে তাতে যোগ দেওয়াও। চার, জঙ্গী শ্রমিক ও ক[illegible]ক জনতার মধ্যে থেকে লাল ফৌজের নতুন নতুন ইউনিট গড়ে তোলো।"

লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ধারণাটি মাও ৎসে-তুং তাঁর "একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে" লেখাটিতে এই ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন : চীন এমন একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ যার জন্যে অনেকগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। এই জিনিসটা যদি কেউ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে তাহলে সে কতকগুলো জিনিস বুঝতে পারবে। এক, বুঝবে কেন একমাত্র চীন দেশেই শাসকশ্রেণীগুলোর মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে জটপাকানো যুদ্ধবিগ্রহের এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায় যা সচরাচর দেখা যায় না, কেন এই যুদ্ধবিগ্রহ নিশ্চিত ভাবে দিনের পর দিন আগের চাইতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে আর ছড়িয়ে পড়ছে এবং কেন কোনও দিন একটা ঐক্যবদ্ধ সরকার গড়ে ওঠেনি। দুই, কৃষক সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং তা থেকে বুঝতে পারবে গ্রামাঞ্চলের বিদ্রোহ আজ সারা দেশ জুড়ে কেন বেড়ে চলেছে।

তিন, শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার শ্লোগান যে নির্ভুল তা বুঝতে পারবে। চার, আরেকটি অসাধারণ ঘটনাও বুঝতে পারবে যা চীনের বাইরে দেখা যায় না। এই ঘটনাটি হচ্ছে লাল ফৌজ ও গেরিলা বাহিনীগুলোর অস্তিত্ব ও ক্রমে বেড়ে ওঠা এবং সেই সঙ্গে শ্বেত অর্থাৎ প্রতি-ক্রিয়াশীল সরকারের এলাকা দিয়ে ঘেরাও হয়ে থাকা ছোটো ছোটো লাল এলাকার অস্তিত্ব ও ক্রমে বেড়ে ওঠা। চীনের শাসকশ্রেণীগুলোর মধ্যেকার দীর্ঘস্থায়ী এবং জটপাকানো যুদ্ধবিগ্রহের জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে। পাঁচ, আধা-ঔপনিবেশিক চীনে লাল ফৌজ, গেরিলা বাহিনী এবং লাল এলাকা-গুলোর প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ, সেটা যে আধা-ঔপনিবেশিক কৃষক সংগ্রামের বেড়ে ওঠার অনিবার্য ফল এবং সেটা যে নিঃসন্দেহে সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবী জোয়ারের গতিবেগকে বাড়িয়ে তোলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা বুঝতে পারবে। ছয়, বুঝতে পারবে যে ঘুরে ঘুরে গেরিলা 'অ্যাকশন' করার নীতি এই দেশজোড়া বিপ্লবী জোয়ারের গতিবেগকে বাড়িয়ে তোলার কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারে না আর বুঝবে যে চু তে ও মাও ৎসে-তুং ও ফ্যাং চি-মিন (যিনি উত্তর-পূর্ব কিয়াংসির ঘাঁটি এলাকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৯৩৫-এর জুলাই মাসে কুয়োমিনতাং দস্যুদের হাতে শহীদ হন—লেখক) যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে নির্ভুল—অর্থাৎ ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠার নীতি, নিয়মিত ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলার নীতি, কৃষি বিপ্লবকে আরও গভীরে পাঠাবার নীতি, জনগণের সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে ব্যাপক ভাবে ধাপে ধাপে গড়ে তুলবার নীতি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছড়িয়ে দেবার নীতি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর মাও ৎসে-তুং সোজাসুজি বললেন, "একমাত্র এই ভাবেই দেশময় বিপ্লবী জনতার আত্মবিশ্বাসকে গড়ে তোলা সম্ভব, যেমন করে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন তা বিশ্বময় গড়ে তুলেছে। একমাত্র এই ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলোকে ভীষণ বিপদের মধ্যে ফেলা, তাদের ভিৎ কাঁপিয়ে দেওয়া এবং তাদের ভেতরে তাড়াতাড়ি ছত্রভঙ্গ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব। একমাত্র এইভাবে সত্যি সম্ভব এমন একটি লাল ফৌজ গড়ে তোলা যেটা হবে ভবিষ্যতের বিরাট বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একমাত্র এই ভাবেই বিপ্লবের প্রবল জোয়ারকে তাড়াতাড়ি এনে ফেলা সম্ভব।" লাল এলাকা তৈরির পুরো প্ল্যানটা মাথায় রেখে মাও ৎসে-তুং এর নেতৃত্বে

চীনের কমিউনিস্টরা কাজে হাত দিলেন। তাঁদের গভীর বিশ্বাস লাল এলাকা গড়ে তুলতে পারলে আর তাকে বাড়িয়ে তুলতে পারলে দেশ জুড়ে বিপ্লবের উত্তাল জোয়ার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

তখন গোটা দেশে জনগণের এতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, শ্রমিক, কৃষক এমন কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদেরও কথা বলার স্বাধীনতা পর্যন্ত নেই। এক জায়গায় জড়ো হওয়াও তখন অপরাধ। আর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার মতো খারাপ কাজ দুনিয়াতে নেই। বিপ্লবের এই দারুণ দুর্দিনে মাও ৎসে-তুং গড়ে তুললেন লাল এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা। সে এলাকা বেড়েই চলল। তখনকার পৃথিবীতে চীনই একমাত্র দেশ যেখানে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

॥ লাল এলাকা টি কবে তো ॥

চারদিকে শ্বেত এলাকা মানে চরম প্রতিক্রিয়াশীল এলাকা—সাম্রাজ্যবাদের দালাল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর সামন্তদের এলাকা। এহেন শয়তানী বেড়াজালের মধ্যে লাল রাজনৈতিক শক্তির দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার কথা এমনিতে ভাবাই যায় না। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যা কখনও ঘটেনি তা চীনে কেমন করে ঘটল? মাও ৎসে-তুং ১৯২৮-এর অক্টোবরে তাঁর "কেন লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা টিঁকে থাকতে পারে" লেখাটিতে চীনে লাল রাজনৈতিক শক্তি টিঁকে থাকার এবং বেড়ে ওঠার পাঁচটি কারণ দেখিয়েছেন।

এক, কোনও সাম্রাজ্যবাদী দেশে বা সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি শাসনের আওতায় কোনও উপনিবেশে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে কেবল চীনে যে দেশ অর্থনীতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, আধা ঔপনিবেশিক দেশ এবং যেখানে একটু আড়াল রেখে সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন চালায়।

মাও ৎসে-তুং ১৯২৮এ এই কথাগুলো বলেছিলেন। পরে রাজনৈতিক অবস্থা অনেক বদলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের অধীন পূবের অনেক উপনিবেশ হাত বদলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ হয়ে গেল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ঐ সব দেশের

কমিউনিস্টরা ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুললো এবং বীরের মতো গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের অবস্থা আর রইল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ঐ সব দেশ থেকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হল। আগের 'প্রভুরা' অর্থাৎ আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ড ঐ সব দেশের ওপর নতুন করে তাদের দখল কায়েম করতে চাইল। কিন্তু জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সেসব দেশের জনগণ সশস্ত্র ফৌজ গড়ে তুলেছিল। তাই এখন তাদের মেজাজ আলাদা — তারা পুরোনো কায়দায় জীবন কাটাতে চাইল না। এদিকে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়ে উঠল, আমেরিকা ছাড়া সব সাম্রাজ্যবাদী দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে দুর্বল না হয় উৎখাত হল, আর শেষ পর্যন্ত চীন বিপ্লব জিতে যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে ফাটল ধরল। পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভীষণ ধাক্কা খেল। এই নতুন অবস্থায়, চীনের মতোই এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে জনগণের পক্ষে ঘাঁটি এলাকা ও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা এবং বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

মাও ৎসে-তুং শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেকার লড়াই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন, আমরা যদি চীনের এই বৈশিষ্টটুকু বুঝি যে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর সাহায্য পায় এমন নতুন ও পুরোনো যুদ্ধবাজদের মধ্যে ভাঙ্গন ও যুদ্ধ অনবরত চলবে তাহলে লাল রাজনৈতিক শক্তির জন্ম, টি কে থাকা এবং দৈনিক ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকবে না। তবে প্রতি-দিন যুদ্ধবাজদের মধ্যে যুদ্ধ চলে না। যখনই এক বা একের বেশি প্রদেশে শ্বেত ক্ষমতা অল্পদিনের জন্যে স্থায়ী হয় তখনই তারা লাল অঞ্চলগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যখন সাময়িক ভাবে স্থায়ী হয় তখনও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে বিপ্লবীরা ব্যবহার করে বিপ্লবকে বাঁচাতে পারে। মাও ৎসে-তুং দেখিয়ে দিলেন যে, এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে প্রতিক্রিয়ার ঐ রকম সুদিনে হুনান ও কিয়াংসির শাসকেরা ঐক্য গড়ে লাল এলাকার বিরুদ্ধে যখন আক্রমণ চালালো তখন বিপ্লবীরা ঐ দু'দল শাসকের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে দু'দলকেই ধ্বংস করল।

দুই, মাও ৎসে-তুং বলেছেন, জেচুয়ান, কোয়েইচাউ, ইউন্নান এবং উত্তরের

প্রদেশগুলোতে যেখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব পড়েনি সেখানে কিন্তু লাল রাজনৈতিক শক্তির প্রথম আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটেছিল হুনান, কোয়াংতুং, হুপে এবং কিয়াংসি প্রদেশে যেখানে শ্রমিক-কৃষক জনতা ও সৈনিকরা ১৯২৬ এবং ১৯২৭-এর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় বিপুল সংখ্যায় বিদ্রোহ করে। এই সব প্রদেশের অনেক অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সমিতি ব্যাপক ভাবে গড়ে তোলা হয় এবং জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক জনতা অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালায়। এই কারণেই ক্যান্টন শহরে জনসাধারণ তিন দিন ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রেখেছিল এবং হাইফেং এবং লুফেং-এ, পূব ও দক্ষিণ হুনানে, হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলে এবং হুপে প্রদেশের হুয়ানগানে কৃষকদের স্বাধীন শাসন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়েছিল।

তিন, ছোটো ছোটো এলাকায় জনগণের রাজনৈতিক শক্তি স্থায়ী হওয়া সম্ভব কিনা তা নির্ভর করে দেশজোড়া রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার ওপর। যদি এগিয়ে যায়, তাহলে ছোটো ছোটো লাল এলাকা নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল টিঁকে থাকবে এবং তার চেয়েও বড়ো কথা দেশজোড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অনেকগুলো শক্তির মধ্যে একটা শক্তি হয়ে উঠবে। যদি দেশজোড়া বিপ্লবী অবস্থা না এগিয়ে চলে, বেশ দীর্ঘকাল ধরে থিতিয়ে থাকে, তাহলে ছোটো ছোটো লাল এলাকার পক্ষে দীর্ঘকাল টিঁকে থাকা অসম্ভব হবে। মুৎসুদ্দি ও জমিদার শ্রেণীর এবং আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর দলবলের নিজেদের মধ্যে অবিরাম ভাঙ্গন ও লড়াইর সঙ্গে সঙ্গে চীনের বিপ্লবী অবস্থা বাস্তবিক পক্ষে অনবরত এগিয়ে চলেছে। সুতরাং ছোটো ছোটো লাল এলাকাগুলো নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল টিঁকে থাকবে এবং বেড়েও যেতে থাকবে আর দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যের দিকে ক্রমে অগ্রসর হবে।

চার, একটি যথেষ্ট শক্তিশালী পুরোদস্তুর লাল ফৌজ না থাকলে লাল রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। যদি আমাদের শুধু স্থানীয় লাল রক্ষীবাহিনী থাকে কিন্তু নিয়মিত লাল ফৌজ না থাকে তাহলে আমরা নিয়মিত শ্বেত বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠব না, পারব শুধু জমিদারদের বাহিনীর সঙ্গে। সুতরাং যদিও শ্রমিক ও কৃষক জনতা সক্রিয় তবু ঘাঁটি এলাকা সৃষ্টি করা যাবে না, যে ঘাঁটি এলাকা স্থায়ী এবং রোজ বেড়ে চলেছে তার কথা তো

ওঠেই না, যদি যথেষ্ট শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনী আমাদের না থাকে। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে "সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠার" আদর্শ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ যে কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং ঘাঁটি এলাকার আওতায় পড়ে এমন অঞ্চলের শ্রমিক ও কৃষক জনতাকে তা পুরোপুরি বুঝতে হবে।

পাঁচ, লাল রাজনৈতিক শক্তির দীর্ঘদিন টিঁকে থাকা ও বেড়ে ওঠার জন্যে ওপরের শর্তগুলো ছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে এই যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন মজবুত হতে হবে এবং তার নীতি সঠিক হতে হবে।

চীন দেশের বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করে মাও ৎসে-তুং লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার এই তত্ত্ব প্রচার করেন। সর্বহারার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে ছোটো বড়ো বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা এবং লাল শাসন শক্ত হাতে রক্ষা করা, দীর্ঘদিন ধরে বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, শক্তি সঞ্চয় করা, গ্রামাঞ্চল থেকে বড়ো বড়ো শহরগুলোকে ঘেরাও করা, এবং তারপর ক্রমে এগিয়ে গিয়ে বড়ো বড়ো শহরগুলোকে দখল করা এবং দেশ জুড়ে বিপ্লবকে সফল করা এই তত্ত্বের সার কথা।

লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার এই তত্ত্বটি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার তত্ত্বও বটে। এই বিপ্লবী সংগ্রাম হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম—যে সংগ্রাম বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা থেকে চালিয়ে যাওয়া হবে। স্তালিন বলেছিলেন, চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে লড়ছে। মাও ৎসে-তুং স্তালিনের শিক্ষাকে হাতে-কলমে আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর "চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম" লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং বললেন: অর্থনীতির দিক থেকে চীন একটি কৃষি প্রধান দেশ। চীন বিপ্লবের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সামরিক কাজের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহকে বাড়িয়ে তোলা।

১৯২৭-এ বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর পার্টির সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে পিছু হটল। পিছু হটার পথে জায়গায় জায়গায় কিছু ঘাঁটি বেছে নিয়ে তারা ঠিক করল যে সেগুলোকে কিছুতেই শত্রুর হাতে পড়তে দেবে না। ফলে তাদের ক্ষতি হল খুবই সামান্য। ১৯২৭-এর বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে মাও ৎসে-তুং পিছু হটার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে

যাওয়ার পথ দেখালেন। এক দিক থেকে দেখলে যাকে পিছু হটা মনে হবে অন্যদিক থেকে বিচার করলে তাকেই এগিয়ে চলা বোঝাবে। চেন পো-তা তাঁর "দশ বছরের গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে" লেখাটিতে বলেছেন, মাও ৎসে-তুং পিছু হটার পথে একটি নির্দিষ্ট গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র হিসেবে ঠিক করে নিলেন—যে অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলো অন্য অঞ্চলের তুলনায় দুর্বল এবং নানা দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন এবং যেখানে বিপ্লবী শক্তিগুলোর পক্ষে কায়দামতো ঘোরাফেরা করা এবং শক্তি সঞ্চয় করার অনেক সুবিধে। চিংকাং পাহাড়ের দিকে মার্চ বিশ্বের বিপ্লবী ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত মার্চগুলোর মধ্যে একটি। গোড়া থেকেই এই মার্চ ছিল একই সঙ্গে পিছু হটা এবং নতুন অগ্রগতির পথে এগিয়ে দেওয়া। যখন মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে সশস্ত্র ফৌজ চিংকাং-এর দিকে এগিয়ে গেল তখন শত্রুর সবটুকু নজর তার ওপরই গিয়ে পড়ল। ফলে দেশের অন্যত্র বিপ্লবী শক্তি শত্রুর নজর এড়িয়ে পিছু হটার সুযোগ পেল। তাই চিংকাং অভিযান শুধু পিছু হটছে এমন বাহিনীকে রক্ষা করল না সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবকে বাঁচাল। এই পিছু হটা নতুনভাবে এগিয়ে চলার পথ করে দিল। সেই এগিয়ে যাওয়াকে আমরা দেখলাম কৃষি বিপ্লব, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠার মধ্যে রূপ নিতে। বিপ্লব শহর-গুলোকে হারালেও গ্রামগুলোকে জয় করল—চিংকাং-এর স্ফুলিঙ্গ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

॥ জাপানী দস্যুর বিরুদ্ধে ॥

ড্র্যাগনের নাক-মুখ থেকে নাকি আগুনের স্রোত বার হত—মানুষ মরত, সব কিছু ছারখার হয়ে যেত। অবশ্য এটা অতীতের রূপকথা। আজকের যুগের সত্যি কথা হচ্ছে এই যে জাপানে "কালো ড্র্যাগন সমিতি" বলে এক সমিতি ছিল। এই সমিতির জিভ লক লক করত মাঞ্চুরিয়া, মংগোলিয়া এবং সোভিয়েতের পূর্বাঞ্চল গ্রাস করবার জন্যে। ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপানী ড্র্যাগন মাঞ্চুরিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সময়টা জাপান ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিল। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো

এবং আমেরিকা তখন বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকটের ফলে বেশ বিপদে আছে —ঘর সামলানোই দায়, অন্য দেশের দিকে মনোযোগ দেবার মতো অবস্থা তাদের নেই। এই সময়ই চীনের ওপর আক্রমণ করার উপযুক্ত সময়। ১৯২৯-এর শেষ থেকে শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার মস্ত অর্থনৈতিক সংকট। আগে কখনও এতদিন ধরে এমন সংকট দেখা দেয়নি।

আমেরিকার কলকারখানার উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩২-এর শেষে ১৯২৯-এর তুলনায় শতকরা তিপ্পান্ন ভাগেরও বেশি কমে গেল। ব্রিটেন, জার্মানি আর ফ্রান্সেরও একই হাল হল। এই শিল্পসংকট কৃষি-সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের কৃষিসংকটও চরম রূপ নিল। সেখানকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। সব চেয়ে বড়ো কথা হল জগৎজোড়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে ইতিমধ্যেই গভীর ফাটল দেখা দিয়েছে। কারণ সোভিয়েৎ ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দিনদিনই জোরদার হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। শিল্প ও কৃষিতে সোভিয়েতের উন্নতি সবার তাক লাগিয়ে দিল। ১৯৩১এ সোভিয়েতের শিল্প উৎপাদন ১৯১৩-র তুলনায় শতকরা দু'শ চোদ্দ ভাগেরও বেশী বেড়ে গেল। সেখানকার কৃষিতে সমবায় আন্দোলনের জয়জয়কার। তাই সাম্রাজ্যবাদীরা মহা ফাঁপরে পড়ল। বিশ্বজোড়া এই অর্থনৈতিক সংকট সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলোর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিজয়ী দেশ আর হেরে যাওয়া দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশ আর উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর কৃষক এবং জমিদার শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তুললো। স্তালিন বললেন, বুর্জোয়ারা এই সংকটের হাত থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে দু'রমক কায়দা নেবে। এক, নিজের দেশের সর্বহারা এবং মেহনতী মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্যে চরম প্রতিক্রীয়াশীল ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব কায়েম করবে এবং রঙবেরঙের প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য নেবে। দুই, দুর্বল দেশগুলোর সর্বনাশ করে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে উপনিবেশ এবং প্রভাবের এলাকাগুলো নতুন ভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করবে। জাপানের শাসক শ্রেণী দেখল যে দেশের ভেতর তার বাজার বড়ো ছোটো। এদিকে জগৎজোড়া অর্থনৈতিক সংকট। জাপান ভাবল বিশাল চীনকে যদি উপনিবেশ হিসেবে পাওয়া যায় তবে মস্ত বাজার জুটবে। ইউরোপ

ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের দেশে সংকটের মধ্যে রয়েছে। আর দুর্বল চিয়াং সাম্রাজ্যবাদের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে ইংরেজ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য নিয়েই লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লড়ছিল। তাছাড়া কুয়োমিনতাং-এর মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। জাপান দেখলো এই তো মওকা। সে নয় শক্তির চুক্তি দু'পায়ে মাড়িয়ে চীনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

১৯৩০-এর জুনেই স্তালিন ঘোষণা করেছিলেন, "শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণ এবং যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই মুক্তি খুঁজবে।" চীনের কমিউনিস্টরা সেই পথই নিল।

১৮৯৭-তে চীন-জাপান যুদ্ধের পর থেকেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনকে আক্রমণ করার জন্যে পাঁয়তারা কষছিল। চতুর জাপানী ড্র্যাগন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও বিদেশীদের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিয়ে চীনের ওপরে হামলা করেছিল। চীনের উত্তর অঞ্চলে মাঞ্চুরিয়া। শিল্পের দিক থেকে চীনের সবচেয়ে এগিয়ে-যাওয়া এলাকা। তাই জাপানের শিকার হল মাঞ্চুরিয়া। জাপান হঠাৎ ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়ার শেনিয়াং বা মুকদেন আক্রমণ করল। ইতিহাসে এই ঘটনা "মুকদেন ঘটনা" নামে পরিচিত। চিয়াং জাপানকে রুখবার একটুও চেষ্টা করল না। বরং সে উত্তর-পূর্ব চীনের সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ পাঠাল তারা যেন জাপানী আক্রমণ রুখতে একেবারেই না যায় এবং উত্তর চীনে সরে আসে। চমৎকার "জাতীয়তাবাদী" সরকার! মুকদেন ঘটনার অল্প আগে চিয়াং প্রকাশ্যেই বলেছিল যে কমিউনিস্টদের সফল হতে দেওয়ার বদলে সে সাম্রাজ্যবাদীদেরই চীন দখল করতে দেবে। মাঞ্চুরিয়ার সৈন্যেরা কিন্তু জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে লাগল। বিরাট জাপানী বাহিনী পর পর জায়গা দখল করতে লাগল—শেনিয়াং (মুকদেন), লিয়াওনিং, কিরিন, হেইলুংকিয়াং। তিন মাসেরও কম সময়ে উত্তর-পূর্ব প্রদেশগুলো জাপানের দখলে চলে গেল। ক্রমে তারা সমস্ত দেশটাকে মুঠোর মধ্যে আনতে চাইল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম জনতাকে ডাক দিয়েছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। সে ডাক কোনও ফাঁকা আওয়াজ নয়—সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক। কমিউনিস্ট পার্টিই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জাপানী ড্র্যাগনের বিরুদ্ধে জনতার গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল, কোথাও বা সাহায্য করেছিল।

চীনের নানা অঞ্চলে জনসাধারণ চিয়াং-এর জাপানী দস্যুদের প্রশ্রয় দেওয়ার লজ্জাকর নীতির তীব্র প্রতিবাদ করতে লাগল। শাংহাই ও পিকিং-এর শ্রমিকরা আওয়াজ তুলল "জাপানকে রুখতে হবে, চীনকে বাঁচাতে হবে" এবং তারা জাপবিরোধী আন্দোলনের জন্যে সংঘ গড়ল, ভলান্টিয়ার বাহিনী করল এবং প্রচারের দল তৈরি করল। ১৯৩১-এর শেষের দিকে দেশের নানা জায়গা থেকে ত্রিশ হাজার ছাত্র নানকিং-এ জমায়েৎ হয়ে চিয়াং সরকারের কাছে দাবি জানাল জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। চিয়াং ছাত্রদের দাবির উত্তর দিল বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে। কিন্তু গণআন্দোলনকে এভাবে কোনও দিনই দাবানো যায়নি, এবারেও গেল না। পিকিং-এ দেশপ্রেমিক ছাত্ররা কুয়োমিনতাং পার্টি, সরকার এবং বিদেশ মন্ত্রীর সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দিল। শাংহাইয়ের শয়তান মেয়র আর পুলিশের বড় কর্তার বিচারের জন্যে ছাত্ররা গণআদালত বসাল। জাপবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগল। উত্তর-পূর্ব চীনে তখন লড়াই চলছে। কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে শেনিয়াং, আনশান, ফুশুন এবং হারবিন-এর শ্রমিকরা এবং রেলের মজুররা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে অস্ত্র হাতে চাষীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাপানী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে।

এই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জাপ-বিরোধী গেরিলা দল গড়ে উঠলো। কোথাও কোথাও স্বদেশপ্রেমিকরা জনতার গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়ল। ১৯৩১-এর অক্টোবরের শুরুতে জাপানী বাহিনী যখন হেইলুংকিয়াং আক্রমণ করলো তখন মা চান্-শানের নেতৃত্বে চীনে সৈন্যরা তাদের প্রচণ্ড বাধা দিল। শেষ পর্যন্ত তারা পিছু হটতে বাধ্য হলেও জনগণ তাদের কাজে দারুণ উৎসাহ পেল। চিয়াং লাল ফৌজকে আক্রমণ করার জন্যে ছাব্বিশ নম্বর রুট আর্মি নামে দশ হাজারের যে বাহিনীকে কিয়াংসিতে পাঠালো তারা ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে বিদ্রোহ করে লাল ফৌজের সঙ্গে হাত মেলালো। গেরিলারা ১৯৩২এ শেনিয়াং ও চীনচাউর মতো বড়ো বড়ো শহর আক্রমণ করে, রেল চলাচল বন্ধ করে, যেসব ঘাঁটিকে জাপানীরা মনে করত দুর্গম সেগুলোকে আঘাত হেনে কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু ক্রমে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ যেহেতু এদের স্বদেশপ্রেম আর "জাতীয়তাবাদী" চিয়াং-এর "স্বদেশপ্রেম" আলাদা সেই জন্যে চিয়াং সরকারের কাছ থেকে এরা কোনও সাহায্য পায় না। সংগঠনের দিক থেকেও এরা দুর্বল ছিল এবং কোনও সঠিক নেতৃত্ব পায়নি।

চিয়াং একমাত্র "জাপ-বিরোধী" কাজ করেছিল এই যে তখনকার জাতিসংঘ "লীগ অব নেশনস"-এর কাছে জাপানের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল। লীগ অমনি একটা কমিশন বসিয়ে দিল—লিটন কমিশন। এই কমিশনের ভদ্রলোকেরা সাম্রাজ্যবাদী জাপানের কুৎসিত আক্রমণকে এক হিসেবে সমর্থনই করলেন কারণ তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে এক অপূর্ব সিদ্ধান্ত করলেন, বললেন, "এই বিরোধের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো জড়িয়ে আছে সেগুলোকে যে-রকম সরল প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরা হয় ততো সরল সেগুলো নয়।" বাস্, আর কিছু বললেন না এই "সংযত ভদ্রলোকেরা।" সরল না হয়ে জটিলই না হয় হল, তা আপনাদের "মহাজ্ঞান" নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না? তবে লীগই বা কেন আর তার কমিশনই বা কেন? আসলে এই রকমের সব সংস্থাই সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে। এই "ভদ্রলোকেরা" আসলে অধিকাংশই দালাল। এঁদের এমন মৌনীবাবা হয়ে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে পশ্চিমী শক্তিগুলো এবং আমেরিকাও জাপানকে এখন ঘাঁটাতে চায় না। জাপানের জায়গা দখল আর শক্তিবৃদ্ধি যে তারা খুশি মনে গ্রহণ করছে তা নয় তবে তাদের মাথায় অন্য মতলব খেলছে। জাপান রাশিয়ার সীমানার কাছের জায়গা দখল করছে—এতো ভালো কথা। প্রতিবাদ করবে কেন বরং জাপানকে রাশিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে উৎসাহ দিতে হবে। যা করছে করুক। স্তালিনের সমাজতন্ত্রী রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করতে চায়—তাই এই নীতি। তাছাড়া জাপান জমির পর জমি গিলে করবে কি? সে জমিতে টাকা খাটাবে এত টাকা জাপানের নেই। ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিই সেখানে শেষ অবধি যাবে এবং মুনাফা লুটবে দেদার। জাপানীরা আপাতত চাষটা করুক, ফসল তুলবে ইউরোপ-আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা। সুতরাং সাত-পাঁচ অনেক ভেবে লিটন কমিশনের "ভদ্রলোকেরা" চুপ করে গেলেন।

কুয়োমিনতাং-এর বিশ্বাসঘাতকতা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহস যোগাল।" ১৯৩২-এর ২৮এ জানুয়ারী রাত্রির অন্ধকারে জাপানীরা একেবারে আচমকা শাংহাই আক্রমণ করে বসল। তখনও চিয়াং চুপ। জাপানীরা তুড়ি মেরে বলতো যে তারা নাকি চার ঘণ্টার মধ্যেই চীনের এই সবচাইতে বড় শহরটা দখল করতে পারে। কিন্তু "উনিশ নম্বর রুট আর্মি" নামে যে সৈন্যবাহিনী তখন শাংহাইতে ছিল তারা আশ্চর্য বীরত্বের সঙ্গে জাপানীদের রুখতে

লাগল। চিয়াং তাদের সাহায্য করবার জন্যে কোনও সৈন্য পাঠাল না। তার ইচ্ছা যে উনিশ নম্বর রুট আর্মি জাপানীদের সঙ্গে একা লড়ে ধ্বংস হয়ে যাক কারণ ঐ বাহিনী সরাসরি চিয়াং-এর তাঁবেদারদের অধীনে ছিল না। চিয়াং কেমন স্বদেশপ্রেমিক দেখলেন তো? বিদেশীদের দিয়ে স্বদেশের সৈনিকদের হত্যা করাতেই হবে! বুর্জোয়া 'স্বদেশপ্রেম' এই রকমই—ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। কিন্তু শ্রমিক, ছাত্র আর শাংহাইয়ের সাধারণ মানুষ উনিশ নম্বর রুট আর্মিকে সব রকমে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। জাপানীরা সর্বত্র হারতে লাগল। উনিশ নম্বর রুট আর্মি আর শাংহাইর জনসাধারণের জাপ-বিরোধী সংগ্রাম বিপ্লবী গণসংগ্রামের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। শাংহাইর মানুষ এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কারণ এ যে দেশ রক্ষার সংগ্রাম। কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে শ্রমিকরা ধর্মঘট করল, ব্যবসায়ীরা দোকান-পাটে তালা দিল। শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য নাগরিকরা ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করল। তাদের মধ্যে কোনও দল সশস্ত্র লড়াইয়ে যোগ দিল, কোনও দল প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ নিল, কেউ বা সৈনিকদের উৎসাহ দেবার জন্যে সংগীত নাটক ইত্যাদির আয়োজন করল। একটা দল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেকটা পেছনে থেকে প্রচারের কাজ আর চাঁদা তোলার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল আর যুদ্ধের সময় যে আরও একটা কাজ করা দরকার সেটাও করতে থাকল—দেশদ্রোহী শয়তানদের ওপর নজর রাখল। উনিশ নম্বর রুট আর্মির শাংহাই আপিস জনসাধারণের অসংখ্য উপহারে ভরে উঠল। যারা মানুষ দেশের বিপদে এমনিভাবেই তারা সাড়া দেয়। বিদেশ থেকেও চীনেরা চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাতে লাগল। এত মদৎ পেয়ে উনিশ নম্বর ফৌজ কঠিন প্রতিজ্ঞায় প্রাণপণ লড়তে লাগল। একলাখ জাপানী সৈন্যের মোকাবেলা করছে মাত্র চল্লিশ হাজার লোকের উনিশ নম্বর ফৌজ! সফল লড়াই লড়ছে—শাংহাইকে ঠিক রক্ষা করে চলেছে। জাতীয় বুর্জোয়ারা এবার প্রগতিশীল ভূমিকা নিল। তাদের পত্রিকা "শেন পাও" দাবি করল: কুয়োমিনতাং-এর রাজনীতি পাল্টাও, সোভিয়েতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলো, গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর, এক পার্টির একনায়কত্ব ধ্বংস হোক, অন্য পার্টিগুলোর কাজকর্মের ওপর বাধা-নিষেধ তুলে নাও, সারা দেশ এক হয়ে জাপানকে রোখো। কুয়োমিনতাং-এর দেশদ্রোহীরা উনিশ নম্বর ফৌজকে নতুন সৈন্য ও গোলা-

সোনালি বালির নদী তারপর, দুধারে পাহাড় খাড়া
সূর্যকিরণে ঝলমল জলধারা।
ছড়ানো লম্বা লোহার শেকল—খাদ পার হই তাতু নদীর,
মুঠোর ভেতর কি ঠাণ্ডা লোহা—তবু পৌঁছই অপর তীর।
আসে মিনশান—কতো না মাইল বরফ ধু ধু,
মার্চ, চলে মার্চ, জোর চলে মার্চ, মার্চই শুধু।

মাও ৎসে-তুং-এর কবিতা দিয়েই লং মার্চ শুরু হোক।

সুদীর্ঘ পথে যাত্রা শুরু। আট হাজার মাইলের কিছু বেশি—দক্ষিণ চীন থেকে উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনসি পর্যন্ত।

১৯৩৪-এর অক্টোবরে লং মার্চ আরম্ভ হয়। চিয়াং সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে লাল ফৌজ উত্তর চীনে অভিযান করল কেন? জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া দখল করার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিল গোটা দেশকে জাপ-বিরোধী লড়াইতে সামিল করতে। কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ যদিও চলছে তবু কমিউনিস্ট পার্টি জাপ-বিরোধী যে কোনও পার্টির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ার প্রস্তাব দেশের সামনে উপস্থিত করেছে। তারা এবারে কুয়োমিনতাং বাহিনীর ব্যূহ ভেঙ্গে উত্তরী অভিযানে মেতে উঠল। উদ্দেশ্য—উত্তর-পশ্চিম চীনে ঘাঁটি গেড়ে বেশ কাছে থেকে জাপানী সৈন্যদলের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানো হবে। এই লং মার্চের আওয়াজ ছিল "চীনেদের বিরুদ্ধে চীনেদের কিছুতেই লড়া উচিত নয়!" আর "জাপানকে রোখো!" এ থেকে কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হচ্ছে। মাও ৎসে-তুং তাঁর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সাহায্যে দেখতে পেয়েছিলেন যে ঐ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলটা অল্পদিনের মধ্যেই চীন, জাপান ও সোভিয়েৎ রাশিয়ার ভাগ্যকে বিপুলভাবে নাড়া দেবে।

কিয়াংসি ও ফুকিয়েন প্রদেশে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি-এলাকা। সেখান থেকে এবং অন্যান্য ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে লাল ফৌজ মার্চ শুরু করে। কেন্দ্রীয় ঘাঁটি-এলাকার মূল কেন্দ্র যুইচিনে তারা প্রথম শত্রুর ঘেরাও ভাঙে। বেরিয়ে আসবার সময় তারা কয়েক দল গেরিলাকে সে অঞ্চলে রেখে আসে। চিয়াং কাই-শেক পথে চার-চারটি জায়গায় তার সৈন্যদের দিয়ে বেড় দিয়ে এই জন-স্রোতকে ঠেকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে বাধা চুরমার করে বিপ্লবী ফৌজ

এগিয়ে চলে কিয়াংসি এবং ফুকিয়েন ছেড়ে কোয়াংতুং হয়ে দক্ষিণ হুনানে। হুনানের দক্ষিণে কোয়াংসি প্রদেশ। তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মিয়াও আর ইয়াও উপজাতির বাস পাহাড়ী এলাকা পার হয়ে কোয়েই চাউ প্রদেশের উচিয়াং নদীর ধারে লাল ফৌজ পৌঁছয়। এখানে তাদের সামনে দুটো প্রচণ্ড বাধা এসে দাঁড়াল। নদীই ভয়ানক একটা বাধা কারণ দারুণ স্রোত তার। দ্বিতীয় বাধা চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনী—তারা পাশের এক পাহাড়ের ওপর দিয়ে আগে ভাগে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। এক হাড়-কাঁপানো শীতের ভোরে লাল ফৌজ জোর করে নদী পার হয়ে গেল এবং খানিক দূরে সুনিয়ী বলে একটি জায়গা দখল করে সেখানে তখনকার মতো আস্তানা গাড়ল। ১৯৩৫-এর জানুয়ারী মাসে সুনিয়ীতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর সম্মেলন শুরু হল। লং মার্চের সময়ও নেতৃত্বের একের পর এক সামরিক ভুল-ত্রুটি হচ্ছিল। তাই লাল ফৌজকে বার বার বিপদে পড়ে অকারণ বড়ো বড়ো ক্ষতি সইতে হয়েছিল। মাও ৎসে-তুং লাল ফৌজ এবং চীন বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্যে সঠিক পথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুনিয়ীতে যে সম্মেলন হল তা চীনের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা। "বামপন্থী"দের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তখন থেকে মাও ৎসে-তুং-ই হলেন পার্টির নেতা এবং চীন বিপ্লব তাঁরই নেতৃত্বে এগিয়ে চলল। তাঁর নেতৃত্বই হল বিপ্লবের জয়ের সবচাইতে বড়ো গ্যারান্টি। সামরিক ক্ষেত্রে "বাম" ভুলগুলো দূর করা হল। সুনিয়ী সম্মেলনের পর পার্টি চলমান যুদ্ধের লাইন গ্রহণ করল এবং সৈন্যবাহিনীকে নতুন করে গড়ে তুলল।

সুনিয়ী থেকে উত্তরী অভিযান আবার পথে নাবল। দারুণ আঁকাবাঁকা পথে অভিযানকে এগোতে হল—কারণ যেমন প্রাকৃতিক বাধা তেমনি চিয়াং বাহিনীর উৎপাত। উত্তরে জেচুয়ান প্রদেশের মধ্যে ঢুকে আবার দক্ষিণে কোয়েই চাউতে নেবে এসে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউন্নান প্রদেশের মধ্যে দিয়ে চিয়াং-এর সৈন্যদের তুমুল মার লাগাতে লাগাতে লাল ফৌজ শেষ অবধি শত্রুকে অনেক পেছনে ফেলে চিনশা নদী পেরিয়ে সিকাং প্রদেশে গিয়ে পৌঁছল। আবার তাদের সামনে পাহাড়ী নদী আর চিয়াং সৈন্য। এই পাহাড়ী নদীর নাম তাতু। চিয়াং সৈন্য যে শুধু তাতুতে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে তাই নয়, বেশ কয়েক দল চিয়াং সৈন্য পেছনে পেছনে ধাওয়া করেও

এগোচ্ছে। চিয়াং-এর লোকেদের এবারে আশা হল যে ইঁদুরের মতো জাঁতা-কলে পড়ে লাল ফৌজ সত্যি লাল স্রোতে ডুবে যাবে।

তাতু নদীর ধারে ছোট্টো শহর আনশুচাং। মাত্র একটা ফেরী-বোট সেখানে। লাল ফৌজের একটা অংশ শত্রুর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে সেই ফেরীবোটে করে নদী পার হয়ে গেল। এই হারে নদী পার হতে হলে গোটা ফৌজের কয়েক সপ্তাহ লাগবে এবং তার আগেই তারা ঘেরাও হবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি করে এক সামরিক বৈঠক বসল। এই বৈঠক ডাকলেন লিন পিয়াও। ততক্ষণে মাও ৎসে-তুং, চু-তে এবং চৌ এন-লাই নদীর কাছে পৌঁছে গেছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন তাতু নদীর খাদের ওপর লোহার পুল পার হতে হবে। আঁকাবাঁকা সরু পায়ে চলার পথ ধরে লাল ফৌজ একটা উঁচু এবং খাড়া পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছল। তার নীচেই তাতু নদীর খাদ এবং সেখান থেকে নদী পার হবার একটি ঝোলানো পুল আছে—লোহার শেকলে ঝোলানো লুতিং ব্রিজ। পুলের মাথায় যে ব্লক হাউস বা পাহারা ঘর ছিল চিয়াং-এর লোকেরা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে আগুনের বেড়া পার হয়ে লাল ফৌজ এগোতে না পারে। কিন্তু আগুন ভেদ করে লাল ফৌজ পুলটি দখল করে। লং মার্চের সময় চরম বীরত্বের ঘটনার মধ্যে এটি একটি। শত্রু এবারে পালাতে শুরু করল, মাও ৎসে-তুং লাল ফৌজকে নিয়ে তাতু নদী পার হয়ে উত্তরের দিকে এগিয়ে চললেন। লাল ফৌজ যদি তাতু পার না হতে পারত তা'হলে বোধ হয় ওখানেই ধ্বংস হয়ে যেত।

এর পর আরেকটি প্রাকৃতিক বাধা এল। এবারে বরফে ঢাকা পাহাড়—জেচুয়ান ও সিকাং প্রদেশের সীমানায়। পাহাড়ের বরফের মুকুট পরা উঁচু চূড়ায় বাতাস এত পাৎলা যে নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন। কিন্তু মরীয়া লাল ফৌজ সে পাহাড় বেয়ে উঠে পার হয়ে গেল। ওপারে প্রকৃতি যে দয়া করল তা নয়, আরেক রকমের বাধা এনে হাজির করল তাদের সামনে—বিশাল ঘাসে ঢাকা জমি আর তার এখানে ওখানে কাদায় ভরা অসংখ্য খানা ডোবা আর বিলের পর বিল। মার্চ বুঝি থেমেই যায়! ঘাসের জমিতে সামান্য কিছু বসতি আছে—দু'চার ঘর। থেকে থেকে এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়। আকাশ আর মাটি তোলপাড়। ঘন ঘন বরফ ঝরানো ঝড় ওঠে, শিল ছড়ানো বৃষ্টি

আসে। পায়ে চলার সরু পথ থেকে পিছলে পড়লে রাক্ষুসে কাদার পেটে ঢুকে যেতে হবে। এমনি দুর্গম জায়গায় লাল ফৌজ এবারে এসে পড়েছে। এখানে মালপত্র বওয়ার জন্যে তারা ইয়াক ব্যবহার করল। ইয়াক এক রকমের ষাঁড়। খাদ্যের অভাব হলে সৈন্যদের বুনো গাছগাছড়া আর ইয়াকের মাংস খেতে হত। এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও চরম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে লাল ফৌজ কিসের জোরে এই দিগন্ত-ছোঁয়া ধু ধু মাঠ আর বিলে জমি পার হতে পারল? লক্ষ্যে পৌঁছতেই হবে এই প্রতিজ্ঞার জোরে, কমিউনিজমের আদর্শের জোরে। বরফ ঢাকা পাহাড় আর এই তেপান্তরের মাঠ পেরোবার সময় লাল ফৌজকে সে অঞ্চলের তিব্বতীরা খুব সাহায্য করেছিল।

এক বছরের অভিযানের পর ১৯৩৫-এর অক্টোবরে লাল ফৌজ জেচুয়ানের উত্তরে উত্তর শেনসিতে পৌঁছল এবং সেখানে আরেকটি বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে তারা মিলল। লিউ চি-তান এখানে একটি বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন। দীর্ঘ কঠিন পথে ইয়াংসি নদীর উত্তরের এবং দক্ষিণের আরও কয়েকটি লাল ফৌজের ইউনিট বা ছোটো দল এই উত্তর শেনসিতে এসে পৌঁছল। এখানে এসে তখনকার মতো সবার অভিযান শেষ হল। মাও ৎসে-তুং-এর যে কবিতা দিয়ে এ কাহিনী শুরু করেছিলাম তার আর দুটো লাইন এখানে শোনারে ভালো:

অবশেষে কাজ শেষ, অনেক আনন্দ জাগে মনে
সংগ্রামী সৈনিক মুখে হাসির ঝিলিক ক্ষণে ক্ষণে।।

পেছনে তাকিয়ে লাল ফৌজ দেখল আট হাজার মাইলেরও বেশি পথ তারা এক বছরে পার হয়ে এসেছে—কখনও বিদ্যুৎবেগে নদী এসে বাধা দিয়েছে, কখনও প্রাণ হাতে করে দুর্গম পাহাড়ী পথে এগোতে হয়েছে, কখনও বরফের পাগড়ী পরা প্রকাণ্ড গম্ভীর পাহাড় পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, কখনও ঝোড়ো হাওয়ার উৎপাতে ভরা মাঠে পিছল পথ জল-কাদার অতল পাতালের দিকে টেনেছে। সে পথে দেশদ্রোহীদের দলের সঙ্গে লড়াইতে বার বার রক্ত ঝরেছে, প্রাণ গিয়েছে অনেক, তবু সে পথ চিরদিন মানুষের মনকে নাড়া দেবে বীরত্বের পথ, দেশপ্রেমের পথ, বিপ্লবীদের পায়ের ছোঁয়ায় পবিত্র পথ বলে।

যুদ্ধের ইতিহাসে এরকম বীরত্বের অভিযানের কোনও নজীর নেই। বহু ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও লড়াইর দিক থেকে এবং রাজনীতির ব্যাপারেও এই লং-

মার্চ কমিউনিস্ট পার্টিকে জয়লাভের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। লাল ফৌজের হাজার হাজার মাইল লম্বা পথের দুধারে প্রায় বিশ কোটি দেশবাসী বুঝতে পেরেছিল কিভাবে লড়লে বিপ্লব আসবে। এগারোটি প্রদেশের ওপর দিয়ে লাল ফৌজ যাবার সময় সেখানকার জমিতে বিপ্লবের বীজ ছড়াতে ছড়াতে গেছে। আমরা দেখেছি পথ চলতে চলতে কমিউনিস্ট পার্টি তার পুরোনো দিনের "বামপন্থী" ভুলগুলো বাতিল করেছে। তাতে চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের সংকট কেটেছে, মাও ৎসে-তুং-এর পথ সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, তাঁর নেতৃত্ব পার্টি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছে। এখানে বিশ্বাসঘাতক চাং কুয়ো-তাও-এর কথা না বললেই নয়। এই সুবিধাবাদী সেনানায়ক আনহোয়েই থেকে এসে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম জেচুয়ানে যোগ দিয়েছিল। ছেঁড়া জামাকাপড়, লিকলিকে চেহারা, নেতারা মাঝে মাঝে তাঁদের টাট্টু ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন কারণ সেই ঘোড়ার পিঠে রুগীদের চাপাতে হচ্ছে, গোটা ফৌজ যেমন রোগা এই টাট্টুগুলোও তেমনি রোগা—চাং কুয়ো-তাও-এর নিশ্চিত বিশ্বাস এই লক্‌ঝড় লাল ফৌজ কোনও কালে তার লং মার্চ শেষ করতে পারবে না। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা হারিয়ে সে পার্টি ভাঙ্গার কাজে হাত পাকাল। সে অস্বীকার করল যে দেশজুড়ে জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলন বেড়ে উঠছে। শত্রুর শক্তিকে সে খুব বড়ো করে দেখল। উত্তর দিকে এগোনোর তার কোনও ইচ্ছে নেই। তাই সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে সিকাং প্রদেশের দিকে জোর করে পিছু হটতে বাধ্য করল। সে মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বকে অস্বীকার করল এবং সুনিয়ী সম্মেলনের কোনও সিদ্ধান্ত মানতে চাইল না। একটা ভুয়া "পার্টি কেন্দ্র" গড়ে তুলে চাং পার্টি এবং লাল ফৌজের ঐক্যকে নষ্ট করতে চেষ্টা করল। মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি চাং কুয়ো-তাও-এর পার্টি ভাঙ্গার চক্রান্তকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে পার্টির বিরাট ক্ষতি করে ফেলেছে। অসংখ্য কর্মীর প্রাণের দামে এ ভুল শোধরাতে হল। অনেক ভ্রান্ত কর্মীকে শিক্ষিত করে তুলে কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিক পথে তাদের ফিরিয়ে আনল। যে পো কু আগে "বামপন্থী" ভুল করেছিল সে এবার চাং-এব বিরোধিতা করল। চাং শেষ পর্যন্ত কুয়োমিনতাং-এর গুপ্ত পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিল। চিয়াং-এর পঞ্চম "ঘেরাও" অভিযানের আগে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা বাড়তে

বাড়তে তিরিশ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু "বামপন্থী" ভুল এবং চাং কুয়ো-তাও-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লাল ফৌজের বিরাট ক্ষতি হল। লং মার্চের শেষে শেন্‌সিতে এসে দেখা গেল লাল সেনাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিরিশ হাজারেরও কম। দীর্ঘ পথের অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে শেষ অবধি যারা শেন্‌সিতে এসে পৌঁছল সেই পোড়-খাওয়া মানুষগুলো ভবিষ্যতের বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পদ। তারাই আগামী দিনের মুক্তিযুদ্ধের নেতা। দেশের মানুষের মনে এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, জাপানকে রুখতে হলে এই রকমের ইস্পাতে গড়া ফৌজ দরকার। তাই লাল ফৌজের মুখের আওয়াজের জোর আগের চাইতে অনেক বেশি নাড়া দিল মানুষের মনকে—"চীনেদের বিরুদ্ধে চীনেদের কিছুতেই লড়া উচিত নয়!", "জাপানকে রোখো!"

মাও ৎসে-তুং বলেছেন, "লং মার্চের কথা বলতে গিয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে: 'এর গুরুত্ব কি?' আমরা উত্তরে বলি যে ইতিহাসে এই ধরনের জিনিস এই প্রথম, এটা একটা ইস্তাহার, একটা প্রচার-বাহিনী, একটা বীজ-বোনার যন্ত্র!"

সত্যি, ইতিহাস অবাক্ হয়ে এ দৃশ্য দেখেছে কারণ ইতিপূর্বে এমনটি আর কখনও ঘটেনি। বারোটা মাস ধরে লাল ফৌজের মাথার ওপরে নজর রাখবার জন্যে শত্রুর হাওয়াই জাহাজ ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়িয়েছে। আকাশ থেকে যেমন তারা অসংখ্য বোমা ফেলেছে, মাটিতে তেমনি তাদেরই দলের লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে লাল ফৌজকে ঘেরাও করেছে, তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করেছে, পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। লাল ফৌজকে তার যাত্রাপথে যে বাধা ও বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তবু শুধু দু'টি পায়ের ওপর নির্ভর করে তারা এগারোটা প্রদেশের মধ্যে দিয়ে আট হাজার মাইলেরও বেশি পথ পার হয়ে এসেছে।

বলা হয়েছে যে লং মার্চ একটি ইস্তাহার। এই ইস্তাহার বিশ্বের জনগণের কাছে ঘোষণা করেছে যে লাল ফৌজ হচ্ছে বীরদের দিয়ে তৈরি ফৌজ। এই ইস্তাহার আরও ঘোষণা করেছে যে সাম্রাজ্যবাদীরা আর তাদের পোষা কুকুরগুলো, চিয়াং কাই-শেক ও তার মতো লোকেরা, দুর্বল। ঘোষণা করেছে যে ঐ ব্যাটারা লাল ফৌজকে ঘেরাও করতে, তার পিছু ধাওয়া করতে আর তার পথ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে লং মার্চ একটা প্রচারবাহিনীও বটে। এই মার্চ এগারোটা প্রদেশের বিশ কোটি লোকের কাছে প্রচার করেছে যে লাল ফৌজ যে পথ ধরেছে সেটাই মুক্তির পথ। লাল ফৌজের মধ্যে একটা বিরাট রাজনৈতিক সত্য রূপ নিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। লং মার্চের মতো একটা ঘটনা যদি না ঘটত তবে ব্যাপক জনসাধারণ কি করে এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই বিরাট সত্যটাকে জানত?
লং মার্চ একটা বীজ বোনার যন্ত্রও বটে। এগারোটা প্রদেশে এই মার্চ অনেক বীজ বুনেছে যা থেকে অংকুর এবং ক্রমে পাতা, ফুল এবং ফল দেখা দেবে এবং ভবিষ্যতের ফসল পাওয়া যাবে। এক কথায়, বলতে গেলে লং মার্চ শেষ হয়েছে লাল ফৌজের জয়লাভে আর শত্রুর পরাজয়ে। লং মার্চকে জয়ী করল কে? মাও ৎসে-তুং উত্তর দিচ্ছেন, "কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া এরকম একটা লং মার্চ কল্পনা করা যেত না।"

॥ এঁদের ভুলো না ॥

বিপ্লবের নাকি এখন-তখন অবস্থা। চিয়াং-এর আনন্দ আর ধরে না। সত্যি সত্যি "বাম" ভুল চীন বিপ্লবকে জাহান্নামের কিনারায় এনে দাঁড় করাল। পঞ্চম "ঘেরাও" অভিযানের বিরুদ্ধে ভুল কায়দায় লড়ে কি ক্ষতিটাই না সইতে হল! মানুষের রক্তে হোলি খেলল শয়তানরা। চিয়াং-এর দল গর্ব করে বলল তারা কিয়াংসি দখল করতে গিয়ে দশ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়েছে। চৌ এন-লাই বললেন, শুধু লাল সেনারাই মরেছে ষাট হাজার। তবুও চিয়াং-এর স্বপ্ন সত্য হল না। লাল ফৌজকে একেবারে শেষ করে দেওয়া গেল না। অবশিষ্ট বাহিনীকে নিয়ে মাও ৎসে-তুং পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। শুরু হল লং মার্চ। দেখতে দেখতে পিছু হটা জয়-যাত্রায় পরিণত হল। কিন্তু পেছনে পড়ে রইল একদল বীর যোদ্ধা। ইচ্ছে করেই রইল। তারা আগলে রইল দক্ষিণের আটটি প্রদেশের চোদ্দটি ঘাঁটি অঞ্চল। লং মার্চকে বাঁচাতেই হবে। শত্রুকে ঐ অভিযানের ওপর সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ চালাতে দেওয়া কিছুতেই চলে না। তাই তাকে এখানেই লড়াইয়ে আটকে ফেলা দরকার। যে বীরেরা পেছনে রয়ে গেল তারা গেরিলা কায়দায় জোর লড়াই

চালাল। কিয়াংসি ছেড়ে লাল ফৌজের প্রধান বাহিনী চলে যাওয়ার পর লাল শহরগুলো দখল করতেই কুয়োমিনতাং সৈন্যদের বহু সপ্তাহ কেটে গেল। শত্রু এখানেই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে লং মার্চ সে সুযোগে অনেক দূর এগিয়ে গেল। আসল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শয়তানদের বড়ো দেরি হয়ে গেল। একের পর এক তাদের হার হতে লাগল।

দক্ষিণের ঘাঁটি এলাকার বীরেরা তাদের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেল। তাদের শত্রু কিন্তু সৈন্যসংখ্যায় আর অস্ত্রশস্ত্রে অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী। আর বিপ্লবী আন্দোলনেও তখন ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। সেই ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ অবধি বিপ্লবের চরম দুর্দিনে তারা কঠিন লড়াই লড়ল। তাদের অসাধারণ ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী চীনের মানুষ বুকে করে রেখেছে।

দক্ষিণের কিয়াংসি-কোয়াংতুং সীমান্ত এলাকার লড়াই-এর কথাই ধরা যাক। প্রথম থেকেই গেরিলা যোদ্ধারা তাদের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিল। গেরিলা কায়দায় লড়াই চালিয়ে শত্রুর দৃষ্টি লং মার্চ থেকে সরিয়ে আনতে হবে। আর ঘাঁটি অঞ্চলকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বাড়িয়ে তুলতে হবে। অন্যান্য এলাকার গেরিলা দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ঘাঁটি এলাকার চারপাশে কাজ ভালোই এগোলো। সেই এলাকার মানুষকে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হল। বিপ্লবের শত্রুদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকেও বিপ্লবীরা ব্যবহার করবার সুযোগ পেল। দেখা গেল চিয়াং-এর ফৌজের সঙ্গে কোয়াংতুং-এর যুদ্ধবাজদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। ১৯৩৫-এর এপ্রিলের শুরুতে চেন ঈ এই ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে চিয়াং-এর বাহিনী কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকাকে তছনচ করে ফেলেছে। তাই এবারে লড়াই সরে এল কিয়াংসি-কোয়াংতুং সীমান্ত এলাকায়। চেন ঈ তাঁর সহযোদ্ধাদের বললেন যে এখন দুই বিপ্লবী জোয়ারের মাঝামাঝি সময়। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কুয়োমিনতাং-এর বিশ্বাসঘাতকতা সারা দেশের লোক ধরে ফেলবে। কারণ তাদের নীতি হচ্ছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটানা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অথচ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে রুখবার জন্যে এতটুকু চেষ্টা না করা। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হলে জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আশা করবে। তখন বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন জোয়ার আসবে। তিনি জোর দিয়ে বললেন, বিপ্লবের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। চেন ঈ মাও ৎসে তুং-এর গেরিলা

কৌশলের ওপর নির্ভর করতে বললেন। গেরিলা যুদ্ধকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং সুযোগ বুঝে শত্রুর ওপর আঘাত হানতে হবে। চেন ঈ বললেন, এই ভাবেই বিপ্লবী বাহিনী বেড়ে উঠবে। তিনি বললেন, সৈন্যবাহিনী এবং স্থানীয় জনগণকে বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে কাজের পথ পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিতে হবে আর আগামী ঝড়ের জন্যে তাদের আদর্শের দিক থেকেও প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তাদের বলতে হবে যে সামনে দীর্ঘ এবং কঠিন লড়াই—শত্রুর পেছনের দিক থেকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে তাদের লড়তে হল। শত্রু তাদের নির্মূল করার জন্যে সব রকম চেষ্টা চালাল। কোনও কোনও এলাকায় "পোড়া মাটির নীতি" গ্রহণ করল—সব গাছ কেটে ফেলল, সব বাড়ী পুড়িয়ে দিল যাতে গেরিলারা কোনও রকমের সাহায্য কোথাও না পায়। যাকেই ধরল তাকেই হত্যা করল। প্রতিদিন তারা পাহাড়গুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কড়া অর্থনৈতিক অবরোধ বা ঘেরাও সৃষ্টি করল। তারা এই কাজটা শুরু করল বেশ কয়েকটা ছোট গ্রামকে একসঙ্গে নিয়ে একটা বড়ো সুরক্ষিত গ্রামে পরিণত করে। স্থানীয় লোকদের তাদের বাড়িঘর ছেড়ে এই খোঁয়াড়ের মধ্যে বন্দী থাকতে বাধ্য করা হল। চিয়াং-এর লোকেরা বিপ্লবীদের না খাইয়ে মারার জন্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইল। খোলা বাজারে খাবার ও অন্যান্য জিনিসের অবাধ বেচাকেনা বন্ধ করে দিল। চাল, তেল, নুন, শাক-সব্জি এবং রোজকার প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই মাথাপিছু একটা র‍্যাশন বা বাঁধা বরাদ্দ ঠিক করে দেওয়া হল। যদি কারুর কাছে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ র‍্যাশনের চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায় তবে আর রক্ষে নেই। অমনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে যে সে "ডাকাত"দের অর্থাৎ বিপ্লবীদের সাহায্য করছে আর তার শাস্তি পেতে হবে। সামরিক হামলা আর অর্থনৈতিক অব-রোধের সঙ্গে সঙ্গে তারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাল। অসংখ্য প্রচারপত্রে আর পোস্টারে বিপ্লবীদের "মারাত্মক ডাকাত" বলে মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে চেষ্টা করল। প্রকাশ্য জায়গায় নোটিশ টাঙিয়ে দিল যে চেন ঈ-কে ধরে দিতে পারলে তিরিশ হাজার রূপোর ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। আগেই মাও ৎসে-তুং, চু তে এবং অন্যান্য

অনেকের মাথার দাম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা এখন ক্রমেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছেন। দক্ষিণের গেরিলাদের ঘুষ দেওয়ারও চেষ্টা হল। চিয়াং-এর লোকেরা বলল প্রতিটি বন্দুক আর বুলেট জমা দিলে টাকা দেওয়া হবে। কখনও কখনও গেরিলাদের পরিবারের লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে হয়রান করা হত। উদ্দেশ্য গেরিলাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া। কিন্তু গেরিলারা স্থানীয় কৃষক গেরিলা দলগুলো আর বিপ্লবী জনগণের সাহায্য নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেল। পাহাড় অঞ্চলের অধিকাংশ যুবক গোপন গেরিলা দলে যোগ দিল। তারা গেরিলাদের খবর এনে দিত, পাহারা দিত, স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করত, গেরিলা আক্রমণগুলোতে সাহায্য করত। সঙ্গে সঙ্গে তারা উৎপাদনও বাড়িয়ে চলল।

গেরিলারা লুকিয়ে থেকে হঠাৎ আক্রমণ চালাতো আর বিদ্যুৎগতিতে তাদের কাজ সেরে নিত। অসংখ্য শত্রুসৈন্যকে তারা এই কায়দায় নির্মূল করল। যখন শত্রুরা ছোটো ছোটো গ্রামের ওপর চড়াও হত তখনও গেরিলারা বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালাতো আর চট করেপাহাড়ে মিলিয়ে যেত। জনগণও শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দিল। তারা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে বেড়াতো যে একটা বিরাট গেরিলা বাহিনী এ এলাকায় রয়েছে। আর যায় কোথায়? বীর পুঙ্গবেরা তখন আক্রমণ দূরে থাক নিজেদের বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। পাহাড় থেকে তাদের সৈন্য ফিরিয়ে আনতো। গেরিলারা অনেক সময় গোপনে শত্রুর মাটির নীচেকার ছোটো দুর্গের সামনে লুকিয়ে থেকে আক্রমণের আয়োজন করতো। একজনকে তারা শত্রুর কাছে পাঠাতো। ভুলিয়ে ভালিয়ে শত্রুকে দুর্গ থেকে বার করে আনতে পারলে গেরিলাদের আর পায় কে। শত্রুকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়ে তারা দুর্গ দখল করে নিত। কখনও কখনও গেরিলারা ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে দুর্গগুলিতে যেত। শত্রু সেনারা যখন কিছু কিনতে বেরিয়ে আসতো তখন তাদের গ্রেপ্তার করে দুর্গটাকে দখল করে নেওয়া হত। শত্রুরাও ঠেকে শিখেছিল। গেরিলাদের পায়ের ছাপ দেখে দেখে তাদের যাতায়াতের পথে লুকিয়ে থেকে তারা হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে গেরিলাদের হত্যা করতে লাগল। তাই গেরিলারা চলার সময় অনেক কষ্ট করে পায়ের ছাপ মুছে মুছে চলত আর যে সব ঝোপঝাড় বা গাছপালা তাদের পায়ের চাপে দুমড়ে যেতো তাদের আবার আগের মতো অবস্থায় সাজিয়ে রেখে আসতো। শত্রুকে বোকা বানাবার জন্যে

তারা অনেক সময় চটি উল্টো করে পায়ে বেঁধে হাঁটতো যাতে শত্রু ঠাহর করতে না পারে যে গেরিলারা কোন্ দিকে গেছে। যে নদীর জল খুব কম তার মধ্যে দিয়ে চলা ছিল খুব নিরাপদ। তাদের চলাফেরার পক্ষে বৃষ্টির দিন ছিল আদর্শ সময়। বিপদ ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। তারা প্রথম ছোটো ছোটো কুটীরে আশ্রয় নিয়েছিল। খবর পেয়ে শত্রুরা সব কুটীর মাটিতে মিশিয়ে দিল। তারপর গেরিলারা বাঁশের ছাউনি বানিয়ে থাকতে চেষ্টা করল। শত্রুরা যখন পাহাড়ে পাহাড়ে খোঁজ নিতে শুরু করল আর আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো তখন তাদের ওগুলো সহজেই চোখে পড়ল। তাই ঐ আশ্রয় তাদের ছাড়তে হল। এর পর গেরিলাদের আশ্রয় হল ছাতা। বৃষ্টির দিনে তারা পিঠে পিঠ দিয়ে ছাতা মাথায় বড়ো বড়ো গাছের তলায় আশ্রয় নিল। যে রাত্রিতে আকাশ পরিষ্কার থাকতো সে রাত্রিতে তারা একটা মজার আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। সে আশ্রয় হল গ্রামের পুরোনো কবরগুলো। কবরের ওপরকার পাথরের ফালির ওপর তারা দিব্বি ঘুম লাগাতো।

এদিকে নানা কায়দায় শত্রুর কড়া অর্থনৈতিক অবরোধ গেরিলারা ভেঙ্গে ফেলতো। খাবারের অভাবই ছিল সব চাইতে বড়ো অসুবিধে। কিন্তু জনগণ শত্রুর বেড়াজাল ভেদ করে যখনই সুযোগ পেত তখনই চাল, তেল, নুন আর নানা দরকারি জিনিস তাদের কাছে পৌঁছে দি[illegible]। তারা কখনও কখনও মাছের ঝুড়ির নীচে এইসব জিনিস লুকিয়ে নিয়ে আসতো। গেরিলারা কিন্তু তাদের সব সময় জিনিসের দাম মিটিয়ে দিত। শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে কখনও কখনও বাঁশের চোঙার মধ্যে পুরে চাল আর লবণ স্থানীয় লোকেরা নিয়ে আসতো তাদের পরম আদরের গেরিলা ভাইদের জন্যে। তারা গোপনে নির্দিষ্ট জায়গায় সেগুলো ফেলে রেখে আসতো। আর সুর করে পাহাড়ী ছড়া গেয়ে গেরিলাদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে যেত কোথায় তাদের দরকারি জিনিস রেখে যাওয়া হল। গেরিলারা পরে সেগুলো ঠিক পেয়ে যেত। এদিকে চিয়াং-এর স[illegible]কার ছিল ঘুণে ধরা। তাই পয়সার লোভে কুয়োমিনতাং-এর লোকেরাও গেরিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতো। কখনও কখনও শত্রুর ট্রাকের ওপর আক্রমণ চালিয়ে খাবার জিনিস, ওষুধ আর অস্ত্রশস্ত্র গেরিলারা কেড়ে নিত। তবে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল স্থানীয় জনগণ। গেরিলারা অনেম সময় রান্না করতে

পারতো না কারণ ধোঁয়া দেখে শত্রুরা গেরিলাদের হদিস পেয়ে যাবে। তখন গ্রামের মেয়েরা গেরিলাদের আস্তানায় খাবার আর খবর পৌঁছে দিত। শত্রুকে বোকা বানানোর জন্যে জনতার বুদ্ধির অভাব হয় না। একটা উদাহরণ দিই। শত্রুর কড়া পাহারার মধ্যে একজন মা গেরিলাদের কাছে রোজ ভাত পৌঁছে দিত। একটা ঝুড়ির মধ্যে ভাত ভরে ঘাস দিয়ে ঢেকে নিত। আসবার সময় এমন ভাণ করত যে সে ঘাস কাটতে বেরিয়েছে। আরেকটি মেয়ে শহর থেকে গেরিলাদের জন্যে নানা জিনিস কিনে নিয়ে আসত। ভোর হতে না হতেই ভার বওয়ার বাঁকে জ্বালানির ঝুড়ি ঝুলিয়ে বাজারের দিকে রওনা হত। বাজারে জ্বালানিগুলো বিক্রি করার পর সেখান থেকে কাপড় আর হাঁটু অব্দি লম্বা রবারের জুতো আর ব্যাটারি কিনতো গেরিলাদের জন্যে। সেগুলোকে ঝুড়ির মধ্যে রাখতো। তারপর তরিতরকারি কিনে ঝুড়ির নিচের জিনিসগুলো ঢেকে নিত। কুয়োমিনতাং সেনারা তাকে ভাবত গাঁয়ের এক সাধারণ মেয়ে। তাই তাকে ভাল করে তল্লাশি করতো না—ওপর ওপর দেখেই ছেড়ে দিত। এইভাবে জনগণ গেরিলাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাই চেন ঈ কবিতায় লিখলেন,

> আমরা জনগণকে বিশ্বাস করি
> এবং কখনও তাদের সাহায্য ভুলি না।
> তারা আমাদের দ্বিতীয় পিতামাতা,
> আমরা যুদ্ধে তাদের উপযুক্ত পুত্র—
> বিপ্লবের সবচেয়ে ভালো সৈনিক।

জনগণের শত্রুদের বিরুদ্ধে গেরিলারা চরম আক্রমণ চালাত। স্থানীয় বদবাবু আর উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে তাদের নিয়মিত অভিযান চলত। ফলে জনগণ বেশি বেশি করে বিপ্লবের পক্ষে চলে আসত। যেসব বড়ো ঘরের বাবুরা কম অপরাধ করেছে তাদের হত্যা করা হত না। তাদের ধরে ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হত।[খ] যদি তারা নিজেদের স্বভাব বদলাবে আর অর্থ দিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করবে বলে কথা দিত তবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো। কিন্তু যে উৎপীড়ককে জনগণ ভীষণভাবে ঘৃণা করত তাকে বাঁচিয়ে রাখা হত না। সেরকম উৎপীড়ক গেরিলাদের হাতে বন্দী হলে পর দেখা যেত যে গেরিলাদের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসছে। তাতে অসংখ্য মানুষ ঐ শয়তানের হাজার অপরাধের কথা জানাত। তাকে খতম করলে সবাই খুশি হত।

হুনান রিপোর্টেও মাও ৎসে-তুং বলেন, গ্রামাঞ্চলে যে প্রতিক্রিয়াশীলরা শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তাদের ঠাণ্ডা করার একমাত্র কার্যকর উপায় হল প্রতি জেলায় অন্তত কয়েকটা সবচেয়ে ঘৃণ্য উৎপীড়ককে খতম করা। এ কাজে সারা জেলায় সাড়া পড়তো আর তা সামন্তবাদের বিষ দূর করতে দারুণ ভাবে সাহায্য করতো।

লাল এবং শ্বেত এলাকার মাঝামাঝি এলাকায় যে মানুষেরা বাস করত তারা সব সময় একটা অস্থায়ী অবস্থার মধ্যে থাকত। জনগণের কষ্টের শেষ ছিল না। যুদ্ধে কখনও লালরা জিতছে কখনও সাদারা তাই সেখানে ঘন ঘন অবস্থা বদলাচ্ছে। সেখানকার মানুষের দুঃখ-কষ্টের জন্যে সোজাসুজি কুয়োমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীলরা দায়ী ছিল। তাই জনগণকে সেখানে গেরিলাযোদ্ধাদের পক্ষে টেনে আনা কঠিন ছিল না। ঘাঁটি এলাকাগুলোকে জোরদার করে তুলতে এবং বাড়িয়ে তুলতে তাদের সাহায্য খুবই প্রয়োজন ছিল। এরকম এলাকায় গেরিলারা জনগণের আশু প্রয়োজন ও দাবির ভিত্তিতে স্লোগান ঠিক করল। গেরিলারা জনগণকে ডাক দিল: বেশি হারে খাজনা রুখতে হবে, ফসলের ওপর চড়া ট্যাক্স চলবে না, জমিদারদের কাছে মোটা ঋণগুলো বাতিল কর, ট্যাক্সের বোঝা চাপানো চলবে না, জোর করে শত্রুর সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখানো বন্ধ হোক। গেরিলারা কৃষকদের সংগ্রামকে সাহায্য করল এবং তাদের সংগ্রামকে সশস্ত্র লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করল। যখন শত্রুরা সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখানোর জন্যে জনগণের ওপর জবরদস্তি করতে এল তখন গেরিলারা সরকারী অফিসারদের খুব করে শাসিয়ে দিল। আর কৃষকদের জোর করে রংরুট হিসেবে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে সেখানে আক্রমণ চালিয়ে তাদের মুক্ত করে আনল। যখনই গেরিলারা খবর পেত যে জনগণের ওপর চড়া ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হচ্ছে তখনই তারা ট্যাক্স আপিস উড়িয়ে দিত আর যারা ট্যাক্স আদায় করতে আসতো তাদের তাড়িয়ে দিত। ফসল কাটার সময় জমিদারেরা তাদের দলবল নিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা বাবদ ফসলের ওপর মস্ত থাবা বসাতে আসতো। ফসল নিয়ে যখন তারা ফিরত গেরিলারা তাদের গাড়ি আক্রমণ করে ফসল কেড়ে নিত, আর কৃষকদের ফিরিয়ে দিত। দেখতে দেখতে জনগণ দলে দলে গেরিলাদের সমর্থনে এগিয়ে এল। তাদের অনেকে সামান্য পাখিমারার অস্ত্র

আর বর্শা নিয়েই গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই-এ ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শ্বেত এলাকায় গেরিলারা জনগণকে বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনার জন্যে তাদের প্রভাবকে বাড়িয়ে তুললো। শত্রুবাহিনীর পেছনে থেকে গেরিলারা নিয়মিত কাজ চালিয়ে গেল। কুয়োমিনতাং-এর মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে তারা প্রচারপত্র ছড়াত আর পোস্টার লাগাত। সবচাইতে ঘৃণ্য উৎপীড়ক-দের পাকড়াও করে তারা খতম করত। এ কাজ গেরিলাদের প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করত। গোপনে পারিবারিক যোগাযোগ, কাজের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ এবং পাহাড়ী এলাকার লোকেদের সঙ্গে চারপাশের মানুষের বন্ধুত্ব গড়ে তুলে গেরিলারা সেখানে প্রচার অভিযান চালিয়ে যেত।

লাল এলাকা আর শ্বেত এলাকার সীমানা বরাবর এবং শ্বেত এলাকায় জনগণের মধ্যে পার্টির কাজ বাড়িয়ে তুলবার জন্যে কর্মীরা জনগণের সঙ্গে তাদের মেহনতের কাজে যোগ দিত। যেখানেই সম্ভব সেখানেই কর্মীদের একটা বিশেষ পেশা রপ্ত করে জনগণের মধ্যে মিশে সেই পেশাকে আশ্রয় করে রুজির ব্যবস্থা করতে হত। কেউ হল দর্জি, কেউ হাঁস-মুরগী পালতে শিখল। আর কেউ ঝুড়ি বানাতে শিখল। আর যে কোনও পেশা নিল না তাকে কৃষকের সঙ্গে মিশে একসঙ্গে বীজ বোনা থেকে ধান কাটা পর্যন্ত গতর খাটাতে হত। এই ভাবে তারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললো। তাদের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল।

নানা কায়দায় গেরিলারা খাবার যোগাড় করলেও কখনও কখনও তাদের খিদেতে কষ্ট পেতে হত। এমন দিনও যেত যখন তাদের বুনো গাছপালা খেয়ে থাকতে হত। বসন্তে তারা খেত বাঁশের কচি পাতা, গ্রীষ্মে স্ট্রবেরি বা লাল ফল আর শীতে বুনো ফল। চেন ঈ তাই ১৯৩৬-এর গ্রীষ্মে তাঁর কবিতায় লিখলেন,

আমাদের চাল বাড়ন্ত,
তিন মাস হতে চলল মাংসের স্বাদ পাইনি আমরা ;
গরমের দিনে আমরা স্ট্রবেরি খেয়ে পেট ভরাই,
শীতে খাই বাঁশের কচি পাতা,
বুনো শুয়োর শিকার করতে আমরা
বড়ো বড়ো পাহাড়ের ওপর দিয়ে

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটি,
আর সন্ধ্যা নাবলে সাপ ধরি।

গেরিলা ঘাঁটির চারদিকের এলাকা শত্রুরা ধ্বংস করল। সমস্ত ঘর পুড়িয়ে দিল, মাঠ আর বন ধ্বংস করল, স্থানীয় জনগণকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করল। কিন্তু ফল হল উল্টো—সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ঐ এলাকার মানুষেরা ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে উঠল। অত্যাচারী শ্রেণীকে তারা ভালো করে চিনল। কে তাদের শত্রু আর কে তাদের মিত্র বুঝল। তারা তাই গেরিলাদের দ্বিগুণ উৎসাহে সমর্থন জানালো। শত্রু কেন্দ্রীয় ঘাঁটি অঞ্চল দখল করা সত্ত্বেও স্থানীয় জনসাধারণ কখনও আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করল না। মাও ৎসে-তুং, কমিউনিস্ট পার্টি আর লাল ফৌজকে ঘিরে তাদের স্বপ্ন বেঁচে রইল। লং মার্চের কুশল জানবার জন্যে তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। বার বার তারা লাল ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ শত্রুর কড়া অবরোধ তারা ভেদ করতে পারেনি। শত্রুর শত অত্যাচার আর মিথ্যা প্রচারেও কিন্তু বিপ্লবের চূড়ান্ত জয় সম্বন্ধে তাদের মনে কোনও দিন সন্দেহ জাগেনি। তারা বিশ্বাস করত যে শত্রুর শাসন বেশি দিন টিঁকবে না, কমিউনিস্ট পার্টির মৃত্যু নেই, মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে লাল ফৌজ হারানো লাল এলাকা ফিরিয়ে আনবেই আনবে। তাই সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে তারা অস্ত্রশস্ত্র, লাল পতাকা পার্টির সদস্য-কার্ড, "রেড চায়না নিউজ" পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা, দলিল ইত্যাদি বুকে করে রক্ষা করল। তারা বিপ্লবের বিজয়-উৎসবের জন্যে এই ভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল।

গেরিলাদের আশ্চর্য মনোবল ছিল। বিশ্বাসঘাতকেরা সময়ে সময়ে দারুণ ক্ষতি করলেও তাদের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো নয়। মাও ৎসে-তুং-এর আদর্শে চেন ঈ এখানকার গেরিলাদের গড়ে তুললেন। শীতের রাতে চেন ঈ নিজে জেগে থেকে পাহারার কাজ তদারক করতেন। গেরিলারা যখন ঘুমিয়ে থাকত তখন চেন ঈ ঘুরে ঘুরে নিজের হাতে তাদের গায়ের কাপড় ভালো করে টেনেটুনে গুঁজে দিতেন—যাতে শীতে তারা কষ্ট না পায়। চেন ঈ-র কষ্ট সইবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। পঞ্চম "ঘেরাও" অভিযানের সময় তিনি আহত হন। আঘাতের জায়গাটা মাঝে মাঝে হাঁ হয়ে যেত আর বার বার পুঁজ বেরোত। অভিযানের সময় পাহাড়ে উঠতে তাঁর দারুণ কষ্ট

হত। কিন্তু তিনি কখনও টুঁ শব্দটি করতেন না। দেরিতে হলেও সহযোদ্ধারা একথা জেনে ফেলল। ভাল ওষুধ পাওয়াই যায় না। তাই সব রকম ব্যথা-বেদনাতেই "বাঘ মলম" দিয়ে চিকিৎসা চলতো। প্রথম ঐ মলম দিয়েই চিকিৎসা শুরু হল। আবার ঘা হাঁ হলে পর তার পা একটা গাছে বাঁধা হল। একজন যোদ্ধা রক্ত আর পুঁজ প্রচণ্ড চাপ দিয়ে বার করতে আরম্ভ করল। সে দৃশ্য অনেকেই সহ্য না করতে পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু চেন ঈ-র মুখে এতটুকু কষ্টের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি হেসে হেসে কথা বলে চললেন।

গেরিলাদের মধ্যে ঐক্য ছিল অটুট। শুধু একটা ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনও ঐক্য ছিল না। সেটা হল বই পড়ার ব্যাপার। লাল সেনারা পড়ার ওপর খুব নজর দিত। এদিকে বইয়ের সংখ্যা বড়ো কম। তাই লেনিন স্তালিনের বই নিয়ে তারা প্রায়ই ঝগড়া বাধিয়ে দিত। লেনিনের "বামপন্থী কমিউনিজম" আর স্তালিনের "লেনিনবাদের সমস্যা" বই দুটো সবাই মিলে পড়ে এমন হাল করেছিল যে সেগুলোর মলাট আর ভেতরের পাতাগুলো বেশ কয়েকবার সারাই করতে হল। অভিযান চলার সময় বা বিশ্রামের সময় সবাই একসঙ্গে সেগুলো পড়তে চাইত। কিন্তু অন্য ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। সবাই সবার জামা-কাপড়, বিছানা, জুতো, মোজা ব্যবহার করত। "এইটে আমার আর ঐটে তোমার" বলে কিছু ছিল না। সবাই সবার জন্যে ভাবত। অভিযানের সময় একে অন্যের বোঝা টেনে দিত। চরম বিপদ আর কষ্টের মধ্যেও তাদের ঐক্য আর মনোবল অটুট রইল। কখনও তারা ভেঙ্গে পড়ল না। বিপ্লবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল। চেন ঈ তাঁর কবিতায় লিখলেন,

আমরা অভিযোগ করব না,
বরং ধীর স্থির ভাবে বছরের পর বছর
মার্চ করে এগিয়ে যাব।
উত্তর আমাদের আক্রমণ করছে
এক ভীষণ শত্রু,
কিন্তু আমাদের বিরাট বাহিনী
সোনালি বালির নদী পেরিয়ে
পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেছে।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ
নিশ্চয়ই ক্রমে জোরদার হয়ে উঠবে।

সত্যি সত্যি একদিন এক দারুণ খবর এসে পৌঁছল—"লং মার্চ" উত্তর শেন্‌সিতে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণের গেরিলাদের আনন্দে পাগল হয়ে যাওয়ার যোগাড়! তারা চারদিকে ছুটতে লাগল—ঘরে ঘরে আনন্দের খবরটা পৌঁছে দিল। এই দিনটির জন্যেই দক্ষিণের বীর জনগণ আর গেরিলা সন্তানেরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছিল। তাদের জন্যেই কুয়োমিনতাং কখনও লং মার্চের বিরুদ্ধে তাদের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। বার বার তাদের চোখ ফেরাতে হয়েছে দক্ষিণের দুর্দান্ত গেরিলাদের দিকে। চরম দুঃখকষ্ট সহ্য করে আর অসংখ্য প্রাণের দামে তারা তাদের ঘাঁটি এলাকা আগলে পড়ে রয়েছে আর সেগুলোকে বাড়িয়ে তুলেছে।

ঐতিহাসিক লং মার্চকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা যেন এই অসাধারণ বীরদের ভুলে না যাই—তাদের আত্মত্যাগ আর বিপ্লবী নিষ্ঠাকে যেন ছোটো করে না দেখি।

পথ এখনও অনেক বাকি। কিন্তু বিপ্লব যে জিতবেই সে সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হওয়া গেল। নতুন উৎসাহ নিয়ে দক্ষিণের বীরেরা আগামী লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হয়ে নিল। ১৯৩৭-এ যখন জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হল তখন দক্ষিণের আটটা প্রদেশ থেকে গেরিলা দলগুলোকে একসঙ্গে জড়ো করে একটা শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলা হল। জন্ম নিল নয়া চার নম্বর আর্মি। এই বাহিনী ইয়াংসি নদীর উত্তর আর দক্ষিণ পাড়ে শত্রুর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে মাও ৎসে-তুং এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আট বছর ধরে জাপানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধ চলল।

॥ দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের শেষ পর্ব ॥

ডিসেম্বর মাস। কনকনে শীত। পিকিং-এর বড়ো রাস্তায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জল আর রক্ত জমে অদ্ভুত রঙের বরফ তৈরি করেছে। পুলিসের জলের পাইপের জল আর তাদেরই তরোয়ালের ঘায়ে ছাত্রদের গা থেকে ঝরে

পড়া রক্ত। কারণ দিনটা ১৯৩৫-এর ৯ই ডিসেম্বর লাল ফৌজের লং মার্চ দেশময় ভূমিকম্পের দোল লাগিয়ে থেমেছে। কমিউনিস্ট পার্টি দেশের মানুষকে ডাক দিয়েছে নিজেদের মধ্যে লড়াই থামিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইতে জোট বেঁধে লাগতে। চিয়াং সরকারকে কিছুতেই এ জাপ বিরোধী লড়াইতে সামিল করা যাচ্ছে না। তরুণদের এসব আর সহ্য হচ্ছিল না। শীতের বাতাসে ছুরির ধার। তবু জাপানের নতুন আক্রমণের বিরুদ্ধে ৯ই ডিসেম্বর পিকিং-এর ছাত্ররা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পথে বেরিয়ে এল—স্কুলের ছাত্র, কলেজের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মুখে বিপ্লবী গান :

থাকবো না দাস, জাগো স্বাধীনতা-ভক্ত!
নতুন চীনের প্রাচীর গড়ব শক্ত
দিয়ে আমাদের দেহের মাংস-রক্ত!

শুধু গান নয়, স্লোগানও আছে—"জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!" "দেশদ্রোহী নিপাত যাক!" "জাপানকে রুখতে হবে, অস্ত্র দিয়ে রুখতে হবে!" কুয়োমিনতাং সরকার ছাত্রদের আবেদন-পত্র গ্রহণই করল না। ছাত্ররা ক্ষেপে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে লাগল। বাইরের ছাত্রদের না আসতে দেবার জন্যে কুয়োমিনতাং পিকিং শহরে ঢোকার গেটগুলো বন্ধ করে দিল। তারপর তরোয়ালের আর হোজ পাইপের জলের ঘায়ে ছাত্র-বিক্ষোভ দমন করবার বীভৎস চেষ্টা!

চিরদিন যেমন হয়—রক্তপাতে আন্দোলন ভয়ানক বেড়ে গেল। ১৬ই ডিসেম্বর পিকিং-এ দশ হাজার ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের রক্তাক্ত লড়াই হল। আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। উহান, ক্যান্টন, নানকিং, শাংহাই, সিয়ান সর্বত্র ছাত্ররা ক্লাশে না গিয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ৯ই ডিসেম্বর থেকে এক নতুন জোয়ার জাগল জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইর জন্যে এবং কুয়োমিনতাং-এর স্বেচ্ছাচারের বদলে জাতীয় গণতন্ত্রের জন্যে। ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে ছাত্ররা তিন হাজারের এক প্রচারকদল তৈরি করে গ্রাম ও শহরে কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্তের মধ্যে তাদের দাবিগুলোকে ছড়িয়ে দেয় কারণ জাপানকে হটিয়ে দেশকে বাঁচাবার আন্দোলনে সবাইকে সামিল করতে হবে।

১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারীতে লাল ফৌজ শেনসিতে পীত নদী পার হয়ে জাপানীদের মোকাবেলা করার জন্যে পুব দিকে এগিয়ে যায়। কুয়োমিনতাং বাহিনী শুধু যে তাদের পথ আগলে দাঁড়ায় তাই নয়, তারা শেনসি ও কানসুর

বিপ্লবী ঘাঁটিও আক্রমণ করে। তখনকার মতো আত্মরক্ষার জন্যে লাল ফৌজ পীত নদী পেরিয়ে পিছু হটে পশ্চিমে চলে আসে। কমিউনিস্ট পার্টি এইভাবে প্রমাণ করে যে গৃহযুদ্ধ সে পার্টি চায় না, জাপবিরোধী সংগ্রাম চায়। পার্টির ডাকে জাপবিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকরা এগিয়ে এল। ১৯৩৬-এর শেষের দিকে শাংহাই-এর কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ডাকে পঁয়তাল্লিশ হাজার শ্রমিক জাপ-বিরোধী ধর্মঘটে সামিল হল। এর পর সিংতাও-এ জাপানী মালিকের কাপড়ের কলগুলোতে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দিল। দেশজুড়ে জাপবিরোধিতার জোয়ার বইতে শুরু করল।

মাও ৎসে-তুং ইতিপূর্বেই জাপবিরোধী সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ঘোষণা করে সকলের সহযোগিতার ভিৎ তৈরি করে রেখেছিলেন। পার্টির নীতি যুক্তফ্রন্টের নীতি। সারা পৃথিবীতে তখন ফ্যাসি-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠছে। ১৯৩৫-এর ২৫এ ডিসেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো এক প্রস্তাবে এমন এক যুক্তফ্রন্ট গড়ার আহ্বান জানাল যাতে "চীনের কোনও দেশপ্রেমিক জাপবিরোধী ফ্রন্টের বাইরে না থাকে।" মাও ৎসে-তুং ২৭এ ডিসেম্বর তাঁর "জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৌশল প্রসঙ্গে" রিপোর্টে বললেন যে বিপ্লবী শক্তির সব ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে শুদ্ধ থাকার শুচিবায়ু একেবারে অর্থহীন। "দরোজা বন্ধ" নীতির বিরোধিতা করে মাও ৎসে-তুং জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ার ওপর জোর দিলেন। তিনি বললেন যে জাতীয় বুর্জোয়ার "বামপন্থী" অংশ জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিতে পারে। আর তার বাকি অংশ দোমনা অবস্থা থেকে নিরপেক্ষ অবস্থার দিকে ঝুঁকতে পারে। এমনকি জমিদার এবং মুৎসুদ্দিদের মধ্যেও ঐক্য তেমন মজবুত নয়। তাদের মধ্যে যারা ব্রিটেন ও আমেরিকার কেনা গোলাম তারা জাপানের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে লড়তে পারে। এদিকে শ্রমিক কৃষক এবং ছাত্রদের জাপ-বিরোধী লড়াই বেড়েই চলল। তাই মাও ৎসে-তুং বললেন, "এক বিরাট পরিবর্তন এল বলে। পার্টির কর্তব্য হচ্ছে দেশজোড়া শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, পেতিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কাজের সঙ্গে লাল ফৌজের কাজকে যুক্ত করে একটা বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা।" তিনি নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পার্টির শ্লোগান পাল্টে দিলেন। এত দিন শ্লোগান ছিল "শ্রমিক-কৃষক প্রজাতন্ত্র", এবারে তা বদলে হল "জনগণের প্রজাতন্ত্র"। এই ধরনের

সরকারের প্রধান খুঁটি শ্রমিক-কৃষক হলেও সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ-বিরোধী অন্য সব শ্রেণীর প্রতিনিধিই সেখানে স্থান পাবে। যে সব জাতীয় বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের সমর্থন করে না তাদের শিল্প ও বাণিজ্যকে রক্ষা করা হবে। ধনী কৃষকের যে জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সামন্ত শোষণের সঙ্গে জড়িত নয় সেগুলোকে রক্ষা করা হবে। এই "জনগণের প্রজাতন্ত্র" শ্লোগানটাও চিয়াং মেনে নিতে পারবে না জেনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নানকিং সরকারকে জাপ বিরোধী যুদ্ধে সামিল করবার জন্যে ১৯৩৬-এর ২৫এ আগস্ট কুয়োমিনতাং-এর কাছে এক চিঠিতে ঐ শ্লোগান পাল্টে "গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" এই শ্লোগানটি দিল। শব্দের একটু হেরফের হলেও ছুটো শ্লোগানেরই মূল কথা বলতে গেলে একই।

লাল ফৌজ কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে জাপবিরোধী ঐক্য গড়তে এতটুকু গড়িমসি করেনি। কুয়োমিনতাং ফৌজকে তারা প্রস্তাব পাঠিয়েছিল যে দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষা সম্বন্ধে এবং জাপানকে রুখবার আন্দোলন সম্বন্ধে তারা আলাপ-আলোচনা করতে চায়। লাল ফৌজ এখানেই থেমে থাকেনি। চিয়াং তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালে তারা তাদের সঙ্গে যেমন লড়তে লাগল তেমনি তাদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল "চীনেদের বিরুদ্ধে চীনেদেব কিছুতেই লড়া উচিত নয়। জাপানকে রোখো।" চীনের তখনকার রাজ-নৈতিক অবস্থা আর সাধারণ মানুষের মনমেজাজের সঙ্গে লাল ফৌজের এই শ্লোগানের পুরো মিল ছিল—এ শ্লোগান একেবারে ওপর তলাব বদমায়েস ছাড়া অন্য সবার মনের ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করল। ছাত্রদের আন্দোলন, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টি আর লাল ফৌজের নীতি ও ঘোষণা, চিয়াং সরকারের বর্বরতা সব মিলে এমন একটা আবহাওয়া হল যার প্রচণ্ড প্রভাব গিয়ে পড়ল খোদ চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীর ওপর। ১৯৩৬-এর ৯ই ডিসেম্বর আগের বছরের "৯ই ডিসেম্বর"-এর বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে সিয়ানের ছাত্ররা বিক্ষোভের আয়োজন করে।

চিয়াং খান সিয়ানে এসেছে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূব অঞ্চলের বাহিনীকে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য করতে। কারণ চিয়াং-এর উত্তর-পশ্চিম বাহিনীর সেনাপতি ইয়াংহু-চেং এবং উত্তরপূর্ব বাহিনীর তরুণ সেনানায়ক চাং সুয়েহ্-লিয়াং লাল ফৌজের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে এই চুক্তি করেছে যে এক জোট হয়ে তারা জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে। চিয়াং এতে চটে গিয়ে এই

চুক্তি ভাঙতে এসেছে। ছাত্ররা যখন তার কাছে দাবি নিয়ে হাজির হল যে জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তখন চিয়াং এই উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূব বাহিনীকে হুকুম করল তাদের হত্যা করতে। কিন্তু তখনকার আবহাওয়াতে বাহিনী দুটি জাতীয় জাপবিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে পড়ায় তারা ছাত্রদের ওপর হামলা না করে চিয়াংকেই গ্রেপ্তার করে বসল। তাদের উদ্দেশ্য হল চিয়াংকে জাপবিরোধী যুক্তফ্রন্টে আসতে বাধ্য করা। এরকম নাটুকে ঘটনা কমই ঘটে। ইতিহাসে এই ঘটনা "সিয়ানের ঘটনা" বলে বিখ্যাত। তারিখটা হল ১৯৩৬-এর ১২ই ডিসেম্বর। চিয়াং যখন বন্দী তখন চৌ এন-লাই তার কাছে গেলেন। কমিউনিস্ট পার্টির হাজার হাজার সভ্যকে চিয়াং হত্যা করেছে, সুতরাং সেই পার্টির নেতা চৌ এন-লাইকে দেখে বন্দী চিয়াং ভাবল এবারে তার শেষ সময় উপস্থিত—এক্ষুণি মৃত্যুদণ্ড হবে। কমিউনিস্ট পার্টি হস্তক্ষেপ করে চিয়াংকে বাঁচিয়ে না দিলে চিয়াং-এর অধীন সৈন্যবাহিনীর অফিসারেরা তখনই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তার প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা নির্ঘাত করত। চিয়াং-এর গালাগালির ভাষায় যারা "লাল দস্যু" তারাই চিয়াংকে বাঁচাল, অবশ্য চিয়াংকে বাঁচালো দেশকে বাঁচাবার জন্যে। কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং-এর বাহিনী দুটির বিদ্রোহী সেনানায়কদের বলল যে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা করলে গৃহযুদ্ধ আরও বেড়ে যাবে এবং তাতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদেরই সুবিধে হবে। চিয়াংকে মুক্তি দিয়ে দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার কৃতিত্ব কমিউনিস্ট পার্টির। লাল ফৌজের সঙ্গে সামিল হয়ে জাপবিরোধী যুদ্ধে যোগ দিতে চিয়াংকে রাজি হতে পার্টি বাধ্য করল। কমিউনিস্ট পার্টি প্রমাণ করল যে জাপানের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ব্যাপারে পার্টির চেষ্টা কত আন্তরিক। কিন্তু জাপবিরোধী সংগ্রামে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক-শ্রেণী। মাও ৎসে-তুং ১৯৩৭-এর মে মাসে তাঁর "জাপানের বিরুদ্ধে প্রতি-রোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য" রিপোর্টটিতে দেখিয়ে দিলেন কি করে বিপ্লবী শ্রেণীগুলোকে শ্রমিক শ্রেণী তার পার্টির মধ্যে দিয়ে রাজ-নৈতিক নেতৃত্ব দেবে : এক, ঐতিহাসিক অবস্থা বিচার করে মূল রাজনৈতিক শ্লোগান ঠিক করতে হবে। এগিয়ে চলার প্রতিটি ধাপে কর্মসূচী সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। দুই, লক্ষ্যে পৌছনোর জন্যে শ্রমিকশ্রেণী এবং বিশেষ করে তার অগ্রগামী ফৌজ অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে স্থির আদর্শ এবং

অন্তহীন উৎসাহ নিয়ে এগোতে হবে। এইভাবে পার্টি সবার আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে। কমিউনিস্টদের হতে হবে অত্যন্ত দূরদর্শী, চরম ত্যাগী, সবার চেয়ে বেশি সংকল্পে দৃঢ়, এবং কোনও অবস্থা বিচার করতে গিয়ে একপেশে দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের অবশ্যই অধিকাংশ জনগণের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং তাদের পক্ষে টেনে আনতে হবে। তিন, কমিউনিস্ট পার্টিকে মিত্রদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং মৈত্রীকে বাড়িয়ে তুলতে এবং মজবুত করতে হবে। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে পার্টি কখনই তার নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলো ত্যাগ করবে না। চার, কমিউনিস্ট পার্টি তার সভ্য সংখ্যা বাড়িয়ে তুলবে এবং তার মতাদর্শগত ঐক্য এবং কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করবে। মাও ৎসে-তুং ১৯৩৯-এর ৪ঠা অক্টোবর "দি কমিউনিস্ট" পত্রিকাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, "পার্টি সংগঠনকে বাড়াবার সময়, বেশ কিছু সুবিধাবাদী এবং শত্রুর চর গোপনে ভেতরে ঢুকে পড়তে সফল হয়েছিল, যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি এই শ্লোগানের ওপর জোর দিয়েছিল, 'সাহসের সঙ্গে পার্টিকে বাড়িয়ে তোল। কিন্তু একটাও অবাঞ্ছিত লোককে ভেতরে ঢুকতে দিও না।' এর জন্যে আসলে যে দায়ী সে আজ হাতে নাতে ধরা পড়েছে। এই আসামী লিউ শাও-চি। সে তখন উত্তর চীনে কাজ বা কুকাজ করছিল। সেখানে তার নিজের মতো এক দঙ্গল বিশ্বাসঘাতককে লিউ আদর করে পার্টির ভেতরে ডেকে এনেছিল। এরা আগেই শত্রুর দলে গিয়ে ভিড়েছিল। পরে এদেরই সে তিরিশ বছর ধরে তার প্রতিবিপ্লবী কাজে ব্যবহার করল। যাক সে কথা। ১৯৩৭-এর মে মাসের রিপোর্টটার কথা বলছিলাম। সেখানে মাও ৎসে-তুং বললেন যে বর্তমান সংগ্রাম কোনও অবস্থাতেই শ্রমিকশ্রেণী, পার্টি এবং ব্যাপক জনগণের শেষ লক্ষ্যগুলোকে বরবাদ করে দিয়ে চালানো হবে না। ব্যাপক রাজনৈতিক শক্তিকে সক্রিয় করে তোলার জন্যে কখনও কখনও আপোষ করতে হতে পারে এবং কতগুলো সুবিধে ছেড়ে দিতে হতে পারে। কিন্তুও কোন অবস্থাতেই সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমের আদর্শ থেকে সরে এলে চলবে না। ঐ সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর জন্যেই বর্তমান স্তরে নয়া গণ-তান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হবে। লিন পিয়াও তাঁর "জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক" লেখাটিতে বলেছেন যে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি ঐতিহাসিক স্তর। প্রতিরোধ যুদ্ধে জয়লাভই পার্টির একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। নয়া গণতান্ত্রিক

বিপ্লবে সারা দেশ জুড়ে জয়লাভের জন্যে ভিত্তি গড়ে তোলাও ছিল এই যুদ্ধে পার্টির একটি লক্ষ্য। প্রথমে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে পারলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা সম্ভব। ১৯৩৭ এর মে মাসে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে মাও ৎসে-তুং বললেন, কোনও প্রবন্ধ লেখার সময় প্রথম অংশ শেষ করে তবেই দ্বিতীয় অংশ লিখতে পারা যায়। সমাজতন্ত্রের জয়ের জন্যে আগে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক বিপ্লবে দৃঢ় নেতৃত্ব দেওয়া।

তখনকার অবস্থা বিচার করে পার্টি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই কথাগুলো বুঝেছিল : এক, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের জন্যে জনসাধারণের দাবি যেভাবে প্রবল হয়ে উঠছে তাতে চিয়াং-এর পক্ষে তার সৈন্যদলকে আর বেশি দিন গৃহযুদ্ধে লাগিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। দুই, জাপান তার আক্রমণের এলাকা বাড়াবে, এবং তাহলে চিয়াংকে আত্মরক্ষার জন্যেই লড়তে হবে। তিন, জাপানের যুদ্ধবাজদের ভয়ে চিয়াং-এর ব্রিটিশ ও মার্কিন মুরুব্বীরা জাপ-বিরোধিতায় চিয়াংকে খানিকটা সমর্থন ও সাহায্য করবে। অবশ্য বৃটিশ-আমেরিকান সাহায্যের উদ্দেশ্য হবে পরে জাপানের ওপর চাপ দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কিছু সুবিধে আদায় করা।

প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সময়টা পার্টিকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগোতে হল। একদিকে পার্টি এবং তার সশস্ত্র ফৌজকে নির্মূল করার জন্যে চলছে প্রকাশ্য শত্রুর বর্বর আক্রমণ। আর অন্যদিকে পার্টির ভেতরে "বাম" আর "দক্ষিণ" বিচ্যুতির সঙ্গে এসে জুটলো চাং কুয়ো-তাও-এর ভীরুতার লাইন। পার্টি এবং জনগণকে এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন মাও ৎসে-তুং। পার্টি এবার মাও ৎসে-তুং-কে চিনতে পারল একজন মহান, অসাধারণ গুণী এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নেতা হিসেবে। পার্টিতে তাই নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হল।

মাও ৎসে-তুং-এর এ সময়কার কয়েকটি লেখার কথা না বললেই নয়। ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে তাঁর বিখ্যাত 'চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে রণনীতির সমস্যা' লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং দ্বিতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতার সার সংকলন করেছেন। পার্টিতে দ্বিতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের সময় সামরিক ব্যাপারে দুই লাইনের লড়াই চলছিল, তারই ছবি আমরা এ লেখাতে পাই। ১৯৩৫-এর জানুয়ারীতে সুনিয়ীতে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর বর্ধিত সভায়

মাও ৎসে-তুং-এর সামরিক লাইনের জয় হল। এক বছর বাদে তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের রণনীতির সমস্যার ওপর এই লেখাটি লিখলেন। এ লেখায় তিনি "বামপন্থী" এবং "দক্ষিণপন্থী" সামরিক লাইনের মুখোশ খুলে ফেললেন এবং সঠিক সামরিক লাইন দেখিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে "জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৌশল প্রসঙ্গে" নামে রিপোর্টটিতে মাও ৎসে-তুং দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক লাইনের সমস্যাগুলোর সমাধান করলেন। ১৯৩৭-এর জুলাই মাসে মাও ৎসে-তুং তাঁর অত্যন্ত পরিচিত "অনুশীলন প্রসঙ্গে" লেখাটিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে সহজ অথচ অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করলেন। দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় পার্টির মধ্যে জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ভুল ধারণাগুলো ছিল সেগুলো তিনি খণ্ডন করলেন। তিনি পার্টির ভেতরকার গোঁড়াদের আক্রমণ করলেন। তারা চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করত। তারা মার্কসবাদী রচনা থেকে ইচ্ছেমত ছিঁড়ে এনে বুলি আওড়ে লোককে ঘাবড়ে দিতে চাইত। আরেক দল শুধু অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করত। তারা তাদের খুচরো অভিজ্ঞতার বড়াই করত, তত্ত্বের গুরুত্ব বুঝত না। বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া যে বিপ্লব হয় না এ সত্য না বুঝে তারা অন্ধের মতো পরিশ্রম করত। এই দুই ধরনের ভুল বিশেষ করে গোঁড়ামি ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত চীন বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি করেছিল। তাই পার্টির মধ্যেকার এই দু রকমের ভুল, বিশেষ করে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মাও ৎসে-তুং "অনুশীলন প্রসঙ্গে" লেখাটি লিখেছিলেন। এই গোঁড়ামি দূর করার জন্যেই পরে তিনি "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে" লেখেন।

মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে একমাত্র সঠিক পথ ধরে চীন বিপ্লব এগিয়ে চলল। তখন শহরে শক্তিশালী শত্রুর কাছে বিপ্লবের হার হয়েছে। সেখানে এখন জয় সম্ভব নয়। মাও ৎসে-তুং বিপ্লবে জয়ের সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। তাঁর চেষ্টায় পার্টি বুঝতে পারল সৈন্যবাহিনীতে এবং গ্রামাঞ্চলে কাজ কত জরুরী। পার্টি লাল ফৌজ সৃষ্টি করল এবং গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ল। বিপ্লবী যুদ্ধ, ভূমিসংস্কার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পার্টি নেতৃত্ব দিতে শিখল।

১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৩৫-এর পর থেকে জাপান চীনকে তার একচেটিয়া উপনিবেশে পরিণত করবার জন্যে বেশি বেশি

করে আক্রমণ চালাল। ক্রমে চীন ও জাপানের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠলো আর দেশের ভেতরকার শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলো গৌণ বা অপ্রধান হয়ে পড়ল। দেশের ভেতরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে একের পর এক পরিবর্তন এল। মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ার আহ্বান জানালেন। এবারের যুক্তফ্রন্ট কিন্তু আগেকার যুক্তফ্রন্ট থেকে অনেক আলাদা। এখন রয়েছে একটা শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি আর শক্তিশালী লালফৌজ। তার ওপর রয়েছে লালফৌজের ঘাঁটি এলাকাগুলো। কমিউনিস্ট পার্টি আর লাল ফৌজ শুধু জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের উদ্যোক্তাই নয়, ভবিষ্যতে তারাই হবে জাপবিরোধী সরকার এবং সৈন্যবাহিনীর দৃঢ় অবলম্বন। তারাই জাপ সাম্রাজ্যবাদী এবং চিয়াং-এর যুক্তফ্রন্টকে ভাঙ্গার চক্রান্ত ব্যর্থ করবে।

দশ বছর ধরে চরম সংকটের মধ্যে মাও ৎসে-তুং-এর সঠিক নেতৃত্বে ঘরে বাইরে শত্রুর আক্রমণকে পার্টি রুখল, লাল ফৌজের মূল শক্তি, ঘাঁটি এলাকাগুলোর কিছু অংশ এবং বহু চমৎকার কর্মী এবং লক্ষ লক্ষ সভ্যকে রক্ষা করল এবং মূল্যবান্ বিপ্লবী অভিজ্ঞতা লাভ করল। ১৯৩৫-এর শেষের দিকে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কৌশল দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার পর গৃহযুদ্ধ থিতিয়ে পড়ল আর জাপ-বিরোধী যুদ্ধের দিকে ঁ ন এগিয়ে চলল। দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আগুনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক পোড় খাওয়া পার্টি আর তার খাঁটি বিপ্লবী কর্মীর দল। তারা আগামী দিনের কঠিন লড়াই লড়বে।

॥ প্রতিরোধের হাতিয়ার ॥

১৯৩১-এ উত্তর-পূব চীন পুরোপুরি জাপানী ড্র্যাগনের কব্জায় চলে গেল। ১৯৩২-এর জানুয়ারীতে শাংহাই-এর ওপর তার থাবা এসে পড়ল। পরের বছর যেহল প্রদেশ আর চাহার-এর উত্তর অংশ জাপান গিলে ফেলল। ড্র্যাগনের লোভ বেড়েই চলল। ১৯৩৫-এর পর জাপান বেশি বেশি করে চীন দেশের ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করল, যুদ্ধকে আরও তীব্র করল আর

বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে দিল। ১৯৩৭ এর গ্রীষ্মে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করল। সারা দেশ জুড়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে মাও ৎসে-তুং-এর রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন লিন পিয়াও তাঁর "জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক" লেখাটিতে আশ্চর্য সহজ ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

মাও ৎসে-তুং দেখিয়ে দিলেন যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে জাপানের একটা উপনিবেশে পরিণত করতে চেষ্টা করার ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলেছে—এই দ্বন্দ্বকেই প্রধান দ্বন্দ্ব করে তুলেছে। চীনের ভেতরকার শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বগুলি অবশ্য রয়ে গেছে। যেমন, ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব, কৃষক শ্রেণী এবং জমিদার শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, সর্বহারা শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং একদিকে কৃষক শ্রেণী ও শহরের পেতিবুর্জোয়া আর অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। মাও ৎসে-তুং দেখিয়ে দিলেন যে দেশের ভেতরকার এই দ্বন্দ্বগুলো রয়ে গেলেও জাপানী আক্রমণের ফলে এই সব দ্বন্দ্বগুলো গৌণ বা অপ্রধান হয়ে পড়েছে, তিনি আরও বললেন যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে বিরোধিতা করার দাবিটা বড়ো জমিদার এবং বড়ো বুর্জোয়াদের ভেতরকার জাপান-ঘেঁষা সামান্য কিছু বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সারা চীন জুড়ে জনগণের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের সাধারণ দাবি হয়ে উঠেছে।

একইভাবে চীন ও জাপানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বাড়তে বাড়তে যেমন প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে উঠল, তেমনি চীনের সঙ্গে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দ্বন্দ্ব কমে গৌণ বা অপ্রধান হয়ে পড়লো। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনকে নিজের একচেটিয়া উপনিবেশ করতে চাওয়ার ফলে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে জাপানের বিরোধ বেড়ে গেল। তাই চীনের পক্ষে ঐ সব দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার বিরোধিতা করা সম্ভব হল। এই প্রশ্নগুলো মাও ৎসে-তুং ১৯৩৭-এ মে মাসে ইয়েনানে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে তাঁর রিপোর্টে এবং ১৯৩৭-এর আগস্টে ইয়েনানের জাপ-বিরোধী সামরিক এবং রাজনৈতিক কলেজে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতায় আলোচনা করেন। ঐ কলেজের বক্তৃতাগুলোই মাও ৎসে-তুং আরেক বার নতুন করে দেখে "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে" এই নামে তাঁর রচনাবলীতে ছাপতে দেন। মাও ৎসে-তুং জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের নীতিকে রূপ দিতে গিয়ে চীনের

সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে শ্রমিক, কৃষক এবং শহরের পেতিবুর্জোয়ারা হল জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রধান শক্তি। তারা জোরের সঙ্গে দাবি করছিল যে প্রতিরোধ যুদ্ধকে যেন অবশ্যই শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া হয়। এরাই হল জনগণের মূল অংশ যারা আন্তরিক ভাবে ঐক্য এবং প্রগতি চাইছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণীর ছিল দুটো অংশ—জাতীয় বুর্জোয়া আর মুৎসুদ্দি বা দালাল বুর্জোয়া। বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়ারা সংখ্যায় বেশি। কিন্তু এদের হাঁটুর জোর ছিল না। প্রায়ই এরা দোটানায় পড়ত। শ্রমিকদের সঙ্গেও তাদের দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার ব্যাপারে তারা খানিকটা প্রস্তুত ছিল আর প্রতিরোধ যুদ্ধে তারা ছিল জাপ-বিরোধীদের মিত্রদের মধ্যে একটি। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণী সংখ্যার দিক থেকে খুব ছোটো হলেও তারাই চীনে শাসকের গদিটা দখল করে ছিল। এদের মধ্যেও আবার পার্থক্য ছিল। মুৎসুদ্দিদের মধ্যে যারা জাপান-ঘেঁষা তারা ছিল গোপন ও প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতক। তারা আত্মসমর্পণের জন্যে আগ বাড়িয়ে ছিল। অন্যদিকে বৃটিশ ও মার্কিন-ঘেঁষা মুৎসুদ্দিরা খানিকটা পরিমাণে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষে ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কোনও দৃঢ়তা ছিল না। ওরা খুবই চাইত জাপানের সঙ্গে আপোষে মিটমাট করে ফেলতে। তাছাড়া ওদের প্রকৃতিই ছিল ক'মিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণের বিরোধিতা করা।

জমিদাররা ছিল নানা ধরনের—বড়ো, মাঝারি এবং ছোটো। বড়ো জমিদার-দের একটা অংশ বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেল। অন্যরা প্রতিরোধের পক্ষে ছিল। তবে তারা ছিল ভীষণ দোদুল্যমান। অনেক মাঝারি ও ছোটো জমিদার প্রতিরোধ করতে চাইত। কিন্তু তাদের সঙ্গে আবার কৃষকদের দ্বন্দ্ব ছিল।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্ক যখন এরকম জটিল তখন জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে পার্টির নীতি হল একই সঙ্গে মৈত্রী ও সংগ্রাম। পার্টি জাপ-বিরোধী সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের সঙ্গে ঐক্য গড়বে, .রা দোমনা এবং অস্থায়ী মিত্র তাদেরও নিজেদের পক্ষে টেনে আনবার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী এবং স্তরগুলোর পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যায় এমন সঠিক নীতি নিতে হবে যাতে তারা সকলেই জাপানকে রুখবার সাধারণ উদ্দেশ্যকে সফল করতে সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে পার্টির স্বাধীনতা এবং উদ্যোগকে বজায়

রাখতে হবে। সাহস করে জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং জনগণের বাহিনীকে বাড়িয়ে তোলাকে পার্টির কাজের ভারকেন্দ্র করতে হবে। পার্টি "জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট" এবং "ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র"-র শ্লোগান তুলল। কিন্তু পার্টি চিয়াং এবং তার দলের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র জানে। তাই পার্টি পাশাপাশি এই শ্লোগান দিল—"গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর," "গণতন্ত্রের জন্যে লড়তে হবে" এবং "সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাও"। এই ভাবে দেশময় ঐক্য এবং সংগ্রাম দুটোকে যুক্ত করা হল। প্রতিরোধ, ঐক্য এবং প্রগতির ক্ষতি করে এমন সবরকম কাজকর্মের বিরুদ্ধে লড়াই চলল।

প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগে "দক্ষিণপন্থী" চেন তু-সিউব নীতি ছিল শুধুই মৈত্রী, কোনও সংগ্রাম নয়। আর দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে "বামপন্থী" ওয়াং মিং-এর নীতি ছিল শুধুই সংগ্রাম, মৈত্রীর কথা বলা চলবে না। প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরুতে ওয়াং মিং উল্টো সুর ধরল। এবার সে দক্ষিণপন্থী বনে গেল। ওয়াং এখন আত্মসমর্পনের লাইন নিল। চীনের মানুষ এই শিক্ষাই পেল যে, দক্ষিণপন্থী ভুল শুধরে নেওয়ার পর "বামপন্থী" ভুল মাথা তুলতে পারে। আবাব "বামপন্থী" ভুলকে তাড়ানোর পর দক্ষিণপন্থী ভুল বিপদ বাধাতে পারে। "বাম-পন্থী" ভুলগুলোকে বাতিল করে জাপ-বিরোধী জাতীয় মোর্চা গড়ে তোলার পর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ পার্টির কাছে সবচাইতে বড়ো বাধা হিসাবে দেখা দিল। ওয়াং মিং বলল, "সবকিছুই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে দিয়ে করতে হবে" অথবা "সবকিছুই যুক্তফ্রন্টের কাছে পেশ করতে হবে"। লিউ শাও-চি তাকে মদৎ দিল। এই "লাল" মুৎসুদ্দিগুলো স্বেচ্ছায় জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে ববাদ করল। তাই তারা নির্লজ্জের মতো বলল যে চিয়াং কাই-শেক ও কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে দিয়েই সব কিছু করতে হবে। ওয়াং মিং আর লিউ শাও-চি বলল যে চিয়াং ও কুয়োমিনতাং হচ্ছে "সর্বোচ্চ নেতৃত্ব"। মাও ৎসে-তুং ১৯৩৭-এর মে মাসে ইয়েনানে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে তাঁর রিপোর্টেই বলেছিলেন, "বর্তমান অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া শান্তি, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্যকে সফল করা এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব, একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব।"

যুক্তফ্রন্ট গড়ার জন্যে মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

চেষ্টার কোনও কসুর করেনি। কুয়োমিনতাংকে সমেত সমস্ত জাপ-বিরোধী পার্টি গ্রুপ এবং স্তরকে শত্রুর বিরুদ্ধে একটা যুক্ত মোর্চায় সামিল করার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মনীতিকে পর পর কয়েকবার একটু এদিক ওদিক করে খাপ খাইয়ে নিল। কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিজ্ঞা করল যে সুন ইয়াৎ-সেনের তিনটি বিপ্লবী গণআদর্শকে তারা পুরোপুরি বাস্তবে রূপ দেবে। শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া ঘাঁটি এলাকার সরকারের নাম পাল্টে নতুন নাম রাখা হল—চীন প্রজাতন্ত্রের শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া বিশেষ অঞ্চলের সরকার। শ্রমিক-কৃষকের লাল ফৌজের নতুন নাম হল জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর আট নম্বর রুট আর্মি ও নয়া চার নম্বর আর্মি। তাছাড়া জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার বদলে এখনকার নীতি হল খাজনা ও সুদ কমানোর নীতি।

আর লাল ঘাঁটিগুলোতে তিন পক্ষের যুক্ত শাসন চালু হল। এক পক্ষ হল কমিউনিস্টরা—যারা শ্রমিকশ্রেণী এবং গরীব কৃষকের প্রতিনিধি। আরেক পক্ষ হল পার্টির বাইরেকার প্রগতিশীলরা—যারা পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। তৃতীয় পক্ষ ছিল মাঝামাঝি স্তরের লোকেরা—যারা মাঝারি বুর্জোয়া এবং শিক্ষিত বড়ো ঘরের লোকদের প্রতিনিধি। লাল ঘাঁটিগুলোর শাসন সংস্থায় এই তিন পক্ষের প্রত্যেকটিরই তিন ভাগের এক ভাগ করে প্রতিনিধি ছিল। এটা "তিন তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা" বলে পরিচিত। এই সংস্থাগুলোতে পেতিবুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া এবং বড়ো ঘরের শিক্ষিত লোকেদের প্রতিনিধি ছাড়াও কুয়োমিনতাং-এর যেসব সদস্য জাপানকে প্রতিরোধ করতে চাইত এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করত না তারাও স্থান পেল। এর পেছনে ছিল জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারের আদর্শ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি, গণফৌজ এবং ঘাঁটি এলাকার স্বাধীনতা অটুট রাখা হল। কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিনতাং-এর ওপর চাপ দিল যাতে তারা ব্যাপক জনগণকে সক্রিয় করে তোলে, সরকারী যন্ত্রের সংস্কার করে, গণ-তন্ত্র চালু করে, জনগণের রুজিরোজগারের মান উন্নত করে, জনগণকে সশস্ত্র করে তোলে এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। জাপানের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সক্রিয় বিরোধিতা, জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন দমনের চক্রান্ত এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে আপস এবং শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ—কুয়োমিনতাং-এর এই সব অপরাধের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি

কঠোর সংগ্রাম চালাল। কুয়োমিনতাং এলাকা এবং জাপানের দখলী এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি হল একদিকে যুক্তফ্রন্টকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে তোলা আব অন্যদিকে বাছাই কর্মীদের নিয়ে গোপনে কাজ চালিয়ে যাওয়া। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

কিন্তু ওয়াং মিং বা লিউ শাও-চির এসব পছন্দ নয়। ওয়াং এবং তার দলবল বলল কুয়োমিনতাং কাজের যে গণ্ডী টেনে দেবে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার বাইরে যাওয়া চলবে না। তারা বলল আট নম্বর রুট আর্মি আর নয়া চার নম্বর আর্মিকে কুয়োমিনতাং-এর বাহিনীব সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। চমৎকার। এই তো দালালের মতো কথা।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী। তাই সেখানে বিরোধ থাকবেই। পার্টিকে তাই স্বাধীনভাবে সঠিক নীতি নিতে হবে যার ফলে প্রগতিশীল শক্তি বেড়ে উঠতে পারে, মাঝামাঝি শক্তিগুলোকে পক্ষে টেনে আনা যায় এবং ঘাগী প্রতিক্রিয়াশীলদেব বিরোধিতা করা যায়। প্রগতিশীল-শক্তিগুলোকে এগিয়ে দেওয়া এবং জনগণের বিপ্লবী শক্তিগুলোকে বাড়িয়ে তোলাই হল পার্টির মূল কাজ। একমাত্র এই ভাবেই যুক্তফ্রন্টকে বাঁচানো এবং জোরদার কবে তোলা সম্ভব। মাও ৎসে-তুং তাই বলছেন, "যদি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ঐক্য খোঁজা হয় তাহলে তা বাঁচবে ; যদি আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে ঐক্য খোঁজা হয়, তা হলে তা ধ্বংস হবে।"

মাও ৎসে-তুং-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র লিন পিয়াও বলছেন, "জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে অবশ্যই দু'রকমের মৈত্রী থাকবে। প্রথম, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। দ্বিতীয়, মেহনতী জনগণের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং অন্যান্য অ-মেহনতী জনগণের মৈত্রী। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষক এবং শহর ও গ্রামের অন্য সব মেহনতী জনগণের মৈত্রী। এই মৈত্রীই হল যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি। শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করছে সে ব্যাপক কৃষক জনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে এবং তার নিজের চার দিকে তাদের জমায়েত করতে পারছে কিনা তার ওপর। শ্রমিকশ্রেণী যখন কৃষকদের ওপর তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে একমাত্র তখনই এবং একমাত্র শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতেই দ্বিতীয় ধরনের মৈত্রীটি গড়ে তোলা

সম্ভব। ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা এবং জয়ের পথে সে যুদ্ধকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তা না হলে, যাই করা হোক কিছুই নির্ভরযোগ্য নয়—আকাশ কুসুম বা খানিকটা ফাঁকা বুলির মতো।"

মাও ৎসে-তুং ১৯৩৮-এর মে মাসের "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ" লেখাটিতে বললেন যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীন আক্রমণ করতে এই জন্যে সাহস পেল যে চীনের জনগণ তখনও সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, "এই ত্রুটিটা দূর হয়ে গেলে বেড়া আগুনের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়া একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো জাপানী আক্রমণকারী আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর দ্বারা ঘেরাও হবে, শুধু তাদের গলার আওয়াজেই তার আতঙ্ক হবে এবং তাকে পুড়িয়ে মারা হবে।" জাপান ছিল শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ। কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যবাদের তখন পতনের যুগ। এই বর্বর যুদ্ধে জাপানের জনশক্তি এবং সহায়-সম্পদে কমতি থাকায় তার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সে লড়ছিল অন্যায় যুদ্ধ। তাই আন্তর্জাতিক দিক থেকে সে সামান্যই সমর্থন পাচ্ছিল। অন্যদিকে চীন ছিল দুর্বল আধা ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সে ছিল তার প্রগতির যুগে। সে অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ছিল ন্যায় যুদ্ধ। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানোর জন্যে তার ছিল যথেষ্ট পরিমাণ জনশক্তি এবং সহায়-সম্পদ। আন্তর্জাতিক দিক থেকেও সে প্রচুর সাহায্য এবং সমর্থন পাচ্ছিল। তাই জাপানের সুবিধেগুলো সাময়িক, কিন্তু তার অসুবিধেগুলো মৌলিক। আর চীনের অসুবিধেগুলো সাময়িক আর সুবিধেগুলো মৌলিক। জাপানের সাময়িক সুবিধে এবং চীনের সাময়িক অসুবিধের জন্যে চীনের পক্ষে চট করে জয়লাভ সম্ভব নয়। আবার চীনের মৌলিক সুবিধেগুলো আর জাপানের মৌলিক অসুবিধেগুলোর জন্যে চীনের শেষ পর্যন্ত জয় হবেই হবে। তাই মাও ৎসে-তুং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে। প্রথম স্তরে শত্রুর রণনীতি হচ্ছে আক্রমণ আর বিপ্লবীদের রণনীতি হচ্ছে আত্মরক্ষা। এই স্তরের শেষের দিকে শত্রুর আক্রমণের তীব্রতা অনেক কমে যাবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে বেশ টানাটানির সম্ভাবনা দেখা দেবে। জাপানী জনগণ এবং সৈনিকরা যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়তে শুরু করবে।

যুদ্ধবাজ নেতাদের মনেও ফলাফল সম্বন্ধে হতাশা বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় স্তরে রণনীতির দিক থেকে অচল অবস্থা দেখা দেবে। তখন শত্রুর রণনীতি হবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা। বিপ্লবী শক্তি পাল্টা আক্রমণের জন্যে এই স্তরে প্রস্তুতি নেবে। তৃতীয় স্তরে বিপ্লবী শক্তি পাল্টা আক্রমণের রণনীতি এবং শত্রু পিছু হটার রণনীতি গ্রহণ করবে। এটাই হল যুদ্ধের শেষ স্তর। মাও ৎসে-তুং বললেন, "জয়লাভ করতে হলে প্রতিরোধ যুদ্ধে, যুক্তফ্রন্টে এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে আমাদের লেগে থাকতে হবে।" তিনি জোর দিয়ে বললেন, "কিন্তু জনগণকে সক্রিয় করার কাজ থেকে এগুলোকে আলাদা করা যাবে না।"

ওয়াং মিং ও তার দলবলের কিন্তু জনগণের ওপর কোনও আস্থা ছিল না। তারা কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সামরিক শক্তিকে সাময়িকভাবে দুর্বল দেখে এই সিদ্ধান্ত করল যে, প্রতিরোধ যুদ্ধে জিততে হলে কুয়োমিনতাং-এর ওপরই নির্ভর করতে হবে। জনগণের জয় না হয়ে কুয়োমিনতাং-এরই জয় হবে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রতিরোধ-যুদ্ধে নেতা হওয়া সাজে না। কুয়োমিনতাং-এরই এই যুদ্ধে নেতা হওয়া সম্ভব। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের ওপর তাদের এতটুকু আস্থা ছিল না। ভাবল কুয়োমিনতাং-এর ওপর নির্ভর করে চটপট জয়লাভ সম্ভব। জনগণকে সক্রিয় করতে এবং মুক্ত এলাকা ও জনগণের সশস্ত্র শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে তারা চাইল না। ভাবল যে এসব করলে চিয়াং যুক্তফ্রন্ট থেকে চম্পট দেবে।

কিন্তু মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে পার্টির মূল লাইন ছিল, সাহস করে জনগণের ব্যাপক অংশকে জাগিয়ে তোলা, এবং জনগণের বাহিনীকে বাড়িয়ে তোলা। মাও ৎসে-তুং প্রতিরোধ যুদ্ধে জনযুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়া এবং শহরকে ঘিরে ফেলার জন্যে এবং শেষকালে সেগুলো দখল করার জন্যে গ্রামাঞ্চলকে ব্যবহার করার পথ দেখিয়ে দিলেন। জনযুদ্ধে জয়লাভের জন্যে প্রধানত কৃষকদের ওপর আস্থা রাখা অবশ্য প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের মধ্যে তারাই হচ্ছে সংখ্যায় সবচাইতে বেশি এবং সবার চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য। প্রতিরোধ যুদ্ধে তারাই হচ্ছে প্রধান শক্তি। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ হল মূলত পার্টির নেতৃত্বে কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। লিন পিয়াও বলেছেন, "কৃষক জনতাকে জাগিয়ে

তুলে, সংগঠিত করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের একাত্ম করে তুলে আমাদের পার্টি এমন এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলল যা সবচেয়ে প্রবল শত্রুকে পরাজিত করতে পারে।" কৃষকদের ওপর আস্থা রেখেই গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় জাপানীরা বড়ো বড়ো শহর দখল করে নিলেও সৈন্য-সংখ্যা কম থাকায় বিশাল গ্রামাঞ্চল তারা দখল করতে পারেনি। তাই গ্রামে তারা দুর্বল ছিল। সেই জন্যে সেখানে ঘাঁটি গড়া সম্ভব হল। ঘাঁটি এলাকাগুলোতে গণতান্ত্রিক সংস্কার চালু হল, জনগণের জীবন ও জীবিকার উন্নতি হল, কৃষক জনতাকে সক্রিয় এবং সংগঠিত করা হল। ব্যাপকভাবে জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠা করা হল। ব্যাপক জনগণ নিজেদের ব্যাপার নিজেরা চালাবার গণতান্ত্রিক অধিকার পেল। তাছাড়া খাজনা এবং সুদ কমানো এবং ঐ জাতীয় কাজের ফলে সামন্ত শোষণ দুর্বল হয়ে পড়ল এবং জনগণের জীবন ও জীবিকার উন্নতি হল। কৃষক জনতার উৎসাহ প্রবল ভাবে বেড়ে গেল।

যে সব গ্রাম বা শহর শত্রু দখল করে রেখেছে সেখানে আইনী এবং বেআইনী সংগ্রামকে যুক্ত করা হল। জনগণের মূল অংশকে এবং দেশ-প্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা হল। শত্রু এবং তার হাতের পুতুলদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ভাগ করে খান খান করে দেওয়া হল। এর উদ্দেশ্য ছিল বাইরের আক্রমণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সময়মত ভেতর থেকে শত্রুকে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া।

পার্টি যে ঘাঁটি এলাকাগুলো গড়ে তুলেছিল সেগুলোই চীনের জনগণের জাপানকে রুখবার এবং দেশকে বাঁচাবার লড়াইয়ের ভারকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। এই ঘাঁটিগুলোর ওপর নির্ভর করেই পার্টি জনগণের বিপ্লবী বাহিনীগুলোকে বাড়িয়ে তুলল এবং শক্তিশালী করল, অটল ভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে জয়লাভ করল।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আট নম্বর রুট আর্মি এবং নয়া চার নম্বর আর্মির শক্তির মূলে ছিল মাও ৎসে-তুং-এর বিপ্লবী ফৌজ গড়ে তোলার নির্ভুল তত্ত্ব। এই বাহিনীগুলো ছিল এক নতুন ধরনের বাহিনী। এগুলো ছিল গণফৌজ, যে ফৌজ মন-প্রাণ দিয়ে জনগণের স্বার্থে কাজ করে। এই ফৌজ মাও ৎসে-তুং-এর নির্দেশে তিনটি কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত—

লড়াই, জনগণের মধ্যে কাজ এবং উৎপাদন। আদর করে জনগণ বলত, ওরা "আমাদের নিজের ছেলে।" শৃঙ্খলার তিনটি নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয়ের কথা আগেই বলেছি। সৈনিকেরা সেগুলো সব সময় মেনে চলত।

মাও ৎসে-তুং ফৌজ গড়ার ব্যাপারে রাজনীতিকে প্রাধান্য দিলেন। অর্থাৎ ফৌজ গড়তে হবে প্রথমত এবং প্রধানত রাজনীতির ভিত্তিতে। রাজনৈতিক কাজই হচ্ছে ফৌজের প্রাণ। গণফৌজকে অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম এবং সামরিক কলাকৌশলের উন্নতি করার দিকে সব সময় অবশ্যই নজর দিতে হবে। কিন্তু লড়বার সময় গণফৌজ শুধু অস্ত্রশস্ত্র ও কলাকৌশলের ওপর নির্ভর করে না। সে প্রধানত নির্ভর করে রাজনীতির ওপর। নির্ভর করে সেনাপতিদের এবং যোদ্ধাদের সর্বহারার বিপ্লবী চেতনা ও সাহসের ওপর। নির্ভর করে জনগণের সমর্থন ও সাহায্যের ওপব।

১৯৩৭-এর অক্টোবরে বৃটিশ সাংবাদিক জেম্‌স বেরট্রামকে মাও ৎসে-তুং বলেন যে আট নম্বর রুট আর্মির রাজনৈতিক কাজের তিনটি মূল নীতি ছিল। এক, অফিসার এবং সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য। এর অর্থ হচ্ছে সৈন্য-বাহিনী থেকে সামন্ততন্ত্রের অভ্যাসগুলো উৎখাত করা, মারধোর এবং গালাগাল বন্ধ করা, সচেতন শৃঙ্খলা গড়ে তোলা এবং সবাই একসঙ্গে সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়া—যার ফলে গোটা সৈন্যবাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে। দুই, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে ঐক্য। এর অর্থ হচ্ছে এমন শৃঙ্খলা বজায় রাখা যার ফলে জনগণের স্বার্থের সামান্যতম ক্ষতি ঠেকানো, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, তাদের সংগঠিত করা এবং সশস্ত্র করা, তাদের অর্থনৈতিক বোঝা হাল্‌কা করা এবং সৈন্যবাহিনী এবং জনগণের ক্ষতি করে এমন বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুর সহযোগীদের দমন করা—যার ফলে সৈন্যবাহিনী জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং সর্বত্র অভ্যর্থনা পাবে। তিন, শত্রুর বাহিনীগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলা এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা। আমাদের জয় শুধুমাত্র সামরিক অভিযানের ওপর নির্ভর করে না, শত্রুর বাহিনীগুলোকে ছত্রভঙ্গ করার ওপরও নির্ভর করে।

প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় মাও ৎসে-তুং তাঁর "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রসঙ্গে" লেখাটিতে বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী এবং শত্রুর শক্তির মধ্যে পার্থক্য বিচার করে গেরিলা যুদ্ধের ওপর জোর দিলেন। তিনি বললেন, দীর্ঘ পাড়িতে ঘোড়ার হিম্মৎ

যাচাই হয় আর মানুষের কলজের জোর যাচাই হয় দীর্ঘমেয়াদী কাজে। তেমনি এই দীর্ঘ আর নিষ্ঠুর সংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধ দেখিয়ে দেবে তার প্রচণ্ড শক্তি। তিনি আট নম্বর রুট আর্মি এবং নয়া চার নম্বর আর্মির সামনে এই নীতি তুলে ধরলেন, "গেরিলা যুদ্ধই মূল কাজ, তবে অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধ করার কোনও সুযোগই হাতছাড়া ক'রো না।" লিন পিয়াও বলেছেন যে মাও ৎসে-তুং গেরিলা যুদ্ধকে রণনীতির পর্যায়ে উন্নত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন "শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের সমস্ত শক্তিকে সক্রিয় করার এবং প্রয়োগ করার একমাত্র পথ গেরিলা যুদ্ধ, যুদ্ধ চালাতে চালাতে আমাদের সেনাবাহিনীকে বাড়াবার, শত্রুর সংখ্যা-কমাবার এবং তাকে দুর্বল করার, শত্রু আর আমাদের মধ্যেকার শক্তির ভার-সাম্য ক্রমে বদলাবার, গেরিলা যুদ্ধ থেকে চলমান যুদ্ধে চলে যাবার এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুকে হারিয়ে দেওয়ার একমাত্র পথ গেরিলা যুদ্ধ।" জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের শেষের দিকে শত্রু এবং বিপ্লবী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য পাল্টে যাওয়ায় গেরিলা যুদ্ধ আর লড়াইয়ের প্রধান রূপ থাকল না। তার বদলে চলমান যুদ্ধের রণনীতি হল প্রধান রূপ। তবে প্রধান রূপ চলমান যুদ্ধই হোক বা গেরিলা যুদ্ধই হোক নির্মূল কবার যুদ্ধই ছিল সামরিক কাজের মূল নীতি। এ ধবনের সামরিক কাজের সঙ্গে আমবা আগেই পবিচিত হয়েছি। মাও ৎসে-তুং জনযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল খুব অল্প ক য় এই ভাবে সংক্ষেপে বলেছেন, "তোমরা লড় তোমাদের কায়দায়, আমরা লড়ি আমাদের কায়দায়, আমবা শুধু তখনই লড়ি যখন জিততে পারবো, আর জেতার আশা না থাকলে সবে পড়ি।" জাপানী সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর করছে আধুনিক অস্ত্রের ওপর আর কমিউনিস্ট পার্টি নির্ভব কবছে অত্যন্ত সচেতন বিপ্লবী জনগণের ওপর। যখন শত্রু লড়তে চায় তখন বিপ্লবীরা তাদের লড়তে দেয় না, এমন কি তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না। কিন্তু বিপ্লবীরা যখন লড়তে চায় তখন শত্রুরা যাতে পালাতে না পারে সেদিকে তাবা লক্ষ্য রাখে এবং তাদের খতম করে। লড়াইয়ে জিততে পারা যাবে জেনেও লড়াই না করা হল সুবিধাবাদ। আর জেতা যাবে না জেনেও লড়াই করা হল হঠকারিতা। লড়াইই হচ্ছে বিপ্লবীদের কাছে রণনীতি ও রণকৌশলের মূল কথা। লড়াই-এর প্রয়োজনেই সরে পড়ার প্রয়োজন রয়েছে। সরে পড়ার একমাত্র উদ্দেশ্যই হল লড়াই করা এবং শত্রুকে চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করা। একমাত্র ব্যাপক

জনগণের ওপর নির্ভর করেই এই রণনীতি এবং রণকৌশলগুলিকে কাজে লাগানো যায়।

এইভাবে মাও ৎসে-তুং পার্টি এবং জনগণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এক নির্ভুল রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন—এক দুর্জয় হাতিয়ার। তাই দেখা গেল চীনের মতো একটা দুর্বল দেশ শক্তিশালী জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে জনযুদ্ধের আগুনে পুড়িয়ে মারল। যে সৈন্যবাহিনীকে মনে হয়েছিল দুর্বল সেই সৈন্যবাহিনীই যুদ্ধে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়াল। আর যে আধুনিক সৈন্যবাহিনীকে মনে হয়েছিল অপরাজেয় তারাই শেষ পর্যন্ত পালিয়ে কূল পেল না।

॥ এক যুদ্ধ, দুই ফ্রন্ট ॥

"স্বদেশবাসীগণ! পিকিং ও তিয়েনৎসিন বিপন্ন। উত্তর চীন বিপন্ন! চীন জাতি বিপন্ন! গোটা দেশের প্রতিরোধ যুদ্ধই একমাত্র পথ। আমরা আক্রমণকারী জাপানী সেনাবাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে অবিলম্বে দৃঢ় প্রতিরোধ এবং সব রকম জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করবার জন্যে অবিলম্বে প্রস্তুতি দাবি করছি। মাথা হেঁট করে জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে এক সঙ্গে শান্তিতে বাস করবার ধারণা গোটা দেশের ছোটো বড়ো সবাইকে এই মুহূর্তেই মন থেকে দূর করে দিতে হবে।...আমাদের আওয়াজ হচ্ছে: পিকিং, তিয়েনৎসিন উত্তর চীনে সশস্ত্র প্রতিরোধ, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের স্বদেশকে রক্ষা করো।" ১৯৩৭-এর ৮ই জুলাই—এই ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি গোটা দেশকে ডাক দিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কুয়োমিনতাংকেও হাঁক দিয়ে বলল তারাও যেন এই দেশরক্ষার যুদ্ধে সামিল হয়। এর ঠিক আগের দিন, ৭ই জুলাই, জাপানী দস্যুরা পিকিং-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে লুকৌচিয়াও (মার্কো পোলো ব্রিজ) আক্রমণ করেছে। জাপান তার সমস্ত শক্তি নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। লুকৌচিয়াওর চীনে ফৌজ প্রচণ্ড প্রতিরোধ করল। শুরু হল দেশ জুড়ে প্রতিরোধ।

দেশময় স্বদেশপ্রেমের ঢেউ উঠল, চাপে পড়ে কুয়োমিনতাং সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাবতে রাজি হল। রাজি হল বটে, কিন্তু দোটানা ভাব। চাল-

বাহানা চলল। গোপনে জাপানী প্রভুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা হতে লাগল। জাপানী দস্যুরা ১৩ই আগস্ট শাংহাই আক্রমণ করল। চীনে সৈন্যরা জোর লড়তে লাগল। এবারে কুয়োমিনতাং-এর খানিকটা টনক নড়ল কারণ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে কালো ড্র্যাগন গিলতে এসেছে। কুয়োমিনতাং সরকার জাপ-বিরোধী যুদ্ধের জন্যে তার সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতে বাধ্য হল। কমিউনিস্ট পার্টিকে কুয়োমিনতাং এবারে মেনে নিল এবং লাল ফৌজকে আট নম্বর রুট আর্মি হিসেবে উত্তর-পশ্চিম চীনে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ভার দিল। এই আট নম্বর ফৌজের অধিনায়ক হলেন চু তে। জাপানের বিরুদ্ধে চরম প্রতিরোধ করবার জন্যে এবাব সরকারীভাবে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট হল। জাতিকে বাঁচাবার আট বছরের লড়াই শুরু হল।

১৯৩৭-এর ২৫-এ আগস্ট উত্তর শেন্‌সির লোচুয়ানে এক সম্মেলনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও ৎসে-তুং-এর প্রস্তাব অনুযায়ী বিখ্যাত "দশ দফা জাতীয় মুক্তির কর্মসূচী" গ্রহণ করল। দশদফা হল এই: এক, জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে দাও। দুই, গোটা দেশের সামরিক শক্তিকে সক্রিয় করে তোল। তিন, গোটা দেশের জনগণকে সক্রিয় করে তোল। চার, সরকারী যন্ত্রকে সংশোধন কর। পাঁচ, জাপ-বিরোধী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ কর। ছয়, যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক নীতি চালু কর। সাত, জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত কর। আট, জাপ-বিরোধী শিক্ষানীতি গ্রহণ কর। নয়, বিশ্বাসঘাতক এবং জাপান-ঘেঁষাদের উৎখাত কর এবং সৈন্যবাহিনীর পেছনের অঞ্চল শক্ত করে গড়ে তোল। দশ, জাপ-বিরোধী জাতীয় ঐক্য গড়ে তোল।

লোচুয়ান সম্মেলনে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে নেতৃত্বের প্রশ্নটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হল। এর ওপরই জয়-পরাজয় নির্ভর করছে। দশ দফা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল জাপ-বিরোধী যুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে জয়কে নিশ্চিত করা এবং কুয়োমিনতাং-এর জনবিরোধী নীতিগুলোর বিরোধিতা করা।

অবস্থার চাপে চিয়াং যেই সামান্য প্রতিরোধের চেষ্টা করল অমনি ওয়াং মিং আর লিউ শাও-চি একেবারে গদগদ হয়ে প্রভুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। তারা বলল চিয়াং হচ্ছে এক "মহান্ পতাকা" যাকে ঘিরে চীনের জনগণ জমায়েত হবে। কুয়োমিনতাং-এর নেতৃত্বেই নাকি জাপানের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাতে হবে। আর কমিউনিস্ট পার্টি তার সহকারী হিসেবে কাজ চালাবে।

উত্তর-পূর্ব চীনে জাপানীরা ক্রমে এগোচ্ছে। শানসি প্রদেশের রাজধানী ইয়াংচু দখল করা তাদের ইচ্ছে। কুয়োমিনতাং বাহিনী জাপানীদের ভয়ে পালিয়ে চলে এল। লিন পিয়াওর নেতৃত্বে আট নম্বর ফৌজ তখন উত্তর শানসির পিংসিংকুয়ান গিরিপথের দিকে এগিয়ে গেল। সরু গিরিপথ দিয়ে জাপানী বাহিনী নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছিল, পাহাড়ের ওপর থেকে হঠাৎ নেবে এসে আট নম্বর ফৌজ তাদের চমক লাগিয়ে দিল। পুরো একদিন যুদ্ধ হল এবং জাপানী বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হল। চীনের স্বদেশপ্রেমিকরা এতে আরও উৎসাহ পেল। এর পর আট নম্বর ফৌজ জাপানী ঘাঁটিগুলোকে পেছন থেকে আক্রমণ করবার জন্যে তৈরি হল অবশ্য সামনে থেকে লড়বার আয়োজনও পুরোদস্তুর থাকল। কৃষকদের সাহায্যে এক বছরের মধ্যে তারা সারি সারি অনেক ঘাঁটি গড়ে তুলল শানসি, চাহার, হোপেই, সুই-ইউয়ান, শানতুং, হোনান এবং অন্যান্য প্রদেশে। নয়া চার নম্বর আর্মি সেকেলে অস্ত্র দিয়ে জাপানীদের সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে চমৎকার ভাবে লড়ে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করল। ১৯৩৯-এ কিয়ানসু আর আনহোয়েইতে এরা ঘাঁটি তৈরি করে। দক্ষিণে কোয়াংতুং-এ এবং আরও দক্ষিণে হাইনান দ্বীপে বিপ্লবী ফৌজের আরও ঘাঁটি গড়ে ওঠে। এই সব ঘাঁটিতে কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করল, খাজনা ও মহাজনী সুদ কমাল এবং জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলল। জনতার সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে আট নম্বর ফৌজ আর নয়া চার নম্বর ফৌজ খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল এবং শত্রুবাহিনীর আস্তানার পেছন দিক থেকে গেরিলাদের আক্রমণই এই চীন-জাপান যুদ্ধে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ চিয়াং কাই-শেক মনে মনে পছন্দ করে না। তার নীতি হল আংশিক লড়াই অথচ আমরা দেখলাম কমিউনিস্ট পার্টির নীতি হল পুরোদস্তুর লড়াই। জনগণের শক্তি বাড়লে তার জ্বর আসত। চিয়াং-এর কৌশল হল আট নম্বর আর নয়া চার নম্বর ফৌজকে শত্রুর পিছনের এলাকায় কঠিন লড়াইতে লাগিয়ে দেওয়া যাতে জাপানীদের হাতেই কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমিক বাহিনী দুটি সাবাড় হয়ে যায়। এদিকে কুয়োমিনতাং সৈন্য দলের সাধারণ সৈনিকরা এবং কিছু অফিসার আন্তরিক ভাবে জাপানের

সঙ্গে লড়তে চায় কিন্তু কুয়োমিনতাং সরকারের তা ইচ্ছে নয়। সরকারের আংশিক লড়াইর নীতির দরুন কুয়োমিনতাং বাহিনী মার্কো পোলো ব্রিজের ঘটনার এক মাসের মধ্যেই পিকিং এবং তিয়েনৎসিন ছেড়ে চলে আসে। অল্প দিনের মধ্যেই চাহার ও সুইইউয়ানও ছেড়ে দেয়। ১৯৩৭-এর শেষাশেষি উত্তর চীনে কুয়োমিনতাং বাহিনী পীত নদীর কাছাকাছি অঞ্চল অবধি হটে আসে। ঐ বছর নভেম্বরে শাংহাই এবং ডিসেম্বরে চিয়াং-এর রাজধানী নানকিং-এর পতন হয়। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে জাপানীরা ক্যান্টন ও উহান দখল করে। চীনের অর্ধেক জমি এইভাবে জাপানকে উপহার দিয়ে কুয়োমিনতাং সরকার পশ্চিমে পালিয়ে এসে জেচুয়ান প্রদেশের চুংকিং-এ আস্তানা গাড়ে।

চিয়াং-এর ভরসা ছিল যে তার বৃটিশ ও আমেরিকান প্রভুরা তাকে খাদ থেকে টেনে তুলবে। সে ভাবত বৃটেন এবং বিশেষ করে আমেরিকা তার হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইটা লড়বে। অথচ সোভিয়েৎ রাশিয়াই ছিল চীনের মানুষের একমাত্র খাঁটি বন্ধু। চিয়াং এই মহান্ বন্ধুত্বকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করল না বরং সোভিয়েৎ-জাপান লড়াই লাগাতে চেষ্টা করল। এতে তার দরকষাকষির সুবিধে হবে।

যৌবনে শাংহাইতে চিয়াং যে দালালি আর ফাটকাবাজি শিখেছিল তা তার চরিত্রের মধ্যে বরাবরই থেকে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যবাদের দালাল এমনি দালাল যে জাপানী আক্রমণের সাড়ে চার বছরের মধ্যে সে জাপানের বিরুদ্ধে সরকারী ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করল না। কিন্তু পরে ১৯৪১-এ জাপান যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তখন সে দুদিনের মধ্যে প্রভুর পক্ষ নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাল ঠুকে আখড়ায় নেবে পড়েছিল। ১৯৩৯-এর পর থেকে চিয়াং জাপানের বিরুদ্ধে প্রায় লড়েইনি বলা চলে। তার বরং কাজ ছিল জাপানী সৈন্যদের দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির গণ-বাহিনীগুলোকে ধ্বংস করানো। ইতিমধ্যে নিজের বাহিনীগুলোকেও চিয়াং আবার নতুন ক'রে কমিউনিস্ট হত্যায় উৎসাহ দিতে লাগল। অথচ এদিকে "যুক্তফ্রন্ট" চলছে!

বিদেশীদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা চীনকে এই যুদ্ধে তেমন কোনও সাহায্যই করছে না বরং যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে চীনের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে মোটা মুনাফা লুটছে। আমেরিকা দুদিকেই লুটছে কারণ সে প্রচুর যুদ্ধের

সাজসরঞ্জাম জাপানের কাছে বিক্রি করছে। এক কথায় ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা জাপানকে চীন আক্রমণে উৎসাহই দিয়ে চলেছিল। তবে এই সাম্রাজ্যবাদী শয়তানদের লক্ষ্য ছিল লড়ে লড়ে চান যেন কমজোর হয়ে যায় আর জাপান যেন চীনের ভেতর বেশি দূর ঢুকতে না পারে—এতে পরে শয়তানদের কাজকারবারে সুবিধে হবে। জাপানকে বৃটিশ ও আমেরিকান সরকার বেশি ঘাঁটাতে চাইল না কারণ এখন তারা জাপানের সঙ্গে পেরে উঠবে না, কেন না ইউরোপে জার্মানি নিজের শোষণের এলাকা বাড়াবার জন্যে খুব গরম আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে—সেদিকেই এখন মন দিতে হবে। অপর দিকে স্তালিনের সোভিয়েৎ সরকার চীনের হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে বিশ্বময় প্রচার চালাচ্ছিল। শুধু তাই নয় চীনের সঙ্গে সোভিয়েৎ একটা "অনাক্রমণ চুক্তি" করল অর্থাৎ কথা দিল চীনকে আক্রমণ করবে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে সোভিয়েতের যে মূলেই তফাৎ তা বুঝতে এই ঘোষণা জনগণকে সাহায্য করল। সোভিয়েৎ বন্ধুত্বের বড় প্রমাণ দিল চীনকে ঋণ আর যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়ে। সোভিয়েৎ বিমানচালকরা উহান, চুংকিং, ল্যানচাউ এবং অন্যান্য শহরে ভলান্টিয়ার হিসেবে আক্রমণ-কারী জাপানী বিমানের বিরুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়ল।

উহানের পতনের পর আট নম্বর আর নয়া চার নম্বর ফৌজ পেছন দিক থেকে জাপানী বাহিনীকে এমন ভাবে চেপে ধরল যে যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনটাই এখন 'সম্মুখ' বা আসল লড়াইয়ের জায়গা হয়ে উঠল। জাপানী সরকার চরম চেষ্টা করল কুয়োমিনতাংকে ঘুষ দিয়ে হাত করতে। বলল যদি জাপানের সঙ্গে একজোট হয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুয়োমিনতাং লড়ে তা হলে চীনদেশের পুঁজিপতিদের জাপান পুঁজি খাটাবার দারুণ সুবিধে করে দেবে—উত্তর চীনে চীনেরা শতকরা ৪৯ ভাগ এবং মধ্য ও দক্ষিণ চীনে শতকরা ৫১ ভাগ পুঁজি লগ্নী করবার অধিকার পাবে। গড়ে তাহলে সারা দেশে ৫০ ভাগ হয়ে গেল—অর্ধেক রাজত্ব আর কি!

১৯৩৮-এর ১৮ই ডিসেম্বর কুয়োমিনতাং-এর এক মহাপুরুষ ডিগবাজি খেল। লোকটা আমাদের খুবই পরিচিত—ওয়াং চিং-ওয়েই। সে এককালে উহানের বিপ্লবী সরকারের আমলে কুয়োমিনতাং-এর বামপন্থীদের নেতা ছিল অর্থাৎ চিয়াং-এর নানকিং সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। তারপর সে ডিগবাজি খেয়ে চিয়াং-এর দলে ভিড়ে গেল এবং কমিউনিস্ট হত্যায় মেতে উঠল।

এবারে তার দ্বিতীয় ভিপবাজি—কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে যে জাপান-প্রেমিকের দল ছিল সেই দলকে নিয়ে সে চিয়াং-এর এখনকার রাজধানী চুংকিং ছেড়ে জাপানীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। এই মহাপুরুষ ১৯৪০-এ নানকিং-এ তার সরকার প্রতিষ্ঠা করে নির্লজ্জের মতো স্লোগান ঝাড়ল—"শান্তি, কমিউনিস্ট-বিরোধিতা এবং দেশগঠন!" এই ভাবে বড়ো জোতদার এবং বড়ো পুঁজিপতির দল দেশদ্রোহী হয়ে খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের সঙ্গে হাত মেলাল। এতে চিয়াং-এর দলের মধ্যে জাপানের সঙ্গে আপোসের মনোভাব বাড়তে আরম্ভ করল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণ কিন্তু তখন জাপানের বিরুদ্ধে লড়েই চলেছে এবং আপোস বা দেশকে বিকিয়ে দেবার নীতিকে ধিক্কার দিচ্ছে।

১৯৩৭-এর মধ্যেই ইয়েনানে মাও ৎসে-তুং, কমিউনিস্ট পার্টি ও লাল ফৌজের সদর দপ্তর বেশ ভালো ভাবে বসেছিল। শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকার সরকারের রাজধানী ইয়েনান হল চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের ধ্রুবতারা। এই বিশাল কামারশালাতেই গোটা দেশের আগামী দিনের নেতাদের গড়ে পিটে তৈরি করা হয়েছিল। এডগার স্নো পুরোনো এবং নতুন দুই ইয়েনানকেই দেখেছেন। ১৯৩৯এ নতুন ইয়েনান দেখে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মনে রাখার মতো। তিনি বলেছেন, ইয়েনান আগের আমলে ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে দারিদ্র্য এবং সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর একটি। একটি সৎ ও উদ্যোগী সরকার মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টাতেই এখানে উন্নতিশীল সমাজ-জীবন গড়ে তুলল। ফ্রি প্রাইমারি শিক্ষা চালু করা হল। মাধ্যমিক স্কুল, কারিগরি স্কুল এবং কলেজ ছাড়াও একটি মেয়েদের কলেজ শুরু করা হল। হাজার হাজার তরুণ তরুণী শত্রু এলাকার মধ্যে দিয়ে শত শত মাইল পায়ে হেঁটে ইয়েনানে আসত লেখাপড়া করতে। সেখানে ছিল একটা গণ-স্বাস্থ্য বিভাগ আর বেশ কয়েকটা হাসপাতাল। অনেকগুলো শিল্প-কো-অপারেটিভ ছিল। রাষ্ট্রের মালিকানায় শিল্পও ছিল। ব্যক্তিগত ব্যবসাও চলতো। শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া এলাকার কৃষকেরা ছ'লক্ষ একর নতুন জমিতে আবাদ করল। সরকারের সাহায্য নিয়ে দখলী এলাকার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এখানে স্থায়ী আশ্রয় পেল। আফিংকে দূর করে দেওয়া হল। শিশুদের দাসত্ব এবং নারীকে নিয়ে ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ হল। সেখানে কোনও ভিকিরিও ছিল

না। বেকারদের কাজ দেওয়া হল। প্রত্যেক গ্রামের নির্বাচিত কাউন্সিল ছিল। এডগার স্নো বলছেন যে চীনের ইতিহাসে এই প্রথম জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এলাকার সরকার নির্বাচন করল।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলারের জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে দিল। পাছে জার্মানির বন্ধু জাপান পূর্ব এশিয়ায় তাদের আক্রমণ করে বসে এই আতঙ্কে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড চীনের ওপর বেশি করে চাপ দিতে লাগল জাপানের সঙ্গে আপোস করে ফেলতে অর্থাৎ জাপানের কাছে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে। এই সুযোগে চিয়াং প্রতিরোধ যুদ্ধেব যুগে তার প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু করল। কমিউনিস্ট পার্টি দুই ফ্রণ্টেই লডতে লাগল—জাপানের বিরুদ্ধে এবং চিয়াং-এর কমিউনিস্ট ধ্বংসের জেহাদের বিরুদ্ধে। ১৯৩৯-এব শেষের দিকে চিয়াং-এর বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পশ্চিম শেন্‌সিতে যে জাপ-বিরোধী ফৌজগুলো ছিল তার ওপর আক্রমণ চালাল। ঐ প্রদেশেব দক্ষিণ-পূবে আট নম্বর রুট আর্মিকেও আক্রমণ করল। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান ছিল: "জাপ-বিরোধী লডাই চালিয়ে যাও; দেশকে বিকিয়ে দেওয়া চলবে না; ঐক্য বজায় রাখো, ভাঙন ঠেকাও; এগিয়ে চলো, পিছিও না।" কমিউনিস্ট পার্টির প্রচণ্ড সংগ্রামের দরুন কুয়োমিনতাং বাহিনী হটে গেল এবং তখনকার মতো চিয়াং-এর দলের আত্মসমর্পণের চেষ্টা ঠেকানো গেল।

শয়তানরা আরেকটা ফ্রন্ট খুলল। প্রগতি-বিরোধী আদর্শ প্রচারে লেগে গেল। চিয়াং প্রচার করতে লাগল যে এখন আর কমিউনিস্ট পার্টির কোনও দরকার নেই। প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাগড়া দিল। চিয়াং বুর্জোয়া একনায়কত্বের পক্ষে ঢাক পেটাতে শুরু করল। কমিউনিস্ট পার্টি এ অবস্থায় চুপ করে থাকতে পারে না। কোন্ লক্ষ্যের দিকে দেশ এগোবে তা তাকে স্পষ্ট করেই বলতে হবে।

১৯৪০-এর জানুয়ারীতে "চাইনিজ কালচার" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মাও ৎসে-তুং-এর "নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে" প্রবন্ধটি বের হল। নয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি আগে যেসব কথা বলেছিলেন তা আরও বিস্তারিত ভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করলেন। মাও ৎসে-তুং চিয়াং-এর বুর্জোয়া একনায়কত্বের ফানুস ফাটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, চীন বিপ্লবের

নেতৃত্ব করবে শ্রমিকশ্রেণী। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে চীন বিপ্লবের দুটো স্তর—নয়া গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক। প্রথম স্তরের কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এই কাজ যতদিন না সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথাই ওঠে না। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করতে হবে। আন্তর্জাতিক দিক থেকে দেখলে তখন পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে লড়াই চলছে তাতে সমাজতন্ত্র জিতছে আর পুঁজিবাদ হারছে। সামাজিক চরিত্রের দিক থেকে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলেও, এ বিপ্লব পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া বিপ্লব নয়। এ বিপ্লবের লক্ষ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদী সমাজ এবং বুর্জোয়া একনায়কত্ব নয়। এ বিপ্লবের লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী শ্রেণীগুলোর যুক্ত একনায়কত্বের ভিত্তিতে একটি নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তাই এ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিবাদের শত্রু এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী ফ্রন্টের মিত্র। এই বিপ্লব পুরোনো বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী বিশ্ব বিপ্লবের অংশ নয়, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিপ্লবের অংশ। সাম্রাজ্যবাদ বা বিশ্ব পুঁজিবাদের মরণ দশা বলেই সে বেঁচে থাকার জন্যে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের ওপর শি বেশি নির্ভর করবে—সেখানকার বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বে পুঁজিবাদী সমাজ কিছুতেই গড়তে দেবে না। মাও ৎসে-তুং বললেন, কুয়োমিনতাং যাদের প্রতিনিধি সেই বড়ো বুর্জোয়ারা ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত একটানা সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে একদিকে বিপ্লবী জনগণের বিরোধিতা করেছে আর অন্যদিকে সামন্তবাদের সঙ্গে মৈত্রী গড়েছে। দশ বছর ধরে কমিউনিস্ট বিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে তারা কিন্তু বুর্জোয়া একনায়কত্বে পুঁজিবাদী সমাজ গড়তে পারেনি। একটা আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক একনায়কত্বকেই রক্ষা করেছে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময়ও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর নেতৃত্বে বড়ো বুর্জোয়ার একটা অংশ সরাসরি জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

লিউ শাও-চি "নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে" লেখাটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। ১৯৪২-এ সে চীৎকার করে বলল চিয়াং কাই শেক হচ্ছে "বিপ্লবের পতাকা।" সে আরও বলল, "আমি মনে করি যে অন্তত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান

স্তরে অন্য কোনও পতাকার বদলে কুয়োমিনতাং-এর তিনটি গণ-আদর্শের পতাকার নীচে চীন বিপ্লব অনেক বেশি অবাধে এগিয়ে যাবে" (চীন বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল, অক্টোবর, ১০, ১৯৪২)। সে ক্ষেপে গিয়ে প্রশ্ন করল, "আমরা কেন বলি না যে একগুঁয়েমি করে অন্য কিছুকে রূপ দিতে না গিয়ে আমরা তিনটি গণ-আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি?" মাও ৎসে-তুং তাঁর "নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে" লেখাটিতেই বলেছিলেন, বুর্জোয়া গোঁড়ারা সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এল এবং বলল: "আচ্ছা, তোমরা কমিউনিস্টরা তো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরের স্তরে হবে বলে মুলতুবী রেখেছ এবং ঘোষণা করেছ 'যেহেতু আজ চীন যা চায় তা হল এই তিনটি গণ-আদর্শ তাই আমাদের পার্টি তাদের পুরোপুরি বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে লড়াই করতে প্রস্তুত।' বেশ তো তাহলে এখনকার মতো তোমাদের কমিউনিজমকে গুটিয়ে ফেল।" মাও ৎসে-তুং এর জবাবে বললেন, কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমানের জন্যে নয়া গণতন্ত্র এবং ভবিষ্যতের জন্যে সমাজতন্ত্রের কর্মসূচীর কথা বলে। এই দুটি হল একই দেহের দুটি অংশের মতো। দুটোই একই কমিউনিস্ট আদর্শের দ্বারা পরিচালিত। পরিচালনা করার জন্যে কমিউনিজম না থাকলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা দূরে থাকুক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবই সফল হতে পারে না। তাই বুর্জোয়া গোঁড়ারা কমিউনিজম গুটিয়ে ফেলার জন্যে চেঁচামেচি করছে। কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের কর্মসূচীর সঙ্গে সুন ইয়াৎ-সেনের তিনটি গণ-আদর্শের মূলত মিল রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার তফাৎও রয়েছে। মাও ৎসে-তুং এক এক করে সে তফাৎগুলোও দেখিয়ে দিয়েছেন। কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীতে রয়েছে জনগণের জন্যে পূর্ণ অধিকার, দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় আর কৃষি বিপ্লবের সম্পূর্ণ কর্মসূচী। তিনটি গণ-আদর্শের মধ্যে এগুলো নেই। তাছাড়া কমিউনিস্টদের কর্মসূচীর মতো তিনটি গণ-আদর্শের মধ্যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর পেরিয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে পৌঁছানোর কথা নেই। আরেকটা কথা, কমিউনিস্টরা বাস্তবের ওপর নির্ভর করে। তারা জগৎটাকে দেখে বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের দৃষ্টি নিয়ে, আর সুন ইয়াৎ-সেনের তিনটি গণ-আদর্শ ছিল মূলত ভাববাদী। আরেকটা বড়ো কথা হল যে তিনটি গণ-আদর্শে যারা বিশ্বাস করত তাদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্টদের মতো পুরোপুরি বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারেনি। কমিউনিস্টদের

কথা ও কাজের মধ্যে সব সময় সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু তাদের ছিল না। এই সব পার্থক্যের কথা মনে রাখলে বুর্জোয়া গোঁড়া আর তাদের দালাল লিউ শাও-চির মতলব বুঝতে অসুবিধে হয় না। লিউ ভবিষ্যৎবাণী করল যে জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পর কুয়োমিনতাং হবে "অপরাজেয়।" সেই জন্য নতুন চীনে তাকেই নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া "যুক্তিযুক্ত" হবে। আচ্ছা দালাল বটে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ এগিয়ে চলল। যুদ্ধের সময় দেশের রেলপথ যদি শত্রুর দখলে থাকে তাহলে সেগুলো সাপের মতো ছোবল মারে। এই সাপগুলোকে মারা দরকার। সুতরাং জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর আট নম্বর ফৌজের এক শ' পনেরটা রেজিমেন্ট বা শাখা-দল ১৯৪০-এর ২০এ আগস্ট জাপানের দখল-করা রেলপথের ওপর এক চরম আক্রমণ আরম্ভ করল। রেলের পুল, সুরঙ্গ, স্টেশন এবং জাপানী ঘাঁটি উড়ে গেল। মোটর চলার রাস্তাগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হল। শত্রুর পক্ষে দারুণ দরকারী একটি কয়লার খনিকেও কয়লাখনির মজুরদের সাহায্যে ধ্বংস করা হল। ফলে উত্তর চীনে জাপানীদের সৈন্য চলাচল এবং যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। শত্রু-সৈন্যকে এভাবে অচল করে দিয়ে আট নম্বর ফৌজ তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগল। এই জাপ-বিরোধী যুদ্ধ "এক শ' রেজিমেন্টের আক্রমণ" নামে পরিচিত। প্রায় ' ড়ে তিন মাস এই আক্রমণ চলেছিল এবং এর ফলে চিয়াং-এর দল জাপানের সঙ্গে আপোসের যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল তা উবে গেল। কিন্তু তাদের বদমায়েসি থামল না। চিয়াং দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হল। তার জঘন্য বদমায়েসির একটি উদাহরণ হচ্ছে "দক্ষিণ আনহোয়েইর ঘটনা" বলে পরিচিত একটা বীভৎস ব্যাপার।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র ফৌজ জাপানীদের কড়া মার লাগিয়ে চলেছে। ঠিক এই সময়ই চিয়াং-এর দল এক চক্রান্ত করল। হুকুম জারি করল যে পীত নদীর দক্ষিণে আট নম্বর আর ন। চার নম্বর ফৌজের যত ইউনিট বা ছোটো দল আছে সব পাঠিয়ে দিতে হবে নদীর ওপারে উত্তরে। দেশ-দ্রোহীদের এই হুকুমের উদ্দেশ্য হল এই যে নদীর দক্ষিণ পাড় থেকে বিপ্লবী ফৌজ সরে গেলে সেখানে তারা জাপানী বাহিনীকে ঢুকতে দেবে এবং জাপান মধ্যচীনে বিপ্লবী ফৌজের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া বিপ্লবী ঘাঁটিগুলো

সহজেই দখল করে নিতে পারবে। এতে চিয়াং-জাপ মিতালির রাস্তা পরিষ্কার হবে। এই প্ল্যানের আরেকটা দিক আছে, সেটা আরও অমানুষিক। চিয়াং-এর দল ঠিক করে রাখল হুকুম তামিল করবার পর আট নম্বর আর নয়া চার নম্বর ফৌজ যখন মার্চ করতে আরম্ভ করবে তখন পথে আচমকা আক্রমণ করে তাদের যতো বেশি সৈন্যকে পারা যায় হত্যা করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং-দলের এই প্ল্যান প্রচারের ভেতর দিয়ে লোকের সামনে তুলে ধরল। কিন্তু এই অবস্থায় ফৌজ মিলিটারি আদেশ অমান্য করতে পারে না কারণ তাহলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবে। তাই আট নম্বর আর নয়া চার নম্বর ফৌজ তাদের কিছু ইউনিটকে দক্ষিণ আনহোয়েই থেকে ইয়াংসির উত্তরে পাঠিয়ে দিতে রাজি হল। এর পর নয়া চার নম্বর মার্চ করে চলেছে ইয়াংসি নদীর দিকে। সংখ্যায় তারা ন'হাজার। দুদিন মার্চ করবার পর তারা মাওলিন নামের একটা শহরের কাছে একটা পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে যখন চলেছে তখন তাদের হঠাৎ আক্রমণ করে বসল চিয়াং-এর আশি হাজার সৈন্য। ন'হাজারের ওপর প্রায় ন'গুণ বড়ো চিয়াং বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আট হাজারকেই মেরে ফেলল। অবশ্য তারা লড়াই না করে মরেনি। খাদ্যের অভাব, জল নেই—তবু তারা নাছোড়বান্দার মতো লড়েছে। তবে দশ দিনের যুদ্ধের পর এক হাজার মাত্র সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারল। এই ঘটনার ঠিক পরে পরেই প্ল্যান মাফিক জাপানী সৈন্যদল সে অঞ্চলে ঢুকে পড়ল এবং নয়া চার নম্বর ফৌজের বাকী অংশকে আক্রমণ করল, চিয়াং-এর ফৌজও তাই করল। নয়া চার নম্বরের তখন চরম সংকট। কমিউনিস্ট পার্টি তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাল, তা নইলে জাপ-বিরোধী সংগ্রাম ভেস্তে যায়। চেন ইকে পার্টি নয়া চার নম্বরের অধিনায়ক করে দিল। নয়া চার নম্বর ফৌজ যেসব বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল চিয়াং-এর দল সেগুলোকে ভাঙতে পারল না। পার্টির নেতৃত্বে সেখানে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো এক হয়ে লড়তে লাগল কারণ বিপ্লবী ঘাঁটিগুলো নিজ নিজ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন এনেছিল তা চিয়াং-এর রাজত্বে কোনও কালেই আসত না। তারা খাজনা আর সুদ কমাল। কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে ভাল ব্যবস্থা হল। সেচব্যবস্থা অনেক উন্নত হল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রসার হল। কুয়োমিনতাং এবং জাপানের দখলী এলাকা ছেড়ে অনেক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় চলে এল।

এরই মধ্যে পৃথিবীর আকাশে এল উল্কার মতো একটি দিন। ১৯৪১-এর ২২এ জুন। হিটলার সোভিয়েৎ রাশিয়াকে আক্রমণ করল। বছরের শেষে ৮ই ডিসেম্বর জাপান প্রশান্ত মহাসাগরকে অশান্ত করে তুলল—পার্ল হারবারের ওপর আচমকা হামলা করল। পার্ল হারবার আমেরিকার নৌবহরের ঘাঁটি। জাপানীরা চাইল তাড়াতাড়ি চীনের যুদ্ধ শেষ করতে। সুতরাং আক্রমণের মাত্রা দিল চড়িয়ে। জাপান তার শতকরা ষাট ভাগ সৈন্য এবং নব্বুই ভাগ চীনে পুতুল সৈন্যকে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকাগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণে লাগাল। তারা একটা নীতি বা দুর্নীতি চালু করল যার নাম 'থ্রী-অল' বা 'তিন সমস্ত' নীতি—সমস্ত পোড়াও, সমস্ত লুঠ কর এবং সমস্তকে হত্যা কর—এই হল "তিন সমস্ত"। কুয়োমিনতাং-এর ওপরও জাপান তার চাপ বাড়িয়ে দিল। চিয়াং-এর গোপন হুকুমে অনেক হোমরা-চোমরা কুয়োমিনতাং অফিসার জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করল। পাঁচ লক্ষ কুয়োমিনতাং সৈন্য জাপানের পক্ষে চলে গেল এবং জাপানী সেনাপতির হুকুমে এই কলের পুতুলরা নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করতে লেগে গেল।

১৯৪১-৪২এ জাপানী ফৌজ, পুতুল সৈন্য আর চিয়াংবাহিনী—এই তিনের আক্রমণে জাপবিরোধী আন্দোলন চরম বিপদের মধ্যে পড়ল। বিপ্লবী আট নম্বর ফৌজ ১৯৪০এ ছিল চার লাখ। '৪১এ কমে গিয়ে হল তিন লাখ তিন হাজার। জাপবিরোধী ঘাঁটিগুলো কুঁচকে ছোটো হয়ে এল, দশ কোটি লোকের এলাকার জায়গায় এখনকার ঘাঁটিগুলো জুড়ে রইল মাত্র পাঁচ কোটি লোকের এলাকা।

চীনের "বন্ধুদের" কাজকর্ম ও নীতি একটু আলোচনা করা যাক। পার্ল হারবারের পর চীন হয়ে গেল আমেরিকার "মিত্র শক্তি" এবং জাপান হল শত্রু। চীন সম্পর্কে তাই আমেরিকার যুদ্ধ-কৌশল কিছু বদলাতে হয়। এইটুকু বদলাল যে আমেরিকা চীনকে তার নিজের উপনিবেশ করতে চাইল, তার মানে, চীনের ব্যাপারে আর কারুর কোনও কর্তৃত্ব খাটবে না। না চীনের জনসাধারণের না অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের আমেরিকা চীনে ঝাঁকে ঝাঁকে অফিসার, পরামর্শদাতা পাঠাতে লাগল—শিক্ষার ব্যাপারে, মিলিটারির কাজে, আর্থিক ব্যবস্থার জন্যে। সর্বত্র এই আমেরিকানরা প্রধান হয়ে বসতে লাগল এবং কুয়োমিনতাং সরকারকে কাণ ধরে চালাতে লাগল।

আমেরিকার চাল খুব পাকা। মাঝে মাঝে চিয়াংকে বলে "কমিউনিস্ট

পার্টির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাও, গৃহযুদ্ধ বাড়িয়ো না"। কারণ তখন আমেরিকাও জাপানের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে সুতরাং কমিউনিস্টরা জাপানের শত্রু বলে তাদের বিরুদ্ধে না গিয়ে তখনকার মতো তাদের জাপানী-হত্যায় লাগিয়ে রাখা ভালো। ১৯৪৪এর কাছাকাছি একটা সময় এল যখন আমেরিকা কুয়োমিনতাংকে আরেকটু গড়ে পিটে মানুষ না করে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে নাবাতে চায় না কারণ কুয়োমিনতাং তাহলে পেরে উঠবে না লালদের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৩-এর জুনে চিয়াং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযান চালাতে গিয়ে নাকাল হয়েছে। কমিউনিস্টরা আগেই চিয়াং-এর এই মতলবের কথা জনগণের কাছে ফাঁস করে দেওয়ায় চিয়াং দেশ জুড়ে জনগণের বিরোধিতার মুখে পড়ল। তাই শেষ পর্যন্ত তাকে প্ল্যানটা বাতিল করতে হল। আমেরিকার এ আশাও ছিল যে "মধ্যস্থ" হিসেবে আলাপ আলোচনা করতে করতে কায়দা করে বিপ্লবী গণ-বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়তো সম্ভব। "মধ্যস্থ" হওয়ার আরেকটা সুবিধে হচ্ছে লাল ফৌজের মুক্ত এলাকার সব জায়গায় "নিরপেক্ষ" হয়ে গিয়ে সমস্ত রকমের খবর সংগ্রহ করা যাবে, সেখানকার মিলিটারি ও রাজনৈতিক অবস্থা ভালো ভাবে বিচার করতে পারা যাবে।

ইংল্যাণ্ড জাপানকে খুশী রাখার রাস্তাতেই চলছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ অবধি ইংল্যাণ্ড জাপানকে নিজের দলে টানতে চেয়েছে। চীনের বন্দরে যে শুল্ক আদায়ের অধিকার তার ছিল তা জাপানের হাতে তুলে দিয়েছে। বর্মা রোড দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে চীন বিনা বাধায় সাহায্য পেত, জাপানের চাপে ইংরেজ সেই বর্মা রোড বন্ধ করে দিল। ১৯৪১এ পার্ল হারবারের ঘটনার পর ইংল্যাণ্ডের নীতি হল মুক্তি আন্দোলন এবং আমেরিকার পরের রাজ্যের ওপর লোভ থেকে চীনে এবং পূর্ব এশিয়ার অন্যত্র তার ঘাঁটিগুলোকে রক্ষা করা।

॥ লম্বা শাসন ॥

দেশের বাইরে চীনের জনগণের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ছিল স্তালিনের সোভিয়েৎ রাশিয়া। তাছাড়া তার দুনিয়ার জনগণের এবং ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলোর

সমর্থন পেয়েছিল। আর দেশের ভেতরে ছিল মহান চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি কেমন করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেশকে গড়ে তুলছিল তা মুক্ত এলাকাগুলো থেকেই বোঝা যায়। পার্টি ঘাঁটি এলাকাগুলোতে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শাসন চালু করল। মাও ৎসে-তুং বলেছিলেন জাপ বিরোধী যুদ্ধ এবং গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই এই দুটো কাজ একটা আরেকটার ওপর নির্ভর করে। প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় ঘাঁটি এলাকাগুলোতে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের ছাঁচে রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে উঠল। এই রাজনৈতিক ক্ষমতা হল তাদের সবার রাজনৈতিক ক্ষমতা যারা প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং গণতন্ত্রের স্বপক্ষে। এটা হল সাম্রাজ্যবাদের দোসর এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রেণীগুলোর যুক্ত একনায়কত্ব! এই রাজনৈতিক ক্ষমতা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া এবং বড় জমিদারদের একনায়কত্ব থেকে আলাদা। আবার কৃষি বিপ্লবের যুগের শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বও এটা নয়। 'বাম' এবং দক্ষিণ বিচ্যুতি এড়িয়ে এই নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সৎভাবে কাজে লাগালে দেশে গণতন্ত্রের প্রসারে বিপুলভাবে সাহায্য করা হবে। "তিন তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা" অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিল। ১৯৪১-৪২এ বিভিন্ন ঘাঁটি এলাকায় রাজনৈতিক কাউন্সিল এবং স্থানীয় সরকারগুলো জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হল। চীনের যে কোনও মানুষ, যদি সে প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং গণতন্ত্রের স্বপক্ষে থাকে আর তার আঠারো বছর বয়েস হয়, তবে তার ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল আর সে নিজেও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারতো। সে কোন্ শ্রেণী থেকে এসেছে, তার জাতি কি, সে মেয়ে না পুরুষ, তার ধর্মবিশ্বাস কি, সে কোন্ পার্টির লোক, তার শিক্ষাদীক্ষাই বা কতদূর—এ সব কিছুই ভোটের ব্যাপারে বিচার করা হত না। সঙ্গে সঙ্গে মাও ৎসে-তুং এ কথাও জোর দিয়ে বললেন, আমাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোতে কমিউনিস্টরা যেন নেতৃত্ব দেয় এবং সেই জন্যে যে পার্টি সভ্যরা জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারে তিন ভাগের এক ভাগ পদ অধিকার করে আছে তাদের বিশেষ যোগ্যতা থাকতে হবে।

এই জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারের কৃষি নীতি ছিল কৃষকদের বোঝানো যে পুরোদস্তুর কৃষি বিপ্লব করবার সময় এখনও হয়নি আর কৃষি বিপ্লবের যুগের কাজগুলো এখন করা সম্ভব নয়। জমিদাররা কৃষকের কাছ থেকে

যে পরিমাণ খাজনা ও সুদ আদায় করত তা এখন কমানো হল। খাজনার পরিমাণ সাধারণভাবে শতকরা পঁচিশ ভাগ কমল। এতে জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে কৃষকরা উৎসাহ পেল। সঙ্গে সঙ্গে সরকার এও লক্ষ্য রাখলো যে কৃষকেরা যেন ঐ কমানো হারে খাজনা ও সুদ অবশ্যই দেয়। শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার যাতে উন্নতি হয় সেদিকেও সরকার নজর দিল। ফলে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে তাদের উৎসাহ দারুণভাবে বেড়ে গেল। তাদের কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিককেও চুক্তি অনুযায়ী শৃঙ্খলা মেনে চলতে হল, যাতে মালিকেরও কিছু লাভ হয়। তা না হল ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে শুধু প্রতিরোধ যুদ্ধই দুর্বল হবে না, শ্রমিকদেরও অসুবিধায় পড়তে হবে। শত্রুর আক্রমণ এবং 'ঘেরাও'-এর ফলে মুক্ত অঞ্চলগুলোকে গুরুতর অর্থনৈতিক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হল। ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক জনতা, সৈনিক, পার্টি এবং সরকারী সংগঠনের কর্মীরা পার্টির ডাকে উৎপাদন বাড়ানোর কাজে হাত লাগাল। শিল্প ও কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়ে গেল। জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যে বিপুল উৎসাহ দিল। যেমন রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছিল তেমনি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ঘাঁটি এলাকার বাইরের যেসব পুঁজিপতিরা ঘাঁটি এলাকায় এসে শিল্প গড়ে তুলতে চায় তাদের উৎসাহ দেওয়া হল। এসবের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতিব দিক থেকে আত্মনির্ভর হওয়া। আরেকটা কথা, কেবল জমিদার এবং পুঁজিপতিদেরই ট্যাক্স দিতে হত না, খুব গরীব ছাড়া আর সবাইকে আয় অনুযায়ী ট্যাক্স দিতে হত। যেসব জমিদার এবং পুঁজিপতিরা প্রতিরোধ যুদ্ধের বিরোধিতা করত না, তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার, সম্পত্তি ভোগ করার এবং ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু তাদের প্রতিবিপ্লবী কাজের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সরকার সব সময় সতর্ক থাকত।

মুক্ত এলাকাগুলোতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের আয়োজন হল। অবশ্য এ ব্যাপারে তখনও খুব বেশি সফল হওয়া যায় নি। শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকা সব ব্যাপারেই এগিয়ে ছিল। আগেই এ এলাকার উন্নতির কথা কিছু বলেছি। এখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের আয়োজনও বিশেষভাবে সফল হল। প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্কদের জন্য অবসর সময়ে শিক্ষা, অক্ষর-পরিচয়ের আন্দোলন, খবরের কাগজ পড়ার গ্রুপ, সৈনিকদের

লেখাপড়া শেখানো—এইসব ছিল সংস্কৃতি আন্দোলনের অঙ্গ। সীমান্ত অঞ্চলে জনগণের জাপ-বিরোধী সামরিক এবং রাজনৈতিক বিশ্ব-বিদ্যালয়, লুসুন আর্ট স্কুল, মার্কস-লেনিন পাঠকেন্দ্র এবং ইয়েনান বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল। সীমান্ত এলাকা ও অন্যত্র বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হল। বুর্জোয়া শ্রেণীর উদারপন্থী শিক্ষক, সংস্কৃতি কর্মী, সংবাদিক, পণ্ডিত এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের ঘাঁটি এলাকায় এসে বিভিন্ন কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে দেওয়া হল। সব চেয়ে বড়ো কাজ হল আট নম্বর রুট আর্মি আর নয়া চার নম্বর আর্মিকে চরম সীমা পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা। কারণ এরাই হল চীনের জনগণের জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সবচাইতে বিশ্বস্ত বাহিনী। কমিউনিস্টদের নীতি ছিল কুয়োমিনতাং সৈন্যরা আক্রমণ না করলে কখনই তাদের আক্রমণ না করা। বরং তারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ার সবরকম চেষ্টা করতো। সামরিক অফিসাররা কুয়োমিনতাং বা অন্য কোনও পার্টির সদস্য হন বা না হন যদি তাঁদের কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি থাকতো তবে তাদের কাছে টেনে আনার চেষ্টা হত। নিজেদের সৈন্যবাহিনীতে কমিউনিস্টরা সংখ্যার দিক থেকে সব সময়ই প্রবল ছিল। এখন কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। কিন্তু কমিউনিস্টদের প্রধান ফৌজগুলোর ব্যাপারে "তিন তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা" চালু হল না। তবে পার্টির নেতৃত্বে সম্পূর্ণ অটুট রেখে সৈন্যবাহিনীর সামরিক এবং কারিগরি কাজে সমর্থকদের সাহায্য নেওয়া হল। দেশ জুড়ে সমর্থন পাওয়ার জন্যে এবং বিপ্লবী বাহিনীগুলোকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে বিপুল সংখ্যক সমর্থকদের কাছে টেনে আনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত একাকায় জনগণের "মিলিশিয়া" গুলোকেও জোরদার করে তোলা হল। ১৯৪৩-এর পর মুক্ত এলাকাগুলো বেশি বেশি করে তাদের সীমানা বাড়িয়ে চলল।

।। ভুল তাড়াও ।।

১৯৪২ থেকে ১৯৩৫। সমাজে এবং পার্টির ভেতরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মাথা ছাড়া দিয়ে উঠছে। ওয়াং মিং-এর লাইন চীনের কমিউনিস্ট

উনিস্ট পার্টি ও লাল ফৌজের সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে। তার মতাদর্শ এবং চিন্তার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনেক পার্টি-সভ্যের মন থেকে তো বটেই এমন কি কিছু পার্টি-নেতারও মন থেকে সাফ হয়ে যায়নি। এগিয়ে যাবার পথে এটা একটা গুরুতর বাধা। দেশের সর্বত্র বিপ্লবকে সফল করতে হলে এ বাধাকে সরাতেই হবে। একাজ করবার জন্যে—মাও ৎসে-তুং-এর প্রতিভা সৃষ্টি করল এক অসাধারণ আন্দোলন—ভুল ধারণা শোধরাবার গণ-আন্দোলন। শুধু ভুল শোধরানোই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না। জনসাধারণের মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ানো এবং গোটা পার্টিকে উৎসাহিত করে তোলাও এর উদ্দেশ্য ছিল—যাতে পার্টি-সভ্যরা বিপ্লবী সর্বহারার মতাদর্শের চর্চা ও ব্যবহারকে বেশ উঁচু স্তরে তুলতে পারে।

মাও ৎসে-তুং তাঁর অনেকগুলো বক্তৃতায় প্রথম সংশোধন আন্দোলনে আদর্শগত ভিৎটার কথা বললেন। এই বক্তৃতাগুলো হচ্ছে "আমাদের পড়াশোনা শোধরাও" (মে ১৯৪১), "পার্টির কাজের ধরন শোধরাও" (ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৪২), "পার্টির ছকবাঁধা লেখার বিরোধিতা কর" (ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৪২), এবং বিখ্যাত "ইয়েনান ফোরাম" বা ইয়েনানে সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনা (মে, ১৯৪২)। এই বক্তৃতাগুলোতে ওয়াং মিং-এর নাম একবারও করা হয়নি বটে কিন্তু ওয়াং মিং-এর ভুল মতবাদকে আক্রমণ করাই বক্তৃতাগুলোর লক্ষ্য। পার্টির ভেতর ওয়াং মিং যে পেতি-বুর্জোয়া ভাবধারা এনে ঢুকিয়েছে তার প্রভাব দূর করবার জন্যে মাও ৎসে-তুং তুলে ধরলেন তাঁর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মসূচী। তাঁর এই কর্মসূচীকে ওয়াং মিং-এর অমার্কসীয় অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কর্মসূচীর পাশে রেখে তুলনা আর আলোচনার স্রোত বইল। সমালোচনা আর আত্মসমালোচনার এই জোয়ার প্রায় তিন বছর স্থায়ী হল। ইতিপূর্বে এমন আন্দোলন আর হয়নি। এর ফলে পার্টির ভেতরে সম্পূর্ণ নতুন এক আবহাওয়া সৃষ্টি হল। পার্টি এখন বেশ শক্ত ভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভিতের ওপর দাঁড়াল। চীন বিপ্লবের আগামী দিনের একের পর এক দুনিয়া কাঁপানো জয়লাভগুলোর জন্ম এখানেই—এই সংশোধন আন্দোলন থেকেই।

ওয়াং মিং-এর মতবাদকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি অনুযায়ী সব কিছুকে বোঝবার এবং পার্টির কাজ পরিচালনা করবার

জন্যে মাও৲সে-তুং তিনটি বিষয়ের ওপর জোরদার আক্রমণ চালালেন। এক, নিজের মনগড়া চিন্তাধারা, দুই, দলীয় সংকীর্ণতা এবং তিন, পার্টির ছকবাঁকা লেখা। তিনি পার্টি-সভ্যদের মনে করিয়ে দিলেন, "মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান মানেই সততা এবং সুদৃঢ় জ্ঞান। চালাকি করবার কোনও সুযোগ সেখানে নেই।" তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে প্রত্যেক কমিউনিস্টকে শুরু করতে হয় কতকগুলো "বাস্তব ঘটনা" আয়ত্ত করে, আমাদের মনের বাইরে যে জিনিসগুলোর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে সেগুলোকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। সেগুলো সম্বন্ধে যা "সত্য" তা আবিষ্কার করতে হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে হবে যে নিয়মগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ করে তাও বুঝতে হবে—যাতে গোঁড়ামি আর কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে জ্ঞান এ দুটোকেই এড়িয়ে চলতে পারে। কারণ এ দুটোরই মূলে আছে 'সাবজেক্‌টিভিজ্‌ম্' বা নিজের মনগড়া ধ্যানধারণা। তিনি সাবধান করবার জন্যে বললেন যে মার্কসবাদ একটা গোঁড়া মতবাদ নয়, সেটা আমাদের কাজের সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। সুতরাং নিজের মনগড়া ধ্যানধারণাকে আঘাত হানতে হবে যাতে পার্টির নীতিকে রূপ দেবার রীতিটাকে শোধরানো যায়, যাতে পার্টির নীতিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বাস্তব সত্যের মধ্যে গেঁথে বসানো যায়। পার্টির বাইরের এবং ভেতরকার সম্পর্কগুলোকে শোধরাবার জন্যে, সংগঠনের ব্যাপারে মনগড়া ধ্যানধারণাকে চিরকালের মতো বিদায় দেবার জন্যে এই নীতি গ্রহণ করা দরকার যে ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থের চেয়ে পার্টির স্বার্থ অনেক বড়ো—যাতে পার্টি ঐক্যবদ্ধ আর মজবুত হয়ে উঠতে পারে। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারেও এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে—যাতে চীনের জনগণ এবং বিশ্বের জনগণের স্বার্থ একই সঙ্গে রক্ষা করা যায়। বুঝতে হবে পার্টির লেখার লক্ষ্য কি? পার্টির সভ্যদের আর দেশের বাকি জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, বিশ্ববাসীর সঙ্গেও ভাবের আদান-প্রদান যাতে ভালোভাবে হয় সেই জন্যেই পার্টির ছকবাঁধা লেখার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ছকবাঁধা বাজে লেখা বাতিল করে কাজের লেখা লিখতে হলে বাস্তব ঘটনার পূর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিতে হবে দ্বন্দ্ব কোথায় রয়েছে এবং তার সমাধান কেমন করে হবে। মাও৲সে-তুং

প্রচারকদের বিশেষ করে বলেছিলেন যে লেখার একটা "গণভঙ্গি" গড়ে তুলতে, আর তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের বোঝাবার জন্তে তাদের কাছ থেকেই শিখতে বলেছিলেন তিনি।

জীবনের সব ক্ষেত্রে মনগড়া ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াইতে সবাইকে সামিল করবার জন্তে মাও ৎসে-তুং বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ব তত্ত্বের প্রচারের ওপর জোর দিলেন। তিনি এও বললেন: "প্রত্যেক জিনিসের কি ও কেন'র মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রবেশ করতে হবে, নিজেদের মগজ খাটাতে হবে এবং ভালো ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে সেটার সঙ্গে বাস্তবের মিল আছে কি না এবং সেটার ঠিক ভিত্তি আছে কি না। কোনও কারণেই তারা যেন অন্ধের মতো কারুর পেছনে পেছনে না চলে এবং দাস মনোভাবকে যেন প্রশ্রয় না দেয়।" গুরু ওয়াং মিং হেরে যাওয়ার পর লিউ শাও-চি তার জেহাদের নেতৃত্ব নিয়ে প্রাণপণে মাও ৎসে-তুং-এর এই শিক্ষার বিরোধিতা করে। লিউর মাথা থেকে এক বিষাক্ত আগাছার জন্ম হয়েছিল। সেটি ১৯৩৯এ প্রকাশিত একটি বই: "কেমন করে একজন ভালো কমিউনিস্ট হওয়া যায়" বা "হাউ টু বি এ গুড্ কমিউনিস্ট"। অর্থাৎ "আত্মোৎকর্ষ" বা নিজের উন্নতি করা। বইখানিতে লিউ শাও-চি পার্টি-সভ্যদের জন্তে পথের রেখা এঁকে দিয়েছিল। সে পথ হবে আত্মদর্শনের পথ বা নিজের মনের ধ্যানধারণা আবেগ ইত্যাদিকে পরীক্ষা করে দেখার পথ এবং জনতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে "একান্ত বাধ্য হাতিয়ার" হিসেবে কাজ করে যাওয়ার পথ। এই বইখানিতে লিউ শাও-চি সশস্ত্র বিদ্রোহ করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করবার কথা উল্লেখ করেনি, সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন করবার কথাও না, এমন কি জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার কথাও উল্লেখ করেনি। অবশ্য সংস্করণে সে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট নীতির উল্লেখ করে নিজের 'বিপ্লবী' মুখোশটা বাঁচাতে চেয়েছিল। তার এসব কিছুর পেছনে গোড়া থেকেই একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে নিজেই পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং কয়েক বছর ধরে নিজের মতো একদল লোককে জালের মতো পার্টির ভেতর ছড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই শ্রেণীশত্রুদের পার্টির এবং রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিয়েছে এবং প্রতিবিপ্লবী কাজে তাদের "একান্ত বাধ্য হাতিয়ার" হিসেবে লিউ শাও-চি ব্যবহার করে চলেছে। তার নিজস্ব দলবলের সাহায্যে সে গোটা পার্টিকে

তার কজার মধ্যে রাখতে চেষ্টা করে, চীন বিপ্লবের গতিপথ বদলে দিতে চায়, সে-বিপ্লবকে চীনের জনগণের সবচেয়ে জঘন্য শত্রুদের হাতে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেকের হাতে সঁপে দিতে চায়। শয়তান লোকদের পার্টির মধ্যে ঢুকতে দেওয়ার মানে হচ্ছে মাও ৎসে-তুং-এর যে নীতি পার্টি কংগ্রেস ও পার্টির পত্র-পত্রিকা গ্রহণ করেছিল সেই নীতিকে অমান্য করা। ১৯৪০-এর ২৫এ ডিসেম্বরের "নীতি প্রসঙ্গে" লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং পরিষ্কার বলেছিলেন, "জঘন্য অপরাধ যারা করেছে তারা বাদে দলত্যাগীদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছে এই যে তাদের নতুন করে জীবন আরম্ভের সুযোগ দিতে হবে এই শর্তে যে কমিউনিস্ট বিরোধী কাজকর্ম তারা বন্ধ করবে। আর যদি তারা ফেরে এবং বিপ্লবে সামিল হতে চায় তবে তাদের সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু তাদের পার্টির মধ্যে আবার সভ্য হিসেবে নেওয়া কিছুতেই চলবে না!" কিন্তু লিউ অনবরত এই নির্দেশটিকে পাশ কাটিয়ে যেত, এমন কি পার্টি কংগ্রেসগুলোতে তার ষড়যন্ত্রকে পার্টির নীতি হিসেবে পাশ করিয়ে নিয়ে তার বেআইনী কাজকর্মকে আইনী বলে চালিয়ে দিত। যদিও সে তার প্রতিবিপ্লবী প্রস্তাবগুলো পার্টিকে দিয়ে সরকারীভাবে পাশ করাতে পারেনি তবু বহু বছর ধরে সে পার্টির বিরুদ্ধে বেআইনী কাজকর্ম চালিয়ে যায় এবং একের পর এক সংশোধন আন্দোলনের হাত থেকে পার্টির ভেতরে তার দলবলকে রক্ষা করতে থাকে। ১৯৪২-এর এবং তার পরের সংশোধন আন্দোলন দারুণভাবে সফল হয়েছিল। একটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিকে কি ভাবে ঠিক কার্যকরী করে তুলতে হয় তার দৃষ্টান্ত এই সংশোধন আন্দোলন বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল। পার্টির নীতি ঠিক করবার ব্যাপারে মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারাকেই সবচেয়ে উঁচুতে স্থান দেওয়া হল। কিন্তু তবু লিউ শাও-চির ষড়যন্ত্রের পুরোনো ঘা পার্টির গায়ে রয়েই গেল যতদিন না সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে সম্পূর্ণ সংশোধন আন্দোলন অর্থাৎ সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব এসে সেটাকে একেবারে খুঁড়ে তুলে ফেলল। ১৯৪২-৪৫-এর সংশোধন আন্দোলন সম্পর্কে শেষ কথা হচ্ছে এই যে এই আন্দোলন জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ এবং মুক্তিযুদ্ধের দিকে সফল ভাবে এগিয়ে যাওয়ার আদর্শগত ও সংগঠনগত ভিৎ তৈরি করেছিল।

প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় দলে দলে শিল্পী ও সাহিত্যিক গ্রামাঞ্চলে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এলেন। তাঁরা সেই সময়কার নানা সংগঠনে যোগ দিলেন এবং

জাপ-বিরোধী প্রচারের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন। যাটুকে দল গড়ে নাট্যকার এবং তরুণ সাহিত্য কর্মীরা জনগণকে প্রতিরোধে জাগিয়ে তুলবার জন্যে চরম বিপদ মাথায় নিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যুদ্ধের এলাকায় ছুটে বেড়ালেন। ১৯৩৮-এর মার্চেই হ্যাংকাওতে সারা চীন শিল্প ও সাহিত্য কর্মীদের প্রতিরোধ সমিতি গড়ে উঠলো। কুয়ো মো-জো ছিলেন তার একজন বিশিষ্ট নেতা। এই সমিতিকে ঘিরে দাঁড়াল জাপ-বিরোধী সমস্ত সাহিত্য কর্মীরা। তাঁরা আহ্বান জানালেন, "সাহিত্যকে কৃষক আর সৈনিকের মধ্যে নিয়ে চলো।" "প্রতিরোধ সাহিত্য" পত্রিকাটি ছাড়াও অন্যান্য নানা পত্র-পত্রিকা বার হল। জাপ-বিরোধী গল্প, কবিতা আর নাটক মানুষের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। বিপ্লবী সাহিত্যিকেরা চিয়াং-এর ভণ্ডামীও জনগণের কাছে প্রকাশ করে দিলেন। মাও ৎসে-তুং শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইয়েনানে তাঁর বক্তৃতায় বিপ্লবের সাহিত্যের পথের রেখা স্পষ্ট করে টেনে দিয়েছিলেন। সে পথ ধরেই বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য এগিয়ে চলল।

।। কাগুজে ড্র্যাগন ।।

মুক্ত এলাকাগুলোর ওপর নির্ভর করেই জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল এবং শেষ অবধি চীনে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জাপানীরা এদের শক্তি বুঝতে পারেনি বলেই বারে বারে তাদের হিসেবে ভুল হয়েছিল। কত কৌশলই না তারা করেছিল। যেমন, একটা কৌশল হল "ঝেঁটিয়ে সাফ"। ১৯৪২-এর মে মাস থেকে হোপেই প্রদেশে জাপানীরা আট হাজার গ্রামকে পাহারা দেবার জন্যে দেড় হাজার ঘাঁটি তৈরি করল এবং সাত শ' ট্রাকে করে টহল দিতে থাকল। উত্তর-পূর্ব চীনের এই হোপেই প্রদেশের বিশাল সমতলভূমি হত্যা ও হাহাকারে ভরে উঠল। জাপানীরা ভাবল এই ভাবেই দখল কায়েম হবে। কিন্তু ঝড় উঠল এবং রক্তপাত শুধু এক তরফা হল না। আট নম্বর রুট আর্মি আর মিলিশিয়া বা স্থানীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মাত্র দু'মাসের মধ্যে জাপানীরা তাদের স্বপ্ন নিয়ে রক্তের অতলে' ডুবে গেল। হিসেবে তাদের ভুল হয়েছিল। আরেকবার তাদের ভুল হল উত্তর চীনের সুইইউয়ান প্রদেশে।

সেখানে তাচিং পর্বতমালার গা দিয়ে ঘাসে ঢাকা বিরাট প্রান্তর। উদোম ময়দান পেয়ে জাপানীরা মহানন্দে প্রচুর বিমান আর ট্রাক নিয়ে আট নম্বর ফৌজকে আক্রমণ করল। এখানে লড়ছিল আট নম্বর ফৌজের একটি ঘোড়সওয়ার বাহিনী। জাপানীরা এরকমের ক্যাপা ঘোড়সওয়ার জীবনে দেখেনি তাই তাদের হিসেবে আবার ভুল হল। এই ঘোড়সওয়াররা রোদ, জল, ঝড়, বরফ সব কিছুর মধ্যেই লড়ে যায়, প্রকৃতিকে ভয় না করাই এদের প্রকৃতি। দশ বারো দিন ধরে একটানা দিনে রাতে ঘোড়ার ওপরই আছে—ভাবা যায়? এই দুর্দান্তরা তাই পেরেছিল পিকিং-সুইইউয়ান রেলপথের পাশের জাপানী দুর্গগুলোকে ছাতু ছাতু করে দিতে। "ঝেঁটিয়ে সাফ" কৌশল চালাতে গিয়ে বারে বারে এমনি ভাবে জাপানীরা নিজেরাই সাফ হয়ে গেছে।

আরেকটা কৌশল তারা খাটাতে গেল—তার নাম "গ্রাম আঁচড়ানো।" আমরা যেমন করে সরু চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে উকুন বার করে মাথা পরিষ্কার করে ফেলি জাপানীদের ইচ্ছে হল ঠিক তেমনি ভাবে সৈন্যদের লাগিয়ে দিয়ে গ্রাম আঁচড়ে কমিউনিস্ট "উকুন"গুলোকে বেছে সাবাড় করে দেবে। একাজে একা জাপানীরা পারবে না কারণ দেশের লোক না হলে কমিউনিস্ট খুঁজে বার করা অসম্ভব হবে। তাই দেশদ্রোহী চীনেদের পুতুল সৈন্যরা জাপানীদের সাহায্য করতে লাগল। ১৯৪১-এর গোড়ার দিকে মধ্য চীনের কিয়াংসু আনহোয়েই হুপে ইত্যাদি প্রদেশে "গ্রাম আঁচড়ানো" শুরু হল। বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এক একটা জায়গা দখল করা হত। তারপর তার চারদিকে গাছের ডালপালা দিয়ে বেড়া দেওয়া হত—মাইলের পর মাইল লম্বা বেড়া। এবারে নয়া চার নম্বর ফৌজের লোক এই এলাকায় আছে কি না উকুন বাছা করে বার করা হবে। প্রত্যেক বাড়ীতে ঢুকে খানাতল্লাশি করা আর প্রত্যেককে বাধ্য করা সনাক্ত করবার জন্যে তৈরি এক রকম কার্ডে নাম-ধাম খুঁটিনাটি সব লিখতে—এই উকুন বাছার কায়দা। এই কার্ড অবশ্য সবাইকে দেওয়া হত না, জাপানীরা যাদের "সচ্চরিত্র" মনে করত শুধু তাদেরই দেওয়া হত। যখন এই গ্রাম আঁচড়ানোর কাজ চলছে তখন চার নম্বর ফৌজ কি বসে আছে? মোটেই নয়। তারা আঁচড়ানোর দলকে কামড়ানোর কাজে লেগে গেছে। বেড়া ঘেরা এলাকার ওপর জাপানী সৈন্যদলের পাশ থেকে আক্রমণ চলতে লাগল। জনতাকেও

তাদের সঙ্গে সামিল করে বেড়া পোড়ানোর কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। জাপানীরা যখন খুশি হয়ে ভাবছে ঘেরাও করে উকুন-বাছার কাজটা ভালোই হল—আপাতত কাজ শেষ, ঠিক সেই সময় দেখা গেল বেড়ায় কারা যেন আগুন লাগিয়েছে, মাইলের পর মাইল বেড়া পুড়ছে। যে বেড়া পুঁততে তাদের কয়েক মাস লেগেছে সে বেড়া এক রাত্তিরে ছাই হয়ে গেল। হিসেবে আবার ভুল হল।

ইতিপূর্বে "মিলিশিয়া" শব্দটি উল্লেখ করেছি। মুক্ত এলাকাগুলোতে এই মিলিশিয়া গড়াকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। শক্ত-সমর্থ পুরুষেরা তো আর্মি বা গেরিলা দলেই যোগ দিত। অন্যেরা স্বেচ্ছায় মিলিশিয়াতে নাম লেখাত। তারা এক দিকে গ্রামের উৎপাদনের কাজে প্রাণপাত পরিশ্রম করত, আরেক দিকে অস্ত্র হাতে নিজেদের ভিটেমাটি রক্ষা করত। আর্মি অর্থাৎ মূল সৈন্যবাহিনী এবং গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এরা লড়ে যেত। খাজনা আর সুদ কমানো এবং অন্যান্য দাবি নিয়ে গণ-আন্দোলন যতো জোরদার হতে লাগল এই মিলিশিয়া-গুলোও ততোই বড়ো এবং প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। এই মিলিশিয়া অনেক সময় আশ্চর্য কায়দায় শত্রুকে ঘায়েল করত। তারা শত্রুসৈন্যকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মাইন বা বিস্ফোরক ছড়ানো জায়গায় নিয়ে আসত। তার-পর মাইন ফেটে যাওয়ায় সেই সৈন্যরা তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ড হয়ে যেত। কখনও কখনও মিলিশিয়া সমতল জায়গায় ট্রেঞ্চ খুঁড়ত পর পর অনেকগুলো। ট্রেঞ্চ হচ্ছে সরু আর গভীর নর্দমা, তার ভেতর দাঁড়ালেও মাথা দেখা যায় না। এই চোরাই খাদে শত্রুবাহিনী এসে ফাঁদে পড়ার মতো পড়ত। কারণ ট্রেঞ্চগুলো গাছপাতা দিয়ে ঢাকা থাকত। নদীর বুকে মিলিশিয়ার লোক বাঁধ বেঁধে দিত যাতে শত্রুর স্টিমার এগোতে না পারে। ট্রাকের পথেও তারা বাধা সৃষ্টি করত অনেক রকমের। এরা সুরঙ্গ তৈরি করত মাইলের পর মাইল—তাতে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে তো যাওয়া যেতই, এমন কি পাশের জেলাতেও চলে যাওয়া যেত। বিশেষ সংকটের সময় তারা এই সুরঙ্গগুলোতে লুকোত। সুরঙ্গের ভেতর ঢুকলেও শত্রু তাদের খোঁজ পেত না কারণ ইচ্ছে করেই তারা এই সুরঙ্গগুলোকে আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার মতো জটিল করে তৈরি করত। সময় মতো যেমন লুকোত তেমনি সময় মতো হঠাৎ বেরিয়ে এসে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

ভূল শোধরাবার আন্দোলন, জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার, ফৌজ আর মিলিশিয়ার কাজ সব মিলে মুক্ত অঞ্চলগুলো এমন হয়ে উঠল যে ১৯৪৩ থেকে তাদের জোর ক্রমশ বেড়েই চলল। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে এই মুক্ত এলাকা-গুলোই হয়ে উঠল প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র। এক একটি মুক্ত এলাকা হল ভবিষ্যতের নয়া চীনের শিশু বয়সের ছবি। লিন পিয়াও বলেছেন, "আমাদের ঘাঁটি এলাকাগুলো বাস্তবিক পক্ষে এক একটি ক্ষুদে রাষ্ট্র।" প্রতিটি মুক্ত এলাকা বিপ্লবীদের মনে আশা জাগাত আর ভয় জাগাত শোষকদের মনে।

১৯৪৪ সাল। মুক্ত এলাকার ফৌজ জনতার সাহায্য নিয়ে কোনও কোনও অঞ্চলে জাপানী সৈন্যদলকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। ঐ বছর সোভিয়েৎ রাশিয়া শেষ নাৎসী আক্রমণকারীকে দেশের মাটি থেকে তাড়িয়ে দিল। চীনের জনগণ প্রতিরোধ যুদ্ধে নতুন উৎসাহ পেল। পরের বছর বসন্তে দেখা গেল উত্তরে যেহল থেকে দক্ষিণে হাইনান দ্বীপ পর্যন্ত উনিশটি মুক্ত এলাকায় এখন লোকসংখ্যা নয় কোটি পঞ্চান্ন লক্ষে পৌঁছেছে। যে বিপ্লবী ফৌজের তখন নাম হয়েছে চীনের জনগণের মুক্তি ফৌজ তার সৈন্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে নয় লক্ষ দশ হাজার আর মিলিশিয়া গড়ে উঠেছে বাইশ লক্ষ মানুষকে নিয়ে। চীনের বড়ো বড়ো শহরের বেশির ভাগ, যান-বাহনের প্রধান প্রধান পথ এবং দীর্ঘ সমুদ্রতীর মুক্তিফৌজ হয় দখলে রেখেছে নয় তো সেখানকার শত্রু এলাকা ঘেরাও করে রেখেছে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভের যেন আর বেশি বাকি নেই মনে হচ্ছে।

১৯৪৫-এর ২৩এ এপ্রিল ইয়েনানে কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস বসল। এই কংগ্রেসে মাও ৎসে-তুং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট রাখলেন—"যুক্ত সরকার প্রসঙ্গে"। এই রিপোর্টে তিনি প্রতিরোধ যুদ্ধে গোটা পার্টি ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবার নীতি তুলে ধরলেন। যুদ্ধের পর নয়াগণতান্ত্রিক চীনকে গড়ে তুলবার কর্মসূচী উপস্থিত করলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীকে সফল করবার চাবিকাঠিই হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক যুক্ত সরকার গঠন করা। যুদ্ধের পর নয়াগণতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠা ও সমবায়গুলো হবে সমাজতন্ত্রের উপাদান। তাই ঘটনার গতি সমাজতন্ত্রের দিকে দেশকে নিয়ে যাবে। তিনি জাপ-বিরোধী যুদ্ধে বিপ্লবী ও প্রতি-বিপ্লবী লাইনের মধ্যে যে লড়াই চলছে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন।

মাও৺সে-তুং বললেন, কোনও শত্রু আমাদের ধ্বংস করতে পারে না, কিন্তু আমরা যে কোনও শত্রুকে ধ্বংস করতে পারি এবং যে কোনও বিপদ পার হয়ে যেতে পারি যতক্ষণ আমরা জনগণের ওপর নির্ভর করি, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তাদের সীমাহীন সৃষ্টি শক্তিকে এবং তাদের সঙ্গে একাত্ম হই। জনগণ একবাক্যে কুয়োমিনতাং একনায়কত্বের অবসান চাইছিল। জনগণের দাবিকে এড়িয়ে যাবার জন্যে চিয়াং নামকে ওয়াস্তে "জাতীয় পরিষদ" ডাকল। উদ্দেশ্য হল জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার ছল করে একটা ঝুটা সংবিধান পাশ করা। কায়দা করে কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া। মাও৺সে-তুং বললেন, "তারা নিজেদের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাচ্ছে, যে দড়ি কখনই আর ঢিলে হবে না আর সে দড়ির তারা নাম দিয়েছে 'জাতীয় পরিষদ'। এ লাইনে এগোলে অনৈক্য আর গৃহযুদ্ধ হতে বাধ্য, এ দড়ি শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের ফাঁসির দড়ি হবেই হবে।

এই কংগ্রেসেই চু তে উপস্থিত করলেন তাঁর বিখ্যাত সামরিক রিপোর্ট "মুক্ত এলাকাগুলোর যুদ্ধক্ষেত্র"। এখানে তিনি মাও৺সে তুং-এর সামরিক লাইন ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জনগণের বিরাট বিরাট জয়ের কথা বললেন।

ঐ বছরই ২রা মে সোভিয়েৎ রাশিয়ার লাল ফৌজ বার্লিন দখল করল। জার্মানির রাজধানী বার্লিনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশিস্ত জার্মানি ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল—"বিশ্ববিজয়ী" হিটলার আত্মহত্যা করল। ৮ই আগস্ট স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েৎ রাশিয়া আরেক ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে অর্থাৎ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জাপানী শয়তানদের দখল করা উত্তর-পূর্ব চীনে সোভিয়েৎ লাল ফৌজের জয়যাত্রা শুরু হল। মঙ্গোলিয়ার জনগণতন্ত্র ও জাপানী হানাদার সৈন্যদের আক্রমণ করল। জাপানীরা তাদের দশলাখী কোয়াংতুং ফৌজ নিয়ে সোভিয়েৎ লাল ফৌজের বিরুদ্ধে চরমভাবে লড়বে ঠিক করল, কিন্তু চৌদ্দ দিনের মধ্যে লাল ফৌজ জাপানের কোয়াংতুং ফৌজকে ধ্বংস করে দিল—জাপানী যুদ্ধবাজদের বড়ো গর্বের জিনিস ছিল এই ফৌজ। সোভিয়েৎ ফৌজের অভিযানে উত্তর-পূর্ব চীনে এবং কোরিয়াতে বিরাট এলাকা মুক্ত হল।

৯ই আগস্ট মাও৺সে-তুং এক ঘোষণায় বললেন যে সোভিয়েৎ রাশিয়া জাপ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দেওয়াতে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরও

বললেন যে এখন সময় এসে গেছে যখন জাপানী হানাদারদের এবং তাদের পা-চাটাদের চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দেবার জন্যে চরম আঘাত হানতে হবে। দিকে দিকে তাঁর ডাক ছড়িয়ে পড়ল—আখেরি ধাক্কা লাগাও, হানাদার হটাও! পরের দিনই সর্বাধিনায়ক চু তে শত্রুর দখলী এলাকার দিকে মুক্তি ফৌজকে এগোতে বললেন মুক্তিফৌজের হানাদার-বিরোধী বিরাট পাল্টা আক্রমণ শুরু হল। পাঁচ দিন যেতে না যেতেই ১৪ই আগস্ট জাপানী সাম্রাজ্যবাদ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করল। মুক্তি ফৌজ তখন অনায়াসেই জাপানীদের হাত থেকে সরকারী ভাবে দখলী এলাকার দখল নিয়ে নিতে পারত। কিন্তু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা এবং চিয়াং-এর কুয়োমিনতাং জাপানী সৈন্য এবং চীনে পুতুল সৈন্যদের নির্দেশ পাঠাল আত্মসমর্পণ না করতে এবং মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে। উদ্দেশ্য—যে কুয়োমিনতাং বাহিনী তখনও অনেক পেছনে পড়ে আছে তারা এগিয়ে আসুক এবং তাদের কাছে হানাদাররা অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ সরকারীভাবে করুক। অর্থাৎ চীনের জনসাধারণ যে জয়লাভের গৌরবের ন্যায্য অধিকার পেতে পারে জনগণের শত্রু কুয়োমিনতাং সেই গৌরব চুরি করবার চেষ্টা করল। জনগণের মুক্তিফৌজ থামল না, ঝড়ের বেগে তাড়া করে চলল জাপানী হানাদারদের এবং মাত্র দু'মাসের মধ্যে একশ সাতানব্বুইটা শহর এবং এক কোটি আশি লক্ষ লোককে মুক্ত করল। তাছাড়া তাদের হাতে মারা পড়ল দু'লক্ষ তি[illegible] হাজার জাপানী সৈন্য আর চীনে পুতুল সৈন্য। শেষে ১৯৪৫-এর ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণের দলিল সই করে দিল। অনেক প্রাণের মূল্যে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে চীনের জনসাধারণ জিতল, হানাদার দস্যুদের দেশের মাটি থেকে তাড়িয়ে দিল।

জার্মান, জাপানী এবং ইতালীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে বিশ্বযুদ্ধ চলছিল চীনের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ তার একটি বিশিষ্ট অংশ। চীনের জনগণ জাপানকে রুখতে গিয়ে শুধু বিশ্বের জনগণ ও ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলোর সমর্থনই পায়নি তারা নিজেরাও ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে প্রচুর সাহায্য করেছে। বিশ্বের জনগণের সমর্থন আর যুদ্ধের শেষ পর্বে মহান স্তালিনের লাল ফৌজ চীনের মাটি থেকে জাপানী হানাদারদের হটিয়ে দিতে খুবই সাহায্য করেছিল সত্যি, কিন্তু এই যুদ্ধে চীনের জয় হয়েছিল প্রধানত চীনের জনগণের নিজের চেষ্টার ওপর

নির্ভর করে। নিজেদের পায়ে না দাঁড়িয়ে জনযুদ্ধ করাই যায় না। তাই যদি কেউ বলে যে চীন প্রতিরোধ যুদ্ধে জিতেছিল পুরোপুরি বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভর করে, তবে বুঝতে হবে তার কোনও শয়তানী মতলব রয়েছে। সে জাপানী যুদ্ধবাজদের নোংরা যুক্তিটাই আওড়াচ্ছে। এর আগে চীনের জনগণ বহুবার বীরত্বের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু এই প্রথম তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করল।

একটা দুর্বল দেশের পক্ষে একটা প্রবল দেশকে শেষ অবধি হারিয়ে দেওয়া কেমন করে সম্ভব হল? লিন পিয়াও এই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দিচ্ছেন: জাপ-বিরোধী যুদ্ধটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি খাঁটি জনযুদ্ধ। এই যুদ্ধে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। আট নম্বর রুট আর্মি আর নয়া চার নম্বর আর্মি ছিল খাঁটি গণফৌজ এবং মাও ৎসে-তুং-এর নির্দেশ অনুযায়ী জনযুদ্ধের রণকৌশল ও রণনীতির আগাগোড়া সব কিছুই তারা এই জাপ-বিরোধী যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল।

লিন পিয়াও আরও বলেছেন: জনযুদ্ধ সম্বন্ধে মাও ৎসে তুং-এর তত্ত্ব ও নীতিগুলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্পদ বাড়িয়ে তুলেছে এবং তাকে আজকের দিনের সংগ্রামের উপযুক্ত হাতিয়ার করে তুলেছে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ হল জনযুদ্ধের জয়জয়কার, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারার জয় জয়াকার।

।। এবারে আখেরি জং শুরু ।।

চীনের জনগণের জয়লাভকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা আর কুয়োমিনতাং চুরি করে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। একথা আগে বলেছি। কিন্তু তাদের বজ্জাতির ব্যাপারটা আরেকটু তুলে ধরা ভালো কারণ এর সঙ্গে চীনের মুক্তিসংগ্রামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

কুয়োমিনতাং সৈন্যদল তো জাপানী আক্রমণের মুখে বড়ো বড়ো শহর ও সমুদ্রতীর ছেড়ে বহু দূরে পালিয়ে বেঁচেছিল। সুতরাং কমিউনিস্ট

পার্টির দ্বারা পরিচালিত মুক্তি ফৌজ যখন শেষ পর্যন্ত জাপানীদের কোণঠাসা করল তখন কুয়োমিনতাং সৈন্যরা কাছাকাছি কোথাও নেই। জাপানীরা তখন আত্মসমর্পণ করে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল কিন্তু তাহলে জয়লাভের গৌরব মুক্তি ফৌজ এবং চীনের জনগণ পেয়ে যায়। তাই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি জেনারেল ম্যাকআর্থার জাপানী বাহিনীকে হুকুম করল জনগণের মুক্তি ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ না করতে। চিয়াং-কাইশেক আরও পরিষ্কার করে জাপানী সেনাপতি ওকামুরাকে নির্দেশ দিল—আত্মসমর্পণ তো নয়ই, মুক্তি ফৌজের সঙ্গে লড়ে যাও। এর ফল হল এই যে বড়ো বড়ো শহর এবং বন্দর এলাকা হেরে যাওয়া জাপানী সৈন্যদের দখলেই থেকে গেল। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তাদের বেশ কিছু দিন এই ভাবে রেখে দেওয়া হল। পরে আমেরিকান সৈন্য এনে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হল। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় চীনে বড়ো জোর যাট হাজার আমেরিকান সৈন্য ছিল কিন্তু সে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর আমেরিকার আরও সৈন্য দরকার হল কারণ চীনকে একা কব্জা করবার চেষ্টা করবে আমেরিকা। তাই অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই চীনে আমেরিকান সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াল ডবলেরও অনেক বেশী—এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার। যাক, সে কথা পরে। "আত্মসমর্পণ" তো করাতেই হয়, কদিন আর ঠেকিয়ে রাখা যায়? তাই আমেরিকার বিমানবাহিনীর বিমানে এবং তার নৌবাহিনীর জাহাজে পলাতক চিয়াং-সৈন্যদের প্রায় দশ লক্ষকে জড়ো করা হল দেশের দূর দূর অঞ্চল থেকে এবং এই "বীরেরা" সাড়ে বারো লক্ষ জাপানী সৈন্যের "আত্মসমর্পণ" গ্রহণ করল।

এই ভাবে আমেরিকা এবং কুয়োমিনতাং-এর যৌথ সৈন্যসংখ্যা বাড়তে থাকল। যে সংখ্যা এই মাত্র উল্লেখ করলাম তার সঙ্গে আরও যোগ দিতে হবে। চিয়াং-এর গোপন নির্দেশ পেয়ে চার লক্ষ একানব্বুই হাজার দেশদ্রোহী সৈন্য জাপানের কলের পুতুলের মতো এতদিন লাল সেনাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তা ছাড়া জাপানীরা চীন দখল করে থাকার সময় প্রায় আরও তিন লক্ষ পুতুল সৈন্য যোগাড় করেছিল। এই মোট প্রায় সাত লক্ষ একানব্বুই হাজার পুতুলকে কুয়োমিনতাং বাহিনীর মধ্যে তড়িঘড়ি ভর্তি করে নেওয়া হল কারণ আখেরি জং বা শেষ লড়াই তো সামনে। ইতিপূর্বে এত বড়ো এবং অস্ত্রশস্ত্রে এতো শক্তিশালী বিপ্লববিরোধী ফৌজ

চীনদেশে ছিল না। আমেরিকার যুদ্ধবিদ্যার পণ্ডিতরা এই ফৌজকে ঘষে মেজে আগামী মুক্তি যুদ্ধে মুক্তি ফৌজকে ঘায়েল করবার পাকাপোক্ত হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলল। কিন্তু যে সরষে দিয়ে দেশের ঘাড় থেকে আমেরিকা কমিউনিজমের ভূতকে নাবাবে ভেবেছিল সেই সরষের মধ্যেই ভূত ছিল। কারণ চীনের মানুষ জাপানের বিরুদ্ধে লড়েছিল নিশ্চয়ই আমেরিকার অধীনে আসবার জন্যে নয়—লড়েছিল স্বাধীনতার জন্যে, আবার গৃহ যুদ্ধ শুরু করবার জন্যে নয় শান্তির আবহাওয়ায় দেশকে গড়ে তুলবার জন্যে। সমস্ত চীনেদের এই মনোভাবের সঙ্গে কুয়োমিনতাং-এর চীনে সৈন্যদের মনোভাবেরও মিল ছিল। সুতরাং বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো খেলাটা ধরা পড়ে না যায় এই জন্যে আমেরিকা পর্দানসীন হয়ে থাকল, বলল, 'আমি মধ্যস্থ।' কুয়োমিনতাং এবং কমিউনিস্ট পার্টির আলাপ আলোচনায় আমেরিকা মধ্যস্থ হল। কমিউনিস্ট পার্টি এই মধ্যস্থের নামাবলীর আড়ালে দাঁত-নখ সব দেখতে পাচ্ছিল আর কুয়োমিনতাং-এর কুচক্রীরা তো অনেক দিনের চেনা, তবু পার্টি আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল কারণ যুদ্ধ-ক্লান্ত চীনের সাধারণ মানুষ তখন শান্তি চায়। আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল বটে কিন্তু চিয়াং-এর আক্রমণের উদ্যোগ-আয়োজন আর গৃহযুদ্ধে বার বার উস্কানি দেবার ঘটনাগুলো লোকের কাছে তুলে ধরতে লাগল।

১৯৪৫-এর ২৫এ আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টি এক ঘোষণায় গৃহযুদ্ধকে এড়ানোর জন্যে শান্তি, গণতন্ত্র ও একতার ভিত্তিতে দেশকে ঐকবদ্ধ করে তোলার আহ্বান জানাল। ২৮এ আগস্ট মাও ৎসে-তুং নিজে চুংকিং গেলেন কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে আলোচনায় বসতে। তেতাল্লিশ দিন ধরে আলোচনা চলল। ১০ই অক্টোবর দু'পক্ষে চুক্তি হল। চুক্তিতে বলা হল যে গৃহযুদ্ধকে এড়াতেই হবে—শান্তি, গণতন্ত্র আর ঐক্যের আদর্শকে রূপ দিতে হবে। এও ঠিক হল যে সমস্ত দলের প্রতিনিধি এবং নির্দলীয় বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে একটা রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভা ডাকা হবে। কমিউনিস্ট পার্টিকেও কতকগুলো সুবিধে ছাড়তে হল। চুক্তি সই করার এক সপ্তাহ পরেই ঐ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি চেকিয়াং, দক্ষিণ কিয়াংসু, দক্ষিণ আনহোয়েই ইত্যাদি আটটি মুক্ত এলাকা থেকে গণফৌজকে সরিয়ে নিতে শুরু করল। ঐ সব এলাকার জনগণ চোখের জলে তাদের প্রিয় লাল সেনাদের বিদায়

দিল। চিয়াং কিন্তু গৃহযুদ্ধ শুরু করার প্ল্যান গোপন রাখার জন্যেই চুক্তিতে সই করেছিল। সে আন্দাজ করেছিল যে চুক্তি হওয়ার পর কমিউনিস্টরা অসতর্ক হবে আর মওকা পেয়ে আচমকা আক্রমণে সে তাদের জব্দ করবে। চুক্তি নিয়ে যখন কথাবার্তা চলছে তখনই চিয়াং চাহার এবং শান্‌সিতে যে মুক্তি ফৌজ ছিল তাকে আক্রমণ করার জন্যে কুয়োমিনতাং ফৌজকে নির্দেশ দিল। চুক্তি প্রকাশ হওয়ার পরের দিন চিয়াং একটি গোপন "ডাকাত দমন" হুকুমনামা ছাড়ল। আসলে "ডাকাত" মানে কমিউনিস্ট ও মুক্ত এলাকার গণতান্ত্রিক মানুষ। এই গোপন হুকুমনামার ফল হল এই যে নানা অঞ্চলের মুক্ত এলাকার ওপর সতের লক্ষ কুয়োমিনতাং সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল "ডাকাত দমন" করতে। এই "ডাকাত দমনের" ব্যাপারে আমেরিকা উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে। জনগণের মুক্তি ফৌজ সর্বদা সতর্ক থাকে বলে আসল ডাকাতদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল।

চিয়াং-এর দলই যে নতুন গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালাল দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ তা পরিষ্কার বুঝতে পারল। গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে শহরে শহরে আন্দোলন শুরু হল। কুয়োমিনতাং-এর অধীন বড়ো বড়ো শহরেই এই আন্দোলন দেখা দিল। কুয়োমিনতাং-এর গৃহযুদ্ধের মনোভাব ও কার্যকলাপের নিন্দা হল এবং চীনের ব্যাপারে আমেরিকার অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ হল। ১৯৪৫-এর ১লা ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের কুনমিং-শহরে জনতার ক্ষোভ যেন কামান দাগল। তার দিন পাঁচেক আগে কুনমিং-এর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো যুক্তভাবে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজন করে। কুয়োমিনতাং সরকার বিশেষ ধরনের দালাল পাঠিয়ে সভা ভাঙতে না পেরে যারা বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল তাদের অদ্ভুত কায়দায় ভয় দেখায়—সভার চারদিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। গুণ্ডারা যা করতে পারত সরকার তাই করল—চমৎকার সরকার। যারা বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল তারা কিন্তু শান্তভাবে বক্তৃতা শুনতে লাগল এবং বক্তৃতা দুপুর রাত অবধি চলল। পরের দিন কুয়োমিনতাং-এর সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রচার করল যে ঐ সভার সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্ররা "ডাকাত"। ছাত্ররা এমনিতেই রেগে আগুন হয়ে ছিল, এতে সেই আগুনে যেন ফুঁ পড়ল। প্রতিবাদে ত্রিশ হাজার ছাত্র ধর্মঘট করে ফুঁসে উঠল। তারা

দাবি করল গৃহযুদ্ধ থামাতে হবে, চীনদেশ থেকে আমেরিকান সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, গণতান্ত্রিক যুক্ত সরকার গঠন করতে হবে এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। কুয়োমিনতাং-এর লোকেরা এই স্বদেশপ্রেমিক ছাত্রদের ওপর হামলা করল এবং তাদের গ্রেপ্তার করল। এইসব ঘটনার পরেই এল ১লা ডিসেম্বরের ভয়ংকর দিন।

সেই ১লা ডিসেম্বর কুয়োমিনতাং-এর শত শত দালাল এবং সৈন্য আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং আমেরিকান মোটর গাড়ীতে চড়ে কুনমিং-এর স্কুলগুলোর ওপর ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্কুলের গেট ও স্কুলের দেয়ালের আড়াল থেকে ছাত্ররা তুমুল লড়াই করল। কোথাও কোথাও তারা ক্লাসের ডেস্ক, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি দিয়ে 'ব্যারিকেড' বা আত্মরক্ষার পাঁচিল তৈরি করে তার পেছন থেকে শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লাগল। কুয়োমিনতাং-এর গুণ্ডারা বেয়নেট বা কিরিচ এবং হাত-বোমা ব্যবহার করল, এমন কি হাত-বোমায় জখম একটি মেয়ের গায়ে কিরিচ বসিয়ে তাকে হত্যা করল। যারা জখম হয়েছে তাদের সাহায্যের জন্যে এসেছে এমন প্রাথমিক চিকিৎসার দলও এই গুণ্ডাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। কুনমিং-এর ছাত্ররা কিন্তু এতে দমল না, তাদের মৃত কমরেডদের পাশে দাঁড়িয়ে শপথ নিল লড়াই চালিয়ে যাবে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তারা একমাস ধরে স্ট্রাইক ও প্রবল প্রচার আন্দোলন চালাল। রক্তাক্ত ১লা ডিসেম্বরের ডাক অনেক দূর অবধি পৌঁছল। ক্রমশ বেশি বেশি লোক তিনটে দাবির পেছনে জড়ো হতে লাগল : এক, গণতান্ত্রিক সরকার চাই ; দুই, গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর ; তিন, চীনের ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ বন্ধ হোক।

গুণ্ডামিতে হেরে গিয়ে কুয়োমিনতাং ভণ্ডামির আশ্রয় নিল। চিয়াং দেখল গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার মতো প্রস্তুতি তখনও সারা হয়নি। বলল আমরা জনসাধারণের দাবিগুলো মেনে নিচ্ছি এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আর যুদ্ধ হবে না কারণ চুক্তি করছি গৃহযুদ্ধ বন্ধের। তারিখটা ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৬। সেদিনই আরেক ভড়ং শুরু হল চিয়াং-এর রাজধানী চুংকিং-এ। রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভার বৈঠক বসল। সে সভায় প্ল্যান মতোই দেশদ্রোহী-দের সংখ্যা বেশি ছিল। কমিউনিস্টদের চাপে অর্থাৎ জনতার দাবির চাপে কতকগুলো ভালো ভালো প্রস্তাব এই সভা পাশ করল। যেমন, চীনের

সৈন্যবাহিনীগুলো এবং সরকারকে নতুন করে সংগঠিত করা এবং সংবিধানের খসড়া করার জন্যে একটা জাতীয় পরিষদ ডাকার কথা বলা হল। কিন্তু সেগুলোকে কাজে খাটানোর কোনও ইচ্ছা চিয়াং-এর ছিল না। ছিল না বলেই চিয়াং তার সঙ্গে আরও কতকগুলো গালভরা প্রতিজ্ঞা জুড়ে দিল, যেমন—নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি দিচ্ছি, সব দল এবং গ্রুপকে আইনের দিক থেকে স্বীকার করে নেব, সকলকে ভোটের অধিকার দেব, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেব। ছল, চাতুরী, বজ্জাতিতে চিয়াং-এর জুড়ি নেই। এই শয়তান এক দিকে গৃহযুদ্ধ থামানোর হুকুমনামা জারী করল আরেক দিকে আমেরিকান শয়তানদের সাহায্য নিয়ে গৃহযুদ্ধের জন্যে বাছা বাছা এলাকায় বেশ বড়ো বড়ো সৈন্যদল পাঠাতে লাগল। তাদের প্রধান লক্ষ্য হল উত্তর-পূব চীনের মুক্তি ফৌজ। চিয়াং ঐ এলাকায় যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি চালু করতে আপত্তি করল—কারণ মুক্তি ফৌজকে ঘায়েল করতে হবে। পরে, মার্চ মাসের শেষের দিকে, ঐ অঞ্চলেও যুদ্ধ থামাতে রাজী হল। চিয়াং যুদ্ধ বন্ধ করল, কিন্তু এমনি নোংরা যে আবার তিন দিন বাদেই নতুন করে যুদ্ধ বাধাল। চিয়াং-এর সঙ্গে কার তুলনা?

রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভায় শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রস্তাব পাশ করার ঠিক পরেই কুয়োমিনতাং চুংকিং এবং অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরে জনসাধারণের জমায়েৎ বন্ধ করে দিল। অথচ জমায়েৎগুলো ছিল উৎসব—রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভা সফল হয়েছে, ভালো প্রস্তাব পাস করেছে এই জন্যে আনন্দ-উৎসব। কুয়োমিনতাং নিজে কিন্তু সভা মিছিল শুরু করে দিল সোভিয়েৎ ও চীনের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে। আসলে চিয়াং-এর রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভা এবং আমেরিকানদের মধ্যস্থতার পেছনকার কু-মতলব হচ্ছে কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে সময় নেওয়া—সময় পেলে ভালো করে প্রস্তুত হওয়া যাবে।

আগে ছিল প্যাট্রিক হার্লি, এবার এল জর্জ মার্শাল। প্রতিরোধ যুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন প্রতিনিধি হার্লি কুয়োমিনতাং আর কমিউনিস্টদের মধ্যে "নিরপেক্ষ মধ্যস্থ" হওয়ার ভাণ করেছিল। সে ১৯৪৪-এর নভেম্বরে ইয়েনানে গিয়ে কথা দিয়ে এল যে মার্কিন সরকার চিয়াং-এর এক পার্টির একনায়কত্বের বদলে গণতান্ত্রিক যুক্ত সরকার গড়াকে সমর্থন করবে। কিন্তু খেলাটা ধরা পড়তে দেরি হল না। চিয়াং-এর মাধ্যমে প্রস্তাব

এল যে কমিউনিস্ট ফৌজগুলোকে হয় কুয়োমিনতাং-এর সামরিক কাউন্সিলের অধীনে রাখতে হবে অথবা তিন জনের এক কমিটির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এই তিন জন হচ্ছে কুয়োমিনতাং এবং কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন প্রতিনিধি আর তাদের মাথার ওপরে থাকবে একজন মার্কিন প্রতিনিধি। কেমন মামাবাড়ির আবদার বলুন তো। কমিউনিস্ট পার্টি যেই এ প্রস্তাব বাতিল করল অমনি হার্লিব দাঁত নখ বেরিয়ে পড়ল। সে ক্ষেপে গিয়ে বলল আমেরিকা শুধু চিয়াংকেই সমর্থন কববে, কমিউনিস্টদেব নয়। চীনেব জনগণ এ ধমকানিকে থোডাই কেয়ার করে। কমিউনিস্ট পার্টিব নেতৃত্বে তারা শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ সফল ভাবে চালিয়ে গেল। ১৯৪৬-এব ১০ই জানুয়ারী গৃহযুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হওয়ার পর মার্কিন সবকারও প্রথমে তাকে সমর্থন জানাল। এদিকে ১৯৪৫-এব ডিসেম্ববে হার্লিব বদলে জর্জ মার্শালকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিশেষ প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়েছে। সে নাকি কুয়োমিনতাং এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে আলোচনায় "মধ্যস্থ" হবে। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু "মধ্যস্থতার" আডালে চিযাং-এর যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে তাড়াতাডি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়াবীতে মার্কিন সবকাব কুয়োমিনতাংকে এক নির্দেশ পাঠিয়ে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, চীনেব কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বেশি করে উস্কে দিল। কুয়োমিনতাংকে যে সামরিক সাহায্য দেওয়া হত তার পবিমাণও বেড়ে গেল। চীনে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক অ্যালবার্ট ওয়েডমেয়াবকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন সে কুয়োমিনতাং ফৌজকে উত্তর-পূর্ব চীনের বন্দরগুলোতে যেতে সাহায্য করে।

মার্চের শুরুতেই রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভার প্রস্তাবগুলো বাতিল কবার জন্যে চিয়াং চিৎকার করতে শুরু করল। তাবপব ১৯৪৬-এর জুলাইতে চিয়াং খোলাখুলি যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। ইয়াংসি নদীর উত্তরে আনহোয়েই এবং কিয়াংসু প্রদেশের যে অংশ পড়ে সেই অংশে জনগণেব মুক্তি ফৌজের ইউনিটগুলোর বিরুদ্ধে বড়ো রকমের আক্রমণ চালাতে কুয়োমিনতাং বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হল। গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা এবং শান্তি রক্ষার সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে জনসাধারণ এবারে ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে তৃতীয় গৃহযুদ্ধ বা জনগণের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অবস্থা চমৎকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া স্তালিনের নেতৃত্বে দারুণ জেতা জিতেছে। জার্মানি, ইতালি আর জাপান—এই তিন ফ্যাসিস্ত শক্তি হেরে ভূত হয়েছে। আমেরিকা খুব লাফালাফি করলেও সে আজ একা পড়ে গেছে। পূব ইউরোপেও জনগণতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। ঔপনিবেশিক দেশগুলোর মুক্তিযুদ্ধ প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই বলছিলাম, চীন বিপ্লবের পক্ষে আবহাওয়া চমৎকার।

দেশের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলোর বিরাট পরিবর্তন এসেছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ হটে যাওয়ায় চীন ও জাপানের মধ্যে দ্বন্দ্বের বদলে ব্যাপক জনগণ বনাম বড়ো জমিদার শ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এখন প্রবল হয়ে উঠেছে। জনগণের প্রতিনিধি হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। আর বড়ো জমিদার ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি হল কুয়োমিনতাং। কুয়োমিনতাং ছিল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল। চীনের সামনে এখন সোজাসুজি প্রশ্নটা দাঁড়াল, চীন কোন পথে এগোবে? শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নয়াগণতন্ত্রের পথে না চিয়াংকে সামনে রেখে বড় জমিদার এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার নেতৃত্বে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক পথে? জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় আগেকার প্রধান দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র বনাম ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে অপ্রধান হয়ে গিয়েছিল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ আক্রমণের ফলে জাপান বনাম চীনের দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠেছিল। এখন আবার অবস্থা পাল্টে গেল। এখন সাম্রাজ্যবাদ পর্দার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়তে শুরু করল। দেশের ভেতরকার শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলো প্রধান হয়ে উঠল। তাই ১৯৪৬-এর ৪ঠা মে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জমি সম্বন্ধে নতুন নীতি ঘোষণা করল। খাজনা কমানো আর মহাজনী সুদ কমানোর নীতি আর নয়, এখন জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং চাষীদের মধ্যে সেই জমি বিলি করার নীতি চালু করতে হবে। ১৯৪৭-এর অক্টোবরে পার্টি কৃষি আইনের মূলনীতি প্রচার করল। তাতে এই কথা পরিষ্কার ভাবে বলা হল যে সামন্ত এবং আধা-সামন্ত ভূমিব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং জমি পাবে চাষী এবং জনগণের মধ্যে জমি সমানভাবে বিলি করে দিতে হবে। নীতিটা হল "লাঙল যার

জমি তার"। ভূমিব্যবস্থার এই সংস্কার করবে কে? বাবুদের ওপর ভার দিলে কি যে হবে তা-তো জানাই আছে। তাই বলা হল ভূমিব্যবস্থার সংস্কারকে সম্পূর্ণ সফল করতে হলে সে কাজের ভার দিতে হবে চাষীদের গণকংগ্রেসকে, গরীব চাষী বাহিনীকে এবং তার যে গরীব চাষী আর ক্ষেতমজুর নিয়ে ভূমিসংস্কারের কমিটি আছে তাকে। মাও ৎসে-তুং-এর নীতি ছিল কৃষিসংস্কারকে সফল করার জন্যে গরীব কৃষকের ওপর নির্ভর করা, মধ্য কৃষকদের সঙ্গে ঐক্য গড়া এবং ধাপে ধাপে সামন্ত শোষণকে ধ্বংস করা। মধ্য কৃষকরা ছিল গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ। তাই মাও ৎসে-তুং বলেছিলেন যে গরীব কৃষক আর ক্ষেতমজুরদের অবশ্যই মধ্য কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় যুক্তফ্রণ্ট গড়তে হবে। এটা করতে না পারলে গরীব কৃষক আর ক্ষেতমজুররা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আর ভূমিসংস্কার ব্যর্থ হবে। মাও ৎসে-তুং-এর এই সঠিক লাইনের বিরুদ্ধে লিউ শাও-চি একটা অতি 'বাম' লাইন প্রচার করতে শুরু করল। সে বলল, "জনগণের নির্দেশ মেনে চল!" এমনিতে কথাটা শুনতে ভাল—এত বড় জনগণের ভক্ত আর কটা মেলে! আসলে তার মাথায় রয়েছে জনগণের বারোটা বাজানোর প্ল্যান। লিউ বলল, জনগণ যদি মধ্য কৃষকের জমি বিলি করতে চায় তবে করুক, না চায় তো না করুক। সে মধ্য কৃষককে জমিদার এবং ধনী কৃষকের সঙ্গে এক করে দেখাল। তারা সবাই নাকি ভূমিসংস্কারের বিরোধী। এই ভাবে সে বিপ্লবের শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলল। অথচ মাও ৎসে-তুং-এর লাইন হল ভূমিসংস্কারকে সফল করার জন্যে গ্রামাঞ্চলে শতকরা নব্বুই ভাগ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। মাও ৎসে-তুং-এর লাইনেরই জয় হল, লিউ শাও-চি কলকে পেল না।

কৃষি আইনের সময় থেকেই ভূমিসংস্কার এগিয়ে চলছিল। ঐ আইন ঘোষণা করার এক বছরের মধ্যেই দশ কোটি কৃষক মুক্ত এলাকায় তাদের জমি দখল করে নিল। এই বিরাট ভূমিসংস্কার আন্দোলন মুক্ত এলাকার গ্রামাঞ্চলে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে সম্পূর্ণ বদলে দিল। বিশাল এলাকা জুড়ে যুগ-যুগান্তের সামন্ত মালিকানা উৎখাত হয়ে গেল এবং চাষীরা নিজেদের জমিতে চাষ করতে আরম্ভ করল। জমিদারী অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে চাষীরা দারুণ উৎসাহ নিয়ে মুক্তি যুদ্ধে সামিল হল। এই কৃষক জাগরণের ফলে মুক্তি ফৌজ যেখানেই লড়াই করে সেখানেই তার

পেছনের এলাকা সব সময় নিরাপদ থাকে। যে কোনও যুদ্ধে একটা সৈন্যবাহিনীর পেছন থেকে আক্রমণের ভয় থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে পেছনে শত্রুর বদলে হাজার হাজার মিত্র—সংগঠিত মুক্ত চাষীদের এলাকা।

লিউ শাও-চির লাইন ধরলেই হয়েছিল আর কি। শান্তির স্বপ্নে তাব নেশা ধরেছে। অথচ চিয়াং তখন জনগণের রক্ত জল-করা যুদ্ধ জয়ের ফলগুলো নিজের কোলে টানবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় জাপানকে লড়ার জন্যে যে অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে চিয়াং-এর কাছে এসেছিল তা সে জমিয়ে রেখেছে। আখেরি লড়াইয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সেগুলো লাগবে তো! জনগণ শান্তি চায়, অথচ গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় রয়েছে। আগেই দেখেছি মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি কেমন ধৈর্য ধরে চুংকিং-এ কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে জনগণের মূল স্বার্থকে কমিউনিস্টরা বিসর্জন দিয়ে আলোচনা চালায়নি। যখন আমেরিক কমিউনিস্ট পার্টি আব কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে আলোচনায় "নিরপেক্ষ মধ্যস্থতা"র ভাণ করল তখন লিউ শাও-চিব আনন্দ আর ধরে না। সে বলল চীনে আমেরিকান ধাঁচে গণতন্ত্র গড়ে উঠবে। আমেরিকা চিয়াংকে যে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছিল লিউ বলল সেগুলো নাকি চীনের উন্নতির জন্যে দেওয়া হচ্ছে। এব উদ্দেশ্য যে চিয়াংকে দিয়ে মুক্ত এলাকা এবং গণমুক্তি ফৌজকে ধ্বংস করা শয়তান তার উল্লেখ পর্যন্ত করল না। মাও কিন্তু প্রথম থেকেই জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মার্কিন "মধ্যস্থতা" এবং সাহায্যের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহযুদ্ধের জন্য চিয়াংকে প্রস্তুত করা এবং চীনকে মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করা। মাও ৎসে-তুং-এর নীতি ছিল, "ইঁটের বদলে পাটকেল"। অবস্থা অনুযায়ী কখনও কখনও আলোচনায় না যাওটাই হল সঠিক আবার কখনও যাওটাই ঠিক। দুটোই শত্রুর শয়তানীর বিরুদ্ধে যায়—ইঁটের বদলে পাটকেল। কমিউনিস্ট পার্টি আগে কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে আলোচনায় বসেনি, ঠিকই করেছিল। তাতে শত্রুরই অসুবিধে হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি এখন আলোচনায় বসছে। তাতেও শত্রুর অসুবিধে। কারণ কুয়োমিনতাং প্রচার করছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি ও ঐক্য চায় না। এবার একথা আর লোকে

শুনবে না। কিন্তু চিয়াং-এর সঙ্গে চুক্তি করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন? প্রায় দু'দশক ধরে চীনের মানুষ চিয়াংকে চিনেছে। মাও ৎসে-তুং-এর নীতি ছিল আপোস আলোচনা চলতে থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণকে মতাদর্শ এবং সামরিক দিক থেকে প্রস্তুত করে যাওয়ার কাজ বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। লিউ শাও-চি একেবারে উল্টো কথা বলল। সে বলল, চীন এখন শান্তি এবং গণতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করেছে। লিউ বলল, "বর্তমানে শান্তিপূর্ণ এবং সংসদীয় সংগ্রাম চীনের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রধান রূপ হয়ে উঠেছে" ("পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট", ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৪৬)। এসব কথা সে সেই সময় বলল যখন চিয়াং কমিউনিস্ট পার্টিকে "বেআইনী" করে রেখেছে। আর চিয়াং বলত যে "রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভা"য় কমিউনিস্ট পার্টি শুধু একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে যোগ দিতে পারে। লিউ চিয়াং-এর ঝুটা গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থা জাগাতে চেষ্টা করল। সে বেহায়ার মতো বলল, আমরা অর্থাৎ কমিউনিস্টরা "নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবো এবং জনগণকে আমাদের পক্ষে ভোট দেওয়াতে পারবো" (ঐ একই বই থেকে)। সে জনগণকে লোভ দেখাল যে এখন কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং-এর কুয়োমিনতাং সরকারে যোগ দিতে পারে এবং মন্ত্রী হতে পারে। লিউ নির্লজ্জের মতো বলে ফেলল, "আমরা এখন সরকারী দলগুলোর মধ্যে একটি (অর্থাৎ কুয়োমিনতাং সরকারের দলগুলোর একটি), আমরা এখন আর বিরোধী পক্ষে নেই, বরং আমরা ক্ষমতায় রয়েছি, এবং আমাদের মধ্যে কিছু লোক সরকারী আমলা হবে।" (ঐ) চিয়াং-সরকারের আমলা হবার জন্যে তার জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। মাও কিন্তু ১৯৪৫-এর আগস্টেই বলেছিলেন, "হাত পা বাঁধা আমলা হওয়া সহজ কাজ নয়, আমরা তা হব না।' আমরা যদি সরকারী কর্মচারী হই তবে আমাদের হাত পা খোলা রাখতে হবে, আমাদের কাজ করার স্বাধীনতা রাখতে হবে, অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটা যুক্ত সরকার গড়ে তুলতে হবে।"

লিউ শাও-চির আত্মসমর্পণের নীতি সবচেয়ে নগ্ন হয়ে পড়ল গণমুক্তি ফৌজের প্রশ্নে। তিরিশ বছর আগে এই শয়তান চিয়াং-এর আক্রমণের মুখে উহানের শ্রমিকদের নিরস্ত্র করে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। এবারও সে বলল, চিয়াং-এর হাতে কমিউনিস্টদের ফৌজগুলো এবং অস্ত্রশস্ত্র তুলে দাও এবং "জাতীয়

সৈন্যবাহিনী, জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং আত্মরক্ষা বাহিনীগুলোর ইউনিট হয়ে যাও।" সে আবদার করল, সেনাবাহিনীর মধ্যেকার পার্টি-সংগঠনগুলোকে বাতিল করা হোক। লিউ দাবি করল যে সশস্ত্র ফৌজগুলোর ওপর পার্টির সরাসরি নেতৃত্ব এবং পরিচালনা চলবে না। সেগুলোকে কুয়োমিনতাং সরকারের জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে কাজ করতে হবে (ঐ একই বই থেকে)। লিউ শাও-চি যখন এইভাবে একের পর এক চীন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে তখন ফ্রান্স ও ইতালির সংশোধনবাদী নেতা থোরে আর তোগ্‌লিয়াত্তিও জনগণের রক্ত দিয়ে কেনা জয়ের ফলগুলোকে নষ্ট করে দিল। তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে নোংরা চুক্তি করল। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উপ-প্রধান-মন্ত্রী পদ ও অন্যান্য সরকারী পদের লোভে হাজার হাজার অস্ত্রশস্ত্র বুর্জোয়া-শ্রেণীর হাতে ফিরিয়ে দিল। অথচ এগুলোই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির গ্যারান্টি। দেশে দেশে সংশোধনবাদের এমনি চেহারা। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মাও ৎসে-তুং কিন্তু বলেছিলেন, "জনগণের অস্ত্র, প্রতিটি বন্দুক আর প্রতিটি বুলেট অবশ্যই রেখে দিতে হবে, কিছুতেই দিয়ে দেওয়া চলবে না।" বললেন, "জনগণ যে অধিকারগুলো জয় করেছে সেগুলোকে কখনই হেলায় হারানো চলবে না, সেগুলোকে লড়াই করে রক্ষা করতে হবে। "যদি তারা (কুয়োমিনতাং) লড়াই করে, আমরা তাদের সম্পূর্ণ সাফ করে দেব।" লিউ শাও-চি মার্কা দেশ-বিদেশের সব রংয়ের আত্মসমর্পণের লাইনের বিরুদ্ধে মাও ৎসে-তুং এই ভাবে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

মাও ৎসে-তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, মুক্তি ফৌজ আর জনগণ শক্ত হাতে বন্দুক ধরল, সমস্ত বাধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে চরম জয়ের দিকে জোর কদমে এগিয়ে চলল।

॥ মহামুক্তি ॥

সবে গৃহযুদ্ধ শুরু। চিয়াং তার তেতাল্লিশ লক্ষ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে অহংকার করে বলেছিল, পাঁচ মাসের মধ্যেই মিলিটারি দিয়ে কমিউনিস্ট-দের শায়েস্তা করবে। তার হাতে তখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। তার দখলে রয়েছে সব বড়ো শহর আর বেশির ভাগ রেলপথ। যে এলাকা কুয়োমিনতাং-এর দখলে সেখানে বাস করে তিরিশ কোটি মানুষ।

তার ওপর দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা তার পেছনে। কিন্তু গণমুক্তি ফৌজের মাত্র বারো লক্ষ সৈন্য। তাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই। মুক্ত এলাকার মানুষের সংখ্যাও মাত্র তের কোটি। তাই চিয়াং ভাবছে তার জয় ঠেকায় কে! কিন্তু মুক্তি ফৌজ ঘাবড়াবার পাত্র নয়। তারা জয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তাদের শক্তির মূলে রয়েছে মাও ৎসে-তুং-এর রাজনীতি আর জনগণের সঙ্গে নাড়ীর যোগ।

মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বলল, কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাস্ত করা জনগণের শুধু কর্তব্যই নয়, তাদের পক্ষে তা করা সম্ভবও। চিয়াং স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছে। সে সামরিক দিক থেকে বেশি জোরদার হলেও এবং মার্কিন সাহায্য পেলেও তাতে তার শুধু সাময়িক সুবিধে হবে। যুদ্ধটা ন্যায় যুদ্ধ না অন্যায় যুদ্ধ আর যুদ্ধের প্রতি ব্যাপক জনগণের সমর্থন রয়েছে কি নেই তার ওপরই স্থায়ী ফলাফল নির্ভর করে। এদিক থেকে দেখলে গণমুক্তি ফৌজের দারুণ সুবিধে কারণ সে লড়ছে ন্যায় যুদ্ধ। তার পেছনে রয়েছে ব্যাপক জনগণের বিপুল সমর্থন। কুয়োমিনতাং শাসনের আওতায় আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ শুধু শ্রমিক-কৃষক আর পেতি বুর্জোয়া শ্রেণীকেই শোষণ করছে না, মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থেও আঘাত দিচ্ছে। সেই জন্যে কুয়োমিনতাং-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক, কৃষক এবং পেতিবুর্জোয়া ছাড়া মধ্য বুর্জোয়ারাও যোগ দিতে পারে অথবা নিরপেক্ষ থাকতে পারে।

১৯৪৬-এর নভেম্বরে কুয়োমিনতাং সরকার যা করল তাতে জনসাধারণের ক্ষোভ বেড়ে গেল। সরকার আমেরিকার সঙ্গে এক চুক্তি করল। এর ফলে আমেরিকানরা চীনে বাস করবার এবং সব রকমের ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকার পেল। তাছাড়া চুক্তি ছাড়াই চিয়াং সরকার নানাভাবে আর্থিক, রাজনৈতিক, মিলিটারি ইত্যাদি ব্যাপারে গোপনে আমেরিকার কাছে চীনকে বিকিয়ে দিয়ে গৃহযুদ্ধে আমেরিকান সাহায্য আরও বেশি করে যোগাড় করতে লাগল।

চারটি বড়ো মুৎসুদ্দি পরিবার বেশ কিছুদিন ধরে অর্থাৎ কুয়োমিনতাং ক্ষমতায় আসার পর থেকে চীনের ধনদৌলতের অনেকখানি কব্জা করেছিল, সরকারও তাদের মুঠোর মধ্যে ছিল, অবশ্য তারা সবাই

মিলে আবার আমেরিকার মুঠোর মধ্যে ছিল। আমরা দেখেছি যে মাও ৎসে-তুং আগে বলেছিলেন নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব। দীর্ঘ শাসনের মধ্যে দিয়ে এই চার পরিবারের একচেটিয়া আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি জোট নতুন অবস্থা সৃষ্টি করল। মাও ৎসে-তুং ১৯৪৮-এর ১লা এপ্রিল শান্‌সি-সুইইউয়ান মুক্ত এলাকায় পার্টি-কর্মীদের এক সভায় বিপ্লবের শত্রুদের তালিকায় সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকেও জুড়ে দিলেন। চারটি রাঘব বোয়াল পরিবারের কর্তারা হল চিয়াং কাই-শেক, তি. ভি. সং, এইচ. এইচ. কুং এবং চেন কুয়ো-ফু ও চেন লি-ফু—দুই ভাই। এদের হাতে বড়ো বড়ো চারটে ব্যাঙ্ক, সরকারী ট্রেজারি এবং গোটা দেশের তুলো, চাল এবং আরও কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের একচেটিয়া কারবার। এই চারটি বড়ো ব্যাঙ্ক চীনের শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষির ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ খাটাতো। এই চারটি পরিবারই ছিল দেশে সবচাইতে বড়ো জমিদার আর সুদখোর। তারা নির্দয়ভাবে কৃষকদের শোষণ করত। শিল্পে এদের একচেটিয়া অধিকার জাতীয় শিল্প এবং বাণিজ্যের সর্বনাশ করল। আমরা চীনের ইতিহাসের যে সময়টায় এখন এসে পৌঁছেছি তখন বিদেশীদের মধ্যে আমেরিকানরাই সবচেয়ে প্রবল। তাদের ইচ্ছা একাই চীনকে গ্রাস করে। চার পরিবারের শিল্প-বাণিজ্য আমেরিকানদের ওপর নির্ভর করেই চলে। শুধু সেখান থেকে মুনাফা লুটে আমেরিকা খুশি হল না, নিজেরাই চীনে ফ্যাক্টরি খুলে বসল। চীনের বাজারকে তারা এই সব ফ্যাক্টরিতে তৈরি মালপত্রে ছেয়ে ফেলল। ফলে ঐ ধরনের জিনিস যেসব চীনে কারখানায় তৈরি হত সেগুলো দেউলে হয়ে গেল। এইভাবে জাতীয় শিল্পগুলোর সর্বনাশ হওয়ায় জাতীয় বুর্জোয়াদের দারুণ ক্ষতি হল। তাজ্জব ব্যাপার—বিরাট কৃষির দেশ চীনে আমেরিকা জাহাজে করে প্রচুর তুলো, কমলালেবু আর চীনাবাদাম পাঠাতে লাগল। তাতে চীনের মানুষের দারুণ লোকসান হল। "আমেরিকায় তৈরি" এই ছাপ বুকে নিয়ে আমেরিকার জিনিস চীনের অজ পাড়াগাঁ অবধি ছড়িয়ে পড়ল। কুয়োমিনতাং সরকারের সব গুরুত্বপূর্ণ নীতিও "আমেরিকায় তৈরি"। তাই আমেরিকার যারা সঠিক প্রতিনিধি সেই সাধারণ ইয়াংকি সৈনিকরা দেশময় বুক ফুলিয়ে আর বুট খটখটিয়ে

ঘুরে বেড়াত, তাদের হাতে চীনেদের লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। চীনেদের হত্যা করলেও তাদের শাস্তি হত না। তাদের বেলায় শুধু সাত খুন মাপ নয়—লক্ষ লক্ষ খুন মাপ।

বিদেশী আমেরিকান আর স্বদেশী চার পরিবার দেশটাকে শুষে শুষে প্রায় আখের ছিবড়ের মতো করে ফেলল। চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট। চিয়াং সরকার ক্ষ্যাপার মতো নোট ছাপিয়েই চলল। জিনিসের দাম যে কি পরিমাণ বেড়েছিল তা কল্পনাই করা যায় না। যুদ্ধের আগের তুলনায় ১৯৪৮এ শাংহাইয়ে দাম বেড়েছিল তিরিশ লক্ষ গুণ। ছাপার ভুল নয়, এটাই সত্যি। ঝুড়ি ভর্তি টাকা না নিয়ে গেলে বাজারে কিছুই কেনা যেত না। বেকার শ্রমিক ফ্যাক্টরির বন্ধ দরজায় মাথা ঠোকে, শূন্য মাঠের দিকে চাষী জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। ট্যাক্সের বোঝায় পিঠ বেঁকে তো গেছেই এখন ভেঙ্গে পড়বার জো। আর দেশজোড়া দুর্নীতি—দুর্নীতির কারবারেই সবচেয়ে বেশি মুনাফা। চীনের ধানের গোলা বলে পরিচিত এলাকা উসি, উহু এবং চেংতু। সেখানে মানুষ না খেতে পেয়ে পেয়ে গোলাঘর আর চালের দোকান আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। তাদের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে।

গৃহযুদ্ধে সাময়িকভাবে কিছু জয় হওয়াতে কুয়োমিনতাং-এর দেমাক বেড়েছে, মাথা ঘুরে গেছে। ভাবল—এবারে সেই ভাঁওতায় ভরা সংবিধানটা পাশ করিয়ে নেওয়া যাক। কারণ তা হলে কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক যুক্ত সরকার গঠনের প্রস্তাবটাকে বানচাল করা যাবে আর গৃহযুদ্ধের স্বেচ্ছাচারী নীতিকে আইনসঙ্গত বলে চালানো যাবে। ১৯৪৬-এর নভেম্বরে নানকিং-এ সংবিধান পাশ করাবার জন্যে কুয়োমিনতাং জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো আর অদলীয় গণতান্ত্রিক সদস্যেরা ঐ আইন সভা বয়কট করল। ভাওতাবাজীর দলিল সেই সংবিধান নামকে শুয়াস্তে জাতীয় পরিষদ পাশ করল। সেটা নাকি চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল! অথচ সংবিধানটি সাধারণ গণতান্ত্রিক রীতি-গুলোকেও আমল দেয়নি—এমনি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান! এই অপূর্ব সংবিধান প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিল, আঞ্চলিক স্বাধীনতা বাতিল করল, আরও বাতিল করল সংখ্যালঘু জাতিগুলোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার। প্রজাসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোও কেড়ে নেওয়া

হল। এই মেকি সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো কঠোর সমালোচনা করল, বিক্ষোভের আয়োজন করল প্রচুর। ১৯৪৮-এর মার্চে আবার চিয়াং-এর পুতুলদের জাতীয় আইন সভা বসে। চিয়াংকে রাষ্ট্রপতি, আরেকজন আমেরিকান দালালকে উপ-রাষ্ট্রপতি "নির্বাচন" করল। গণতন্ত্রের এই খেলা দেখে জনসাধারণের মন ঘেন্নায় ভরে গেল। চিয়াং-এর চাকরেরা একঘরে হল।

সমাজের একটা বিশেষ অংশে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে একটা শক্তি মাথা উচু করল—ক্ষুদে ও মাঝারি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা। গৃহযুদ্ধের গোড়ার দিকে এই ভদ্রলোকেরা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাতে বিশ্বাস করতেন না, 'যুক্তফ্রন্ট' নীতিও এঁদের মনে সাড়া জাগাত না। কমিউনিস্ট পার্টিকে এঁরা উড়নচণ্ডী মনে করতেন। এঁদের ভাবতে বেশ ভাল লাগত যে "জাতীয়তাবাদী" কুয়োমিনতাং এবং "গণতন্ত্রের দেশে"র আমেরিকানরা চীনের একটা হিল্লে করে দেবে। এই ভদ্রলোকদের বড়ো আশা ছিল যে বিপ্লব আর পাল্টা বিপ্লবের মাঝখান দিয়ে দেশ কেটে বেরিয়ে যাবে—একটা "তৃতীয় পথ" পাওয়া যাবেই যাবে। জোড়াতালি দিয়ে লজ্ঝড় একটা সমাজকে আবার দাঁড় করানো যাবে—এই দুর্বল মনের স্বপ্ন থেকেই তৃতীয় পথের জন্ম। সে যাই হোক, এই ক্ষুদে ও মাঝারি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা দেখল যে গৃহযুদ্ধের চাপে চিয়াং-সরকার স্বেচ্ছাচারী জুলুমবাজ হয়ে উঠল—গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর আইনসঙ্গত ক্ষমতা কেড়ে নিল। তৃতীয় পথের স্বপ্ন একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল যখন ১৯৪৭-এর অক্টোবরে চীন গণতান্ত্রিক লীগকে কুয়োমিনতাং সরকার ভেঙ্গে দিল। কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে এই "মাঝ পথের যাত্রীরা" নতুন করে সংগঠিত হলেন। ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে হংকং-এ কুয়োমিনতাং-এর কতকগুলো গণতান্ত্রিক গ্রুপ "কুয়োমিনতাং-এর বিপ্লবী কমিটি"র মধ্যে সামিল হল। চীন গণতান্ত্রিক লীগ তার নেতৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠা করল। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর জুলুমবাজ কুয়োমিনতাংকে রুখবার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাতে চান। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল তাদের আদর্শ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরল।

১৯৪৮-এর ১লা মে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার মে দিবসের স্লোগানের মারফৎ দাবি করল : একটি গণতান্ত্রিক যুক্ত সরকার গঠনের

জন্যে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে বিপ্লব-বিরোধী দলগুলোকে বাদ দিয়ে একটি নতুন জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভা ডাকা হোক। এই দাবি তৎক্ষণাৎ গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো এবং অদলীয় গণতান্ত্রিক লোকেরা সমর্থন করেন। বোঝা গেল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের-গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত অবস্থা এখন হয়েছে। ঐ মাসেই শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্যান্য নাগরিকেরা দেশের সর্বত্র আমেরিকান ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তাদের অভিযোগ—আমেরিকা জাপানের হানাদার-দের চীনের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। এই স্বদেশপ্রেমিকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় এমন একটি দিনও যায়নি যেদিন কোথাও না কোথাও জনতাকে রক্ত দিতে হয়নি।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে যেমন জমির সামন্ত মালিকানাকে কৃষকের মালিকানায় পরিণত করছিল, তেমনি শহরে তার নীতি হল আমলা-তান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা। অর্থাৎ চারটি রাঘব বোয়াল পরিবারের মুৎসুদ্দি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প এবং বাণিজ্য পার্টি রক্ষা করবে। বিপ্লবের শত্রুর সংখ্যা কমানোর জন্যে পার্টি ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে গরীব কৃষক আর ক্ষেতমজুরের ওপর নির্ভর করলেও, মধ্য কৃষকদের সঙ্গে ঐক্য গড়ল এবং একদিকে সাধারণ ধনী কৃষক আর মধ্য ও ছোটো জমিদার এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যকারী বদবাবু আর স্থানীয় উৎপীড়ক-দের মধ্যে পার্থক্য টানল। শহরে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্ভর করলেও ব্যাপক পেতিবুর্জোয়া জনগণের সঙ্গে ঐক্য গড়ল আর মধ্যপন্থী-দের সঙ্গে নিতে চেষ্টা করল। এসবের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিক্রিয়াশীলদের একঘরে করা। অন্যদিকে কুয়োমিনতাং-এর একমাত্র ভরসা ছিল মার্কিন সাহায্য। এটাই ছিল তাদের দুর্বলতার সবচাইতে বড় প্রমাণ।

দেশের ভেতরে-বাইরে তখনকার অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটা ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার খুবই সম্ভাবনা দেখা গেল। আর বিপ্লবে জেতার জন্যেও সেটার খুবই দরকার ছিল। শত্রুর মূল দুর্বলতাই ছিল তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি। কোনও শক্তি, সে যত জোরদারই হোক না কেন, যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় এবং জনগণের শত্রুতা করে তবে তার পতন ঠেকায় কার সাধ্য?

গৃহযুদ্ধের শুরুতে শত্রুর সামরিক শক্তি ছিল বেশি। তাই তখন মুক্তি ফৌজের যুদ্ধকৌশল হল আত্মরক্ষার কৌশল। ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৪৭-এর জুলাই পর্যন্ত গণমুক্তি ফৌজ অনেক শহর এমন কি ইয়েনান থেকেও সরে এল। মাও ৎসে তুং-এর রণনীতির প্রধান লক্ষ্য হল শত্রুর লোকবলকে। নির্মূল করা, কোনও বিশেষ শহর বা এলাকা রক্ষা করা নয়। শত্রুকে নির্মূল করার জন্যে তার বাহিনীর একটা দুর্বল অংশকে বেছে নিয়ে তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি সৈন্য জড়ো করে সময় বুঝে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী যুদ্ধের প্রথম দিকে গণমুক্তি ফৌজ প্রতি মাসে গড়ে প্রায় আট ব্রিগেড কুয়োমিনতাং সৈন্য খতম করতে লাগল, শত্রুর কাছ থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিল, এবং যুদ্ধবন্দীদের নতুন করে শিক্ষা দিয়ে নিজেদের পক্ষে টেনে আনল। এইভাবে গণমুক্তি ফৌজের শক্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল, আর কুয়োমিনতাং বাহিনী বেশি বেশি করে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। আট মাস ধরে যুদ্ধ চলার পর দেখা গেল যে চিয়াং-এর সৈন্যদের দারুণ ক্ষতি হয়েছে। তাই ১৯৪৭-এর মার্চ থেকে কুয়োমিনতাংকে মুক্ত এলাকার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করার কৌশল বদলাতে হল। এখন তার শক্তিকে জমাট করে কতকগুলো মোক্ষম জায়গায় লালদের আক্রমণ করতে হবে। তাই শানতুং এবং উত্তর শেনসিকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করা হল। চিয়াং বিপ্লবীদের র[illegible]নীতি ও রণকৌশল বুঝবার এবং তার পাল্টা ব্যবস্থা নেবার কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু জনযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল কোনও প্রতিবিপ্লবী বাহিনী কাজে লাগাতে পারে না। সেগুলো গণমুক্তি ফৌজের মতো বিপ্লবী বাহিনীরই একচেটিয়া জিনিস। শানতুং ও উত্তর শেন্‌সির বিরুদ্ধে চিয়াংএর আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। কুয়োমিনতাং লড়ছিল জনগণের বিরুদ্ধে। তাছাড়া তাদের নিজেদের মধ্যেই ভাঙ্গন ধরেছিল। এই সময়কার আমেরিকান সরকারী মহলের রিপোর্ট বলছে যে কুয়োমিনতাং-এর সৈন্যরা বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাছাড়া তাদের মধ্যে ক্ষোভও খুব। কারণ তাদের অফিসাররা নানা রকমে নিজেদের পেট মোটা করছে আর সেপাই হতভাগারা মাত্র দু'চার টাকা মাইনে পাচ্ছে। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয় যে সেপাইরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভিনগাঁয়ে মারমুখো মানুষের মাঝখানে লড়তে তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না—এদিকে কমিউনিস্টরা লড়ছে নিজেদের দেশের মাটির

জন্যে। রিপোর্টে যা ছিল না তা হচ্ছে এই যে কমিউনিস্টরা গ্রামাঞ্চলে যে ভূমিসংস্কার করেছিল তাতে কুয়োমিনতাং ফৌজের পাথুরে মনেও ফাটল ধরেছিল। মুক্ত এলাকায় যেসব কুয়োমিনতাং সৈন্যের বাড়ি, তারা জানতে পারল যে জমিদারের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে জমি বিলি করার সময় কমিউনিস্টরা অন্য চাষীদের মতো তাদেরও জমি দিয়েছে। তাদের এবং তাদের পরিবারকে যারা জমি দিয়েছে সেই কমিউনিস্ট পার্টিকে কুয়োমিনতাং-এর সৈন্যরা "শত্রু" কি করে মনে করবে? সুতরাং আমেরিকা অনেক পরামর্শদাতা, ছ শ' কোটি ডলারের অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দিলেও এই কুয়োমিনতাং বাহিনীকে দিয়ে কি কমিউনিস্ট মারা যায়! মার্কিনীরা নিজেরাই স্বীকার করেছিল যে কুয়োমিনতাং বাহিনী আক্রমণকারী জাপানীদের মতোই বেকায়দায় পড়েছে আর গণফৌজ তার ইউনিটগুলোকে অটুট এবং সচল রেখেছে।

তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় বিপ্লবীরা চলমান যুদ্ধের রণনীতিকে লড়াই-এর প্রধান রূপ হিসেবে গ্রহণ করল। লিন পিয়াও বলেছেন, "তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগের মাঝামাঝি এবং বিশেষ করে শেষের দিকে আমাদের সামরিক কার্যকলাপ ব্যাপক আকারের চলমান যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল, বড়ো বড়ো শহরকে আক্রমণ করাও তার মধ্যে ছিল।" ১৯৪৭-এর জুলাই মাস নাগাদ গণমুক্তি ফৌজ আত্মরক্ষার লড়াইয়ের বদলে আক্রমণ চালাতে শুরু করল। আর চিয়াং এবার আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে বাধ্য হল। তখন সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুক্তি ফৌজ শহরগুলোকে গ্রাম দিয়ে ঘেরাও করার অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। রাজনৈতিক দিক থেকেও গ্রামে এবং শহরে কুয়োমিনতাংকে জনতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে কোণঠাসা করে ফেলা গেছে। জুলাই মাসেই গণমুক্তি ফৌজ পীত নদী পার হয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

এবারে আমরা এক মহানাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এসে পৌঁছেছি—মুক্তি ফৌজ শহর এলাকাগুলোর টুঁটি টিপে ধরবে। শুধু মুক্ত এলাকায় নয়, কুয়োমিনতাং এলাকাতেও এখন গণমুক্তি ফৌজ জোর লড়াই চালাল। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে মাও ৎসে-তুং উত্তর শেনসিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় বললেন যে এই ঘটনা শুধু গৃহযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে কুয়োমিনতাং-এর কুড়ি বছরের প্রতি-বিপ্লবী শাসনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় নি, চীনে

এক শ' বছরেরও বেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসনেরও মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল— বাড়তির যুগ থেকে ধ্বংসের দিকে। ইতিহাস মাও ৎসে-তুংকে নির্ভুল প্রমাণ করল।

এদিকে কুয়োমিনতাং এলাকার দেশপ্রেমিক জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন আগে থেকেই বেড়ে উঠছিল। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে দাবি উঠলো মার্কিন ফৌজকে চীন ছেড়ে যেতে হবে। দেখতে দেখতে তা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হল। ১৯৪৭-এর মে। শাংহাইতে ছাত্ররা গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে আন্দোলন দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছে গেল। গৃহযুদ্ধ, অনাহার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। তার ওপর প্রতিক্রিয়ার রক্তাক্ত অত্যাচার নেবে এল। কিন্তু আন্দোলন এগিয়ে চলল। ১৯৪৮-এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে শাংহাই-এর কাপড় কলের শ্রমিকদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে চিয়াং-এর তিন হাজার সৈন্য ও পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্রমিকেরা বীরের মতো হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে দুর্দান্ত লড়াই চালাল। মেয়ে শ্রমিকরাও ট্যাঙ্ক ও মেশিনগানের বিরুদ্ধে আশ্চর্য লড়াই করল। জনগণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে কুয়োমিনতাংকে আক্রমণ থামাতে হল। কুয়োমিনতাং এলাকায় কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। চাল নিয়ে নানা জায়গায় দাঙ্গা শুরু হল। কৃষকেরা খাজনা এবং ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করল। লক্ষ লক্ষ কৃষক অস্ত্র হাতে কুয়োমিনতাং ফৌজের মোকাবেলা করল।

এই যুগে তাইওয়ানের জনগণের সংগ্রাম বিশেষ করে মনে রাখার মতো। এই তাইওয়ান বা ফরমোজা দ্বীপ চীনের একটি প্রদেশ। এখানকার মানুষ পঞ্চাশ বছর ধরে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছিল। তাই যখন চীনে জাপানীরা হেরে গেল তখন তারা দারুণ আনন্দিত হল আর মাতৃভূমির সঙ্গে এতদিন বাদে যুক্ত হতে পেরে আনন্দ-উৎসব করল। কিন্তু জাপানী শোষকের বদলে চীনের চারটি মুৎসুদ্দি পরিবার তাড়াতাড়ি এসে সেখানে গদি দখল করে বসল। তাদের শোষণ-পীড়ন জাপানীদের চেয়ে কিছু কম নয়। তারা তাইওয়ানের শতকরা তিয়াত্তর ভাগেরও বেশি জমি দখল করল। ব্যাঙ্ক, রেল, বন্দর, কলকারখানা, খনি ইত্যাদি সব হাত করল। এরপর যা হবার তাই হল—শোষণ চলল,

অত্যাচার প্রবল হল। জাপানী দস্যুরা তাইওয়ানের স্বদেশপ্রেমিকদের তালিকা তৈরি করেছিল। চিয়াং-এর দল সেই তালিকা ধরে তাদের ওপর হামলা করতে লাগল। চিয়াং-এর প্রভু আমেরিকানরা তাইওয়ানে মিলিটারি ঘাঁটি গড়ে তুলতে শুরু করল। ভবিষ্যতে এখান থেকে গোটা এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ চালাবে এই হল উদ্দেশ্য। জনগণের বুঝতে দেরি হল না যে এক শয়তানের বদলে আরেক শয়তান তাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তারা স্বায়ত্তশাসন দাবি করল। এই দাবিতে ১৯৪৭-এব ২৮শে ফেব্রুয়ারী এক মস্ত আন্দোলন শুরু হল। কুয়োমিনতাং-এর তা সহ্য হবে কেন? বর্বর আক্রমণ করে চিয়াং দশ হাজার মানুষের প্রাণ নিল। শক্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে শেষ পর্যন্ত তাইওয়ানীদের আন্দোলন ব্যর্থ হল। কিন্তু কুয়োমিনতাং-এর ওপর তাদের ঘৃণা দারুণভাবে বেড়ে গেল।
ওদিকে গণমুক্তি ফৌজ এগিয়ে চলেছে। তারা ১৯৪৮-এর কাছাকাছি শহর আক্রমণের কৌশল বেশ রপ্ত করেছে। একের পর এক কুয়োমিনতাং-এর হাত থেকে শহর ছিনিয়ে নিচ্ছে।
১৯৪৮-এর এপ্রিল মাসে গড়ে পিটে বিপ্লবী তৈরি করবাব বিরাট কামারশালা ইয়েনানকে মুক্তি ফৌজ মুক্ত করল। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে উত্তর-পূব চীন পুরোপুরি মুক্ত হল। আমেবিকান মিলিটারি পরামর্শদাতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিপোর্ট দিল যে কোথাও কোথাও দলে দলে কুয়োমিনতাং সৈন্যরা দল ছেড়ে কমিউনিস্টদের দলে চলে যাচ্ছে আবার কোথাও যথেষ্ট আমেরিকান ট্রেনিং এবং অনেক সাজসরঞ্জাম সত্ত্বেও কুয়োমিনতাং ইউনিটগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। মাঞ্চুরিয়ার মুকদেন অঞ্চলের কয়েক হাজার কুয়োমিনতাং সৈন্যকে তাড়াতাড়ি জাহাজে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল বটে কিন্তু এক বিরাট সরকারী ফৌজ লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করে বসল। কি মুস্কিল! এরপর মুক্তি ফৌজের সৈন্যসংখ্যা কুয়োমিনতাং-এর সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে গেল—লড়াই করবার ক্ষমতা আর পেছনে জনসমর্থন তার তো ছিলই। ১৯৪৮-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৯-এর জানুয়ারীর মধ্যে শানতুং প্রদেশের হুয়াই-হাই যুদ্ধে হায় হায় করে উঠল কুয়োমিনতাং সরকার এবং আমেরিকার যুদ্ধ-সাহায্য দলের নেতা জেনারেল বার। কারণ পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কুয়োমিনতাং সৈন্য খতম হল এবং জেনারেল বার তার রিপোর্টে বলল যে সৈন্যদের দু'টি বড়ো দল

কমিউনিস্টদের সঙ্গে ভিড়েছে বলে জানা গেছে আর তিনটি বড়ো দলও ভিড়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। হুয়াই-হাইর জয়লাভ হৈ হৈ করে ঘোষণা করবার মতো কারণ কুয়োমিনতাং-এর বাছাই-করা ভালো সৈন্যরা এখানে প্রায় নিঃশেষ হয়। শুধু তাই নয়, মুক্তি ফৌজ এখানে গাদা গাদা ট্যাঙ্ক, কামান এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কব্জা করে।

এহেন অবস্থায় পড়ে ভক্ত চিয়াং ভগবান্ আমেরিকার কাছে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল। আমেরিকা কুয়োমিনতাং ফৌজকে পুরোপুরি নিজের হাতে নিয়ে নিক—এই প্রার্থনা। ভগবান্ বুদ্ধিমান্, তাই উত্তরে জানালেন যেখানে হেরে যাওয়া নিশ্চিত সেখানে ওরকম দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়!

১৯৪৯-এর জানুয়ারিতে উত্তর চীনের বিরাট বন্দর তিয়েনৎসিনকে মুক্তি ফৌজ মুক্ত করল, শহররক্ষী সমস্ত সৈন্য সমেত পিকিং আত্মসমর্পণ করল। এই দু'টি শহরের বিজয় মিছিল যে বিদেশীরা দেখেছিলেন তাঁরা লিখে গেছেন যে মুক্তি ফৌজের সৈনিকরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মার্চ করছিল—পরিষ্কার চেনা গেল যে কুয়োমিনতাং বাহিনীকে আমেরিকা যে অস্ত্র ও সরঞ্জাম দিয়েছিল এগুলো সেই জিনিস! ঐ জানুয়ারী মাসেই কুয়োমিনতাং আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্য হারাল আর এদিকে মুক্তি ফৌজ হু হু করে বেড়ে চলল। ১৯৪৯-এর বসন্ত [illegible] এল। মুক্তি ফৌজ তখন ইয়াংসির উত্তর পাড়ে। ইতিমধ্যে চিয়াং দুটো চাল চেলেছে। একবার কমিউনিস্ট পার্টির কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছে, আরেকবার রাষ্ট্রপতির পদ থেকে "অবসর গ্রহণের" অভিনয় করেছে আর তলায় তলায় মুক্তি ফৌজকে আক্রমণ করবার আয়োজন করেছে। জুয়াড়ীর শেষ চাল হিসেবে আমেরিকা এবার চেষ্টা করল টাকা দিয়ে বিপ্লবকে কিনে নেওয়া যায় কি না। বলল "চীনের সব অংশকেই সাহায্য করা হবে সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি যেন এক্ষুণি মুক্তি ফৌজের অভিযান থামিয়ে দেয় এবং দিব্যি কেটে বলে যে চিয়াং আর অন্যান্য আমেরিকান দালালদের তাড়িয়ে দেবে না।" "চীনের সব অংশকেই সাহায্য করা হবে" এটাই হল ঘুষ। অর্থাৎ "শুধু চীনের কুয়োমিনতাং অংশকেই সাহায্য করব না, কমিউনিস্ট এলাকাকেও করব, উত্তর চীন নিয়েছ, ইয়াংসি পর্যন্ত এসে গেছ, ব্যস্। আর দক্ষিণে যেও না—ও অঞ্চলটা আমাদের থাক। কত কোটি ডলার চাও বল!" এই হল আমেরিকার বক্তব্য। মুক্তি ফৌজ যখন ইয়াংসি পার হয় হয়

তখন শাংহাইতে এই ঘুষের প্রস্তাব আসে অর্থাৎ দেশ-ভাগের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু খাঁটি কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘুষ দিয়ে কেনা যায় না। দালাল লিউ শাও-চি অন্য কায়দায় বিপ্লবের শেষ জয় ঠেকাতে চেয়েছিল। সে ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে বলল, বিপ্লব বড়ো তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ভাল করে "প্রস্তুতি" নিয়ে এগোনো দরকার। কিন্তু চীনের জনগণ মাও ৎসে-তুং-এর পথ ধরে লিউ-এর প্রস্তাব দু'পায়ে মাড়িয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলল।

কুয়োমিনতাং-এর যুদ্ধবাজ সর্দাররা, রাজনীতিক ঘুঘুরা, ইউয়ান শিহ-কাইর মতো দেশদ্রোহীরা তখন ফোকলা মুখে "ধর্মকথা" বলতে আরম্ভ করল। বলতে লাগল পুরোনো আর পচা গণতন্ত্রের কথা আর সেই মেকী শান্তির কথা। শয়তানরা বলল যে তারা মুক্তি ফৌজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে রাজি। এমন কি তারা "ভূমিসংস্কার" করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল, অবশ্য জমিদারদের তারা "ক্ষতিপূরণ" দেবেই!

১৯৪৯-এর ২১এ এপ্রিল। মাও ৎসে-তুং আর চু-তে নির্দেশ দিয়েছেন, দশ লক্ষ মুক্তি ফৌজ ইয়াংসি পার হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদীদের আর চিয়াং-এর সবচেয়ে পাকাপোক্ত ঘাঁটিতে ঢুকছে। ইতিহাসের পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর মতো আবার ইয়াংসির বুকে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তেমন জৌলুস যেন নেই—যেন অতীতের দৈত্যদের ছায়ামূর্তি মাত্র। মুক্তি ফৌজ অতীতের সব ইতিহাসকে ছাপিয়ে উঠল—কামান দেগে যুদ্ধজাহাজগুলোকে তাড়িয়ে দিল। যুদ্ধজাহাজ সামনে রেখে নামকে ওয়াস্তে "আলাপ-আলোচনা" আর চলবে না। কাকতাড়ুয়ার ভয় দেখিয়ে বিপ্লবী ফৌজকে পিছু হটানোর চেষ্টা আজ বৃথা। সুতরাং বিদেশীরা এরপর আর মিলিটারি হিম্মৎ দেখাবার চেষ্টা মোটেই করল না। আমেরিকানদের পত্রিকা "নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" লিখল—আজ আর সেদিন নেই, কয়েকটা পশ্চিমী কামান, না হয় অনেকগুলোই হলো, কোটি কোটি এশিয়ার লোককে এখন আর দমিয়ে দিতে পারে না।

ইয়াংসির ওপারে পাহারা দিচ্ছে কুয়োমিনতাং-এর বিশাল বাহিনী। দু'দিন ধরে প্রচণ্ড লড়াই করে কুয়োমিনতাং সৈন্যদলকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মুক্তি ফৌজ ইয়াংসি পার হয়ে গেল। ২৩এ এপ্রিল নানকিং-এ "রাষ্ট্রপতির" আপিসের চূড়ায় মুক্তির লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল।

ইয়াংসি পার হওয়ার একমাস আগে পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণ অধিবেশন বসেছিল হোপেইর সিপাইপো গ্রামে। সেখানে ১৯৪৯-এর ৫ই মার্চ তাঁর রিপোর্টে মাও ৎসে-তুং আগামী দিনের পথের ছক কেটে দিলেন। বললেন, ১৯২৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কাজের ভারকেন্দ্র ছিল গ্রামগুলো। কাজ ছিল গ্রামগুলোতে শক্তি সঞ্চয় করা, শহরগুলোকে ঘিরে ফেলার জন্যে গ্রামগুলোকে ব্যবহার করা, তারপর শহরগুলোকে দখল করা। এই পদ্ধতিতে কাজের যুগ শেষ হয়েছে। "শহর থেকে গ্রামের দিকে" যাবার এবং শহর থেকে গ্রামকে নেতৃত্ব দেবার যুগ এখন শুরু হয়েছে। পার্টির কাজের ভারকেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে সরে এসেছে। দক্ষিণে গণমুক্তি ফৌজ প্রথম শহরগুলো দখল করবে তারপর গ্রামগুলোকে। তবে পার্টি এবং ফৌজের কাজের ভারকেন্দ্র শহর হলেও কোনও অবস্থাতেই গ্রামকে উপেক্ষা করা চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে মাও ৎসে-তুং বিপ্লবের জয়ের পর যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈদেশিক নীতি পার্টিকে গ্রহণ করতে হবে তা ঠিক করে দিলেন।

১৯৪৯ শেষ না হতেই চীনের প্রধান প্রধান শহরগুলো মুক্ত হল। আমেরিকাকে দলবল নিয়ে সরে যেতে বাধ্য করা হল। চিয়াং এবং তার আগের চাইতে অনেক ছোটো সৈন্যবাহিনী আমেরিকান জাহাজে চড়ে তাইওয়ান দ্বীপে গিয়ে তাইওয়ানীদের ঘাড়ে চড়াও হল।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ! চীনের মাটিতে মরতে মরতেও আমেরিকা আশা করল যুদ্ধে জিতলে কি হবে, কমিউনিস্টরা রাজ্য চালানোর মতো কঠিন কাজ পারবে না! তারা গাঁয়েই মোক্তার, শহরে কিছু না! শহরের এঞ্জিনিয়ার. ওপরতলার কারিগর এবং বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিফৌজ এসে পৌঁছবার আগেই শহর ছেড়ে পালাবে অথবা ফৌজের সঙ্গে কোনও রকম সহযোগিতা করতে আপত্তি করবে—এই ছিল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের আশা। কিন্তু আশা পূর্ণ হল না, কারণ মুক্তি ফৌজ শুধ অস্ত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করেনি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও জয়লাভ করেছে। শাংহাই খুব বড়ো শহর, ষাট লক্ষ লোকের বাস। সেখানকার অর্থনৈতিক এবং শাসন-সংক্রান্ত জটিল সমস্যা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এমন কিছু গুরুতর মনে হল না। বুদ্ধিজীবী, এঞ্জিনিয়ার, উঁচু ধাপের কারিগর, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বদেশ-প্রেমিকরা জনতার শক্তিকে সাহায্য করল। শুধু তাই নয় এতদিনে দেশ

স্বাধীন হল বলে মুক্তি ফৌজকে অভিনন্দন জানাল। কয়েক মাসের মধ্যেই উৎপাদন ব্যবস্থা আবার চালু করা হল এবং মূল্যবৃদ্ধি থামানো হল। কুয়োমিনতাং যা বহু বছরে পারেনি বা ইচ্ছা করেই করেনি, তা নতুন সরকার পারল। "সভ্য" সাম্রাজ্যবাদীদের আরেক দিক থেকে আশা ছিল যে, বড়ো শহরের জাল-জুয়াচ্চুরি, ফাটকাবাজি এবং আরও অনেক লোভের মধ্যে পড়ে কমিউনিস্টরা নষ্ট হয়ে যাবে। তা'হলে কমিউনিস্টদের চরিত্রের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদেব শ্রদ্ধা ছিল বলতে হয়! এ ব্যাপারেও আশা তাদের অপূর্ণই রইল।

এতদিন আমেরিকা নিজেকে জাহির করেছে চীনের বন্ধু বলে। এখন আমেরিকা তাইওয়ানের চিয়াং সরকারকে বিমান দিল, বিমান-সেনাকে ট্রেনিং দিল এবং তাইওয়ান থেকে চীনের শাংহাই এবং অন্যান্য শহরের ওপর বোমা ফেলার ব্যবস্থা করল। চিয়াং প্রভুর আদেশ মেনে চলতে লাগল। আমেরিকা বাইরে থেকে চীনে মালপত্র আমদানির ব্যবস্থাকে ঘেরাওর সাহায্যে বানচাল করবার চেষ্টাও করল। নানা রকমের ষড়যন্ত্র করেই চলল। কিন্তু শয়তানদের কোনও চেষ্টাই সফল হল না। জনগণ আসল শত্রু আর আসল মিত্রকে আরও ভাল করে চিনল। তারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বেশি বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হল। তিন বছরের মুক্তি যুদ্ধে জনগণ আশি লক্ষ কুয়োমিনতাং সৈন্যকে অকেজো করে দিল। শত্রুর হাজার হাজার মেশিনগান আর অসংখ্য রাইফেল দখল করল। বড়ো বড়ো এলাকায় জমিদারী উৎখাত করল। আগামী দিনে দেশ জুড়ে ভূমিসংস্কার সফল হবার গ্যারান্টি সৃষ্টি হল। শহর মুক্ত হওয়ার পর আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিরা যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা আর ব্যাঙ্ক কব্জা করেছিল সেগুলোকে জাতীয় সম্পত্তি করে নেওয়া হল। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিৎ তৈরি হল। ঠিক হল যে ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে সাহায্য করা হবে যাতে তারা দেশের পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করে। এই সাহায্যের শর্ত হচ্ছে যে তারা ফাটকাবাজী করবে না এবং উৎপাদন বাড়িয়ে যাবে।

এশিয়ার ইতিহাসে নতুন দিন এল, পৃথিবীর ইতিহাসেও। দিনটা ১লা অক্টোবর, ১৯৪৯। আগেই সব প্রস্তুতি সারা হয়েছে। এই বছরটা জুড়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহরকে মুক্ত করা হয়েছে। হুনান, সুইইউয়ান, সিংকিয়াং,

সিকাং এবং ইউন্নান প্রদেশ বিনা যুদ্ধেই মুক্ত হয়েছে। মূল ভূখণ্ডে মুক্তির জয়যাত্রা প্রায় সম্পূর্ণ। সেপ্টেম্বরে পিকিং-এ জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভার শুরুতেই মাও ৎসে-তুং ঘোষণা করলেন "মানবজাতির চার ভাগের এক ভাগ, চীনের জনগণ এখন মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়িয়েছে।" "সাধারণ কর্মসূচী" ঠিক হল। বলা হল নতুন প্রজাতন্ত্রের চরিত্র হবে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। এই নতুন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণী আর তার ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক এবং পেতিবুর্জোয়া ছাড়াও জাতীয় বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করবে এবং জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি শ্রেণীগুলোর ওপর একনায়কত্ব চাপিয়ে দেবে। আন্তর্জাতিক দিক থেকে জনগণের প্রজাতন্ত্র সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এবং সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে একটা আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলবে।

পৃথিবীর ইতিহাস পাতা ওল্টাল। এল ১৯৪৯-এর ১লা অক্টোবর। আকাশের বুকে চমক জাগিয়ে দেখা দিল এক নতুন পতাকা। গাঢ় লাল পটের ওপর পাঁচটি উজ্জ্বল তারা। নয়া চীনের জাতীয় পতাকা। বেলা তখন তিনটে। পিকিং-এর বিখ্যাত তিয়েন আন মেন পার্ক তিন লক্ষ মানুষের আনন্দ-কলরবে মুখর। মঞ্চে একজনের আবির্ভাবে বিশাল জনসমুদ্র হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতে হবে কারণ তিনি মাও ৎসে-তুং! আজ বিজয়ের চরম মুহূর্তে মাও ৎসে-তুং ঘোষণা করলেন চীনে জনগণের প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। জনসমুদ্রে জোয়ারের দোলা লাগল। ঢেউয়ের গর্জনে আকাশ উঠল কেঁপে। ইতিহাসে এমনি করেই এল নতুন দিন—নতুন সমাজের জন্মদিন।

॥ জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ॥

"তোমরা একনায়কতন্ত্রী"—আপনারা ঠিকই বলেছেন, মশাইরা, আমরা ঠিক তাই। কয়েক দশক ধরে চীনের জনগণ যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তা আমাদের শিক্ষা দেয় জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব চালু করতে, অর্থাৎ

মত প্রকাশের অধিকার থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বঞ্চিত করতে এবং কেবলমাত্র জনগণকেই সেই অধিকার ভোগ করতে দিতে। ১৯৪৯-এর ৩০এ জুন মাও ৎসে-তুং তাঁর "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে" লেখাটিতে এই ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখের মতো জবাব দিয়েছেন।

জনগণ কারা? ঐ একই লেখাতে মাও ৎসে-তুং বলছেন, চীনের ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে জনগণ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সমাজ, শহরের পেতিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া। শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই শ্রেণীগুলো নিজেদের রাষ্ট্র গড়বার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাদের নিজেদের সরকার নির্বাচন করে। তারা তাদের একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয় সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুরদের ওপর, জমিদারশ্রেণী ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের ওপর এবং সেই সব শ্রেণীগুলোর প্রতিনিধি কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের ও তাদের সাঙ্গাতদের ওপরও—তাদের দাবিয়ে রাখে, সঠিক আচরণ করবার সুযোগটুকু দেয় মাত্র এবং কথায় বা কাজে অবাধ্য হবার সুযোগ দেয় না। যদি তারা অবাধ্যভাবে কথা বলে বা কাজ করে, তাদের অবিলম্বে থামিয়ে দেয় এবং শাস্তি দেয়। গণতন্ত্রের প্রয়োগ হয় জনসাধারণের মধ্যে, তারা মত প্রকাশ, সমাবেশ, সংগঠন ইত্যাদি করবার অধিকার ভোগ করে। ভোট দেবার অধিকার থাকে শুধু জনগণের, প্রতিক্রিয়াশীলদের নয়। জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের ওপর একনায়কত্ব—জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব হচ্ছে এই দুটো দিকের সমন্বয়।

মাও ৎসে-তুং আরও বললেন, জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সমাজ এবং শহুরে পেতিবুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রী, এবং প্রধানত শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী, কারণ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আছে চীনের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি থেকে নব্বই জন মানুষ। এই দু'টি শ্রেণী হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করবার প্রধান শক্তি। আবার তাদের মিত্রতার ওপরই নির্ভর করে নয়াগণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো। জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রয়োজন। কারণ কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে সবচেয়ে দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন, সবচেয়ে নিঃস্বার্থ এবং সবচেয়ে পুরোপুরি বিপ্লবী। বিপ্লবের গোটা ইতিহাস প্রমাণ করে যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব

ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ হয় আর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব জয়লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পেতিবুর্জোয়ারা বা জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। জাতীয় বুর্জোয়ারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল। তাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টি এবং যথেষ্ট সাহসের অভাব রয়েছে। তা'ছাড়া তাদের অনেকেই জনগণকে ভয় করে। চীনে পেতিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত অনেক বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। সুন ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চল্লিশ বছরের বিপ্লবের ব্যর্থতা তার বড়ো প্রমাণ।

মাও ৎসে-তুং বললেন, আমাদের অভিজ্ঞতাকে সংক্ষেপে যদি এক কথায় বলি তা হলে তা এই দাঁড়ায়ঃ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে (কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে) এবং কৃষক ও শ্রমিকের মিত্রতার ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। এই একনায়কত্ব আমাদের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ অবশ্যই করবে। এই হল আমাদের মূল সূত্র, আমাদের প্রধান অভিজ্ঞতা, আমাদের প্রধান কর্মসূচী।

"জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে" লেখাটি এবং তার প্রায় চার মাস আগে পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণ অধিবেশনে মাও ৎসে-তুং-এর ৫ই মার্চের রিপোর্ট হল ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে চীনের জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভার প্রথম অধিবেশনে গৃহীত সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তি। নয়া চীন প্রতিষ্ঠার পর এটা অস্থায়ী সংবিধানের কাজ করে।

৫ই মার্চের রিপোর্টে মাও ৎসে-তুং বললেন, চীনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী শিল্পকে উপেক্ষা করলে চলবে না। এই শিল্প চীনের আধুনিক শিল্পে দ্বিতীয় স্থান দখল করে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, এবং আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদ চীনে জাতীয় বুর্জোয়া এবং তার প্রতিনিধিদের ওপর উৎপীড়ন চালিয়েছে এবং তাদের কোণঠাসা করেছে। তাই তারা অনেকবার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে অংশ নিয়েছে অথবা নিরপেক্ষ থেকেছে। "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে" লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং বললেন, সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের বিরোধিতা করার জন্যে এবং তার পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির উন্নতি করবার জন্যে চীনের অবশ্যই শহর ও গ্রামে পুঁজিবাদের যেসব উপাদান উপকারী এবং জাতীয় অর্থনীতি ও জনগণের জীবিকার পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাদের সবগুলোকেই ব্যবহার করতে হবে এবং

সাধারণ সংগ্রামে আমাদের জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে অবশ্যই সামিল হতে হবে। আমাদের বর্তমান নীতি হল পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধ্বংস করা নয়। তিনি ৫ই মার্চের রিপোর্টে বললেন : কিন্তু চীনে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব এবং বেড়ে ওঠা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতো বাধাহীন এবং নিয়ন্ত্রণহীন হবে না। বিভিন্ন দিক থেকে তার সীমা বেঁধে দেওয়া হবে—তার কাজের এলাকার ব্যাপারে এবং ট্যাক্সনীতি, বাজার দর এবং শ্রমিকদের কাজের শর্তের ব্যাপারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান সমাজতান্ত্রিক উপাদান হিসেবে কি দেখা দেয়। চীনের জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভার সাধারণ কর্মসূচীতে বলা হল যে এই সমাজতান্ত্রিক উপাদান হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে এবং জনগণের সশস্ত্র ফৌজের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব।

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়লাভ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই বা সমাজতন্ত্রের প্রধান উপাদান হিসেবে কি বেরিয়ে আসে? এই প্রধান উপাদান হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা এবং সেগুলোর মালিকানা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের প্রজাতন্ত্রের কাছে হস্তান্তর করা। পুঁজির সবচেয়ে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ এতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের এবং তাদের পা-চাটা আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের পুরোপুরি কব্জায় রয়েছে। ৫ই মার্চের রিপোর্টে মাও ৎসে-তুং বলেছিলেন, এই পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে প্রজাতন্ত্রের হাতে নেওয়ার ফলে জনগণের প্রজাতন্ত্রের পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক প্রাণধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার অর্থনীতির পক্ষে গোটা জাতীয় অর্থনীতির প্রধান বিভাগ হয়ে ওঠা সম্ভব হবে। তাই সাধারণ কর্মসূচীতে বলা হল : রাষ্ট্রীয় মালিকানার অর্থনীতির চরিত্র সমাজতান্ত্রিক। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং জনগণের জীবিকার ওপর প্রবল প্রভাব আছে এমন সব প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ পরিচালনার অধীন থাকতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় মালিকনায় আছে এমন সব সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠান গোটা জনগণের সাধারণ সম্পত্তি। জনগণের প্রজাতন্ত্র যে বাস্তব ভিত্তির ওপর নির্ভর করে উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আসবে তার ভিত্তি এই সম্পত্তি এবং সেটাই গোটা সমাজের অর্থনীতির প্রধান

শক্তি। অর্থনীতির যে বিভাগে রাষ্ট্রীয় মালিকানা আছে সেই বিভাগের মারফৎই রাষ্ট্র বাকি বিভাগগুলোর ওপর নেতৃত্ব করতে পারবে।

মেহনতী কৃষকদের যে পরস্পরকে সাহায্য করার সংস্থাগুলো, কৃষি উৎপাদক সমবায় এবং সরবাহ্ ও বিক্রয় সমবায়গুলো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় গড়ে উঠেছে সেগুলোর মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক উপাদান আছে এবং তারা কৃষকদের সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই সমবায়গুলো শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীন মেহনতী জনগণের ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যৌথ অর্থনৈতিক সংস্থা। ৫ই মার্চের রিপোর্টে মাও ৎসে-তুং বললেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানার অর্থনীতির চরিত্র হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক এবং সমবায়ের অর্থনীতি হচ্ছে আধা-সমাজতান্ত্রিক। সমবায় গড়ে তুলতেই হবে। যদি কেবল রাষ্ট্রীয় মালিকানার সংস্থাগুলোই থাকত এবং সমবায় না থাকত তাহলে মেহনতী জনগণের ব্যক্তিগত অর্থনীতিকে ধাপে ধাপে যৌথ মালিকানার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হত, নয়াগণতান্ত্রিক সমাজকে ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হত এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর সর্বহারার নেতৃত্ব সুদৃঢ় করা অসম্ভব হত।

এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানার নেতৃত্ব আইনে স্বীকার করে নেওয়া হল। জনগণের প্রজাতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর এটাই হল বড়ো গ্যারান্টি।

॥ নতুন দিগন্ত ॥

পূবের আকাশ লালে লাল। চীন বিপ্লবের জয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক দারুণ ঘটনা। ষাট কোটিমানুষের দেশ বিশ্ব ধনতন্ত্রের শৃঙ্খল চুরমার করল— সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ সঙ্কটকে বাড়িয়ে তুলল। লিন পিয়াও তাঁর "জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক" লেখাটিতে চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং মাও ৎসে-তুং-এর জনযুদ্ধের তত্ত্বের জগৎজোড়া তাৎপর্য চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনের জনগণের জয় সারা দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পথ করে দিল। এই যুদ্ধে জয়লাভের

একটা মূল কারণ হল যে এ যুদ্ধ ছিল পার্টি ও মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি খাঁটি জনযুদ্ধ। যখন ১৯৪৬-এ কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য নিয়ে সারা দেশ জুড়ে একটা গৃহযুদ্ধ শুরু করল, তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাও ৎসে-তুং জনযুদ্ধের তত্ত্বকে আরও বিকশিত করলেন। তিনি আরও ব্যাপকভাবে জনযুদ্ধ চালানোর জন্যে চীনের জনগণকে নেতৃত্ব দিলেন। তিন বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে জনগণের মুক্তিযুদ্ধে বিরাট জয় হল। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসন শেষ হল। আর চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। চীনের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধে এই জয় পূবে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরাল, বিশ্বের শক্তিগুলোর ভারসাম্যের ব্যাপারে বিরাট পরিবর্তন আনল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশের জনগণের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। তখন থেকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তির আন্দোলন একটা নতুন ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করল।

মাও ৎসে-তুং দেখিয়ে দিলেন, রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর যে যুগ শুরু হয়েছে সে যুগে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক কোনও দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব আর পুরোনো বুর্জোয়া বিশ্ব বিপ্লবের অংশ নয়, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিপ্লবের অংশ। চীন বিপ্লব ঐ সমস্ত দেশগুলোর গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করার সমস্যা সফলভাবে সমাধান করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব। "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব" লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং বলেছেন যে তিনটি প্রধান অস্ত্রের সাহায্যে চীন বিপ্লবের জয় হয়েছে। এক, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বের অস্ত্রে সজ্জিত ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং জনগণের সঙ্গে যুক্ত এরকম একটি সুশৃঙ্খল পার্টি। দুই, সেরকম একটি পার্টির নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী। তিন, সেরকম একটি পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীগুলোর এবং সমস্ত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোর একটি যুক্তফ্রন্ট। এই তিনটি অস্ত্রের সাহায্যেই চীনের জনগণ শত্রুদের পরাজিত করেছে।

লিন পিয়াও বলেছেন, চীন বিপ্লব হচ্ছে মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের ক্রম-পরিণতি। অক্টোবর বিপ্লবের পথ জনগণের সমস্ত বিপ্লবের সাধারণ পথ।

চীন বিপ্লব আর অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে কতকগুলো মূল বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মিল রয়েছে।

এক, দুটি বিপ্লবেই শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব করেছিল—একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ছিল তার প্রাণকেন্দ্র।

দুই, দুটি বিপ্লবেরই ভিত্তি ছিল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী।

তিন, দুটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রক্ষমতা সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দখল করা হয়েছিল এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

চার, দুটি ক্ষেত্রেই বিপ্লবে জয়ের পর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল।

পাঁচ, দুটোই ছিল সর্বহারা বিশ্ব বিপ্লবের অংশ।

স্বাভাবিকভাবেই, চীন বিপ্লবের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল।

এক, অক্টোবর বিপ্লব ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ায়, কিন্তু চীন বিপ্লব ঘটেছিল একটা আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে।

দুই, প্রথমটি ছিল সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, আর পরেরটি নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণ বিজয়ের পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

তিন, অক্টোবর বিপ্লব বড়ো বড়ো শহরে সশস্ত্র বিদ্রোহ দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং তারপর গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর চীন বিপ্লব দেশজোড়া জয়লাভ করেছিল গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে ঘেরাও করে আর সবশেষে শহরগুলোকে দখল করে।

লিন পিয়াও বলছেন, মাও ৎসে-তুং-এর বিরাট কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে একাত্ম করেছেন। তিনি চীনের জনগণের দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সাধারণ সূত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন এবং সার সংক্ষেপ করেছেন। এইভাবে মাও ৎসে-তুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমৃদ্ধ এবং বিকশিত করেছেন। তাঁর অপরাজেয় জনযুদ্ধের তত্ত্ব শুধু চীন নয় সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিগুলোর এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিপুল অবদান।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে জনযুদ্ধ হয়েছিল তার দুটো অংশ ছিল—জাপানকে রুখবার যুদ্ধ আর বিপ্লবী গৃহযুদ্ধগুলো। সব মিলে চীনের এই

জনযুদ্ধ বাইশ বছর ধরে চলেছিল। আধুনিক ইতিহাসে এটাই হল সব চেয়ে দীর্ঘ এবং সবচেয়ে জটিল জনযুদ্ধ এবং বিপ্লবী অভিজ্ঞতার দিক থেকেও এই জনযুদ্ধ সবচেয়ে মূল্যবান্।

মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে সর্বহারা বিপ্লবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব হচ্ছে, বিপ্লবী বলপ্রয়োগ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার তত্ত্ব, জনগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এমন জনযুদ্ধ। চীনের জনযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকেই মাও ৎসে-তুং আশ্চর্য সহজ ও জোরদার ভাষায় তাঁর এই বিখ্যাত তত্ত্বটি প্রচার করেছেন, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়।" তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, "সশস্ত্র আক্রমণ করে ক্ষমতা দখল করা, যুদ্ধের সাহায্যে প্রশ্নটির মীমাংসা করাই বিপ্লবের মূল কর্তব্য এবং বিপ্লবের সর্বোচ্চ রূপ। বিপ্লবের এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি বিশ্বের সব জায়গায় খাটে, যেমন চীনে তেমনি অন্য সব দেশে।"

সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণব্যবস্থা যুদ্ধ সৃষ্টি করে। যতদিন সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণব্যবস্থা বজায় থাকবে ততদিন সাম্রাজ্যবাদীরা এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা অস্ত্রবলের সাহায্যে তাদের রাজত্ব কায়েম রাখতে চাইবে এবং অত্যাচরিত জাতিগুলোর ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পা-চাটাদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে জনগণ কি করবে? আত্মসমর্পণ না প্রতিরোধ এবং মুক্তির জন্যে লড়াই? মাও ৎসে-তুং বলেছেন, দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান ও চিন্তার ফলে চীনের জনগণ আবিষ্কার করেছেন যে, সব সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পা-চাটা চাকরদের "হাতে আছে তরোয়াল এবং তারা হত্যা করতে উদ্যত। জনগণ এটা বুঝতে পেরেছে, সুতরাং তারাও একই কায়দায় কাজ করছে।" সাম্রাজ্যবাদ ও তার পা-চাটাদের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে মারের বদলে মার, জনযুদ্ধ, চালানোর হিম্মৎ আছে কি নেই তার ওপরই ঠিক হবে কে খাঁটি বিপ্লবী আর কে নয়।

কিছু লোকের মনে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্বন্ধে ভয়ানক ভয় ছিল। তাই মাও ৎসে-তুং তাঁর এই বিখ্যাত তত্ত্ব সবার সামনে তুলে ধরলেন, "সাম্রাজ্যবাদীরা এবং সব প্রতিক্রিয়াশীলরা কাগুজে বাঘ।" ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, বাইরে থেকে দেখতে প্রতিক্রিয়াশীলরা ভয়ঙ্কর কিন্তু আসলে তারা ততো শক্তিশালী নয়। দীর্ঘ-মেয়াদী হিসেবের

দিক থেকে দেখলে কিন্তু জনগণই আসলে শক্তিশালী, প্রতিক্রিয়াশীলরা নয়। চীন ও অন্যান্য দেশের জনযুদ্ধের ইতিহাস প্রমাণ করে যে জনগণের বিপ্লবী ফৌজ গোড়ায় খুব ছোটো আর দুর্বল থাকলেও ক্রমে প্রবল ও বিরাট হয়ে ওঠে। এটা শ্রেণীসংগ্রামের একটা নিয়ম—যে নিয়ম সব জায়গাতেই খাটবে। এটা জনযুদ্ধের একটা নিয়মও বটে। জনযুদ্ধ অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে বাধ্য, তার গতিপথে অনেক ওঠানামা আছে, আছে অনেক বাধা। কিন্তু শেষ অবধি জনযুদ্ধের জয় হবেই হবে, এমন কোনও শক্তি নেই যে নিশ্চিত জয়ের দিকে তার গতিকে পাল্টে দিতে পারে।

মাও ৎসে-তুং শিক্ষা দিচ্ছেন যে রণনীতির দিক থেকে আমাদের উচিত শত্রুকে তুচ্ছ করা আর রণকৌশলের দিক থেকে উচিত তার শক্তির পুরো পরিমাপ করা। যদি রণনীতি হিসাবে শত্রুকে তুচ্ছ করার এবং জয়লাভ করার সাহস না থাকে তবে জয় তো দূরের কথা বিপ্লব এবং জনযুদ্ধ চালানো একেবারেই অসম্ভব। তেমনি রণকৌশলের দিক থেকে কতকগুলো কাজ না করলে জনযুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। শত্রুর পুরো পরিমাপ করতে হবে। বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে। বিচার-বিবেচনা না করে এগোলে চলবে না। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে লড়াইয়ের কল-কৌশল শিখতে হবে। প্রতিটি দেশের বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে এবং সংগ্রামের প্রতিটি বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে লড়াইয়ের সঠিক রূপ গ্রহণ করতে হবে। নইলে জনযুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়।

যে শক্তির ক্ষয় শুরু হয়েছে তাকে নবজাত শক্তিগুলোর তুলনায় প্রবল মনে হতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাকে দুর্বল মনে হচ্ছে সেই নবজাত শক্তিগুলোই সব সময় যে শক্তির ক্ষয় শুরু হয়েছে তাকে হারিয়ে দেয়। এর কারণ কি? কারণ নবজাত শক্তির পক্ষে রয়েছে সত্য আর জনগণও তার পক্ষে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তারা জনতার বিরুদ্ধে কাজ করছে। যা উঠতি এবং বেড়ে চলেছে কেবল তাই অপরাজেয়। চীন বিপ্লব এ সত্য আরেকবার প্রমাণ করল।

"সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরাই কাগুজে বাঘ"—এই সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে। আর সংশোধনবাদীরা এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করছে। লিন পিয়াও নবম পার্টি কংগ্রেসে তাঁর

রিপোর্টে বলেছেন, "আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাগুজে-বাঘ চরিত্র পৃথিবী জুড়ে জনগণ অনেকদিন হল প্রকাশ করে দিয়েছে।...সোভিয়েৎ দলত্যাগী চক্রও হচ্ছে একটা কাগুজে বাঘ। এটা তার সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র আগের চাইতেও বেশি করে প্রকাশ করেছে।" লিন পিয়াও সোভিয়েতের বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লেনিনের এই কথাগুলো ব্যবহার করছেন, "কথায় সমাজতন্ত্র, কাজে সাম্রাজ্যবাদ, সুবিধাবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে।" এই হল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। কথাগুলো লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন।

লিন পিয়াও তাঁর "জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক লেখাটিতে বলেছেন যে মাও ৎসে-তুং জনযুদ্ধ কি করে চালাতে হবে সে সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি বলেছেন, এ কথা জোর দিয়ে বলা দবকার যে মাও ৎসে-তুং-এর গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি গডার ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে ঘেরাও কবাব তত্ত্ব সমস্ত নিপীড়িত জাতিগুলোর এবং জনগণের বর্তমান বিপ্লবী সংগ্রামেব পক্ষে এবং বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিগুলোর এবং জনগণের সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পা-চাটাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে একটি অসাধারণ তত্ত্ব এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্রই একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। তিনি বললেন, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাব অনেকগুলো দেশের মূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পুরোনো চীনের অবস্থার অনেক মিল রয়েছে। চীনের মতো এই সব অঞ্চলের কৃষক সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদ ও তার পা-চাটাদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষকরাই হল প্রধান শক্তি। এই সব দেশে আক্রমণ চালাতে গিয়ে সাম্রাজ্যাবাদ প্রথম বড়ো বডো শহরগুলো কব্জা করে, কিন্তু বিশাল গ্রামাঞ্চলকে পুরোপুরি মুঠোর মধ্যে আনতে পারে না। একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই সেরকম বিস্তীর্ণ এলাকা পাওয়া যায় যেখানে বিপ্লবীরা সামরিক প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে, এবং একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই বিপ্লবী ঘাঁটি হতে পারে, যেখান থেকে বিপ্লবীরা চূড়ান্ত জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। লিন পিয়াও বললেন, ঠিক এই কারণেই, মাও ৎসে-তুং-এর গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তোলার এবং গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলো ঘেরাও করার তত্ত্ব এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের মনোযোগ বেশি বেশি করে আকর্ষণ করছে।

লিন পিয়াও বললেন গোটা পৃথিবীকে ধরলে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপকে বলা যায় "পৃথিবীর শহরাঞ্চল" আর এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকাকে নিয়ে "পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে "পৃথিবীর শহরাঞ্চলে" শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন নানা কারণে সাময়িক ভাবে বাধা পেয়েছে আর অন্য দিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন প্রবল ভাবে বেড়ে চলেছে। এক অর্থে এখনকার বিশ্ব-বিপ্লবও গ্রামাঞ্চল দিয়ে শহর অঞ্চলকে ঘেরাও করার ছবি তুলে ধরছে। শেষ বিচারে বিশ্ব-বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার যে জনগণ বিশ্বের জনসংখ্যার বিরাট গরিষ্ঠ অংশ তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের ওপর।

লিন পিয়াও তাঁর নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে বলেছেন: বর্তমান বিশ্বের সাধারণ ঝোঁক মাও ৎসে-তুং যেভাবে তার বর্ণনা করেছিলেন এখনও সেই রকমই রয়েছে, "শত্রু দিন দিন পচছে, আর আমাদের অবস্থা দিন দিন ভালো হচ্ছে।" আজ সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা নয়, শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত দেশের বিপ্লবী জনগণই বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করে।

"যা নির্ভুল তা সব সময়ই যা ভুল তার সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতর রূপ পায়। সত্য, শিব এবং সুন্দর সব সময় মিথ্যা, অকল্যাণ ও অসুন্দরের প্রতিরূপ হিসেবে থাকে এবং এদের সঙ্গে সংগ্রাম করে পূর্ণতর হয়।"—মাও ৎসে-তুং

রেনমিন রিবাও, জুন ৮,

॥ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ॥

এক

নতুন সমাজে পৌঁছতে হলে রাজনৈতিক বিপ্লব বা ক্ষমতা দখলের অনেক আগে থেকেই বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করতে হয়। সে রকমের আন্দোলন শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মতো অবস্থা দেশের মধ্যে সৃষ্টি করতে হয়। বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণী সামন্ত বা জমিদার প্রভুদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার আগে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল। ইউরোপের ইতিহাসে তখন সামন্ত যুগ শেষ হতে চলেছে। পুঁজিবাদ তখন উঠতি। আরও উঠবার জন্যে যে আন্দোলন আরম্ভ হল তার বিদেশী নাম "রেনেসাঁস", আমাদের ভাষায় "নবজাগরণ"। নতুন জেগে ওঠার দল অর্থাৎ নতুন সমাজব্যবস্থার প্রচারকরা সামন্ত যুগের সংস্কৃতি বা রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে অনবরত প্রচার চালাতে লাগল। শুধু তাই নয়, সেগুলো বাতিল করে দিয়ে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি সমাজকে গ্রহণ করতে হবে তারও জোর প্রচার সঙ্গে সঙ্গে চালাল। এক আধ বছর নয়, কয়েক শ' বছর ধরে সাংস্কৃতিক প্রচার চালানোর পর সতেরো, আঠারো এবং উনিশ শতকে বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী শ্রেণী ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করল। ক্রমে ইউরোপে একটার পর একটা দেশে তাদের শাসন কায়েম হল। ঠিক তেমনি রুশ বিপ্লবের প্রায় আশি বছর আগে মার্কস এবং

এঙ্গেলস কমিউনিজমের আদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পক্ষে জনসাধারণের মনকে তৈরি করা বা গণসমর্থন যোগাড় করা। রাশিয়ার ভেতরে প্লেখানভ থেকে শুরু করে লেনিন-স্তালিনের প্রচার আন্দোলন অর্থাৎ সংস্কৃতি আন্দোলন কতদিন চলার পর অক্টোবরের মহাবিপ্লব হয়েছিল? প্রায় ষাট বছর পরে। চীনের যে বিপ্লব মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে সফল হল তার পেছনে যে সংস্কৃতির লড়াইয়ের ইতিহাস আছে তা কত দিনের? বলা যেতে পারে প্রায় ত্রিশ বছরের। কারণ ১৯১৯-এর ৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকেই চীনের বিপ্লবী আন্দোলন মোড় ঘুরে সঠিক পথ ধরে—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ ধরে। সাংস্কৃতিক সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি চলে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরও এই দুই সংগ্রামই চলতে থাকে কারণ শ্রমিক-কৃষক ক্ষমতা দখল করলেই শ্রেণীসংগ্রাম শেষ হয় না অর্থাৎ শোষক আর শোষিতের লড়াই থেমে যায় না। শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল আর অন্য এক শ্রেণীর ক্ষমতা দখল এক জিনিস নয়। অতীত দিনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা কি দেখি? দাস যুগের পরে এল সামন্ত যুগ। দাসদের যারা মালিক ছিল তাদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিল সামন্ত বা জমিদার প্রভুরা। এক শোষক শ্রেণীর হাত থেকে আরেক শাষক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করল। তারপর সামন্তদের হটিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করল। এবারেও সেই একই ব্যাপার—এক শোষক শ্রেণীর হাত থেকে আরেক শোষক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এল। কিন্তু রুশ বিপ্লব বা চীন বিপ্লবের চরিত্র অন্য রকম। তা তো শুধু শোষক বদলের ব্যাপার নয়। ইতিপূর্বে ইতিহাসে যা কখনও ঘটেনি এ বিপ্লবে তাই ঘটে—শোষিত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং শোষকদের ঘাড়ে পা দিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখে। এই দাবিয়ে রাখার রাষ্ট্রযন্ত্রটি হচ্ছে "শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব" বা তার একচেটিয়া শাসন। কিন্তু ক্ষমতা দখল করেই কাজ শেষ হয় না বরং তখন নতুন সমাজ গড়ার অনেক যুগের স্বপ্নকে সফল করার কাজ সবে শুরু হয়। শ্রমিকশ্রেণীর এই ক্ষমতা দখলকে মাও ৎসে-তুং বলেছেন দশ হাজার লি অতিক্রম করবার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

বুর্জোয়া শ্রেণীর সামন্তবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক বিপ্লব ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের পরই সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়—এ বিপ্লব সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর মতাদর্শকে উৎখাত করে এবং জনগণের মধ্যে নতুন মতাদর্শ এবং সংস্কৃতি, নতুন অভ্যাস এবং রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করে।

শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠার পর শত্রুতা কারা করে? দেশের ভেতরকার সামন্তরা এবং বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদীরা। পুরোনো সমাজব্যবস্থার দীর্ঘ-দিনের পুরোনো অভ্যাসও তাদের সাহায্য করে। আর সাহায্য করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ। ষড়যন্ত্রকারীরা মাথা নীচু করে অপেক্ষা করতে থাকে, সুযোগ এলেই ছোবল মারবে বলে। ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা আবার দখল করবার জন্যে সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চেষ্টার অন্ত থাকে না। এই শয়তানরা অত্যন্ত ধড়িবাজ। বিপ্লবের আগে এবং পরে তাদের দালালেরা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়ে, এমন কি নিজের আসল চরিত্র গোপন রেখে পার্টির ওপরের দিককার নেতাদের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নেয় অর্থাৎ নেতা হয়ে বসে। পার্টির ভেতরে থেকে এই শয়তানেরা পার্টির ধ্যানধারণা, আদর্শ ইত্যাদি প্রচারের ব্যাপারটা কব্জা করতে চেষ্টা করে এবং কখনও কখনও করেও ফেলে। কুচক্রীরা সুযোগ করে নিয়ে পার্টির বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে খুব কায়দা করে প্রচার চালাতে থাকে। এভাবে তারা সামন্ত ও বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় ফিরে আসার পথ তৈরি করে অর্থাৎ পুঁজিবাদকে আবার গ্রহণ করবার জন্যে লোকের মনকে তৈরি করে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই শত্রুদের শক্তিকে খাটো মনে করা ভুল। লড়াই ছাড়া এদের কখনও চূড়ান্তভাবে ঘায়েল করা যায় না। মাও ৎসে-তুং বলেছেন যে মানুষের উন্নতি বা প্রগতির বিরোধী প্রত্যেকটা জিনিসই এক জাতের—যদি তাকে আঘাত না কর তাহলে তার পতন ঘটাতে পারবে না। বিপ্লবের শত্রুদের শক্তিকে অল্প মনে না করে তাদের বেশ শক্তিশালী বলে ধরে নিয়ে সেই অনুযায়ী জোরদার সংগ্রাম চালানোই ঠিক। লেনিন বলেছেন যে তাড়া খেয়ে গদী থেকে সরে যাবার পর বুর্জোয়াদের পাল্টা আক্রমণ দশগুণ বেড়ে যায় এবং তাদের শক্তির পেছনে থাকে অতীতের বিপুল অভিজ্ঞতা, প্রচুর অর্থ এবং বিদেশের

বুর্জোয়াদের আন্তরিক ও প্রবল সাহায্য। তাই তাদের যারা উৎখাত করেছে সেই শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে প্রথম দিকে বুর্জোয়াদের শক্তি অনেক বেশি থাকে। তাছাড়া বুর্জোয়া আদর্শের খদ্দের সমাজে অনেক থাকে অর্থাৎ যে আদর্শ সমাজে এতদিন শাসক শ্রেণীর সমর্থনে ও সাহায্যে প্রচারিত হচ্ছিল এবং লোকের মনের ভেতরে ভিৎ গেড়ে বসেছিল তা বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় না—অনেক তলা অবধি গাঁথা থাকে এবং অনেকের মধ্যে তখন সে আদর্শের কাটতি থাকে, মানে, প্রচার করলেই গ্রহণ করবে এরকম লোকের সংখ্যা সমাজে বেশ কিছু থাকে। পুরোনো অভ্যাস প্রতিবিপ্লবের মস্ত ঘাঁটি। লেনিন বলেছেন, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের অভ্যাসের শক্তিটা খুবই সাংঘাতিক শক্তি। তিনি আরও বলেছেন, বুর্জোয়া আর পেতিবুর্জোয়া অভ্যাসের বিপুল শক্তিকে কেবলমাত্র দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড লড়াইয়ের সাহায্যেই হারিয়ে দেওয়া সম্ভব। সমাজে নিজেদের আবার প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বুর্জোয়া ও সামন্তদের প্রথম কাজই হচ্ছে জনতাকে ভুল পথে চালাবার জন্যে নানা কায়দায় পুরোনো ধ্যান-ধারণার প্রচার করা। এই প্রচারের সাহায্যেই তারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের ভিৎ ধ্বসিয়ে দেবার কাজ শুরু করে এবং অপেক্ষা করতে থাকে বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ করবার সুযোগের জন্যে।

এরকম আক্রমণ তারা বার বার করেছে এবং আবার যেখানে যখন দরকার হবে করবে। ১৮৭১ সালের ফ্রান্সে কি ঘটেছিল? ফ্রান্সের বিখ্যাত প্যারিস শহরে শ্রমিকশ্রেণী বিদ্রোহ করে "প্যারিস কমিউন" নামে পৃথিবীতে প্রথম সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ফ্রান্সে ইতিপূর্বে বুর্জোয়া-শ্রেণী সামন্ততন্ত্রকে ঘায়েল করবার সময় ১৭৮৯-এর বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা"র আওয়াজ তুলে আকাশ কাঁপিয়েছিল। সেই শ্রেণীই কিন্তু পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র "প্যারিস কমিউন"কে সহ্য করতে পারল না বরং ফ্রান্সের শত্রু বিসমার্কের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাজারে হাজারে দেশের মেহনতী মানুষকে খুন করে আবার প্যারিসের ওপর বুর্জোয়া দখল কায়েম করল। একেবারে গোড়া থেকেই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যা-প্রচার পৃথিবীর বাজারে গরম ফুলুরির মতো বিকোচ্ছিল। জন্মের পর এক বছর যেতে না যেতেই শিশু সোভিয়েৎ রাষ্ট্রকে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে রাশিয়ার

সামন্ত ও ধনিক শ্রেণীর যোগসাজস ছিল। ১৯৫৬ সালে হাংগেরিতে প্রতিবিপ্লবীরা প্রথমে জনসাধারণকে দলে টানবার জন্যে দেশময় প্রচারের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল এবং তার পর পথে নেমে পড়েছিল বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। এর পেছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদীরা এবং হাংগেরিতে তাদের দালাল হিসেবে কাজ করল "পেটোফি ক্লাব" নামে কমিউনিস্ট-বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের একটি ক্লাব। ইমরে নাজ "সিংহাসনে" বসেছিল বিপ্লব-বিরোধীদের নেতা হিসেবে। তখনও এই মেকী বিপ্লবীর মাথায় কমিউনিজমের তাজ। এদিকে ভেতরে ভেতরে বেশ কিছুদিন ধরে ষড়যন্ত্র করে "শান্তিপূর্ণ ক্রমপরিবর্তন"-এর পথে প্রতিবিপ্লবীরা যুগোস্লাভিয়াতেও সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। বিশ্বাসঘাতক টিটো এখন বিশ্বময় প্রতিবিপ্লব বা বিপ্লব-ধ্বংসের মাল-মসলা ফেরি করে বেড়াচ্ছে। ক্রুশ্চভপন্থীরা রাশিয়ায় স্তালিনকে সরিয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে খারিজ করে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। আগে থেকেই জমি তৈরি করতে হয় বলে লিউ শাও-চির দল চীনে ছলে বলে কৌশলে প্রচার চালিয়ে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে আক্রমণ করবার আবহাওয়া তৈরি করছিল।

বিপ্লব-বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে জেল, ফাঁসি, গুলি ইত্যাদির সাহায্যে খতম করে দিই না কেন? যারা বিরোধিতা করছে তাদের সকলকে আমরা এক দলে ফেলতে পারি না, ফেললে ভুল করব। পার্টি-বিরোধী এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী লোকদের একই দলে ফেলতে পারি কিন্তু যারা পার্টিকে এবং সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে কিন্তু কিছু অন্যায় কাজ করেছে বা অন্যায় কথা বলেছে কিংবা কিছু খারাপ প্রবন্ধ লিখেছে বা ঐ জাতীয় খারাপ কাজ করেছে এইরকম লোককে ঐ আগের দলের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক হবে না। বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মধ্যে একদল আছে যারা তাদের "বিরাট জ্ঞান" ফলাও করে তুলে ধরে জনসাধারণকে বিপ্লব-বিরোধী পথে টানতে চেষ্টা করে—এরা শয়তান। কিন্তু আরেক দল বুর্জোয়া আছে যারা ঐ দলে পড়ে না, তারা বিপ্লব-বিরোধিতাকে তাদের প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করেনি। তারা শুধু সাবেককালের বুর্জোয়া ধারণাগুলোকে মনের মধ্যে পুষে রাখে, সেগুলোর প্রভাব এড়াতে পারে না। তাই সবাইকে ডেলা পাকিয়ে এক দলের মধ্যে ফেললে ভুল হবে। যারা মিত্র হতে পারত তাদের শত্রু করে তোলা হবে। এখানে জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে বিরোধ কি

করে মেটাতে হবে সে সম্পর্কে মাও ৎসে-তুং-এর শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে—গুলিগোলার পথ মারাত্মক ভুল পথ। জনগণের মধ্যে যারা ভুল করেছে তাদের রাজনীতিগত এবং মতাদর্শগত শিক্ষা দিয়ে সারিয়ে তুলতে হবে। নীতিটা হল অসুখ সারিয়ে রুগীকে বাঁচানো। তাছাড়া জবরদস্তি করে মন থেকে পুরোনো ধারণা উপড়ে ফেলা যায় না।

চৌ এন-লাই সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন: "আমরা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছি, কিন্তু তাদের মগজের ভেতর যে প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাগুলো আছে সেগুলো তো বাজেয়াপ্ত করতে পারি না।" তারা সব সময় তাদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পেতে চায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল পার্টির মধ্যেকার সেই সব শয়তানরা যারা ক্ষমতার পদগুলো দখল করে পুঁজিবাদের পথে দেশকে নিয়ে যেতে চাইছে। তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে, দোমনাদের বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনতে হবে আর জনগণের ব্যাপক গরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে ঐক্য গড়তে হবে। তবেই শেষ পর্যন্ত পঁচানব্বুই ভাগেরও বেশি কর্মী ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা যাবে।

দুই

মাও ৎসে-তুং-এর ব্যক্তিগত নেতৃত্বে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বিরাট জয়লাভ করে আরও এগিয়ে চলেছে। এই মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বুঝতে হলে চীনের "দুই লাইনের দ্বন্দ্ব" নিয়ে প্রথম আলোচনা করা দরকার। দ্বন্দ্ব সর্বত্রই আছে এবং থাকবেই থাকবে। দ্বন্দ্ব "আছে সব জিনিসের ক্রমে বেড়ে ওঠার মধ্যে এবং আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে।" "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে" লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং এই কথা বলেছেন। মাও ৎসে-তুং দেখিয়ে দিলেন, যেহেতু সব জিনিসের মধ্যেই দ্বন্দ্ব থাকে সেই জন্যে রাজনৈতিক পার্টিগুলোর অস্তিত্ব এবং বেড়ে ওঠার মধ্যেও দ্বন্দ্ব থাকে। কমিউনিস্ট পার্টিও তার ব্যতিক্রম নয়। লিন পিয়াও বলেছেন মাও ৎসে-তুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরও এগিয়ে দিয়েছেন। ফলে যে যুগে সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ছে আর সমাজতন্ত্র জগৎ জুড়ে

জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারা হচ্ছে সেই যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। রাজনীতির পথের ওপর উজ্জ্বল আলো ফেলে পথকে স্পষ্ট করে তুলছে মাও ৎসে-তুং-এর এই কথাগুলো: "বিভিন্ন ধরনের চিন্তার মধ্যে বিরোধ এবং সংগ্রাম পার্টির ভেতর সব সময়ই চলতে থাকে। এটা হল পার্টির মধ্যে শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার এবং পুরোনো ও নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। যদি পার্টির ভেতর কোনও দ্বন্দ্ব না থাকত এবং তার সমাধানের জন্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম না থাকত তাহলে পার্টির অস্তিত্ব শেষ হয়ে যেত।"

জনগণতন্ত্র এগিয়ে চলার পথে একটি বিশিষ্ট স্তর। সামনে অনেকটা পথ এবং সে পথে চড়াই উৎরাই রয়েছে, পথ বেশ দুর্গম। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পার্টির নেতৃত্বে জনগণ সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যৌথ খামার চালু করবে, হাতের কাজের ছোটো ছোটো কারখানাকে সমাজতান্ত্রিক কায়দায় ক্রমে নতুন রূপ দেবে। দেশ জুড়ে মুক্তি সংগ্রাম জয়লাভ করবার আগেই মাও ৎসে-তুং অসাধারণ দূরদৃষ্টি নিয়ে এই কর্মসূচী তুলে ধরেছিলেন। ১৯৪৯-এর ৫ই মার্চ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণ অধিবেশনের কাছে একটি রিপোর্টে মাও এই কর্মসূচী উপস্থিত করেন। গোড়াতে মনে হয়েছিল যে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে দীর্ঘ দিন লাগবে। কিন্তু দেশের ভেতরের এবং বাইরের ঘটনা এগোনোর গতিকে দিল বাড়িয়ে। ১৯৫১-র মধ্যেই ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ হল—বাকী রইল সামান্য কিছু এলাকা—জাতীয় সংখ্যালঘুদের এলাকাগুলো আর স্বয়ংশাসিত অঞ্চলগুলো। অল্পদিনের মধ্যেই চীনের গ্রামাঞ্চলে পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যে ছোটো ছোটো সংস্থা গড়ে উঠল। ১৯৫৫র মধ্যেই চাষীরা দাবি তুলল আধা-সমাজতান্ত্রিক কৃষি উৎপাদক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে জমির উন্নতি আর জল সংরক্ষণ পরিকল্পনার উন্নতি হয় কারণ চীনের গ্রামজীবনের চেহারা পাল্টে দিতে হবে। হাতের কাজের শিল্প আর পুঁজিবাদী শিল্প-বাণিজ্য ১৯৫৬-র মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক রূপ নিল। এসবের ফলে মুক্তির সাত বছরের মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলত সমাজতান্ত্রিক রূপ পেল।

এই পরিবর্তন বিনা বাধায় হয়নি, হতে পারে না। প্রতি পদে

বাধা দিয়েছে জমিদারশ্রেণী, ধনী চাষীর দল আর বুর্জোয়ারা। এদের কিছু প্রতিনিধি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর থেকে বাধা সৃষ্টি করে চলেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবার আগে ভাল করে বোঝা যায়নি যে শ্রীমান্ লিউ শাও-চিই ছিল পার্টির ভেতরকার এই বিশ্বাসঘাতক দলের নেতা। লিউর উদ্দেশ্য ছিল সমাজব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক পথে পরিবর্তন ঠেকানো আর পুঁজিবাদী শক্তিগুলোকে জোরদার করা—যাতে একদিন চীনে আবার পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনা যায়। দীর্ঘ দিনের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় লিউ শাও-চি মাও ৎসে-তুং-এর সর্বহারা শ্রেণীর নীতির বিরোধিতা করে চলেছে। শহরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে লিউ দিনের পর দিন বলেছে যে বিপ্লবে জয়লাভের পর দেশবাসীর কর্তব্য হচ্ছে "নয়াগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার জন্যে সংগ্রাম করা" (চীনের জনগণের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সম্মেলনের জাতীয় কমিটিতে বক্তৃতা, নভেম্বর ৪, ১৯৫১)। অর্থাৎ আর এগিয়ে যাওয়া ভাল নয়, সমাজতন্ত্রের পথে না যাওয়াই উচিত—এই হল তার মনের আসল কথা। এই শয়তান বলেছে যে চীনে পুঁজিবাদীদের বড়ো বেশি প্রাধান্য রয়েছে একথা বলা ঠিক নয়, বরং পুঁজিবাদ নাকি এখানে অতি সামান্যই আছে। সে এমন কথাও বলল যে পুঁজিবাদী শোষণ বাড়ানো দরকার কারণ ঐ ধরনের শোষণ প্রগতিশীল। সে গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকদের শোষণ বহাল রাখবার এবং বাড়িয়ে তোলবার পক্ষে কাজ করে চলল। চীন যাতে সমাজতন্ত্রের পথ না নেয় তার জন্যে লিউ শাও-চির চেষ্টার অন্ত ছিল না। ১৯৪৯-এর শেষের দিকে সে বলেছিল "সঠিক ভাবে গুরুত্ব দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগোতে চীনের এখনও অনেক অনেক দিন লাগবে" (চীনের জনগণের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা, ২১এ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)। লিউ হিসেব করে বলেছিল যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগোতে চীনের বিশ থেকে ত্রিশ বছর লাগবে। মাঝখানে বেশ কয়েক বছর যাবে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতায়। কারণ প্রথমে কলকারখানা বাড়াতে বেশ কিছু বছর কেটে যাবে। তারপর কিছু বছর যাবে শিল্পের জাতীয়করণ করতে এবং যৌথ কৃষি চালু করতে। সে বলেছিল, ভবিষ্যতে যখন কলকারখানা এবং উৎপাদন বেশ বাড়বে তখনই সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়ানো উচিত হবে, তার আগে নয় (প্রথম জাতীয় যুব কংগ্রেসে বক্তৃতা, ১২ই মে, ১৯৪৯)। চমৎকার

কথা! "ভবিষ্যতে চীনের কলকারখানায় যখন অতিরিক্ত উৎপাদন হবে সেটাই হবে সমাজতন্ত্রের দিকে পাড়ি দেবার সময়" (শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের আলোচনা সভায় বক্তৃতা, ২৫এ এপ্রিল, ১৯৪৯)। কি শয়তান! শিল্পে অতিরিক্ত উৎপাদন তো পুঁজিবাদের একটা বিশেষ লক্ষণ! সুতরাং লিউ শাও-চির মনের কথা এ থেকে বেরিয়ে পড়ছে। তার একান্ত বাসনা যে চীনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বেড়ে চলুক। সে যে তত্ত্বকথা শোনাল তার মধ্যে নতুন কিছু ছিল না। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির সপ্তম অধিবেশনে ট্রট্স্কি বলেছিল, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের তুলনায় উন্নত তা প্রমাণ হতে পঞ্চাশ কি এক শ' বছর লাগবে। সংশোধন-বাদের কুৎসিত ইতিহাসে ট্রট্স্কি, বুখারিনের মতো সংশোধনবাদীরা যা বলেছিল এবং লেনিন ও স্তালিন যে বজ্জাতি তত্ত্বকে তুলোধুনো করে ছেড়েছিলেন লিউ তাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে পাতে তুলে দিল। চীনের পঞ্চাশ কোটি কৃষকের কাছে লিউ শাও-চির তত্ত্বের মানে দাঁড়ালো এই যে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর যন্ত্রপাতি তৈরি না হলে পিছিয়ে থাকা কৃষিব্যবস্থার বন্ধন থেকে তাদের মুক্তি নেই অথচ শিল্পের উন্নতি হতে অনেক বছর লাগবে—অর্থাৎ দীর্ঘ দুঃখের রাত্রি তাদের সামনে। কিন্তু কৃষিতে যৌথ ব্যবস্থা চালু করলেই চাষীদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা এক বিপুল শক্তিকে জাগিয়ে তোলা যায়। গ্রামাঞ্চলের বিরাট জনসংখ্যার শ্রমের শক্তি রাজনৈতিক স্পর্শ পেয়ে প্রচণ্ড গতিতে অসাধ্য-সাধন করবে। এসব সত্য লিউ আড়াল করে রাখল মিথ্যা প্রচারের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়। লিউই যদি চীনের একমাত্র নেতা হত তাহলে চীনের পঞ্চাশ কোটি কৃষক পিছিয়ে পড়ত কারণ না এগোলেই পিছিয়ে পড়তে হয় এবং লিউ তাদের এগোতে শুধু বারণই করছিল না, বাধাও দিচ্ছিল। লিউ সর্বেসর্বা হতে পারলে গ্রামে জমির মালিকানার হাত বদল হত, নতুন এক শ্রেণীর জমিদার এবং ধনী চাষী কৃষি-যন্ত্রপাতির ওপর একচেটিয়া দখল পেত আর গরীব চাষী আর ক্ষেতমজুররা এদের কথায় ওঠ-বস করতে বাধ্য হত। এই রকমের পিছু-হটা খানিকটা শুরুও হয়েছিল এবং লিউ তা দেখে খুশি হচ্ছিল কারণ দেশে পুঁজিবাদকে আবার প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নে সে মশগুল।

প্রচুর কলকারখানা দেশময় ছড়িয়ে পড়া অবধি সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়ানো ঠিক হবে না—এ তত্ত্ব লিউ কেন প্রচার করছিল? গ্রামাঞ্চলে এবং

শিল্পে পুঁজিবাদ যেন টিঁকে থাকতে পারে এবং ক্রমে বাড়তে পারে এই ছিল তার কুমতলব। দেশের মুক্তিযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। ঠিক তার পরে পরেই শুধু কলকারখানা বাড়ানোর কথা বলা সন্দেহজনক নয় কি? সৎ লোক হলে লিউ গোড়াতেই বলত যে সমাজতান্ত্রিক রাস্তায় কলকারখানা গড়তে হবে। এই সমাজতান্ত্রিক রাস্তার কথা সে যে চেপে গেল তার মানেই হল যে সে চায় পুঁজিবাদী রাস্তায় শিল্প গড়ে উঠুক, তার মুরুব্বিরা মুনাফা লুটুক আর সুযোগ বুঝে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করুক, চীনের আকাশে ভোর বেশি দূর না এগোতেই অন্ধকার তাকে গিলে খাক।

লিউর লাইনের বিরুদ্ধে মাও ৎসে-তুং যা বললেন তা থেকেই দুই লাইনের দ্বন্দ্ব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দেশে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনার লাইন আর জনগণের একনায়কত্বকে সুদৃঢ় করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার লাইন —এই দুই লাইনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। মাও বললেন যে পুঁজিবাদীদের মালিকানায় শিল্প থাকবে না তা নয় কিন্তু তা জনগণতান্ত্রিক সরকারের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাঁধনের মধ্যে থাকবে, থাকবে সমাজতন্ত্রের শাসনে। নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ বনাম নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতাই হবে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রধান রূপ। এই বাঁধনের মধ্যে পুঁজিবাদী শিল্প বাড়বার সুযোগ পেল বটে কিন্তু তাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে লাগল জনগণতান্ত্রিক সরকারের ট্যাক্স-ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট বাজার দর, কাঁচামালের ওপর তদারকি আর শ্রমিকদের সুখ-সুবিধে সম্বন্ধে সরকারী নীতি। দীর্ঘ সময় নিয়ে নয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'পাকাপোক্ত' করার যে কর্মসূচী লিউ উপস্থিত করেছিল মাও তার কঠোর সমালোচনা করে বললেন যে এটা একটা পুঁজিবাদী কর্মসূচী এবং এগিয়ে যাওয়ার বর্তমান স্তরে পার্টির মূল নীতির বিরোধী।

লিউ তার বুর্জোয়া লাইন আঁকড়ে থাকল বলে চীনের ইতিহাসের এই স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে দুই লাইনের বিরোধ প্রবল হল। পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণ অধিবেশনে ১৯৪৯-এর ৫ই মার্চ মাও তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে চীন বিপ্লবের দেশজোড়া জয়লাভ এবং ভূমি সমস্যার সমাধানের পরও দেশে দুটো মূল দ্বন্দ্ব থেকে যাবে। প্রথমটা ভেতরকার—অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়টা বাইরের—অর্থাৎ চীন এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান করবার জন্যে পার্টি-সভ্য এবং জনগণকে

সাম্রাজ্যবাদী, কুয়োমিনতাং এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে রাজনীতি, অর্থনীতি আর সংস্কৃতির দিক থেকে লড়াই করতে শিখতে হবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে কূটনীতির লড়াই কি করে চালাতে হয় তাও শিখতে হবে। তা না হলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া গেছে তা রক্ষা করা যাবে না। মাও ৎসে-তুং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ওপর সব সময় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বললেন যে জনগণের একনায়কত্বের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক এবং শহরের পেতিবুর্জোয়ার মৈত্রী। প্রধান ভিৎ শ্রমিক আর কৃষকের মৈত্রী। এই দুটি শ্রেণীই ছিল সাম্রাজ্যবাদ আর কুয়োমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংস করবার ব্যাপারে প্রধান শক্তি। এদের মৈত্রীর ওপর ভর দিয়েই নয়া গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবে।

মাও ৎসে-তুং যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কথা তুলে ধরছেন আর তাদের ওপর আস্থা রাখতে উপদেশ দিচ্ছেন তখন লিউ শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে খাটো করে দেখাচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে যে সর্বহারার একনায়কত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থার কোনও ভূমিকা আছে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। শ্রমিক-কৃষক জনতাই যে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করে এবং তারাই যে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সত্যিকার শক্তির অধিকারী একথা লিউ বিশ্বাস করত না। তার চোখের সামনে রয়েছে শুধু পুঁজিবাদীরা অর্থাৎ তার প্রভুরা! তাদের সাহায্যেই লিউ তার স্বপ্নের স্বর্গকে পৃথিবীর মাটিতে প্রতিষ্ঠা করবে! লিউ ভেংচি কেটে বলল: "শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও বিশ্বাস করা যায় না এমন লোক আছে।" বলল: "ধরে নিয়ো না যে শ্রমিক-শ্রেণীর ওপর নির্ভর করার ব্যাপারে কোনও সমস্যা নেই" ("তিয়েনৎসিনে কাজ সম্পর্কে নির্দেশ", এপ্রিল ২৪, ১৯৪৯)। যখন চীনে শ্রমিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রাম প্রধানত পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণ এবং সেই নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতার রূপ নিচ্ছে তখন লিউ নির্লজ্জভাবে বলল: "সাত-আট বছর কোনও রকমের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। এতে রাষ্ট্রের, শ্রমিকশ্রেণীর এবং উৎপাদনের মঙ্গল হবে" (শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের আলোচনা সভায় বক্তৃতা, ২৫এ এপ্রিল, ১৯৪৯)। লিউ একথাও বলেছিল, "রাষ্ট্রীয় মালিকানার এবং ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্পের মধ্যে সব ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া-নেওয়া চলবে—কাঁচামাল থেকে শুরু করে বিক্রি করা অবধি—এবং তারা মুক্তভাবে সেগুলোর

বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থা করবে যাতে সবাই টাকা রোজগারে ভাগ পায়" (ঐ একই বক্তৃতা)। লিউ শাও-চি লজ্জার মাথা খেয়ে খোলাখুলি বুর্জোয়াদের বলেই ফেলল, "আপনাদের শ্রমিকদের সঙ্গে লড়াই করতেই হবে। যদি আপনারা তা না পারেন তবে ভবিষ্যতে যদি আপনাদের কারখানাগুলো ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা লড়াই চালিয়ে যায় তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষ দেবেন না কিন্তু" (ঐ একই বক্তৃতা)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তার মতে সর্বহারার নেতৃত্বে যে রাষ্ট্র চলছে তার কাজ বুর্জোয়াদের শায়েস্তা করা নয়, শ্রমিকশ্রেণীকে শায়েস্তা করা। লিউ আরও এগিয়ে গিয়ে খোলাখুলি বলল: "আজকের দিনে আমরা একটা শ্রেণীর একনায়কত্ব চাই না। আমাদের উচিত সমস্ত জনগণের প্রতিনিধি হওয়া" (তিয়েনৎসিনে কাজ সম্পর্কে নির্দেশ, ২৪এ এপ্রিল, ১৯৪৯)। জনগণের প্রতি আর কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আর কাকে বলে? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে লিউ আর তার সাঙ্গাৎরা ইতিমধ্যেই শোষকদের হাতে সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবার কাজে লেগে গেছে যা চীনের মেহনতী মানুষ অনেক ত্যাগ আর বুকের রক্ত দিয়ে সবেমাত্র পেয়েছে। নইলে সে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বদলে দেশের সব মানুষের একনায়কত্বের বজ্জাতি তত্ত্ব প্রচারে লাগবে কেন? মাও ৎসে-তুং ৫ই মার্চের রিপোর্টে গোটা দেশে ক্ষমতা দখল করবার সঠিক লাইন স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবার ঠিক এক মাস পরেই লিউ এই বেইমানি লাইন প্রচার করল। সুতরাং পেছনে পাকাপোক্ত আয়োজন নিশ্চয়ই ছিল। মাও ঐ রিপোর্টেই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "বন্দুকধারী শত্রুরা যখন নির্মূল হয়েছে তখনও বন্দুকহীন শত্রুরা থাকবে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে মরীয়া হয়ে লড়তে বাধ্য আর এই শত্রুদের কখনও হাল্‌কা করে দেখা আমাদের উচিত হবে না। আমরা যদি এখনই সমস্যাটাকে এই ভাবে তুলে না ধরি এবং না বুঝি তাহলে আমরা অত্যন্ত গুরুতর ভুল করব।"

সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর বিপ্লব তো বিশ্রাম করতে পারে না। যদি করে তা হলে সে তার মৃত্যু ডেকে আনবে। মাও ৎসে-তুং-এর দূরদৃষ্টি সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পরেকার সংগ্রাম স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়েছিল যে সে সংগ্রাম হবে শ্রমিকশ্রেণী আর

বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম এবং তা হবে খুব জটিল আর দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং মাও প্রথম থেকেই পার্টির সামনে যে জরুরী কর্তব্য উপস্থিত করলেন তা হল রাজনৈতিক মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, কুয়োমিনতাং এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণ অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী এবং মাও ৎসে-তুং পার্টির সাধারণ লাইন সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল।

মাও ৎসে-তুং ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারীতে বললেন, "কোন্‌টা জিতবে, সমাজতন্ত্র না ধনতন্ত্র, সে প্রশ্নের সমাধান বাস্তবিকপক্ষে এখনও হয়নি।" তিনি আরও বলেছিলেন, "শ্রমিকশ্রেণী আর বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে মতাদর্শের ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম দীর্ঘ এবং আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলতে থাকবে এবং কখনও কখনও খুব তীব্র হয়ে উঠবে।" লিন পিয়াও তাঁর নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে এই কথাগুলো উদ্ধৃত করে বলছেন যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম পরিষ্কার-ভাবে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল যে উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মোটামুটি হয়ে যাওয়ার পরও শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম থাকবে এবং সর্বহারা শ্রেণীকে বিপ্লব চালিয়ে যেতে হবে।

অনেক দিন লিউ শাও-চির মুখোশকে লোকে মুখ মনে করত। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড়ের ঝাপটা সে মুখোশকে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন স্পষ্ট হয়েছে যে সে অনেক দিনের দাগী আসামী। আমরা দেখছি যে ১৯২৩এই লিউ চীন বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়দা করে অস্বীকার করেছিল। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগে সে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করল। সবচেয়ে বড়ো কথা, আজকের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে পরিষ্কার প্রমাণ হয়েছে যে লিউ-শাও চি হচ্ছে ক্ষমতা দখলে রেখে যারা পুঁজিবাদের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে চায় সেই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান পাণ্ডা। তার রাজনৈতিক লাইন ধরে সে চীনে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছিল। তার ইচ্ছা ছিল দেশটাকে সাম্রাজ্যবাদ আর সংশোধনবাদের একটা উপনিবেশে পরিণত

করা। এই রাজনৈতিক লাইনকে কার্যকরী করার জন্যে শয়তানটার একটা সাংগঠনিক লাইনও ছিল। মাও ৎসে-তুং দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিগুলোই কোনও না কোনও শ্রেণীর রাজনৈতিক লক্ষ্যকে রূপ দেবার সংগঠন। তাই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন হবে তার রাজনীতির অধীন এবং এই রাজনীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ এবং রূপ দেবার হাতিয়ার। কিন্তু লিউ চেঁচাতে শুরু করল, রাজনীতি হবে সংগঠনের অধীন। সে সোজাসুজি বলে বসল, "সাংগঠনিক ব্যাপারে আমরা চরম ভাবে বাধ্য থাকার পক্ষপাতী।" পার্টি-কর্মীদের "বাধ্য হাতিয়ার" হতে হবে অর্থাৎ নেতৃত্বের আদেশ নিঃশব্দে অন্ধের মতো মেনে চলতে হবে। শয়তানটা পার্টি-কর্মীদের বিপ্লবী উদ্যোগ নষ্ট করতে চাইল। সে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি দু পায়ে মাড়াল। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পূর্বশর্তই হল পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলোকে অবশ্যই সঠিক ভাবে পথের নিশানা দিতে হবে— পরিচালনার নীতি ও কর্মপন্থা সঠিক হওয়া চাইই চাই। কিন্তু লিউ শাও-চি এই আসল ব্যাপারটাকে আড়াল করার জন্যে বলল, "চরম ভাবে এবং বিনা শর্তে সংগঠন, মেজরিটি বা সংখ্যাগুরু এবং ওপরওয়ালাদের মানতে হবে।" সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নীতি ছিল: সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে হবে। কারণ কখনও কখনও তাদের মধ্যেই সত্য থাকে। কিন্তু লিউ বলল, "সংখ্যার জোরে উপরওয়ালা বা কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা একবার কোনও কিছু পাস হয়ে গেলে বা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে তা ভুল হলেও অবশ্যই মানতে হবে।" সে বলল, তখনও "সংখ্যালঘুরা অতি অবশ্যই সংখ্যাগুরুদের" বাধ্য থাকবে যখন "সংখ্যালঘুরাই সঠিক এবং সংখ্যাগুরুদের মধ্যে সত্য নেই।" অথচ ১৯৩০-এর মে মাসেই "বইপূজা চলবে না" লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং বলেছিলেন, "ওপরকার সংস্থার কাছ থেকে আসছে বলেই নির্দেশগুলো সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক মনোভাব গ্রহণ করা এবং সেগুলোকে বাস্তব অবস্থার আলোতে পরীক্ষা ও আলোচনা না করেই অন্ধভাবে পালন করা খুবই অন্যায়।" সম্প্রতি মাও ৎসে-তুং বলেছেন, "যে ভুল নেতৃত্ব বিপ্লবের ক্ষতি করে তাকে বিনা শর্তে স্বীকার করা উচিত নয়, বরং তাকে দৃঢ় ভাবে প্রতিরোধ করা উচিত" (পিপলস্ ডেইলি, এপ্রিল ৬,) । দাস মনোভাব জাগিয়ে তোলার পেছনে লিউ-এর একটা উদ্দেশ্য হল, যে সব পুঁজিবাদের পথিকরা ওপরওয়ালার পদ দখল করে ছিল তাদের

জনগণের বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করা। অনেক বছর ধরে দলত্যাগী আর বিশ্বাসঘাতকদের যোগাড় করে লিউ তার চারপাশে জড়ো করেছে—যারা ক্ষমতার গদী পেয়েছে এমন পুঁজিবাদের পথের পথিক আর এক দঙ্গল শত্রুর দালাল। তারা সযত্নে তাদের অতীত রাজনৈতিক জীবনকে চোখের আড়ালে রাখল। তারা পরস্পরকে রক্ষা করল এবং শয়তানী কাজে সহযোগিতা করল। তারা পার্টিতে এবং সরকারী চাকরীতে গুরুত্বপূর্ণ পদ ছলে বলে কৌশলে দখল করল এবং অনেক কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পার্টি ইউনিটের নেতৃত্ব কব্জা করল। এইভাবে তারা মাও ৎসে-তুংএর সর্বহারা সদর দপ্তরের পাল্টা এক গোপন বুর্জোয়া সদর দপ্তর গড়ে তুলেছিল। আমেবিকান সাম্রাজ্যবাদীরা, সোভিয়েৎ সংশোধনবাদীরা, কুয়োমিনতাং দস্যুরা এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের চেষ্টায় যা করতে পারে না এই স্বদেশী দালালরা তাদের সঙ্গে গোপনে :যোগাযোগ করে তাই করল, পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরাল।

তিন

লিউ শাও-চির মুখোশহীন মুখ একটু ভালো করে দেখতে হলে পেছনে ফেলে আসা ইতিহাসের আরও কয়েকটা পাতা ওল্টাতে হবে। তখন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ আর জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ জোয়ারের বেগে এগিয়ে চলেছে। ১৯৩৯ সাল। লিউ সাহেব তার শয়তানীতে ভরা "আত্মোৎকর্ষ" বা "হাউ টু বি এ গুড্ কমিউনিস্ট" বইটি ছেপে বার করল। এ বইয়ের কথা আগেই বলেছি। প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় অনেকবার বইটা ছাপা হয়েছিল। জাপানের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষার লড়াইতে তখন দেশের অগুণতি মানুষের বুকের রক্ত ঝরছে অথচ লিউর "আত্মোৎকর্ষ"তে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে হারিয়ে দেবার কথা ঘুণাক্ষরেও থাকছে না, কুয়োমিনতাংএর প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়বার কথা মোটেই থাকছে না আর সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করবার মার্কসবাদী লেনিনবাদী মূল নীতির উল্লেখ মাত্র থাকছে না। মার্কস অনেক দিন আগেই শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার

কথা বলেছিলেন। লেনিন আরেকটু জোর দিয়ে বললেন, "যারা শুধু শ্রেণী সংগ্রামকেই স্বীকার করে তারা এখনও মার্কসবাদী হয়ে উঠতে পারেনি, তাদের এখনও বুর্জোয়া চিন্তাধারা ও বুর্জোয়া রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যে দেখা যাবে।...শুধু সে-ই মার্কসবাদী যে শ্রেণী সংগ্রামের স্বীকৃতিকে সর্বহারার একনায়কত্ব অবধি বাড়িয়ে দেয়।"

লিউ শাও-চি তার এক শ' পাতার "আত্মোৎকর্ষ" বইখানিকে শ্রেণী সংগ্রামের কতকগুলো হাওয়াই বুলি দিয়ে বোঝাই করেছে। কিন্তু একটি বারও সে বাস্তব জীবনে যে শ্রেণী সংগ্রাম হচ্ছে তার এবং সর্বহারার একনায়কত্বের উল্লেখ করেনি। সর্বহারার একনায়কত্বের ছোঁয়াচ এড়িয়ে সে যে বিশুদ্ধ শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছে তাতে তার প্রভু বুর্জোয়ারা খুশি হতে পারে, কিন্তু বিপ্লবী জনগণ হবে ক্ষিপ্ত। লিন পিয়াও তাঁর নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে দেখিয়েছেন যে লেনিনের লেখা থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে একটি অংশ তার "আত্মোৎকর্ষ" বইখানিতে তুলে দিতে গিয়ে লিউ "শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব একান্ত প্রয়োজন" কথাগুলো লেনিনের উদ্ধৃতি থেকে বাদ দিয়েছিল। আগেই বলেছি, সশস্ত্র শক্তির দ্বারা ক্ষমতা দখলের কথাও লিউ চেপে গেল। মাও ৎসে-তুং জাপবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় ঘোষণা করলেন, "বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য এবং সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতা কব্জা করা, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান করা।" তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি আজ যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই হতে পারত না। যুদ্ধের বছরগুলোতে যখন কামান গর্জনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মাও ৎসে-তুং সশস্ত্র বিপ্লবের মারফৎ ক্ষমতা দখলের কথা বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করে যাচ্ছেন এবং প্রচণ্ড সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সে কথাকে কাজে রূপ দিচ্ছেন তখন ভণ্ডতপস্বী লিউ নপুংসকের আত্ম-উন্নতির দর্শন প্রচার করছে। উদ্দেশ্য—যারা এই আত্মোৎকর্ষের ফাঁদে পা দেবে তারা বিপ্লবী যুদ্ধের ছায়া মাড়াবে না আর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার বিরোধিতা করবে।

জাপবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনের জনগণের জয় হল। কিন্তু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী ফৌজকে অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়েই যাচ্ছে যাতে তাদের শীগ্‌গিরই মুক্ত এলাকাগুলোর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায়। আমেরিকা ও চিয়াং-এর এই কাজে সাহায্য করবার জন্যে

লিউ শাও-চি তার সাংস্কৃতিক প্রচার অভিযান শুরু করল। লিউ-এর এ সময়কার কাজকর্ম আমরা আগেই দেখেছি। এখানে আরেকবার অল্প কথায় সেগুলো ঝালিয়ে নিলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বুঝতে সুবিধেই হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে আত্মসমর্পণের নীতি প্রচারই তার কাজ। সে বলল, "চীন শান্তি ও গণতন্ত্রের নতুন যুগে প্রবেশ করেছে।" লিউর শান্তি জল মাও ৎসে-তুংএর আগুন নেভাতে চায়, কারণ মাও তখন কর্মীদের ডাক দিয়েছেন, "জনগণকে সক্রিয় করে লড়াইতে নাবাবার চেষ্টা চরমে তোলো, জনগণের বাহিনীগুলোকে বাড়িয়ে তোলো এবং আমাদের পার্টির নেতৃত্বে আক্রমণকারীকে হটিয়ে দাও এবং এক নতুন চীন গড়ে তোলো।" লিউ প্রচার করল, এখন নাকি সংসদীয় সংগ্রামই হবে লড়াইয়ের প্রধান রূপ। সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টা করল গণ-ফৌজগুলোর ওপর পার্টির নেতৃত্ব বাতিল করতে। লিউ আট নম্বর রুট আর্মি আর নয়া চার নম্বর আর্মিকে "এক" করে দিয়ে চিয়াংএর "জাতীয় ফৌজ"-এ মিশিয়ে দিতে চাইল। এতেও সে খুশী নয়। সে আরও চাইল পার্টির নেতৃত্বে যে শ্রমিক-কৃষক সৈনিকরা আছে তাদের ফৌজ থেকে একেবারে ছুটি দিয়ে দেওয়া যাতে জনগণের সশস্ত্র বাহিনী বলে কোনও কিছুর আর অস্তিত্ব না থাকে, চীন বিপ্লবকে টুটি টিপে খুন করা যায় এবং অনেক রক্ত দিয়ে চীনের জনগণ যে মুক্তিকে কিনেছে আমেরিকা ও কুয়োমিনতাংএর পায়ে তা সঁপে দেওয়া যায়।

১৯৪৯-এর এপ্রিল। সারা চীন জুড়ে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের ঠিক আগের মুহূর্ত। চীনের মুক্তি ফৌজ ইয়াংসি নদী পার হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে লিউ শাও-চি ছুটে গেল তিয়েনৎসিনে এবং পুঁজিপতিদের কোলে এলিয়ে পড়ল। বলল, চীনে পুঁজিবাদের এখনও উজ্জ্বল যৌবন অর্থাৎ অন্য দেশে তার আয়ু ফুরোলেও এখানে ফুরোয়নি। সুতরাং ব্যক্তিগত পুঁজির ওপর কোনও রকমের কড়াকড়ি করা চলবে না। অর্থাৎ সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণ অধিবেশনের প্রস্তাবের সে বিরোধিতা করল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে লিউ শাও-চি ও তার দলবল মাও ৎসে-তুংএর বিপ্লবী লাইনকে কুৎসিত ভাবে আক্রমণ করেছে এবং প্রতিবিপ্লবের পথ ধরে ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ভাঙ্গন ধরাবার

প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। স্তালিনকে সরিয়ে দিয়ে যখন খ্রুশ্চভ ক্ষমতা দখল করল আর সোভিয়েৎ সংশোধনবাদীদের সঙ্গে আমেরিকার সাম্রাজ্য-বাদী আর অন্য সব দেশের প্রতিবিপ্লবীদের কোলাকুলি শুরু হল আর যৌথভাবে চীনবিরোধী প্রচার আন্দোলনের জোয়ার বইল তখন লিউ আর তার সাঙ্গাৎরা মরীয়া হয়ে আরও বেশি নোংরামিতে নাবল। খ্রুশ্চভকে খুশি করার জন্যে "আত্মোৎকর্ষ" বইটির সংস্করণে লিউ স্তালিনের নাম কেটে বাদ দিয়ে দিল। স্তালিনের লেখা "সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস" থেকে যে সব কোটেশন বা উদ্ধৃতি লিউ ঐ বইয়ে আগে ব্যবহার করেছিল তাও ঐ সংস্করণে বাদ পড়ল। শুধু স্তালিনের নামটা বাদ দেওয়ায় লোকের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে জেনে সে এঙ্গেলসের নামটাও বাদ দিয়ে দিল। আর এতদিন বাদে জাপবিরোধী যুদ্ধের উল্লেখ করল। ভাবটা এমন যে নতুন সংস্করণে কিছু অদল বদল তো হয়েই থাকে। চরম শয়তানীটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে চালিয়ে দেওয়ার এই হল লিউবাদী কায়দা।

মাওই প্রথম লিউ আর তার দলের বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র ধরতে পেরেছিলেন।

জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মাও সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে বলে সতর্ক থাকবার জরুরী প্রয়োজনের কথা তুললেন। ঐ কমিটির আগস্ট মাসের সভায় আর সেপ্টেম্বর মাসে অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম পূর্ণ অধিবেশনে মাও বিস্তারিত ভাবে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে পার্টির মূল লাইনের কথা তুলে ধরলেন। তিনি বললেন যে, যখন সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ চলছে তখনও শ্রেণী থাকে, শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণীসংগ্রাম থাকে, সমাজতন্ত্রের পথ আর পুঁজিবাদের পথের মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকে এবং পুঁজিবাদের ফিরে আসবার ভয় থেকেই যায়। এ সংগ্রাম খুব জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী। সতর্কতা অনেক বাড়িয়ে দিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই হবে। শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণী সংগ্রাম সঠিক ভাবে বুঝতে হবে এবং সমাধান করতে হবে। তা না হলে চীনের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশ উল্টো পথে চলে আবার পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবে। একথা এখন থেকে প্রতি বছর, প্রতি মাস, এবং প্রতিটি দিন, নিজেরা নিজেদের মনে করিয়ে দেবে

যাতে এই সমস্যা সম্বন্ধে চেতনা অটুট থাকে এবং যাতে মার্কসবাদী লেনিনবাদী লাইন ঠিক থাকে।

শিল্পে দুই লাইনের দ্বন্দ্ব ইতিপূর্বে মোটামুটি দেখিয়েছি। কৃষির ব্যাপারে দুই লাইনের দ্বন্দ্বেরও উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটু বলি। লিউ কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দারুণ বিরোধী এবং সমবায় গড়ার কাজকে ভেতর থেকে ধ্বসিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সব সময় ব্যস্ত ছিল। যেসব চাষী আগে গরীব ছিল তারা যখন নিজেদের সংগঠিত করবার দাবী তুলল লিউ তখন তাদের গালাগাল করল। ১৯৫০এর জানুয়ারীতে সে বলল যে তারা দেউলে, তাই ব্যক্তিগতভাবে চাষ-আবাদ করবার মুরদ তাদের নেই। পরের বছর জুলাই মাসে লিউ কৃষিতে পরস্পর সাহায্যের সংস্থাগুলো সমবায়ে পরিণত করবার সঠিক প্রস্তাবকে "ভুল এবং কৃষিতে কাল্পনিক সমাজ-তন্ত্র" বলে উড়িয়ে দিল। লিউ ধনী কৃষককে ভিত্তি করে কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার সমর্থক অর্থাৎ সে কৃষিকে পুঁজিবাদের পথে চালাতে চায়। মাও ৎসে-তুং কিন্তু কৃষি এবং হাতের কাজের কারিগরি দুটোকেই ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অথচ সক্রিয়ভাবে আধুনিক করে তোলবার এবং যৌথ রূপ দেবার পক্ষে। তাঁর ১৯৪৯এর ৫ই মার্চের রিপোর্টে একথা আছে। যদি 'এক পরিবারের এক খামার' এই স্তরে কৃষিকে রেখে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হত তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই গরীব চাষীরা চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ইত্যাদির জন্যে অন্যত্র মজুর খাটত আর আরও কিছু দিন পরে তাদের জমি বিক্রি করে ফেলতে বাধ্য হত। উৎপাদকদের আর ক্রেতাদের কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতি এবং সমবায় ঋণদান সমিতি গড়ে তুলে অগুণতি সাধারণ চাষী আর হাতের কাজের কারিগররা শুধু যে আত্মরক্ষা করতে পারবে তাই নয়, যৌথ ভাবে কাজ করার সুবিধে কি তা ভালো করে বুঝতে পারবে। আমরা আগেই দেখেছি যে মাও তাঁর ৫ই মার্চের রিপোর্টে বলেছেন, যদি শুধু রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে এবং সমবায় মারফৎ যৌথ মালিকানা না থাকে তাহলে মেহনতী মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাকে যৌথ মালিকানার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে, অসম্ভব হবে নয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অগ্রসর হওয়া, অসম্ভব হবে রাষ্ট্র-ক্ষমতার ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বকে সুদৃঢ় করা। তাই নয়া গণতান্ত্রিক

অর্থনৈতিক কাঠামোর পাঁচটা ভাগ হল: এক, রাষ্ট্রীয় মালিকানা (সমাজতান্ত্রিক); দুই, সমবায় (আধা-সমাজতান্ত্রিক); তিন, পুঁজিবাদী (ব্যক্তিগত); চার, বেসরকারী (ব্যক্তিগত) এবং পাঁচ রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী মালিকানা (যুক্ত)।

কিন্তু লিউ তার প্রতিক্রিয়াশীল লাইন ছাড়বার পাত্র নয়। মাও যখন কৃষি উৎপাদকদের সমবায়গুলোর উচ্চ প্রশংসা করে চলেছেন এবং অন্যদের বলছেন এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে তখন লিউ সেগুলোর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েই চলল। সে প্রথমে সমবায়গুলো গড়ার আয়োজনকে বলল 'অ্যাডভেঞ্চারিজম' বা হঠকারিতা। ১৯৫৫তে যখন মাও ৎসে-তুং পিকিংএ অনুপস্থিত ছিলেন তখন লিউ ক্ষ্যাপার মতো সমবায়গুলোর ওপর হামলা করল। দুমাসের মধ্যে সে দুলক্ষ সমবায় সমিতি ভেঙ্গে দিল। শয়তান যুক্তি দেখাল যে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যাপক হারে তৈরি না হলে যৌথ কৃষি সফল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ১৯৫৫য় প্রকাশিত "চীনের গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক জোয়ার" নামের প্রবন্ধ-সংকলনটির একটি প্রবন্ধের ভূমিকায় মাও ৎসে-তুং এর তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন কিছু কমরেড আছে যারা ছুরি চালিয়ে সমবায়গুলোকে কেটে বাদ দিতে চান। অথচ দিনের পর দিন গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্র গড়বার উপাদান বা মালমশলা বেড়েই চলেছে। চাষীরা বিপুল সংখ্যায় সমবায় চাইছে। মাও আরও বললেন যে অনেক জায়গায় পার্টির নেতারা জনগণের এই ইচ্ছার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাইছে না। এটা এক বিরাট ত্রুটি। আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন ধরে চলতে হবে। আনন্দের সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে কৃষি সমবায় আন্দোলনকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাও এর পর ঠাট্টা করে বললেন, পার্টি কমিটিগুলো যেন লর্ড শেহ্ যে অবস্থায় পড়েছিল সে অবস্থায় না পড়ে। এই বড়োলোকটি খুব ড্রাগন ভালোবাসত কিন্তু সত্যিকার ড্রাগন যেদিন এল সেদিন ভয়ে তার মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড় হল। পার্টি কমিটিগুলোও বছরের পর বছর সমাজতন্ত্রের কথা অলোচনা করে চলেছে, আজ যখন সমাজতন্ত্র তাদের খোঁজ নিতে এসেছে তখন তারা তার ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল।

মাও এভাবে লিউদের মুখোশ খুলে ফেলার দরুন তাদের ষড়যন্ত্র মাঝপথে আটকে গেল এবং মাও ঘটনাস্রোতকে উল্টো দিকে অর্থাৎ বৈপ্লবিক পথে

চালিয়ে দিতে পারলেন। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগ—ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প এবং বাণিজ্য, হাতের কাজের কারিগরি শিল্প, ইত্যাদি, ইত্যাদি—কৃষকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমাজ-তন্ত্রের পথে এগিয়ে চলল।

পার্টির ভেতরকার একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্রের কথা এখনও বলাই হয়নি। সমাজের মধ্যে এবং পার্টির ভেতরকার দুটো লাইনের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম বড়ো জটিল। ১৯৫৪-র বসন্ত কাল। পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণ অধিবেশনে একটি পার্টিবিরোধী ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করা হল। পার্টি সভ্য হয়ে পার্টির মধ্যে লুকিয়ে ছিল দুজন সুবিধাবাদী আত্ম-উন্নতি-পন্থী কুচক্রী—কাও কাং আর যাও শু-শিহ্। চীনের উত্তর-পূব এবং পূবের দুটো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় উঁচু পদ দখল করে এরা চেষ্টা করল সেই দুটো জেলাকে 'স্বাধীন রাজ্য' করে ফেলতে। কারণ হঠাৎ আক্রমণ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার জন্যে তারা জেলা দুটোকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পেং তে-হুয়েইকে তাদের দলে পেল। ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ায় লিউ শাও-চি খুব ঘা খেল। কারণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় নিশ্চিত ভাবে জানা গেল যে এই সব কিছুর পেছনে লিউ শাও-চির হাত ছিল অনেকখানি। কাও আর যাওকে লিউ কিছুতেই রক্ষা করতে পারল না, কিন্তু কায়দা করে সে পেং তে-হুয়েইকে উদ্ধার করল এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদে তাকে বহাল রাখতে পারল। ষড়যন্ত্রটা চুরমার হওয়ায় দেশের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে অনেক বাধা দূর হল। পার্টি সবাইকে সতর্ক করে দিল যে যতদিন দেশে ও বিদেশে শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে ততদিন এই কাও-যাওর মতো প্রতিবিপ্লবীরাও থাকবে এবং এই ধরণের ষড়যন্ত্রের চেষ্টাও হতে থাকবে। ঠিক এর পরেই যে সমস্যাটা বড়ো হয়ে দেখা দেয় তা হচ্ছে অর্থনীতির যে নতুন বুনিয়াদ তৈরি করা হয়েছে সেটাকে কেমন করে পাকাপোক্ত করা যায়। মনে রাখতে হবে যে বছরটা হচ্ছে ১৯৫৬। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের কঠিন সংকটের বছর। সোভিয়েৎ রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ তার সংশোধনবাদী কর্মসূচী পেশ করেছে। বছরের শেষের দিকে হাঙ্গেরীতে প্রতিবিপ্লব দেখা দিল। তার ফলে অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অত বড়ো না হলেও ঐ ধরণের ঘটনা পর পর ঘটে গেল এবং তাতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব

দুর্বল হয়ে পড়ল আর টিটোর যুগোশ্লাভিয়ার পথ ধরে পুঁজিবাদ আবার সে সব দেশে ফিরে এল। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে বেশীর ভাগ কমিউনিস্ট পার্টিতেই দুই লাইনের তর্ক ঝড় তুলেছে এবং ভাঙ্গন নিয়ে আসছে। বেশীর ভাগ পুরোনো পার্টিই সংশোধনবাদী হয়ে পড়ছে—তারা হারাচ্ছে তাদের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী মনোভাব। গোটা ইউরোপে একমাত্র এন্‌ভার হোজার নেতৃত্বে আলবেনিয়াতে সমাজতন্ত্র রক্ষা পেল। চার দিকের অবস্থা যখন এই রকম তখন চীনে সমাজতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করতেই হবে। তখনকার সমস্যাগুলো নতুন এবং জটিল এবং জনসাধারণের আগের অভিজ্ঞতার বাইরে। এই প্রশ্নগুলোকে সঠিক ভাবে সমাধানের চেষ্টা যাতে জনসাধারণ করতে পারে সেই জন্যে মাও ৎসে-তুং তাঁর "জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলোর সঠিক ভাবে সমাধানের চেষ্টা প্রসঙ্গে" লেখাটিতে দেখিয়ে দেন কি ভাবে কি করতে হবে। খ্রুশ্চভের অনেক তত্ত্ব এতে চুরমার করে দেওয়া হল। ফলে "চীনের খ্রুশ্চভ" লিউ শাও-চির বিরুদ্ধে লড়তেও খুবই সুবিধে হল।

দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এই লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে দখান যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়ও দ্বন্দ্ব, শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম থাকে। তিনি আরও দেখালেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আলাদা আলাদা দুটো দ্বন্দ্ব থাকে—একটা জনগণ ও তাদের শত্রুর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। আরেকটা জনগণের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আমলে বিপ্লব চালিয়ে যাওয়ার মহান্ তত্ত্বটিও মাও ৎসে-তুং এই লেখাটিতে তুলে ধরলেন। লিন পিয়াও বলেছেন যে এই মহান্ রচনা চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের পথের ওপর উজ্জ্বল আলো ফেলছে এবং চলতি মহান্ সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বের ভিৎই হচ্ছে এই লেখাটি।

লেখাটিতে মাও ৎসে-তুং ব্যাখ্যা করে দেখান যে যদিও চীনে উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটেছে, তবু রাজনীতি এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে এই সাফল্য যথেষ্ট নয়। কারণ এখনও পরাজিত জমিদার ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীগুলোর ঝড়তি পড়তি অংশ রয়ে গেছে, এখনও বুর্জোয়াশ্রেণী আছে এবং পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র বদলানোর কাজ সবে শুরু হয়েছে। শ্রেণী-

সংগ্রাম শেষ হয়নি মোটেই। মাও আরও বললেন, শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টি অনুযায়ী জগৎকে বদলাতে চায়, বুর্জোয়া শ্রেণীও তার বিশ্বদৃষ্টি অনুযায়ী জগৎকে পাল্টাতে চায়। এই ব্যাপারে কে জিতবে, সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ, তা এখনও ঠিক মীমাংসা হয়নি। মাও সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "যদি এই জিনিসটা যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবে বোঝা না হয় অথবা একেবারেই বোঝা না হয় তবে চরম গুরুতর ভুল করা হবে এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করবার প্রয়োজনকে অবহেলা করা হবে।"

লিউ শাও-চির যেমন চরিত্র তেমনি সুরে সে কথা বলল—মাও ৎসে-তুং-এর একেবারে উল্টো কথা। ১৯৫৬তে লিউ বলেছিল, "চীনে সমাজতন্ত্র আর ধনতন্ত্রের মধ্যে কে জিতবে সে প্রশ্নের সমাধান ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।" তার মতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ফলে শ্রেণী সংগ্রাম মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, দেশের ভেতরে যে শত্রুরা ছিল তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, জনগণ ও তাদের শত্রুদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব শেষ হয়েছে। সে আরও বলল যে চীনের পুরোনো বুর্জোয়া শ্রেণী এখন "নতুন" শুদ্ধ বুর্জোয়া শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে, জমিদার ও অন্য শোষক শ্রেণী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

লিউ এই সব অদ্ভুত কথা বলতে লাগল, "আমাদের দেশে শ্রেণী বা শ্রেণী-সংগ্রাম আর নেই। পুঁজিপতি, জমিদার আর ধনী চাষী সবাই সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামিল হবে" ("একজন বিদেশী অতিথির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা," জুলাই ১৩, ১৯৫৬)। তাই "আর বিপ্লবী সংগ্রাম থাকবে না, ভূমি-সংস্কারও না, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরও না। বীরপুরুষদের বীরত্ব দেখাবার কোনও যুদ্ধক্ষেত্র থাকবে না, কারণ আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে এমন কোনও জমিদার শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণী থাকবে না" ("শাংহাইয়ে পার্টির সংগঠক কর্মীদের সম্মেলনে ভাষণ", এপ্রিল ২৭, ১৯৫৭)। লিউ শ্রেণী শত্রুদের এই-ভাবে আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করে তাদের ষড়যন্ত্রে উৎসাহ যোগাল। সে বেহায়ার মতো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে বলল, "এমন কোনও ব্যবস্থা নেই যা পুরোপুরি ভালো" এবং "শুধু আমাদের ব্যবস্থাকে ভালো বলে ধরে নিয়ে অন্য সব ব্যবস্থাকে খারাপ বলা ঠিক নয়" ("বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা," জুন ১৭, ১৯৫৬)।

ষড়যন্ত্রীরা আঘাত হানতে বেশী দেরী করল না। হাঙ্গেরীর প্রতিবিপ্লবী ঘটনা চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লববিরোধীদের মনে উৎসাহ জাগালো। চীনেও হাঙ্গেরীর মতো একটা ঘটনা ঘটলে তারা খুশী হয়। কতকগুলো খবরের কাগজ এবং বইয়ের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার, ছাত্র-বিক্ষোভ আর কলকারখানায় কিছু স্ট্রাইক থেকে বোঝা গেল কালো হাওয়া এখানেও বইতে শুরু করেছে। ধর্মঘটে অবশ্য খুব সামান্য শ্রমিকই যোগ দিয়েছিল। স্ট্রাইকের কারণ আমলাতন্ত্রের অবহেলায় শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী অপূর্ণ থাকা। ধর্মঘটীরা অন্যায় দাবী নিয়েও কোথাও কোথাও আসরে নেবেছিল কারণ তারা তাদের সাময়িক ও ব্যক্তিগত দাবীগুলোকে ভুল করে বড়ো করে দেখছিল, সকলের যৌথ স্বার্থের কথা ভাবছিল না, বুঝছিল না যে সমাজতন্ত্র গড়ার সমস্যা কত রকমের এবং তা কত জটিল। কিছু তরুণের উত্তেজনার কারণ এই যে অতীতের তুলনায় যে উন্নতি হয়েছে তা তারা বুঝতে পারল না এবং এমন সব দাবী করতে লাগল যেগুলো তখন মেটানো সম্ভব ছিল না।

মাও বললেন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের আমলে এই সব অভিযোগ শান্তিপূর্ণ ভাবে মেটানো যায় কারণ এগুলো হচ্ছে জনগণের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। 'ঐক্য, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা, ঐক্য' এই সূত্র অনুযায়ীই এহেন দ্বন্দ্ব মেটানো যায়। কিন্তু একদল বুর্জোয়া রাজনীতিক এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী আছে যারা মরীয়া হয়ে চায় যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বাতিল হোক। তার জন্যে তারা বলপ্রয়োগ করতেও প্রস্তুত। তারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারের জন্যে আন্দোলনের ঝড় তুলল। ১৯৫৬-র ১৬ই নভেম্বরের এক বক্তৃতায় লিউ বলল একটা রাজনৈতিক মন্ত্রণা-সভা চাই। সেটা সংসদের উচ্চতর সভা হিসেবে কাজ করবে আর 'জাতীয় জনগণের কংগ্রেস' হবে সেই সংসদের নীচের সভা। এই কাঠামোর মধ্যে একটা পার্টি বসবে ক্ষমতার গদীতে আর আরেকটা হবে বিরোধী পক্ষ। পালা করে দুই পার্টি শাসন ক্ষমতা ভোগ করবে।

এই ভাবে যখন দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা আরম্ভ হল তখন মাও ৎসে-তুং-এর সর্বহারার সদর দপ্তর এই আক্রমণকে কমিউনিস্ট-বিরোধী, গণবিরোধী এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী বলে চিহ্নিত করল এবং জনগণ এবং তাদের শ্রেণী শত্রুর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বলে ঘোষণা করল। মাও

সঠিক ভাবে এই দক্ষিণপন্থী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ বলে মনে করলেন। লিউ কিন্তু দক্ষিণদের পক্ষ নিয়ে তাদের আক্রমণকে সমর্থন করল এবং বলল যে তাদের বিরুদ্ধে মাওর আন্দোলন সমাজের 'গণতান্ত্রিক উপাদান' আর পার্টির মধ্যে বিভেদ এনে দিচ্ছে। লিউ আরও বলল যে তখনকার অবস্থায় সরকারের একমাত্র কাজ হচ্ছে জনগণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনগুলো মেটানো। উত্তরে মাও বললেন, জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কিসের জন্যে? তার প্রধান কাজই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলোকে আর দেশের মধ্যেকার যে শোষকরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বাধা দেবে তাদের দমন করা, যারা সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডকে ধ্বংস করতে চায় তাদের দমন করা অর্থাৎ জনগণ আর শত্রুদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সমাধান করা। একনায়কত্বের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে দেশের ভেতরে বিদেশী শত্রুর ধ্বংসমূলক কাজ বা আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। এই একনায়কত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের জনগণের পক্ষে শান্তিপূর্ণ শ্রমে আত্মনিয়োগ সম্ভব করে তোলা, চীনকে সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা—শিল্পে, কৃষিতে, বিজ্ঞানে সংস্কৃতিতে চীন যেন সত্যি সত্যি আধুনিক হয়ে ওঠে। মাও ৎসে-তুং-এর এই সর্বহারার লাইন আবার জয়লাভ করল। জীবনের বাস্তব সত্যগুলোকে খাটো করে দেখাচ্ছিল যে বুর্জোয়া লাইন তার আবার হার হল।

চার

কি করে সমাজতন্ত্র সবচেয়ে তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা যায় এই নিয়ে দুই লাইনের বিরোধ দেখা দিল। মাও ৎসে-তুং তাঁর জনগণের লাইন উপস্থিত করলেন। বললেন, সর্বশক্তি দিয়ে কাজে লাগো, লক্ষ্য উঁচু রাখো—যাতে সমাজতন্ত্র গড়ার ব্যাপারে আগের চাইতে আরও বেশি, আরও দ্রুত এবং আরও কম খরচে ভালো ফল পেতে পারো। সঙ্গে সঙ্গে লিউ বিষ উগ্‌রে বলল, ভাবনা চিন্তা না করে অত তাড়াহুড়ো করবার কি হয়েছে, অন্যদেরও অন্য কর্মসূচী উপস্থিত করার অধিকার আছে, বিশেষ করে যারা সতর্ক করে দিয়ে বলছে শামুকের মতো ধীরগতিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলো।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮। এই আশ্চর্য বছরগুলোতে চীনের জনগণ সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে সমাজতন্ত্রের পথে অসাধারণ উন্নতি করল। বিশ্ব বিখ্যাত "চীনের বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাস"-এর লেখক ডক্টর যোজেফ নীডহ্যাম গত বছরের শেষের দিকে তাঁর "মানুষের দীর্ঘ যাত্রা" প্রবন্ধটিতে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত চীনের প্রধান প্রধান কীর্তিগুলোর পরিচয় সংক্ষেপে এই ভাবে তুলে ধরেছেন :

এক, দেশের ভেতরে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা হল। হাজার হাজার বছর ধরে এরকম শান্তি ও শৃঙ্খলা দেশে দেখা যায়নি এবং কোনো কালেই এহেন অবস্থা ছিল বলে মনে হয় না।

দুই, চাষীদের ওপর জমিদার ও সুদখোর মহাজনের অত্যাচারের অবসান হল। চাষীরা জমি পেল এবং ক্রমে ধাপে ধাপে পরস্পর সাহায্য সংস্থা ও সমবায় গড়ে তোলা হল এবং শেষে ১৯৫৮তে জনগণের কমিউন গড়ে তোলা হল।

তিন, বড়ো বড়ো পূর্ত-কার্য বিশেষ করে নদী-সংরক্ষণ, বন্যা-নিরোধ এবং জলসেচের ব্যবস্থা হল, নতুন বন তৈরি করা হল আর এই প্রথম সারা দেশকে রেল লাইন ও বাঁধানো রাস্তার জাল দিয়ে ছেয়ে ফেলা হল।

চার, পরিকল্পনার ভিত্তিতে খনিজ সম্পদের উন্নতি করা হল এবং সোভিয়েতের সাহায্য নিয়ে এই প্রথম দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে লক্ষ রেখে বিজ্ঞান-সম্মত প্ল্যান অনুযায়ী একটি আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা হল।

পাঁচ, মুদ্রাস্ফীতির অবসান এবং বিশ্বের সবচেয়ে স্থিতিশীল কারেন্সি বা মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করা হল—যে কারেন্সির ক্রয়-ক্ষমতা না কমে বরং বেড়েছে।

ছয়, এর আগের পুরুষের লোকদের মধ্যে ছাড়া সর্বত্র নিরক্ষরতাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হল।

সাত, অবৈতনিক শিক্ষার বিপুল প্রসার হল, বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হল।

আট, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যা, ভূবিদ্যা, কৃষি, জৈবরসায়ন এবং চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষণার জন্যে প্রচুর অর্থ সাহায্য দেওয়া হল।

নয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে গণ-আন্দোলন সহজ সরল উপায়ে নাটকীয় ভাবে শিশু-মৃত্যু এবং সাধারণ মৃত্যুর হার কমিয়ে দিল এবং জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করল।

দশ, মৌলিক সমাজসংস্কার, যেমন—বিবাহ আইন (সামন্ত যুগের বিবাহ প্রথা বাতিল করে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া), সমান কাজের জন্যে সমান বেতন; আঞ্চলিক কমিটিগুলোর মারফৎ গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন, আরও উপযুক্ত পরিমাণ পেনসন এবং স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি, ইত্যাদি করা হল।

১৯৫৮ সালে মাও যখন তাঁর "তিনটি লাল পতাকা" তুলে ধরলেন, জনতা তখন সেগুলো দারুণ উৎসাহে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল। এই "তিনটি লাল পতাকা" হল মাওর 'জনগণের লাইন', শিল্পে 'সামনের দিকে বিরাট লাফ' আর গ্রামাঞ্চলে 'জনগণের কমিউন'। চীনের ইতিহাসে এল এক অবাক্-করা কর্মকাণ্ডের যুগ। কোটি কোটি নির্ভীক মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করতে শুরু করল। ঘুম হল কি না, খাওয়া হল কি না—সে দিকে লক্ষ নেই, যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করে দেশকে তারা সামনের দিকে এগিয়ে দেবেই দেবে। কিছু ভুল নিশ্চয়ই হল, কিন্তু এতো বড়ো গণ-আন্দোলনে ভুল তো হবেই, হতে বাধ্য। ভুলের পাশে লাভ খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় লাভের তুলনায় ভুল কিছুই নয়। 'সামনের দিকে বিরাট লাফ' আশ্চর্য ভাবে সফল হয়েছে। সারা বিশ্বের মানুষ স্বীকার করেছে যে অর্থনীতির দিক থেকে আর বিজ্ঞান এবং এঞ্জিনিয়ারিংএ চীন যে পরে এত উন্নতি করেছে তার ভিৎ তৈরী হয়েছিল এই তিন লাল পতাকাকে কেন্দ্র করে যে অসাধারণ কর্মকাণ্ডের যুগ এসেছিল সেই আশ্চর্য যুগে। এই অগ্রগতি ঠেকাতে না পেরে লিউ হাত কামড়াতে লাগল আর এর নিন্দা শুরু করল। বিশ্বময় প্রতিক্রিয়াশীলরা তখন চীনের 'সামনের দিকে বিরাট লাফ'-এর নিন্দায় পঞ্চমুখ কারণ সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি তাদের বুকে শেলের মতো লাগে। লিউ এই খেউড়ে যোগ দিল। সমাজতন্ত্রকে ঠেকানো যাচ্ছে না, কি আফশোষ!

তবু চেষ্টা ছাড়ে না লিউ। ১৯৫৯-এর আগস্ট মাসে লু শান-এ রাজনৈতিক ব্যুরোর সভা বসল। সেখানে পার্টির ভেতরকার দ্বন্দ্ব একটা চরম রূপ নিল। লিউ এবার পেং তে-হুয়েইকে সামনে এগিয়ে দিল। পেং

"তিনটি লাল পতাকা"-র ওপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বলল ওগুলো হচ্ছে 'পেতিবুর্জোয়া পাগলামো'। যে ত্রুটিগুলো তখন প্রায় দূর হয়ে এসেছে এবং যেগুলো ছিল একান্তই সাময়িক সেগুলো সে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরল তার বক্তৃতায়। মাও ৎসে-তুং নিজে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করলেন, দেখালেন দোষত্রুটি সত্ত্বেও সাফল্য দারুণ হয়েছে, আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। তারপর মাও আসল কথা পাড়লেন। বললেন, আজকের দিনের প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দক্ষিণপন্থীরা পার্টিকে আক্রমণ করছে, জনগণকে আক্রমণ করছে আর আক্রমণ কারছ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের অসাধারণ উৎসাহকে। তিনি এই দক্ষিণপন্থী আক্রমণকারীদের নাম দিলেন রাজনৈতিক ফাটকাবাজ বা জুয়াড়ী। দক্ষিণরা রেগে অস্থির। দারুণ তর্ক হল। ভালোই হল। যুক্তির ঝড়ে পেং তে-হুয়েইর মুখোশ গেল উড়ে। তার সত্যিকার চেহারা বেরিয়ে পড়তেই দেখা গেল তা অসহ্য। সুতরাং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর চাকরী থেকে তাকে বরখাস্ত করা হল। বুকে অনেক ব্যথা নিয়ে লিউ দেশময় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করে বোঝাতে চেষ্টা করল যে পেং তে-হুয়েইকে বরখাস্ত করা 'ভুল' হয়েছে। প্রথমটা লিউ লু শান সভার দলিলকে পাল্টে নামকে ওয়াস্তে "বামপন্থী বিচ্যুতি"র বিরুদ্ধে, আসলে "তিনটি লাল পতকা"র বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার হিসেবে তাকে ব্যবহার করতে চাইল। ...র সে সরাসরি লু শান সভাকে আক্রমণ করে বলে বসল, "লু শান সভা একটা ভুল করেছে। এই সভার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত হয়নি" (সিনানে সংগঠক কর্মীদের সভায় ভাষণ, জুলাই ৯, ১৯৬৪)।

লিউ সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করত মাও ৎসে-তুং-এর এই বিখ্যাত কথাটিকে, "রাজনীতির নির্দেশ মেনে চলো।" কথাটার মানে হচ্ছে এই যে সব কাজে রাজনৈতিক চেতনাই হবে অগ্রগতির মূল চালক-শক্তি। লিউ শয়তানটার উদ্দেশ্য ছিল 'টেকনিক' বা প্রয়োগবিদ্যায় দক্ষতার ওপর জোর দিয়ে বুর্জোয়া এক্স্‌পার্ট বা গুণীদের উঁচু পদে বসানো। এটা হবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার শুরু। ক্রমে লিউ করবে কি শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্রদের অর্থাৎ গরীব ও মধ্য চাষীদের নীচের স্তরের অর্থাৎ "ছোটোলোকদের" হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাকে জোরদার করবে। সুতরাং লিউ মোটেই চায় না যে সর্বহারার মতাদর্শ জনগণের

মধ্যে ঢুকে তাদের জঙ্গী করে তোলে। নানা কায়দায় সে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারার প্রচারকে ঠেকাতে চেষ্টা করল।

পাঁচ

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লিউর এজেন্টরা বেশ সক্রিয় ছিল। এদের মধ্যে চৌ ইয়াং-এর জুড়ি মেলা ভার।

জনগণের প্রজাতন্ত্রের পুরো দুবছর বয়েস তখনও হয়নি। ১৯৫১ সাল। ভূমিসংস্কার ও প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার আন্দোলন তখন পুরো দমে চলছে। বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সামন্তবাদের ঝড়তি-পড়তি অংশ এক জোট হয়ে ষড়যন্ত্র করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর সাংস্কৃতিক আঘাত হানতে শুরু করল। তারা একখানি ফিল্ম বার করল। নাম "উ সুন-এর জীবন-কথা"। উ সুন ছিল চিং রাজ বংশের রাজত্বের সময়কার একজন প্রতিক্রিয়াশীল বড়ো জমিদার, সুদখোর মহাজন এবং ঠগবাজ লোক। কিন্তু "উ সুন-এর জীবন-কথা" ছবিটিতে এই বদমায়েসকে করা হয়েছে একজন মহান্ লোক যিনি গরীব চাষীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ দেবার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। চৌ ইয়াং ও তার সুবিধাবাদী গ্রুপ এই ছবিটি তৈরির ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। ছবিটি প্রচার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে উল্টো হাওয়া বওয়ানো! ছবিটিতে জমিদারশ্রেণী ও তাদের পা-চাটাদের উচ্চ প্রশংসা ছিল, লজ্জাহীন দাসত্ব ও আত্মসমর্পণের পক্ষে প্রচার ছিল আর ছিল কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা। মুক্তিযুদ্ধ সফল হওয়ার অনেক আগেই কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলরা এই নোংরা ফিল্মটি তৈরি করবার কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজ শেষ না হতেই মুক্তি ফৌজের কামান গর্জন শোনা গেল। কুয়োমিনতাং-এর শয়তানরা যে ছবি অর্ধেক তৈরী করে ফেলে রাখতে বাধ্য হয়েছিল চৌ ইয়াং-এর সংশোধনবাদী গ্রুপের এক চাঁই সিয়া ইয়েন দেশের মুক্তির পর নিজে তদ্বির-তদারক করে সেই ছবিটিকে সম্পূর্ণ করল। প্রতিবিপ্লবী কাজে কি নিষ্ঠা! ছবিটি দেখানো শুরু হতে

হতেই পার্টির ভেতরের এবং বাইরের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছবিটি সম্বন্ধে জোর ঢাক পেটানো শুরু করল। তারা জনসাধারণকে ডাক দিয়ে বলল উ সুনের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই প্রচারকরা চেয়েছিল যে মেহনতী শ্রেণী যেন উ সুনের মতো জমিদার শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর পায়ে পড়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মাও ৎসে-তুং নিজে "উ সুনের জীবন-কথা"র সমালোচনার সূত্রপাত করেন। মে'র ২০ তারিখে তিনি রেনমিন রিবাও পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম "উ সুনের জীবন-কথা ফিল্মটি সম্পর্কে আলোচনার প্রতি একটু গুরুতর মনোযোগ দিন।" এই প্রবন্ধটিতে তিনি খুব ধারালো ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির সেই সব সদস্যদের আক্রমণ করেন যাদের "মার্কসবাদে পুরোপুরি দখল আছে বলে শোনা যায়"। এই মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মনে রাখতে হবে চৌ ইয়াং তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার বিভাগের সহকারী পরিচালক এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের মধ্যেকার নেতৃস্থানীয় পার্টি সদস্যদের গ্রুপের সম্পাদক। সে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের ভাব নিয়ে বলল, "অনেক দিন আগে আমি 'উ সুনের জীবন-কথা' দেখেছিলাম।" আসলে কিন্তু তার অনুমতি নিয়েই দেশময় ছবিটি দেখানো হয়েছিল। মাও ৎসে-তুং-এর চেষ্টায় উ সুনের সত্যিকার ইতিহাস জানার জন্যে একটা তথ্য সংগ্রহের দল তৈরী হল। এই তথ্য সংগ্রহের কাজে চৌ ইয়াং-এর লোকেরা নানা কায়দায় বাধা দিল। কিন্তু জনগণের সাহায্যে অনুসন্ধানের কাজ চলল। তথ্য যা আবিষ্কার হল তাতে স্পষ্ট প্রমাণ হল যে উ সুন ছিল একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল বড়ো জমিদার, সুদখোর মহাজন এবং ঠগ।

১৯৫৪ সাল। তখন চীনের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর জীবনের গভীরে প্রবেশ করছে। ইউ পিং-পোর "'লাল কুঠরীর স্বপ্ন' সম্বন্ধে আলোচনা" বইখানির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। পার্টি তার সাধারণ লাইন হিসেবে তখন প্রচার করেছে যে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে এবং কৃষিতে, হাতের কাজের কারিগরিতে এবং পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর আনতে হবে। বুর্জোয়া শ্রেণীর এসব জিনিস মোটেই পছন্দ হবার কথা নয়। তারা তাই সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ওপর

আক্রমণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ব্যাকুল ভাবে পার্টির ভেতর দালাল খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সময় কাও আর যাওর পার্টি নেতৃত্ব দখল করবার ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। স্তালিনের মৃত্যু হয়েছে, তাই এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধুনিক সংশোধনবাদের প্রতিবিপ্লবী ঝোঁক ক্ষ্যাপার মতো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। চীনের শিল্প-সাহিত্যের ওপর এর প্রভাব পড়ল। পার্টির ভেতরে এবং বাইরে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা সক্রিয় হয়ে ওঠল। পার্টির ভেতরকার সংশোধনবাদীদের পাণ্ডা ছিল চৌ ইয়াং। এই সংশোধনবাদীরা বুর্জোয়া "পণ্ডিতদের" প্রশংসা করে করে একেবারে আকাশে তুলে দিত। আরেক দিকে তারা উঠতি মার্কসবাদী শক্তিগুলোকে জবরদস্তি করে দাবানোর চেষ্টা করত। হু শি-র প্রতিবিপ্লবী ভাববাদী দর্শনকে তারা পুরো মদৎ দিত অথচ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে কেউ যদি সমালোচনা করত তাকে নির্দয় ভাবে দমন করত। এই ভাবে তারা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালাত। মাও ৎসে-তুং নিজে উদ্যোগী হয়ে "'লাল কুঠরীর স্বপ্ন' সম্বন্ধে আলোচনা" বইখানি আর হু শি-র প্রতিবিপ্লবী মতাদর্শের সমালোচনা শুরু করেন। মাও পার্টিকে একটা চিঠিতে জানালেন যে কিছু লোক নিজেদের "কেউ কেটা" মনে করে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর সমালোচনার গলা টিপে ধরে। মাও "উ সুনের জীবন-কথা"-র সঙ্গে "চিং রাজদরবারের ভেতরকার কাহিনী" ফিল্মটির উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় ফিল্মটি ১৯৫০-এ পিকিং-এ দেখানো হয়। আমরা ইতিপূর্বে এই ছবিটির উল্লেখ করেছি। দাসমনোভাব এবং সাম্রাজ্য-বাদের কাছে আত্মসমর্পণের পক্ষে প্রচার করাই ছিল এই নোংরা ফিল্মটির উদ্দেশ্য। এই কাজ করতে গিয়ে ফিল্মটি বক্সার বা ঈ হো-তুয়ান আন্দোলনের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা প্রচার করে। মাও ৎসে-তুং বলেন যে ছবিটি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ছবি অথচ দেশময় এটাকে দেখিয়ে বেড়ানো হচ্ছে। তিনি আরও বললেন যে যদিও "উ সুনের জীবন-কথা"-র সমালোচনা করা হয়েছে তবু তা থেকে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। ইউ পিং-পোর ভাববাদী দর্শনকে সহ্য করা হচ্ছে এবং "কেউ কেটা নয়" এমন লোকেরা পিং-পোর সমালোচনা করে যে সব প্রবন্ধ লিখছে সেগুলোকে প্রকাশ করবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। যারা এই সুযোগ দিচ্ছে না তাদের সর্দার হচ্ছে চৌ ইয়াং। দলের অন্য পাণ্ডারা হচ্ছে ভিং লিং, ফেং সুয়ে-ফেং ইত্যাদি।

১৯৫৪-৫৫তে হু ফেং-এর প্রতিবিপ্লবী জোটের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে এই সংগ্রাম পরিচালনা করল। হু ফেং একজন প্রতিবিপ্লবী দলত্যাগী বেইমান। সে গোপনে পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। মুক্তি যুদ্ধ সফল হওয়ার পর সে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একটা চক্রের সঙ্গে সামিল হয়। উদ্দেশ্য প্রতিবিপ্লবকে মদৎ দেওয়া। চৌ ইয়াং-এর মতাদর্শ মূলত হু ফেং-এর মতোই ছিল। হু ফেং-এর মতো সে অনবরত প্রচার করত "আর্টের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতাই হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি" এবং সে মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টি ও মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারার বিরোধিতা করত। হু ফেং-এর মতোই সে সাহিত্য ও শিল্পকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের স্বার্থে ব্যবহার করার বিরোধী ছিল এবং মেহনতী জনগণের সংগ্রামের সাথী যে লেখকরা তাদেরও বিরোধী ছিল। হু ফেং-এর মতোই চৌ ইয়াং সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখার বিরোধী ছিল কারণ তার মতে লেখকের বিষয়বস্তু বাছাই করবার ব্যাপারে "পূর্ণ স্বাধীনতা" থাকা দরকার। হু ফেং-এর মতোই সে বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রচার করত এবং শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা করত। চৌ বলত, "লেখা হচ্ছে একজন লেখকের জীবনকে ভালো করে বোঝার প্রক্রিয়া," "বস্তুজগৎ ও মনের জগতের পুরোপুরি মিশে যাওয়া," "একেবারে গলে গিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া"। এই সব অনেক ধোঁয়াটে কাব্যিক কথা বলে সে হু ফেং-এর মতো সাহিত্য রচনায় চরম ভাববাদী আদর্শের সমর্থন করত। হু ফেং-এর মতোই সে মনে করত যে পশ্চিমী দুনিয়ার বুর্জোয়া সাহিত্য ও শিল্পকলা হচ্ছে সংস্কৃতির সব চেয়ে উঁচু চূড়া, উন্নতির চরম শিখর। তবে চৌ ছিল চরম ধূর্ত। তাই যখন হু ফেং-এর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করে প্রগতিশীলদের পক্ষ থেকে বলা হল যে ঐ শয়তান ও তার দলবলের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট. পার্টি এবং মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারা তখন চৌ ইয়াং শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাও ৎসে-তুং-এর লাইনের পক্ষে মহা ভক্তের মতো প্রচার শুরু করল। তার লাল ঝাণ্ডা ওড়ানো মানে রংএ ছোপানো মেকী "লাল ঝাণ্ডা" দিয়ে শ্রমিক-কৃষকের রক্তে লাল সত্যিকারের লাল ঝাণ্ডাকে ঘায়েল করার চেষ্টা। চৌ-র সুবিধাবাদ আর জোচ্চুরির অন্ত ছিল না। ভুল ধরা পড়লেই সে মাও-ৎসে-তুং-এর ভক্ত সাজত আর আত্ম-সমালোচনা করত। তারপর আবার

সুযোগ বুঝে বেশী আত্ম-সমালোচনা হয়ে গেছে বলে উল্টো সুর গাইত। বার বার এই কায়দা সে নিয়েছে। কিন্তু শেয়াল লেজ লুকোতে পারে না। হু শি আর হু ফেং-এর গরম সমালোচনার আবহাওয়াটা একটু নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চৌ ইয়াং আবার দক্ষিণপন্থী সাহিত্যের ঝাণ্ডা নিয়ে পথে নাবল। ১৯৫৫-র নভেম্বরে সে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করল। নাম— "লীভস্ অব্ গ্রাস্ এবং ডন্ কুইক্সটের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি"। তখন কৃষি সমবায় সম্পর্কে মাও ৎসে-তুং-এর রিপোর্ট বেরিয়েছে এবং তাতে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের খুব জোরদার সমালোচনা করা হয়েছে। আরেক দিকে তখন এক বিরাট সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে গ্রামাঞ্চল তোলপাড়। মাও ৎসে-তুং সাহিত্য ও শিল্প কর্মীদের গ্রামাঞ্চলে চলে যাবার ডাক দিয়েছেন কারণ তাঁদের যোগ দিতে হবে জনগণের আগুন-ভরা আন্দোলনে আর লিখতে হবে রাশি রাশি লেখা "লক্ষ লক্ষ" বীরদের সম্বন্ধে। গণ-আন্দোলনের এমন একটা বন্যার মুহূর্তকে চৌ ইয়াং বেছে নিল হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে ডন কুইক্সটের "উঁচু দরের সুনীতির আদর্শ" প্রচারের জন্যে। অথচ কুইক্সটের আদর্শ মানেই হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সুনীতির আদর্শ। কুইক্সটের প্রশংসার চেয়েও চৌ ইয়াং-এর হুইটম্যানের প্রশংসা শুনলে বেশী গা ঘিন্ ঘিন্ করে! "লীভস্ অব্ গ্রাস্" বা "ঘাসের পাতা" নামের কবিতার বইটির লেখক আমেরিকার বিখ্যাত কবি হচ্ছেন এই হুইটম্যান্। তিনি উনিশ শতকের একজন বুর্জোয়া কবি। চৌ লেখকদের বলল সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার হুইটম্যানী আদর্শ তারা যেন অনুসরণ করে। হুইটম্যানের লেখা থেকে খুঁজে খুঁজে মালমশলা যোগাড় করে চৌ "এক নতুন ধরনের মানুষ"-এর মূর্তি তৈরী করল এবং বলল চীনের জনগণকে সেই আদর্শ মানুষটির অনুকরণ করতে হবে! চৌ মহাপণ্ডিতের ভঙ্গীতে লিখল হুইটম্যানের উল্লেখ করবার মতো কবি-কীর্তি হচ্ছে একটি অপূর্ব "মানব" মূর্তি সৃষ্টি করা। তাঁর কবিতাগুলো পড়ার পর আমরা যেন চোখে দেখতে পাই এই হুইটম্যানীয় ঢঙের মানুষটিকে —এক নতুন ধরণের মানুষ, শক্তিমান্, উদার-হৃদয়, যার আকাঙ্খা উঁচু-দরের, যার হাত দুটো সৃষ্টির কাজে নিপুণ ও কর্মরত আর যার মনে অনন্ত আশা। "সৃষ্টির কাজে নিপুণ ও কর্মরত" হাতের কথা পড়ে কেউ ভাবতে পারেন যে হুইট্ম্যান মেহনতী মানুষের কথা লিখেছিলেন। কিন্তু তা মোটেই

নয়। "ঘাসের পাতা" কাব্যে হুইটম্যান যে "মানব"কে তুলে ধরেছেন সে সংসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবাস্তব কিছু নয় আবার শ্রমিক শ্রেণীর মানুষও নয়, সে হচ্ছে আমেরিকান বুর্জোয়া শ্রেণীর "মানব"। জাতির ইতিহাসের যে আশ্চর্য শুভ লগ্নে কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষক সমাজতন্ত্রের পথ ধরে কৃষি, হাতের কাজ এবং পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল, যখন লক্ষ লক্ষ সমাজতান্ত্রিক বীরের আবির্ভাব ঘটছিল ঠিক তখন চৌ মহাশয় আর কিছু খুঁজে পেল না, মেকী ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া "গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা" আর বুর্জোয়া ধরনের "উঁচু দরের আশা আকাঙ্খা"কে দারুণ প্রশংসা করল এবং "সংগ্রামে অংশগ্রহণ"-এর "দৃষ্টান্ত" হিসেবে তুলে ধরল হুইটম্যানকে। আমেরিকান বুর্জোয়া শ্রেণীর ঠিক ঠিক প্রতিনিধি যে মানুষটি তাকে চৌ বলল "এক নতুন ধরনের মানুষ," "এক চমৎকার উদাহরণ"! আর ডন কুইক্‌সটের নৈতিক আদর্শ হল "উঁচুদরের সুনীতির আদর্শ" যা অনুশীলন করতে হবে এবং অনুকরণ করতে হবে! এটা চৌ ইয়াংএর দিক থেকে খোলাখুলি ভাবে মাও ৎসে-তুংএর চিন্তাধারার বিরোধিতা, ষাট কোটি মেহনতী মানুষের দুনিয়া কাঁপানো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতা। আরেক দিকে চৌ ইয়াংএর এই শয়তানীর উদ্দেশ্য হল শহরে ও গ্রামে বুর্জোয়া ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের কাণে কাণে বলা—দমে যেয়ো না, "চির আশাবাদী" হও এবং দৃঢ় ভাবে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাও আর পুঁজিবাদের পথ আঁকড়ে ধরে থাকো।

আমরা জানি চীনে যে প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধনবাদী স্রোত বইল তার আন্তর্জাতিক কারণ ছিল। সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিক সংশোধনবাদ ঘোমটা ফেলে দিয়ে আসরে নামল এবং তাতে চীনের সংশোধনবাদীরা উৎসাহ পেল। ১৯৫৬তে বিংশ কংগ্রেসের পর একটা প্রকাশ্য সভায় চৌ বলল আমাদের শুধু যে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কাছ থেকেই শিখতে হবে তাই নয়, পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য থেকেও শিখতে হবে। এই প্রসঙ্গে চৌ "মাদাম ক্যুরি" নামে আমেরিকান ফিল্মটির প্রশংসা করল। বলল, ফিল্মটিতে কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। চৌ আরও বলল যে এই কারণেই পুঁজিবাদী দেশের প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

গড়ে তোলা .উচিত। তাদের মধ্যে যা ভালো তা আমাদের নিজেদের মধ্যে নিতে হবে এবং এরকম নিতে নিতেই আমরা পরস্পরের ওপর প্রভাব আনতে পারব।

চৌ ইয়াংএর এই তত্ত্ব "শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের" তত্ত্ব, বিপ্লব-বিরোধী তত্ত্ব। আসলে মার্কসীয় দৃষ্টিতে দেখলে "মাদাম কুরি" একটি প্রতিক্রিয়াশীল ছবি। রুজভেল্টের আমলে তৈরী এ ছবি বুর্জোয়া মানবতা, শান্তিবাদ, ব্যক্তিগত সংগ্রাম, ব্যক্তিগত খ্যাতির পিছনে ছোটা, শ্রেণী সহযোগিতা ইত্যাদি প্রতিবিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্যে তৈরি হয়েছিল। ফিল্মটি প্রচার করল যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সব শ্রেণী ও রাজনীতির ঊর্দ্ধে এবং গোটা মানবজাতির সেবায় লাগে। সুতরাং এই ছবিটির উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চরম মুনাফা লুটতে সাহায্য করা। শ্রমিক শ্রেণী যেন শ্রেণী সংগ্রামের পথ ছেড়ে ব্যক্তিগত চেষ্টায় সমাজের ওপর তলায় উঠতে চেষ্টা করে এই উদ্দেশ্যেই এই বুর্জোয়া প্রচার। চৌ-র কাছে কিন্তু আদর্শটা পছন্দসই এবং কয়েক বছর ধরে তার এবং তার নোংরা দলের পরিচালনায় প্রচুর বজ্জাতি ফিল্ম বার হল। চৌ ইয়াং তার বক্তৃতা ও প্রবন্ধে "প্রচার সাহিত্য"-কে আক্রমণ করল কারণ সে সাহিত্য সর্বহারা শ্রেণী ও কমিউনিজমের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রচার করে। সে "শিল্পীর স্বাধীনতা" দাবী করল লেখার বিষয়বস্তু বাছাই করবার ব্যাপারে। ১৯৫৭র বসন্ত কালে চৌ-এর বজ্জাতি যেন নতুন জীবন পেল। এপ্রিল মাসে চৌ অসংখ্য সভার আয়োজন করল। উদ্দেশ্য আগুন উস্কে দেওয়া, অশান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করা, "কড়াকড়ি"-র বিরোধিতা করা, "বরফ-গলা"-র দাবী করা অর্থাৎ এক কথায় পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনা। চৌ ইয়াং বলল যে যারা কোটি কোটি কমিউনিস্টকে হত্যা করতে বলে তারা যে প্রতিবিপ্লবী হবেই হবে একথা বলা যায় না! লোকটা চরম দক্ষিণপন্থী হলেও অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হলেই সে ভোল পাল্টে মহা বিপ্লবী সেজে বসত।

তিং লিং, চেন চি-সিয়া এবং ফেন সুয়ে-ফেংএর মতো প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুযোগকে ব্যবহার করে সে দেখাতে চাইল যে সে ছিল "বরাবরই নির্ভুল"। চৌ ইয়াং তার "সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিরাট বির্তক" লেখাটিতে লেখক ও শিল্পীদের "দুই জাতের লোক"

হিসেবে ভাগ করে ফেলল—এক জাতের লেখক ও শিল্পী হল "পার্টির সঙ্গে যাদের অন্তরের মিল হয়নি"—যারা যৌথ জীবনের মনোভাব নিয়ে নিজেদের নতুন করে গডতে অনিচ্ছুক" ; আরেক জাতের লেখক ও শিল্পী হল যাঁরা "ইতিমধ্যেই ব্যক্তিত্ববাদ বাতিল করেছেন" এবং "পার্টির সঙ্গে যাঁদের অন্তরের মিল হয়েছে" আর চৌ-র মতে সে নিজে এই দ্বিতীয় দলে পড়ে। কিন্তু ইতিপূর্বে কৌশলে নিজেকে গণ-আন্দোলনের আগুন থেকে বাঁচাতে পারলেও মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড়ের হাতে পড়ে চৌ-র ঝলমলে ছদ্মবেশ খসে পড়ল আর তার বীভৎস নাঙ্গা মূর্তি সবার চোখে ধরা পড়ল।

এই চৌ ইয়াংই ১৯৫৯-এর বসন্ত কালের শুরুতে প্রতিবিপ্লবীদের "মুখ খুলবার" সুযোগ করে দেয়। চু সিন-ফ্যাংকে সে "হাই জুই সম্রাটের কাছে আবেদন করছে" এই বিষয় নিয়ে একটি গীতি-নাট্য চালু করতে বলে। চৌ ইয়াং চু সিন-ফ্যাংকে মাল-মশলাও যোগান দিল। বলল, আজকাল এই ধরনের অপেরা আমাদের চালু করতে হবে কারণ মনের কথা খুলে বলতে প্রত্যেকে ভয় পায়। "প্রত্যেকে" মানে কিন্তু সামান্য কয়েকজন জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী এবং দক্ষিণপন্থীদের দালাল। চৌ ইয়াং-এর উদ্দেশ্য অপেরার সাহায্যে এই প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎসাহ দেওয়া।

চৌ-র বজ্জাতির আরেকটা দিক হল "সামনের দিকে বিরাট লাফ"-এর তীব্র সমালোচনা করা। সে ব্যঙ্গ করে বলেছিল, এক কোটি টন ইস্পাত উৎপাদন করেই এরা নিজেদের এত চমৎকার মনে করে যে এমন কি সোভিয়েৎ ইউনিয়নকেও ঘৃণার চোখে দেখে। একটা সভায় সে "সামনের দিকে বিরাট লাফ"-এর গণ-আন্দোলনের নিন্দা করল, এবং বিপ্লবী গান গাওয়া সম্বন্ধে বলল যে বুড়ী মেয়ে মানুষের গানের সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে—যে গান কেউ শুনতে চায় না। সে টিটকারি দিয়ে বলল মেহনতী মানুষের পক্ষে কবিতা লেখা সম্ভব নয় কারণ কবিতা লিখতে হলে "প্রেরণা" দরকার—সে প্রেরণা বা উৎসাহ কোনও অদৃশ্য শক্তি প্রেরণ করেন অর্থাৎ পাঠিয়ে দেন। মার্কসবাদী বটেন! চৌ ইয়াং বলল যে রেডিও এবং টেলিভিজনে সব সময় মাও ৎসে-তুং-এর প্রতি সমর্থন প্রচারিত হওয়া উচিত নয়। বলল, "রোজ রোজ চেয়ারম্যান মাওর কথা বলা" অন্যায়। কী ন্যায়-অন্যায় বোধ!

সংশোধনবাদীরা একটা পার্টি-বিরোধী চক্র গড়ে তুলে তার নাম দিল "তিন পরিবারের গ্রাম"। তিন জনের এই চক্রের মধ্যে ছিল তিন জন প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী—তেং তো, উ হান আর লিয়াও মো-শা। তারা একটি পত্রিকায় "তিন পরিবারের গ্রাম থেকে টুকিটাকি" এই শিরোনাম দিয়ে লেখা প্রকাশ করত। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, মাও ৎসে-তুংএর চিন্তাধারা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তারা সব রকম জঘন্য পার্টি-বিরোধী কাজ চালাত। ১৯৬১র ১৯এ মার্চ এই "তিন পরিবারের গ্রাম" থেকে "ইয়েনশানে সন্ধ্যাবেলার বৈঠকী গল্প" এই শিরোনাম দিয়ে পর পর অনেক প্রবন্ধ বার হতে লাগল। এই লেখাগুলোরও ঐ একই উদ্দেশ্য—পার্টি, সমাজতন্ত্র ও মাও ৎসে-তুংএর চিন্তাধারার বিরোধিতা করা। লেখাগুলো লিখত প্রতিবিপ্লবী তেং তো, কিন্তু নিজের নাম না দিয়ে সে মা নান-সুন এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করত। উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের ফিরে আসার রাস্তা তৈরি করা।

ঠিক এক সপ্তাহ পরেই, ২৬এ মার্চ তারিখে "ওয়েনিয়ী বাও" পত্রিকাটি "বিষয়বস্তুর সমস্যা" নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ বার করে। সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে এই চরম প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী কর্মসূচী চৌ ইয়াং এবং লিন মো-হান-এর নির্দেশ অনুযায়ী লেখা হয়। এই প্রবন্ধটি গলাবাজি করে স্লোগান দিল: "সব রকম উপায়ের সাহায্যে সাংস্কৃতিক পথটাকে উদার ভাবে খুলে দাও।" কিন্তু প্রতিটি মার্কসবাদী জানে যে পথ হচ্ছে দুটো—সমাজতন্ত্রের পথ আর পুঁজিবাদের পথ। একটাকে খুলতে হলে আরেকটাকে বন্ধ করতে হয়। যদি প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শিল্প-সাহিত্যের পথ খুলে দিতে হয় তবে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সাহিত্যের পথ বন্ধ করে দিতে হয়। চৌ ইয়াংরা উদারতার নামে আসলে তাই চায়! ১৯৬১-তে "শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে দশ দফা বক্তব্য" লেখাটিতে চৌ ও তার দল বলল শিল্প-সাহিত্য রাজনীতির সেবা করবে এই আদর্শটি সংকীর্ণ, এক-পেশে এবং ভুল ধারণা থেকে জন্মেছে। চৌ-র দল বলল "কোনও বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়।" এটা হাঙ্গেরীর সেই প্রতিবিপ্লবী পেটোফি ক্লাবের স্লোগান। আসলে চৌ-রা প্রতিবিপ্লবী আদর্শ নিয়েই চলছিল—তারা শিল্প-সাহিত্যে মাও ৎসে-তুং-এর লাইনের বিরোধিতা করছিল এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টির কেন্দ্রীয়

কমিটির চরম শত্রুতা করছিল। তারা চায় না যে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি নেতৃত্ব দেয় এবং বিষয়বস্তু বাছাই করবার সময় শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এরা বলত সাহিত্যে বৈচিত্র্য চাই। এদের এই স্লোগানের মানে হচ্ছে যে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পরিবর্তে সম্রাট্, রাজা, সেনানায়ক, মন্ত্রী, পণ্ডিত ও রূপসীরা এবং সামন্ত-বুর্জোয়া সমাজের অন্য সব কিম্ভূত জন্তু-জানোয়ারেরা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে যাতে প্রতিবিপ্লবী আদর্শকে আবার প্রতিষ্ঠা করা যায়। "বিশ্বের বৈচিত্র্য" চাই মানে পচে গলে ধ্বসে পড়েছে এমন জমিদার, বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সেই সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের জীবনের কুৎসিত দিকগুলোর "বৈচিত্র্য" শিল্প-সাহিত্যে তুলে ধরতে চাই। শয়তানী আদর্শ আর কাকে বলে! মেহনতী মানুষের মধ্যেকার বীরদের চরিত্র সবার চোখের সামনে বড়ো করে তুলে ধরা আর যাদের শ্রম পৃথিবীর সব উন্নতির মূলে আর যারা সব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছে তাদের সীমাহীন মহিমা প্রচার করাকে চৌ মনে করত "সংকীর্ণ" "এক ঘেয়ে" কাজ। উদার এবং বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-রচনার কাজ হচ্ছে দেশদ্রোহী, পা-চাটা, ষণ্ডা-গুণ্ডা, জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী, দক্ষিণপন্থী বজ্জাতদের মাহাত্ম্য প্রচার, তাদের কথা নানা রঙ চ‌ড়িয়ে ফলাও করে বলে যাওয়া। নোংরা জীবনের ছবি আঁকতেও সংশোধনবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকরা আনন্দ পায়। স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে কথা বলা, মনস্তত্ত্বের নামে মনের এবং শরীরের নোংরামিকে কেন্দ্র করে যৌন জীবনের ছবি আঁকা, তাদের যৌনবিকারগ্রস্ত মনের পাগলামিকে রূপ দেওয়াতেই সংশোধনবাদীদের পরম তৃপ্তি। ১৯৫৯-এ খ্রুশ্চভ নির্লজ্জের মতো শোলোকভ-এর "একটি মানুষের ভাগ্য" বইখানির বিরাট তাৎপর্যের উচ্চ প্রশংসা করে। বলে যে সাধারণ মানুষের জটিল ও বিচিত্র মনের জগৎকে এই বইটি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছে। এই খ্রুশ্চভের চীনে সাকরেদরাও "জটিল ও বিচিত্র মনের জগৎ"-কে রূপ দিতে চাইল কারণ চীনের সাহিত্যিক ও শিল্পীরা শোলোকভ জাতীয় দলত্যাগী সাহিত্যিকদের পথ ধরলে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে সুবিধে হয়। খ্রুশ্চভের "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" ও "সমগ্র জনগণের পার্টি" এই স্লোগানগুলোর মতো সংশোধনবাদী স্লোগান চৌ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়ে এল। বলল "সমগ্র

জনগণের সাহিত্য ও শিল্প" নাকি বিপ্লবী ব্যাপার। মাও ৎসে-তুং-এর "ইয়েনান বৈঠকে শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা"-র পর বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসবে ১৯৬২-র মে মাসে চৌ ইয়াং এক কৌশল করল। উৎসবের সুযোগ নিয়ে সে পিকিং-এ সব বুর্জোয়া পণ্ডিতদের এক বৈঠক ডাকল। সবাই মিলে মাও-এর শিল্প-সাহিত্যের লাইনের বিরুদ্ধে প্রবল ঝড় তুলবার জন্যে। পত্র-পত্রিকায় তারা অনেক প্রবন্ধ ছাপাল। "সমগ্র জনগণের সংস্কৃতি," "সমগ্র জনগণের শিল্প-সাহিত্য" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে তারা মুখ থেকে ফেনা বার করে ফেলল। ইয়েনান বৈঠকে মাও বলেছিলেন যে বিপ্লবীদের সাহিত্য ও শিল্প "প্রথমত শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্যে; তা সৃষ্টি করা হয় শ্রমিক, কৃষক, এবং সৈনিকদের জন্যে এবং তাদের ব্যবহারের জন্যে।" চৌ-র দলের পত্রিকা এই স্লোগান প্রচার করল: "জনগণের সঙ্গে লেখক ও শিল্পীদের সম্পর্ক আরও জোরদার কর!" এমনিতে চটকদার হলেও আসলে এটা পুরোপুরি খ্রুশ্চভের কাছ থেকে ধার করা একটা সংশোধনবাদী স্লোগান। প্রথমত, এই স্লোগান লেখক ও শিল্পীদের বসাচ্ছে হর্তাকর্তাবিধাতার উঁচু সিংহাসনে আর তাদের ডাক দিচ্ছে জনগণের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ করবার জন্যে এবং শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে। দ্বিতীয়ত, "জনগণ" বলতে খ্রুশ্চভ স্পষ্ট ভাবে "সমগ্র জনগণ"-কে বোঝাত এবং "সমগ্র জনগণ" বলতে স্পষ্ট ভাবে শুধু বুর্জোয়া ও মোটা মাইনে-ওয়ালাদের স্তরটাকে বোঝাত। খ্রুশ্চভ-ভক্ত চৌ ইয়াংদের কাছে "জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক" মানে বুর্জোয়া ও মোটা মাইনেওয়ালাদের স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তৃতীয়ত, লেখক ও শিল্পীদের মতাদর্শগত পরিবর্তন যে প্রয়োজন তা এই স্লোগানে অস্বীকার করা হয়েছে। তার মানে, বুর্জোয়া শিল্পী ও লেখকরা তাদের বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টি বজায় রেখে নির্ভয়ে তাদের সমাজতন্ত্র-বিরোধী লেখা লিখে যেতে পারে। চতুর্থত, "পেটোফি ক্লাব" জাতীয় সংস্থাগুলোও "জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করবার" একটা উপায় হতে পারে। তাই যদি হয় তবে প্রতিবিপ্লবী সংস্থাগুলোকে এবং প্রতিবিপ্লবী কাজকে আইনী বলে মেনে নেওয়া এবং তাদের অবাধে চলতে দেওয়ার কোনও বাধা নেই। খ্রুশ্চভের স্লোগানকে চৌ ইয়াং আপনার করে নিয়েছিল শিল্প-সাহিত্যে মাও ৎসে-তুং-এর লাইনের

পাল্টা পথকে প্রচার করবার জন্যে। কারণ মাও বলেছিলেন যে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিনা দ্বিধায় এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে, লড়াইয়ের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

১৯৬২র সেপ্টেম্বরে পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম পূর্ণ অধিবেশনের ঠিক আগে পর্যন্ত চৌ মাও ৎসে-তুং এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতেই লাগল। একদল পার্টি-বিরোধী আত্ম-উন্নতি-পন্থীর সঙ্গে যোগ দিয়ে সে "লিউ চিহ্‌তান" নামের একটি প্রতিক্রিয়াশীল উপন্যাস বার করতে উৎসাহ দেয়। উপন্যাসটির উদ্দেশ্য হল সেই পার্টি-বিরোধী কাও-যাও ষড়যন্ত্রের কাও কাংএর সম্বন্ধে পার্টি যে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা পাল্টানো। চৌ নিজে এই "লিউ চিহ্‌তান" উপন্যাসের পার্টি-বিরোধী লেখককে আপ্যায়ন করে এবং উপন্যাসটিকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেয় এবং প্রশংসা করে বলে যে এটি একটি অনুকরণ করবার মতো "আদর্শ" উপন্যাস। চৌ কোম্পানী এই উপন্যাসটিকে ব্যবহার করল কাও কাংএর পার্টি-বিরোধী অপরাধগুলোকে চূণকাম করবার কাজে, পার্টির ইতিহাসকে মিথ্যা রূপ দেবার কাজে এবং কাও কাং আর যাও শু-শিহ্‌-র পার্টি-বিরোধী মিতালি সম্পর্কে মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে পার্টির নির্ভুল সিদ্ধান্তকে বরবাদ করে দেওয়ার জন্যে। পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম পূর্ণ অধিবেশনে মাও আরেকবার দ্বন্দ্ব তত্ত্ব, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী ও শ্রেণী দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের ওপর জোর দেন এবং চৌ এবং তার দলবলকে সরাসরি সমালোচনা করেন। মাও বললেন, পার্টি-বিরোধী কাজকর্ম চালাবার জন্যে উপন্যাস ব্যবহার করা একটা নতুন কৌশল। কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে গদিচ্যুত করবার জন্যে বরাবরই প্রয়োজন হয়েছে গোড়ায় জনমত সৃষ্টি করা, অর্থাৎ মতাদর্শের জগতে কাজ করা। বিপ্লবীরা এই কাজ করে। প্রতিবিপ্লবীদেরও এই ধরনের জমি তৈরির কাজ করতে হয়। মাও ৎসে-তুং এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি চৌ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ভাল হওয়ার আরেকটা সুযোগ দিলেন। কিন্তু চৌ দুমুখো নীতি চালিয়ে মাওর নির্দেশকে ঠেকাতে চেষ্টা করল। তার দলবল দিয়ে সে তার সংশোধনবাদী কালো লাইনে সর্বহারা শ্রেণীকে আক্রমণ করেই চলল। চৌ কায়দা করে বলল, "খুব বেশি পার্টি-বিরোধী এবং মার্কসবাদ-বিরোধী

বই বার হয়নি” অর্থাৎ পার্টি বাড়াবাড়ি করছে। সে আরও বলল দক্ষিণপন্থী উগ্রতা যেমন খারাপ, উগ্রতার উল্টো সীমান্তে যাওয়াও তেমনি খারাপ। অর্থাৎ বুর্জোয়াদের সমালোচনা বন্ধ করা হোক এবং বিষাক্ত আগাছা-গুলোকে উপড়ে ফেলার দরকার নেই। যেহেতু সর্বহারা শ্রেণী এখন পাল্টা আক্রমণের দিকে এক পা বাড়িয়েই আছে তাই চৌ চরম প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হল। অল্প দিনের মধ্যেই নভেম্বরে শানতুং-এ সে 'কনফুসিয়াস আলোচনা চক্র' বসাল। এই হল তার দিক থেকে পাল্টা আক্রমণ। মুক্তি যুদ্ধ সফল হওয়ার পর এই প্রথম বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থীরা তাদের সামন্তবাদী পূর্বপুরুষদের পূজো করবার এক হাস্যকর আয়োজন করল।

প্রথম ভাগে মাও ভূত সম্বন্ধে নাটক এবং সম্রাট, মন্ত্রী, বিদ্বান্ এবং রূপসীদের কাহিনী রচনাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বললেন যে চৌ ইয়াং, চি ইয়েন-মিং, সিয়া ইয়েন এবং লিন মো-হান-এর নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক মন্ত্রীদপ্তর বা মন্ত্রণালয় চলছে সেটা হচ্ছে “সম্রাট এবং মন্ত্রীদের, বিদ্বান্ আর রূপসীদের” মন্ত্রণালয়। চৌ ইয়াং কিন্তু সেই বছরের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে বলল, ভূত নিয়ে যে নাটক তার পক্ষে প্রচার করলে বুর্জোয়া মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে একথা বলা যায় না। চৌ বলল কাজের একটা ভাগ করে নেওয়া মন্দ নয়—যেহেতু পিকিং অপেরা বিশেষ করে সম্রাট্ ও মন্ত্রীদের কাহিনীকে রূপ দেবার উপযুক্ত আসর সেই জন্যে পিকিং অপেরা তাই করে যাক, অন্য জায়গায় অন্য জিনিস হোক। এ একেবারে 'গুরুদেব' লোক! ডিসেম্বরে মাও আবার বললেন যে নাটক, গাথা, সঙ্গীত, চারুশিল্প, নাচ, সিনেমা, কাব্য ও অন্যান্য সাহিত্য এবং এগুলোর সঙ্গে জড়িত লোকেদের সমস্যা অসংখ্য। অনেক বিভাগেই তখন অবধি সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণ বলতে সামান্যই হয়েছে। চৌ সমালোচনার শক্ত মুঠো থেকে ফস্‌কে যাবার চেষ্টা করে বলল যে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের লাইন সম্বন্ধে কোনও ভুল হয়নি, ভুল হয়েছে বোঝার। জুনে মাও ৎসে-তুং আবার শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করলেন। বিপদ বুঝে চৌ সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে একটা “সংশোধন আন্দোলন”-এর অভিনয় করল। ওটা পুরো ধাপ্পাবাজী। উদ্দেশ্য জনগণকে ধাপ্পা দেওয়া, বাম শক্তিগুলোকে দাবিয়ে দেওয়া এবং নিজেকে ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের রক্ষা করা। নভেম্বর

মাসে এক রিপোর্টে চৌ বলল যে "ইয়েনান বৈঠকে শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা"-র পর থেকে সে চেয়ারম্যান মাওর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। তার শয়তানী কাজের সাঙ্গাৎদের নিজেই সমালোচনা করে এই ধড়িবাজ বলল তাদের লাইনের ভুল হতে পারে কিন্তু তার নিজের লাইন ভুল নয়, অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যে কিছু ত্রুটি হয়েছে মাত্র। মাও ৎসে-তুং-এর ডাকে প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য ও কতকগুলো খারাপ ফিল্মের বিরুদ্ধে শুরুতে সমালোচনা ও বর্জন আন্দোলন আরম্ভ হয়। চতুর চৌ এক দিকে দেখাল যে সে এই সমালোচনার পক্ষে, আরেক দিকে সে অপেক্ষায় থাকল কখন আন্দোলনটাকে দক্ষিণমুখী করবার সুযোগ পাওয়া যায়। সমালোচনার জোয়ার যখন অনেক উঁচুতে উঠল তখন চৌ-রা পিকিং-এ বড়ো বড়ো কাগজের প্রধান সম্পাদকদের এক সভা ডাকল। সেখানে তারা সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলোর তীব্র নিন্দা করল এবং পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। সেপ্টেম্বরে তারা পার্টিকে আক্রমণ করবার পর্যায়ে চলে গেল কারণ তাদের ধারণা হল যে পাল্টা সমালোচনায় জনগণের মুখ বন্ধ করা গেছে। সেখানে মাও ৎসে-তুং-এর লাইনকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করা হল। "চাকরী থেকে বরখাস্ত হাই জুই" নাটকটির বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হওয়ার উনিশ দিন পর চৌ 'অবসর সময়ে লেখেন এমন তরুণ সক্রিয় কর্মীদের জাতীয় সম্মেলন'-এ মাও ও পার্টিকে খোলাখুলি আক্রমণ করল। সর্বহারার মহান্ সাংস্কৃতিক আন্দোলন এসে পড়ল বলে। তাই তার আগুন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শয়তানটা একাজ করল। একমাস বাদে জানুয়ারীতে তার রিপোর্টটি বার হল! এই রিপোর্টে চৌ ইয়াং "হাই জুই"র বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গণ-সংগ্রামের, এমন কি বইটির সমালোচনার, উল্লেখ পর্যন্ত করল না এবং আগাগোড়া মাও ৎসে-তুং-এর লাইনের বিরোধিতা করল। কিন্তু দাবানলকে ছাই চাপা দেয় কার সাধ্য! ইতিমধ্যেই "হাই জুই"র বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণ-সমালোচনা সংশোধনবাদীদের ভীষণ কোণঠাসা করে ফেলেছে। এবারে শয়তানরা মরণ-কামড় দেওয়ার ফিকির খুঁজছে!

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুই লাইনের দ্বন্দ্বের এই সব ঘটনাকে খুঁটিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব যে একটি হচ্ছে লাল লাইন এবং আরেকটি হচ্ছে কালো লাইন। লাল লাইনটি হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যে মাও ৎসে-তুংএর

লাইন। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনে ব্যাপক জনগণ যোগ দিয়েছে, ''সত্তর কোটি সমালোচক" কোনও না কোনও রকমে এই সাংস্কৃতিক লড়াইতে সামিল হয়েছে এবং লিউ-চৌ কোম্পানীর পুরোনো আস্তানা চুরমার করে দিয়েছে। এই হল লাল লাইনের কীর্তি। কালো লাইন হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যে পার্টি-বিরোধী, সমাজতন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া লাইন—সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে এই প্রতিবিপ্লবী লাইনের প্রধান নেতা হচ্ছে চৌ আর তার পেছনে চীনের ক্রুশ্চভ—লিউ শাও-চি। কালো লাইনের কালো লোকগুলোর কিছু নাম জেনে রাখা ভালো—হু ফেং, ফেং সুয়েহ্-ফেং, তিং লিং, আই চিং, চিন চাও-ইয়াং, লিন মো-হান, তিয়েন হান, সিয়া ইয়েন, ইয়াং হান-শেং, চি ইয়েন-মিং, চেন হুয়াং-মেই এবং শাও চুয়ান-লিন। চৌ ইয়াংএর দলের মধ্যে ছিল এক পাল দেশদ্রোহী প্রতিবিপ্লবী দক্ষিণপন্থী যারা কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে ছিল। তারা নানা কায়দায় তরুণদের মনকে বিষিয়ে দেবার ফিকিরে ছিল যাতে এই তরুণরা তাদের উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং তাদের ''পুণ্য" কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই কালো লাইন তার ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিল দেশময় অনেক সাংস্কৃতিক চক্র ও সমিতির গলায়। এই কালো লাইনের লম্বা দাঁড়া পৌঁছেছিল দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এবং শয়তান চৌ সভ্য হওয়ার আইনগুলোকে কব্জা করে রেখে এবং পাল্টা সমিতি আর ইউনিয়ন গড়ে তুলে একদল বুর্জোয়া লেখককে দুধকলা দিয়ে পুষত আর সেখান থেকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের তাড়িয়ে সেগুলোকে ছোটো বড়ো "পেটোফি ক্লাব" করে তুলত। এ লাইনের উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদকে চীনে আবার গদিতে বসানো। অথচ এ লাইনের নেতা চৌ ইয়াং সব সময় গর্ব করে বলত যে সে ''মুক্ত এলাকা" থেকে এসেছে—সে ইয়েনানের লোক। আসলে কিন্তু ইয়েনানে থাকতেও সে ট্রটস্কিপন্থী পার্টি-বিরোধী লোকেদের স্বজাতি ছিল। যেমন, ওয়াং শিহ্ ওয়েই, তিং লিং, সিয়াও চুন এবং আই চিং। চৌ ইয়াং হচ্ছে একজন বুর্জোয়া যে বিপ্লবীদের দলে এক ফাঁকে ঢুকে পড়েছিল। তিরিশের দশকে সে ওয়াং মিংএর লাইনকে সমর্থন করত এবং শিল্প-সাহিত্যে লু সুন-এর সর্বহারার লাইনের বিরোধিতা করত। লু-সুনকে এই বেহায়া বলেছিল সংকীর্ণ দলবাজ লোক। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড়ের চড় খেয়ে এই শয়তান আর তার দলবল ধুলোয় বিশ্রাম করছে।

ছয়

১৯৫৯ থেকে এই তিনটে বছর চীনের মানুষের জীবনে নিয়ে এল চরম দুর্যোগ। এ দুর্যোগ প্রাকৃতিক ও মানবিক দুই-ই। প্রথম দিকে এল বন্যা বিরাট গ্রাম এলাকা জুড়ে। শেষের দিকে এল অনাবৃষ্টির অভিশাপ, এল সর্বনেশে দিক-দিগন্তজোড়া অজন্মা। প্রকৃতির হামলার সঙ্গে যোগ দিল মানুষের শয়তানি। সোভিয়েৎ সংশোধনবাদীরা এক-তরফা ভাবে শত শত চুক্তি বাতিল করে দিয়ে চীনকে দারুণ বিপদে ফেলল। যে যন্ত্রপাতির দাম চীন দিয়ে দিয়েছে তাও তারা জাহাজে তুলল না আর তাদের কারিগরি এক্‌সপার্ট বা গুণী কারিগরদের হঠাৎ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ক্রুশ্চভ এই চাপটা চীনের ওপর দিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মাও ৎসে-তুং দেশের ভেতর সমাজতন্ত্রের কার্যসূচীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন—এটা বন্ধ করতে হবে। মাও বিশ্বের সামনে সংশোধনবাদের আসল চেহারা তুলে ধরছেন—সেটাও বন্ধ করতে হবে।

এদিকে শয়তান লিউ শাও-চি বলতে লাগল যে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের ভেতর তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সে গলা কাঁপিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, শ্রমিক, কৃষক এবং পার্টির কর্মীদের কারুর মনেই নাকি কোনও শান্তি নেই। জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় কমিটির একটা সভায় লিউ প্ল্যান মতো ১৯৫৯— দুর্যোগের জন্যে দায়ী করল মাও ৎসে-তুংএর "তিনটি লাল পতাকা"র আন্দোলনকে। লিউ অংব কষে দেখাতে চাইল যে দুর্যোগের শুধু এক শ' ভাগের ত্রিশ ভাগের জন্যে প্রকৃতি দায়ী, বাকী সত্তর ভাগের জন্যে দায়ী মানুষেরই ভুল ত্রুটি। এই সুযোগে পেং তে-হুয়েই ইতিপূর্বে যে অভিযোগগুলো এনেছিল তার অনেকগুলোকেই সরাসরি সমর্থন করে লিউ বলল এগুলোর মূলে "সত্য" ছিল। সেই সভায় মাও ৎসে-তুংএর দীর্ঘ দিনের বহু সংগ্রামের সাথী লিন পিয়াও উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আশ্চর্য সুন্দর ভাবে অদ্ভুত ধারালো ভাষায় "তিনটি লাল পতাকা"র আন্দোলনকে সঠিক বলে প্রমাণ করলেন। বললেন ঐ "তিনটি পতাকা" দেখিয়ে দিচ্ছে যে চীনের সমাজব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক এবং পার্টি ও জনগণের চীন বিপ্লবই ঐ "তিনটি লাল পতাকা"র জন্ম দিয়েছে। লিন পিয়াও

আরও বললেন যে অতীতে দেখা গেছে যখনই মাও ৎসে-তুংএর চিন্তাধারার প্রচারে কোনও বাধা পড়েনি তখনই কাজ ভালো হয়েছে, এবং যখনই কাজে দোষ ত্রুটি ধরা পড়েছে তখনই দেখা গেছে যে মাও ৎসে-তুংএর্র সর্বহারার লাইনকে গোঁজামিল দিয়ে চালানোর চেষ্টা হয়েছে অথবা তার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হয়েছে। মাও ৎসে-তুং নিজেও সেই সভায় বক্তৃতা করলেন। তিনি তখনকার শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে বললেন যে কিছু লোক কমিউনিজমের মুখোশ পরে থাকে কিন্তু আসলে তারা বুর্জোয়া শ্রেণীরই প্রতিনিধি। লিউ বেচারীর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল। ছাঁটাই মন্ত্রী পেং তে-হুয়েইকে গদীতে ফিরিয়ে আনার প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। লিউ এবার জিততে পারলে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ-আয়োজন খানিকটা এগোতো। বেচারাদের 'কপাল মন্দ'!

এর পর লিউ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে প্রচার করতে লাগল যে "বড়ো বেশী রাজনৈতিক আন্দোলন" হচ্ছে এবং কড়া সতর্কবাণী ছাড়তে লাগল "ছুটে এগিয়ে যাওয়া"র হঠকারিতার বিরুদ্ধে। "কমিউন"-গুলোকেও সে আক্রমণ করল। অথচ সেগুলো ছিল সমাজতন্ত্রের শক্ত খুঁটি।

যেখানে আগেই ভূমি সংস্কার হয়ে গেছে এ রকম পুরোনো মুক্ত এলাকা ছাড়া ১৯৪৯-এ চীনের কৃষি এবং হাতের কাজের কারিগরি ছিল ছড়ানো এবং ব্যক্তিগত, কিছুটা প্রাচীনকালে যেমন ছিল তেমনি। '৪৯-এর পর উন্নতি এল ধাপে ধাপে ঃ এক, পরস্পর সাহায্য সংস্থা—প্রত্যেক সদস্যের জমিতে পালা করে এই সংস্থা কাজ করত। দুই, সমবায়—প্রথমে নীচু স্তরের, আর পরে উঁচু স্তরের। তিন, কমিউন। চীনের জনগণের কমিউন হল অনেকগুলো কৃষি কো-অপারেটিভ বা সমবায়কে একত্র করে তৈরি একটি বিরাট সমবায়। একত্র হবার পর এই নতুন সংগঠনটির দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। এই কমিউনগুলো যে শুধু চাষবাসের কাজ পরিচালনা করে তা নয়, নিজ নিজ এলাকার কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষা এবং সামরিক কাজকর্মও চালায়। স্থানীয় স্কুল এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কিছু স্থানীয় শাখাও তারা চালায়। লিউ শাও-চি বলল সময় না হতেই "কমিউন" চালু করা হয়েছে এবং সেগুলো যে উন্নততর ব্যবস্থা তা হাতে কলমে প্রমাণ হয়নি। তার এই শয়তানি বক্তব্য সে বেশি বেশি করে প্রচার করতে লাগল আর একটা "প্রতিবাদ" আন্দোলনের ঢেউ তুলবার চেষ্টা করল। উদ্দেশ্য 'মহৎ'

সমাজতান্ত্রিক কাজে বাধা দেওয়া! কারণ গ্রামাঞ্চলে কমিউন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন সম্পর্ক বদলে গেল। ছিল আধা-সমাজতান্ত্রিক বা নীচু স্তরের সমবায়, এবারে এল পুরোদস্তুর সমাজতান্ত্রিক বা যৌথ সংস্থা। এ তো লিউর পক্ষে অসহ্য! মাও ৎসে-তুং বললেন কমিউনগুলো শুধু এখনকার সমস্যাই মেটাবে না, সেগুলো চীনের কৃষকদের সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর সমগ্র জনগণের মালিকানা গড়ে ওঠার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। এই ভাবে মাও লিউর দক্ষিণপন্থী প্রচার ও হতাশা সৃষ্টির বিরোধিতা করলেন এবং জনগণের মনে প্রবল আশার সঞ্চার হল। সে আশা মিথ্যে হল না। তিন বছরের দুর্যোগের সময় চীনকে যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তখন এই কমিউনই তাকে রক্ষা করেছিল। কমিউনের আত্মনির্ভরতার নীতির দরুন পর পর গত সাত-আট বছর ধরে চীনে প্রচুর ফসল হয়েছে এবং চীনের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে কৃষিব্যবস্থা যে উন্নতির স্তরে উঠতে পারেনি আজ সেই চরম উন্নতির চূড়ায় তা পৌঁছেছে। মাও যখন কমিউনগুলোব দারুণ প্রশংসা করছেন লিউ তখন কথাচ্ছলে বলে ফেলল যে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার ব্যাপারে কৃষকদের একটার বেশী রাস্তা থাকতে পারে, যেমন, তারা ব্যক্তিগত চাষাবাদে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সচেতন চাষীরা এ ধোঁকাবাজি ধরে ফেলেছিল। ব্যক্তিগত চাষাবাদ ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবে। তাই মাও বললেন শ্রমিকশ্রেণী যদি গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের ওপর কড়া নজর না রাখে তবে যৌথ অর্থনীতি পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে পারবে না। সম্প্রতি রাশিয়ায় কি হয়েছে? সমাজতান্ত্রিক দেশ পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জায়গা দখল করে নিয়েছে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব। আর কমিউনিস্ট পার্টি অধঃপতনের অতলে নেবে হয়েছে এক ফ্যাসিস্ট পার্টি। শুধু চীনের ব্যাপারেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও লিউ সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদের দালালি করছিল। সে বলেছিল, "এমন কি আমেরিকার সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক ভালো করার আশা আমরা রাখি"। বেইমান বলল, খ্রুশ্চভ "সোভিয়েতে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনতে পারেনি" এবং সে নাকি একজন "সাচ্চা" সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। তাই লিউ-র পরামর্শ হচ্ছে, "আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে ঐক্য গড়া—এক সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের

বিরোধিতা করা" ("বিদেশী কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা", জুন ২৭) লিউ শাও-চি বার্মার কমিউনিস্ট পার্টিকে বলল: আপনারা অস্ত্র বাদ দিতে পারেন অথবা সেগুলোকে মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে পারেন কিংবা আপনাদের বাহিনী নতুন ভাবে সংগঠিত করে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পরিণত করতে পারেন ("একজন বিদেশীর সঙ্গে আলোচনা", এপ্রিল ২৬)। সে এই চমৎকার উপদেশ দিল যে "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করবার জন্যে" বার্মার কমিউনিস্ট পার্টি যেন জল্লাদ নে উইনের সঙ্গে "সহযোগিতা" করে ("বিদেশী কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা", জুলাই ২০)। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টদেরও এই শয়তান সংসদীয় পথ ধরতে পরামর্শ দিয়েছিল। দেশে বিদেশে এই ভাবে লিউ বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল।

সাত

তিন বছরের দুর্যোগের ধাক্কা অনেকখানি সামলে নিল চীন। কিন্তু চীনে তখনও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। তাই শ্রেণী সংগ্রামও চলছে। এই সংগ্রাম প্রধানত চলল রাজনীতি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে। শ্রমিক শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণী দুইই চাইল তার নিজের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে। ১৯৫৯এ লিউ জনগণতান্ত্রিক চীনের চেয়ারম্যান হওয়া অবধি তার উঁচু পদের সুযোগ নিয়ে কায়দা করে জাতীয় জীবনের সব বিভাগে তার নিজস্ব "সেনাপতি" বসিয়ে দিয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে—রাষ্ট্র-ক্ষমতা কব্জা করার এই হল সূচনা।

দ্বন্দ্ব যে এরকম রূপ নেবে মাও ৎসে-তুংএর দূরদৃষ্টি তা আগেই আবিষ্কার করেছিল। ১৯৫৭র ১২ই মার্চ প্রচারকার্য সম্বন্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাও বলেছিলেন যে নতুন ব্যবস্থা চট করে পাকাপোক্ত হবে না। ধাপে ধাপে সেটাকে শক্ত করে তুলতে হবে। নতুন ব্যবস্থাকে চিরদিনের মতো সুদৃঢ় করতে হলে শুধু দেশে সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুললে এবং ধৈর্য ও পরিশ্রমের সাহায্যে অর্থনৈতিক ফ্রন্টে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়ে চললে চলবে না, রাজনৈতিক

ও মতাদর্শের ফ্রন্টেও অবিরাম এবং কঠোর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা চালিয়ে যেতে হবে।

চীনে দুই লাইনের দ্বন্দ্ব, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, বিশেষ করে স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েৎ ইউনিয়নে আধুনিক সংশোধনবাদের প্রাধান্য—এই সব কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মাও ৎসে-তুং এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সমাজতন্ত্রের প্রাণ শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কি বিভিন্ন শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম থাকে? বিশেষ করে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মূলত সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও কি থাকে? তখনও কি সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই চলে? শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের আওতায়ও কি বিপ্লব করতে হয়? কার বিরুদ্ধেই বা বিপ্লব করতে হবে? এবং কি করেই বা আমরা এ বিপ্লব হাসিল করব?

মার্কস ও এঙ্গেলস ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের যুগে এই গুরুতর মতাদর্শগত সমস্যাগুলোর সমাধান করে যেতে পারেননি। লেনিন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পরও পরাজিত বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী থাকে এবং সব সময় তাদের হারানো সিংহাসন ফিরে পেতে চেষ্টা করে। আমরা জানি যে লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়া শ্রেণী উৎখাত হলে পর তার প্রতিরোধ দশগুণ বেড়ে যায়। তিনি বললেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তি কেবল আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তি এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের শক্তি ও স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে না—অভ্যাসের শক্তি ও ক্ষুদে উৎপাদনের শক্তির ওপরও নির্ভর করে। ক্ষুদে উৎপাদন নিজের থেকেই অবিরাম, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় ব্যাপক হারে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে। লেনিন একথাও বলেছিলেন যে সোভিয়েতের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে থেকেও নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হচ্ছে। তাই তিনি বললেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত করার পরও শ্রমিক শ্রেণীকে দীর্ঘদিন একনায়কত্ব চালিয়ে যেতে হবে। উদ্দেশ্য হল এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যে অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব অথবা নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম অসম্ভব হয়ে ওঠে। লেনিন বললেন যে কাজটা মোটেই

সহজ নয়, অত্যন্ত জটিল। তিনি আরও বলেছিলেন, পুঁজিপতিদের সব রকম বাধার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে; শুধু তাদের সৈন্যবাহিনী আর রাজনীতির মারপ্যাঁচের বিরুদ্ধে নয়, তাদের ধ্যানধারণার পাল্টা আক্রমণের বিরুদ্ধেও—যে আক্রমণের শেকড় অনেক গভীরে থাকে এবং যা সবচেয়ে জোরদার। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে বিপ্লবের পর কিছুদিন নতুন ফসলের শীষগুলোর ওপর পুরোনো নৈতিক আদর্শ দারুণ ভাবে চাপ দিতে থাকবেই। সবে যখন নতুনের জন্ম হয়েছে তখন কিছুদিন ধরে পুরোনো নতুনের চেয়ে বেশী শক্তিশালী থাকবেই। একথা প্রকৃতিজগতে যেমন সত্য মানুষের সমাজ জীবনেও তেমনি সত্য। কিন্তু এই সমস্যাগুলো সমাধান করার আগেই লেনিনের মৃত্যু হয়।

স্তালিন ছিলেন একজন মহান্ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, যিনি পার্টিকে এক দঙ্গল প্রতিবিপ্লবীর হাত থেকে মুক্ত করেন। এই শয়তানগুলো হচ্ছে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাডেক, বুখারিন, রিকভ ইত্যাদি। লেনিন এবং স্তালিন মার্কসবাদের বিকাশ ঘটালেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে সর্বহারার এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মতাদর্শগত এবং প্রয়োগের সমস্যার সমাধান করলেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে স্তালিন ভুল করে ফেললেন। তিনি তত্ত্বের ক্ষেত্রে মেনে নেননি যে সর্বহারার একনায়কত্বের গোটা যুগ ধরে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে। তাঁর কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে বিপ্লবে কে শেষ পর্যন্ত জিতবে তা এখনও মীমাংসা হয়ে যায়নি —অর্থাৎ সব সমস্যার ঠিকমতো সমাধান না হলে বুর্জোয়াশ্রেণী নতুন করে ক্ষমতা দখল করতে পারে। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কিন্তু স্তালিন সোভিয়েৎ সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি তাদের সমালোচনা করেছিলেন যারা শান্তির সময় শ্রেণী সংগ্রামকে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। ১৯১৯-এ লেনিন অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে বলেছিলেন, আমরা কেবলমাত্র তখনই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি এবং জয়লাভ করতে পারি যখন গোটা জনগণ সরকারের কাজে অংশ নেয়। একাদশ কংগ্রেসেও লেনিন এ বিষয়ের ওপর বলেছিলেন এবং একটি স্লোগানে "সাংস্কৃতিক বিপ্লব"-এর ডাক দিয়েছিলেন। ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে স্তালিন এই স্লোগানের ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে আমলা-তন্ত্রের বিষ ঝেড়ে ফেলার শ্রেষ্ঠ ওষুধ হল শ্রমিক-কৃষকের সাংস্কৃতিক মান

বাড়িয়ে তোলা। যদি না ব্যাপক শ্রমিক জনতা একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক মানে পৌঁছয় যার ফলে তাদের নিজেদের দ্বারা নীচে থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা, ইচ্ছা এবং যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, তাহলে সব চেষ্টা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্র টিঁকে থাকবে। স্তালিন বললেন, এটাই হচ্ছে লেনিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্লোগানের অর্থ এবং তাৎপর্য। ১৯২৮-এর মে মাসে স্তালিন আমলাতন্ত্রকে খতম করার জন্যে নীচের থেকে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাপক শ্রমিক জনতার সমালোচনাকে সংগঠিত করতে বলেছিলেন। কিন্তু ১৯২৮-এর পর, যখন কুলাক বা ধনী কৃষকের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, কৃষিতে যৌথ খামার গড়ে তোলার কাজ সম্পূর্ণ হল, প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা শেষ হল, তখন স্তালিন বললেন যে রুশ সমাজে শ্রেণীগুলো খতম করে দেওয়া হয়েছে এবং এখন আর তাদের অস্তিত্ব নেই। সোভিয়েৎ সংবিধানের খসড়া উপস্থিত করতে গিয়ে ১৯৩৬-এ স্তালিন বলেছিলেন, জাতীয় অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে পূর্ণ জয়লাভ হয়েছে তা এখন বাস্তব ঘটনা। সোভিয়েৎ সমাজের এমন ভিৎ গড়ে উঠেছে যে তাকে নড়ানো যাবে না। স্তালিন এ কথাও বললেন, "সমস্ত শোষক শ্রেণীগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা হয়ে গেছে।" ১৯৩৯-এ পার্টির আঠারো নম্বর কংগ্রেসের রিপোর্টেও স্তালিন বলেছিলেন, "শোষক শ্রেণীগুলোকে নির্মূল করা হয়েছে" এবং সোভিয়েৎ সমাজ এখন "শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত"। ঐ রিপোর্টেই এক জায়গায় শ্রেণীশত্রু শয়তানদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা ঘোষণা করে স্তালিন ভাবছেন যে সমাজকে শয়তান-মুক্ত করেছেন। রিপোর্টের যেখানে পার্টির করণীয় কাজের তালিকা তিনি দিচ্ছেন সেখানে পাঁচ দফা কাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা নেই। শুধু পঞ্চম দফায় সোভিয়েৎ গোয়েন্দা বিভাগকে জোরদার করে তুলে দেশের শত্রুদের উৎখাত করার কাজে ঐ বিভাগকে সাহায্য করতে বলা হয়েছে। কারণ পুঁজিবাদী দুনিয়ার বেড়াজালের মধ্যে রয়েছে রাশিয়া আর বিদেশীদের গুপ্তচর বিভাগ ঘাতক, গোপন ধ্বংসকারী ইত্যাদিকে এদেশে পাঠাবে। সত্যি সত্যি শত্রুর চরেরা গোর্কি আর কিরভের মতো স্তালিনের সহকর্মীদের হত্যা করেছিল, বিদেশী শত্রুর আক্রমণের সুবিধে করে দেওয়ার জন্যে দেশের মধ্যে গোপনে শিল্প ধ্বংস করেছিল এবং এমনি আরও অনেক গুরুতর ক্ষতি করেছিল। সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টেও শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তার বিরোধী

বিষয়বস্তু বাজার গরম করেছিল। বাজে ফিল্ম আর নাটকের বিরুদ্ধে স্তালিন আর তাঁর সহকর্মীদের লড়তে হয়েছিল। পত্র-পত্রিকায় বিপদ্‌জনক লাইন প্রচার করা হচ্ছিল। এখানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দু'একটা প্রস্তাবের উল্লেখ করা ভাল। ১৯৪৬-এর ১৪ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে "জ্‌ভেজ্‌দা" এবং "লেনিনগ্রাদ" পত্রিকা দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টিকে তুলে দিল এবং প্রথমটিকে সঠিক পথে চালানোর জন্যে পুরো মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তার এগারো দিন পর ২৬-এ আগস্ট ঐ কেন্দ্রীয় কমিটি আরেকটি প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে দেশে যে নাটক চালু ছিল সেগুলো ভাল নয়। একটি কাজকে প্রধান হিসেবে ধরা হল এবং শিল্প সংক্রান্ত কমিটির ওপর কাজটির ভার দেওয়া হল। কাজটি হচ্ছে, শিল্প সংক্রান্ত কমিটি দেখবে যে প্রত্যেক থিয়েটার অবশ্যই যেন প্রতি বছর কম করে হলেও দুটো কি তিনটে নতুন নাটক দেখায়। সেগুলো আদর্শ ও শিল্পকলা দুদিক থেকেই যেন উঁচু ধরনের হয় এবং আজকের সোভিয়েৎ জীবন যেন সেগুলোর বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ঐ বছর ৪ঠা সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে "ঝলমলে জীবন" নামে একটি ফিল্মের মতাদর্শগত এবং রাজনীতিগত ভুলের তীব্র সমালোচনা করল। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে স্তালিন জীবনের শেষ প্রান্তে সোভিয়েৎ সমাজে শ্রেণীগুলোর এবং শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব কিছুটা বুঝতে পারেন। তাই ১৯৫২-তে "সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা" লেখাটিতে তিনি বলেছেন, হাজার হাজার তরুণের মার্কসবাদের শিক্ষা নেই, তারা অনেক সত্য জানে না যা আমাদের খুবই জানা জিনিস। সেই জন্যে তারা অন্ধকারে হাতড়ে মরতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি বললেন, সাংস্কৃতিক শিক্ষা নতুন করে দিয়ে নতুন মন তৈরী করতে হবে যাতে লোকে কাজকে রুজি রোজগারের জিনিস মনে না করে, মনে করে কাজ জীবনের প্রধান চাহিদা অর্থাৎ মনে করে কাজ না করলে জীবন শূন্যময়, অসহ্য। দেশের মধ্যে তখন সমাজতন্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক চিন্তা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। স্তালিন তাই ঐ লেখায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে পণ্য উৎপাদন, মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদদের বোঝালেন। কিন্তু ঐ লেখাতেই স্তালিন বললেন যে যে-সব বুড়িয়ে যাওয়া শ্রেণী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে তারা সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেই। তার পরের

লাইনেই দেখি স্তালিন বলছেন, কিছু পিছিয়ে পড়া, জবুথবু শক্তি সমাজতন্ত্রের যুগেও থাকবে—যারা উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা-বদল পছন্দ করে না। কিন্তু তিনি বললেন, তাদের খুব একটা লড়াই না করেই হটিয়ে দেওয়া সম্ভব (পৃষ্ঠা : ৫৭)।

১৯২০-তে লেনিন আশা করেছিলেন যে দশ কি বিশ বছরের মধ্যে রাশিয়া সমাজতন্ত্রের ধাপ পেরিয়ে সাম্যবাদে পৌঁছে যাবে। স্তালিনেরও সে আশা ছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দুর্বলতার জন্যে রাশিয়া আজ উল্‌টো পথ নিয়েছে। স্তালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক সংগঠন পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, একটা নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ার কাজ একেবারেই করা হচ্ছে না। বরং উল্‌টো। বিলাস-ব্যসনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। আরও টেলিভিজন, আরও বাড়ি, আরও গাড়ি, আরও আরাম—এই খাই খাই রব উঠেছে। চীনের কমিউনিস্টরা এমন কথা বলে না যে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা চলবে না। বরং সে কাজ করতেই হবে। কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করলে কিছুতেই চলবে না। বর্তমান চীনের শিল্প এবং কৃষিতে অর্থনৈতিক উৎসাহ একেবারেই দেওয়া হয় না একথা ঠিক নয় : তবে সব সময় প্রধান জোরটা দেওয়া হয় রাজনৈতিক এবং আদর্শগত শিক্ষার ওপর। চীনের কমিউনিস্ট-দের নীতি হল রাজনীতির নির্দেশ মেনে চলতে হবে, মুনাফা এবং টাকাকড়ির নির্দেশ নয়। সেই জন্যেই আজ চীনের শ্রমিক বোনাস ফিরিয়ে দিচ্ছে। বলছে, লাল পতাকা আর মাও ৎসে-তুং-এর রচনা দাও। সেটাই হবে বড়ো পুরস্কার। টাকাকড়ি চাই না, ওগুলো রাষ্ট্রকে দিয়ে দাও। অপেরার গায়িকা তার মাসিক মাইনে অনেক কমিয়ে দেওয়ার জন্যে আবেদন করছে। জেলায় জেলায় পার্টির নেতারা আদর্শ সৃষ্টি করছেন। তাঁরা পোশাক-আশাকের চালচুলোকে আমল দিচ্ছেন না। সাদা-সিধে ভাবে জীবন কাটাচ্ছেন। কোনও কোনও বিদেশী বকশিস দিতে গিয়ে বে-আক্কেল হয়েছেন—কারণ চীনের মানুষ বকশিসকে অপমান বলে মনে করে। চীনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ার এমন ধুম পড়েছে যে শিক্ষকের প্রধান সমস্যাই হল কি করে ছাত্রকে অতিরিক্ত পড়ার হাত থেকে বাঁচানো

যায়। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষার মান অসাধারণ বেড়ে গেছে। চীনের মানুষ অর্থনৈতিক উৎসাহ চায় না। কারণ এর ফলে মানুষ স্বার্থপর হয়ে পড়ে—সে শুধু নিজের কথা চিন্তা করে, অন্যের কথা ভাবে না। চীনের মানুষ জানে যে সে শুধু নিজের জন্যে এমন কি কেবল নিজের দেশের জন্যেই কাজ করছে না, কাজ করছে সারা দুনিয়ার উৎপীড়িত এবং শোষিত জনগণের জন্যে। ইতিপূর্বে কোথাও জনগণকে এমনি ভাবে জাগিয়ে তোলা হয়নি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভাগ্য নির্ভর করছিল সাহস করে জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং না তোলার ওপর। মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একমাত্র পদ্ধতিই হল জনগণকে দিয়েই জনগণকে মুক্ত করা। আগস্টে বিখ্যাত ষোল দফা কর্তব্যের তালিকায় কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দিল : জনগণের ওপর বিশ্বাস রাখো, তাদের ওপর নির্ভর করো এবং তাদের উদ্যোগকে শ্রদ্ধা করো। ভয় দূর করো। বিশৃঙ্খলার ভয়ে আঁৎকে উঠো না। তাই আজকের চীনে নতুন মানুষ তৈরী হয়েছে। চীনের সত্তর কোটি মানুষেব সবাই আজ সমালোচক। তারা পুরোনো দুনিয়ার সমালোচনায় মুখর। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের বুর্জোয়া এবং সংশোধনবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের বিরাট বিরাট জয় হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায় যে মার্কস এবং এঙ্গেলস সর্বহারা বিপ্লব এবং সর্বহারার একনায়কত্বের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এলেন। লেনিন এবং স্তালিন সোভিয়েৎ ইউনিয়নে এই তত্ত্বের বাস্তব রূপ দিলেন। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের যুগে সর্বহারা বিপ্লবের নানা সমস্যার সমাধান করলেন। এক দেশে সর্বহারার একনায়কত্ব গড়ে তোলার আদর্শগত এবং প্রয়োগের সমস্যারও তাঁরাই সমাধান করলেন। এই ভাবে তাঁরা মার্কসবাদের বিকাশ ঘটালেন। মাও ৎসে-তুং ঐ তত্ত্বকে চীনে শুধু বাস্তব রূপই দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্তমান যুগে সর্বহারা বিপ্লবের নানা সমস্যার সমাধানও করলেন। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের আওতায় কেমন করে বিপ্লব করতে হবে তার তত্ত্বগত এবং প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যার তিনি সমাধান করলেন কি করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের রঙ পাল্টানো আটকানো যায়, কেমন করে পুঁজিবাদের ফিরে আসা বন্ধ করা যায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে মজবুত করে তোলা যায় এ সব প্রশ্নের তিনিই সমাধান করলেন। এই

ভাবে মাও ৎসে-তুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ ঘটালেন এবং তাকে নতুন স্তরে তুলে দিলেন।

আট

মাও ৎসে-তুং পরিষ্কার বুঝলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আমলে বিপ্লবের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সেই সব প্রতিনিধিরা যারা গোপনে সুড়ঙ্গপথে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শাসনযন্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, যারা হচ্ছে পার্টির কর্তাস্থানীয় গুটিকয়েক পুঁজিবাদী পথের পথিক। মাও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে এক দিকে এই গুটিকয়েক লোক আর আরেক দিকে অগুণতি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বিপ্লবী কর্মী এবং বুদ্ধিজীবী এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বই হচ্ছে প্রধান দ্বন্দ্ব এবং এ দ্বন্দ্ব শত্রুতামূলক। এই দ্বন্দ্বের সমাধান করবার সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই শ্রমিক ও বুর্জোয়া এই দুই শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রাম আর সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ এই দুই পথের সংগ্রাম নিজেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করছে। এ প্রসঙ্গে সেপ্টেম্বরে মাও ৎসে-তুং জনগণের কাছে যে ঐতিহাসিক আহ্বান পৌঁছে দিয়েছিলেন তা স্মরণ করি : "কখনও শ্রেণী সংগ্রাম ভুলো না।"

এ পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম তা থেকে বুঝতে পারছি যে লিউ শাও-চি পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বপ্রধান প্রতিনিধি। সে পার্টির ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পার্টির ক্ষতি করেছে। পার্টির মধ্যে গোপনে কাজ করে গেলেও নানা কাজ ও কথার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বদৃষ্টি প্রকাশ না হয়ে থাকেনি এবং সেই জন্যে তার সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা করার দিন ঘনিয়ে এসেছে। লিউ যতই বুঝতে পারছে যে এই মোকাবেলার দিন এগোচ্ছে সে ততই ক্ষ্যাপার মতো কাজকর্ম করছে। মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দুটি বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন এর সাক্ষী। একটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন আর অপরটি হচ্ছে মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

শ্রেণীসংগ্রাম, উৎপাদন ও বিজ্ঞানকে কাজে খাটানোর সংগ্রাম ইত্যাদি যদি না থাকে, জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী, বদের দল আর কিম্ভূত

জন্তু-জানোয়ারগুলোকে যদি তাদের গোপন গর্ত থেকে গুঁড়ি মেরে চুপি চুপি বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয় আর পার্টির কর্মীরা যদি তাদের সম্বন্ধে সতর্ক না থাকে তাহলে শত্রুপক্ষের নরম আর গরম দুরকম কৌশল দেশের চরম বিপদ ঘটাবে। হয়তো কয়েক বছর বা এক দশক বা বড়ো জোর কয়েক দশক যেতে না যেতেই সারা দেশে প্রতিবিপ্লব জয়লাভ করবে এবং আজকের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি একটা সংশোধনবাদী বা ফ্যাসিস্ত পার্টিতে পরিণত হবে। গোটা দেশের রং যাবে পাল্টে। এই কথাগুলো ৯ই মে'র "সংগঠক কর্মীদের শারীরিক শ্রমে যোগ দেওয়া সম্পর্কে চেকিয়াং প্রদেশের সাতটি সুলিখিত দলিল" সম্বন্ধে মাও ৎসে-তুং-এর মন্তব্য থেকে সংক্ষেপে তুলে দেওয়া হল।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন চলে। এর আরেকটা নাম ছিল "চার দফা ঝাড়পোঁছ"। কারণ আন্দোলনটির উদ্দেশ্য ছিল চারটি ক্ষেত্রে ভুল, অন্যায় কাজ ইত্যাদি শোধরানো—এক, রাজনীতি ; দুই, মতাদর্শ ; তিন, সংগঠন এবং চার, অর্থনৈতিক ব্যাপার। মাও ৎসে-তুং-এর পরিচালনায় এই আন্দোলন নির্দেশ দিল যে জনগণকে নিজেদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে রক্ষা করবার জন্যে লড়াই আর পুঁজিবাদের ফিরে আসার বিরুদ্ধে লড়াইর মধ্যে দিয়ে জনগণ নিজেদের শিক্ষিত করে তুলবে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে বিপ্লবকে চালু রাখা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাপক গণ-প্রচেষ্টা ইতিহাসে এই প্রথম। আন্দোলনটির লক্ষ্য ছিল লিউ শাও-চি যাদের গ্রামে ও শহরে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে এবং সযত্নে আড়াল করে চলেছে তাদের ওপর আঘাত হানা। শয়তান লিউ প্যাঁচ কষে আন্দোলনের মানে বদলে দিল। আন্দোলনের আক্রমণের লক্ষ্যকে দিল ঘুরিয়ে। আক্রমণের লক্ষ্য ছিল গুটিকয়েক কর্তাস্থানীয় পার্টি সভ্য যারা পুঁজিবাদের পথ ধরেছে। লিউ ব্যাখ্যা করে বলল যে আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে অসংখ্য কর্মী, কৃষক ও শ্রমিক যাদের "ঝাড়পোঁছ" দরকার। শ্রমিক শ্রেণীর লাইন ধরে বুর্জোয়া শ্রেণীর লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের লক্ষ্য। লিউ এমনভাবে আন্দোলনের গতিকে বদলাল যে অনেকের মনে হল এটা দুই শ্রেণীর দুই লাইনের দ্বন্দ্ব নয়,

এটা "শুচি ও অশুচি" অর্থাৎ "পরিষ্কার আর অপরিষ্কার" লোকের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এবারে জনগণের মধ্যেকার পরিষ্কার আর অপরিষ্কারেরা মারামারি কাটাকাটি করে মরুক আর পুঁজিবাদীদের দালাল যে সব কর্তাব্যক্তি পার্টির মাথায় বসে আছে তারা আনন্দে গোঁফে তা দিক। চমৎকার শয়তানি খেলা। জানুয়ারীতে লেখা "গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনে কয়েকটি চলতি সমস্যা" দলিলটিতে মাও লিউ শাও-চির বজ্জাতি তুলে ধরে বললেন আন্দোলনের আক্রমণের লক্ষ্য হবে শুধু তারাই যারা সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে বাধা দিচ্ছে। তিনি ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণ ও কর্মীদের শতকরা পঁচানব্বুই জনকে ঐক্যবদ্ধ এবং গুটিকয়েক শ্রেণী শত্রুকে কোণ-ঠাসা করা। মাও-র নির্দেশে আন্দোলন সঠিক পথে চলে লিউর বজ্জাতি লাইনকে হারিয়ে দিল। এটা যেন আগামী দিনের মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ড্রেস রিহার্স্যাল বা সাজগোজ সহ মহড়া।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন ক্রমে খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল যে লিউ ও তার দলবলই হচ্ছে চীনের জনগণের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু। এদের উৎখাত করবার জন্যে, চীনের মহান্ পার্টিকে রক্ষা করবার জন্যে, চীনের পার্টি যাতে উজ্জ্বল প্রদীপের মতো বিপ্লবী জনগণকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই জন্যে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের খুবই জরুরী প্রয়োজন। সে আন্দোলন আরও গভীরে চলে যাবে, জনতার মধ্যে আরও বেশী ছড়িয়ে পড়বে আর শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে একটা চূড়ান্ত লড়াই লড়বে।

এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে লিউ শাউ-চিকে তাড়াতে এত দেরী হল কেন? মূল দ্বন্দ্ব বুঝতে কি দেরী হয়েছিল? না, দ্বন্দ্ব বুঝতে দেরী হয়নি, দেরী হচ্ছিল একটা উপযুক্ত পদ্ধতি বার করতে। ফেব্রুয়ারীতে মাও ৎসে-তুং বলেছিলেন: পার্টি অনবরত খুঁজছিল কাজ করার এমন একটা ধরণ বা পদ্ধতি যা দিয়ে ব্যাপক জনগণকে জাগিয়ে তোলা যাবে, আমাদের অন্ধকার দিকটা খোলাখুলি চোখের সামনে ধরা যাবে—সম্পূর্ণভাবে এবং তলা থেকে। পার্টির নবম জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে একথাগুলো উল্লেখ করার পর লিন পিয়াও বলেছেন: এখন আমরা এই পদ্ধতিটা বার করেছি—এটা হচ্ছে মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। শাসন

কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ বা ওপর থেকে ছুড়ে দেওয়া ফর্মান মূল সমস্যার সমাধান করতে পারত না, কেন না অনেক ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা ঐ শ্রেণীশক্র-দের হাতেই ছিল। জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে এই বিশ্বাসের কথা আবার প্রচার করা, কেবলমাত্র তাদের ওপরই এই রাজনৈতিক আন্দোলনের দায়িত্ব সরাসরি সঁপে দেওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম থাকে এটা বোঝবার দিকে তাদের এগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্যিকারের পথ। এই পথ মাও ৎসে-তুং-ই চিন্তা করে বার করলেন। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি নতুন এবং বিরাট অবদান।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ কি ? পুঁজিবাদের পথের পথিক পার্টির মধ্যেকার গুটিকয়েক কর্তাব্যক্তির মুখোশ খোলা, তাদের সংশোধনবাদী বেসাতি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা এবং সেগুলোর বিস্তারিত সমালোচনা করা, যুক্তি দিয়ে সেগুলোকে একেবারে বাতিল করা, তাদের অপদস্থ করা ও উৎখাত করা এবং সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া—মাও ৎসে-তুং বললেন এইগুলোই হবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে চীনের জনগণের করণীয় কাজ। এই বিপ্লব শুরু হল সমাজের ইমারতের ওপর মহলে অর্থাৎ মতাদর্শের ক্ষেত্রে। এঙ্গেলস বলেছিলেন যে অর্থনৈতিক ভিতের পরিবর্তনের তুলনায় ইমারতের উপর-মহলে অর্থাৎ মনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় অনেক ধীরে। চীনে মতাদর্শের ক্ষেত্রে কয়েক দশক ধরে লিউ আর তার দলবল কাজ করে যাচ্ছে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে জনমত তৈরি করতে। মুক্তি-যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই লিউর দল একাজ করে চলেছে। এদের বিরুদ্ধে লড়াইতে পথ দেখাবার জন্যেই মাও ৎসে-তুং "কোথা থেকে সঠিক চিন্তা আসে ?" এবং অনেক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং স্মারকলিপি লেখেন। এই লেখাগুলোতে তিনি লিউর বুর্জোয়া ও ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন, এক এক করে শিক্ষা সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, গ্রন্থপ্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ এবং সমাজের ইমারতের উপরমহলের অন্যান্য দিকগুলোর সমালোচনা করেন কারণ তারা সর্বহারার লাইনকে অবহেলা করেছে। মাও ৎসে-তুং সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে কাজের ব্যাপারে দু'বার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন। এই নির্দেশগুলোর মোদ্দা কথাই ছিল শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে লিউ শাও-চির

প্রতিবিপ্লবী লাইনের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানা। শ্রীমতী চিয়াং চিং অসাধারণ সাহসের সঙ্গে মাও ৎসে-তুং-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিপ্লবীদের এ লড়াই-এ নেতৃত্ব দেন। তখন পর্যন্ত রাজা রাজড়া, বড়ো ঘরের মহিলারা আর তাদের ছেলে মেয়েরাই স্টেজ দখল করে ছিল। তিনি গোঁড়া অচলপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি পিকিং অপেরা, ব্যালে এবং সিম্ফনিক মিউজিককে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করলেন। এই প্রথম যারা সত্যিকার ইতিহাস সৃষ্টি করে সেই শ্রমিক, কৃষক আর সৈনিকরা স্টেজ দখল করতে শুরু করল। ইতিহাসকে উল্টো পথে চালানোর চেষ্টা উল্টে দেওয়া হল। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিকিং অপেরাতে পচা-গলা সংস্কৃতিকে হটিয়ে দিয়ে "ডাকাতদের শক্ত ঘাঁটি দখল", "লাল লণ্ঠন" আর "শাচিয়াপাং"এর মতো আদর্শ বিপ্লবী অপেরা স্টেজ দখল করেছে। নভেম্বরে ইয়াও ওয়েন-ইউয়ানের লেখা একটি প্রবন্ধ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। প্রবন্ধটি হচ্ছেঃ নতুন ঐতিহাসিক নাটক 'চাকরী থেকে বরখাস্ত হাই জুই' প্রসঙ্গে। প্রবন্ধটি শাংহাইতে প্রকাশিত হয় এবং চিয়াং চিং-এর নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবীরা এই নাটকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করে। চার শ' বছর আগে মিং রাজবংশের সময় হাই জুই ছিল এক সামন্ত আমলা এবং সে বরখাস্ত হয়েছিল। এই গীতি-নাট্যের হাই জুই হচ্ছে আসলে পেং তে-হুয়েই এবং এ নাটক বলতে চায় যে তাকে 'অন্যায় ভাবে' চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে! ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান তাঁর প্রবন্ধে গীতি-নাট্যটির ঝলমলে বাইরের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে সবাইকে দেখিয়ে দেন যে সেটি একটি রাজনৈতিক প্রচারের দলিল এবং তার উদ্দেশ্য প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে সমর্থন করা। তখন পেং চেন-এর নেতৃত্বে পিকিং মিউনিসিপ্যালিটির পার্টি কমিটি চলত। সেই কমিটির অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে এই প্রবন্ধে ইয়াও সন্ধানী আলো ফেলে সব কিছু ফাঁস করে দিলেন। দেখা গেল "হাই জুই" গীতি-নাট্যের পেছনে অন্ধকারে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিউনিসিপ্যাল কমিটির নেতা পেং চেন আর পেং চেনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লিউ শাও চি।

ফেব্রুয়ারীতে লিন পিয়াও চিয়াং-চিংকে ভার দিলেন সেনাবাহিনীতে শিল্প ও সাহিত্যের ওপর এক আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করতে। চিয়াং চিং-এর সভাপতিত্বে এই আলোচনার একটা সার-সংকলন করা হল। মাও ৎসে-তুং নিজে সেই সার-সংকলন তিনবার দেখে

দিলেন। লিন পিয়াও বলেছেন যে এই সার-সংকলন একটি অত্যন্ত ভালো দলিল। মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারার আলোয় এই দলিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করেছে। লিন পিয়াও বলছেন যে এটার শুধু অসাধারণ ব্যাবহারিক গুরুত্বই নেই এমন কি বহুদূর প্রসারিত এবং গভীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

লিউ করিৎকর্মা লোক। সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বিপথে চালাতে বা ধ্বংস করতে সে চেষ্টা করবেই করবে। যে গ্রুপের ওপর সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়ে নেবার দায়িত্ব পড়েছিল শয়তান লিউ শাও-চির পরামর্শে পেং চেন সেই গ্রুপেরই চেয়ারম্যান হয়ে বসল। ফেব্রুয়ারীতে এই ঘুঘুটি একটি রিপোর্ট পেশ করে ধরা পড়ে গেল! কারণ তার রিপোর্ট ছিল মাও ৎসে-তুং ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনের সম্পূর্ণ বিরোধী। পেং চেন এই রিপোর্টে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামকে একটা পড়ুয়া লোকদের আলোচনার রূপ দিতে চায়—যে আলোচনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী বা শ্রেণীসংগ্রামের নাম গন্ধও থাকবে না। এই রিপোর্টকে লিউ সমর্থন করল। কিন্তু পেং চেনের গোপন অভিযান আচমকা ধাক্কা খেল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৬ই মে এক সার্কুলার বার করে পিকিং মিউনিসিপ্যাল কমিটি, পেং চেন এবং তার রিপোর্ট এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ভেতর তার গ্রুপের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটাল। এই সার্কুলার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্ব, কর্মধারা, মূল আদর্শ ও কর্মনীতি তুলে ধরল আর কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে একটা "সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপ" গঠন করল। তার অধিনায়ক হলেন চেন পো-তা এবং চিয়াং-চিং ও চাং চুন-চিয়াও হলেন সহ-অধিনায়ক। সার্কুলারটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করল যে ক্রুশ্চভের মতো লোক তখনও পার্টির বিভিন্ন স্তরে আরাম করে বসে আছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের পদ খালি হলে সে পদ দখল করবার জন্যে ট্রেনিং নিচ্ছে। সব স্তরে পার্টি কমিটিগুলোকে এ সম্পর্কে সর্তক হতে নির্দেশ দেওয়া হল। সার্কুলারটা মাও ৎসে-তুংএর সর্বহারা লাইনকেই তুলে ধরল। কোটি কোটি মানুষের মনে সাড়া জাগল এবং বুর্জোয়া নেতৃত্ব, ধ্যানধারণা, অভ্যাস, রীতিনীতি ইত্যাদি সব কিছুকেই ধ্বংস করবার কাজে মেতে উঠল বিশাল দেশের বিপুল জনগণ।

প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে যিনি তখন

কর্তা তিনি লিউ শাও-চি আর পেং চেনের পা-চাটা চাকর। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে বিদ্রোহীরা প্রথম 'দাজিবাও' বা বড়ো হরফের পোস্টার লেখে এই পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়েই। জেনে রাখা ভালো পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের নিয়েহ্ ইউয়ান-ৎজু ও অন্যান্য সদস্যরা ২৫এ মে চীনের প্রথম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বড়ো হরফের পোস্টার লিখেছিলেন। এই পোস্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার পুঁজিবাদের পথের পথিকদের দিকে নজর দিতে বলা হয় কারণ তারাই হল সর্বহারা আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। মাও ৎসে-তুং-এর নির্দেশে এই পোস্টার সম্বন্ধে দারুণ প্রচার চলে এবং তার ফলে এই স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদনকেন্দ্র ও আপিসে আপিসে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। তরুণরা অসাধারণ সাড়া দেয় এবং রেড গার্ড বাহিনী গড়ে তোলে এবং লড়াইয়ের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ায়। মাও কিছু দিন পিকিং-এর বাইরে ছিলেন। সেই সুযোগ নিয়ে লিউ পাল্টা আক্রমণ চালাতে লাগল। সেটা নিছক গুণ্ডামি বা যাকে বলে 'হোয়াইট টেরর'' অর্থাৎ শ্বেত সন্ত্রাস। এখন লিউর চেষ্টাই হল সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং তারই মারফৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে লোকের চোখে খাটো করা এবং ক্রমে সর্বহারার সদর দপ্তরকে ধ্বংস করা। কিন্তু ক্ষ্যাপার মতো পাল্টা আক্রমণ করে লিউর দল কতদিন টিঁকতে পারবে? মাও কিছু দিন পরেই পিকিংএ ফিরে এলেন এবং ১৯৬৬-র আগস্টে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটি একাদশ পূর্ণ অধিবেশন ডাকলেন। এই অধিবেশনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার জন্যে বিখ্যাত ষোলো দফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তাছাড়া পার্টির ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ থেকে লিউ শাও-চিকে তাড়িয়ে তার জায়গায় লিন পিয়াওকে বসানো হল। এখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিচালনা পুরোপুরি এসে পড়ল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের আওতায়। এই অবস্থায় মাও প্রথম তাঁর নিজের 'দাজিবাও' বা বড়ো হরফের পোস্টার ছাড়লেন—"কামান দেগে সদর দপ্তর উড়িয়ে দাও!" মানে, লিউ শাও-চির বুর্জোয়া সদর দপ্তর উড়িয়ে দাও। এই পোস্টার জনগণকে ডেকে বলল লিউ শাও-চির গোপন সংগঠনের ওপর আঘাত হানতে। অর্থাৎ মাও চান যে সঠিক রাজনীতি মনের মধ্যে নিয়ে জনতা সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ওপর আঘাত হানুক আর সমাজকে বদলাক। গোটা দেশ উৎসাহে ফেটে পড়ল। সে এক আশ্চর্য উত্তেজনা। তরুণদের

বিশাল বিশাল অসংখ্য দল দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য, বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার লেনদেন। তাদের আরেক লক্ষ্য যেমন করে হোক পিকিংএ পৌঁছনো—তা সে পায়ে হেঁটেই হোক আর যে কোনও রকমের যানবাহনের সাহায্যেই হোক। মাও ৎসে-তুং পিকিং-এর বিখ্যাত তিয়েন আন-মেন স্কোয়ারে আট বারে মোট এক কোটি তিরিশ লক্ষ রেড গার্ডের সঙ্গে দেখা করলেন। এতে তাদের মনে বিপ্লবী উৎসাহ অনেকগুণ বেড়ে যায়। চৌ এন-লাই বলেছেন পিকিং-এর মাধ্যমিক স্কুলগুলোতেই দুনিয়া-কাঁপানো রেড গার্ড আন্দোলনের জন্ম হয়। এই তরুণ বিপ্লবীরা তাদের স্কুল থেকে সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা মহা উৎসাহে "চার পুরোনো"-কে ধ্বংস করতে থাকে—পুরোনো ধারণা, পুরোনো সংস্কৃতি, পুরোনো প্রথা এবং পুরোনো অভ্যাস। কারণ এগুলো শোষক শ্রেণীগুলোর সৃষ্টি। তারা প্রচার করতে থাকে "চার নতুন"কে—নতুন ধারণা, নতুন সংস্কৃতি, নতুন প্রথা এবং নতুন অভ্যাস। এগুলো সর্বহারার দান। শুধু এই তরুণদের উৎসাহই নয়, দেশময় অসংখ্য শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বিপ্লবী কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংগ্রামী উত্তেজনা প্রবল ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জোয়ার সর্বত্র ঢেউ তুলল, আকাশ-কাঁপানো আওয়াজ উঠল দিক্ থেকে দিগন্তে: "প্রতিক্রিয়াশীলদের রিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই সঠিক!" শেষের দিকে দেখা গেল লিউ শাও-চির বুর্জোয়া সদর দপ্তর ধূলিসাৎ হতে সামান্যই বাকী আছে।

লিন পিয়াও তাঁর নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে বলেছেন। "কোনও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী কখনও আপনা থেকেই ইতিহাসের মঞ্চ থেকে নেবে আসবে না।" তাই লড়াই আরও চলল। লিউর পতনের পর তার সংশোধনবাদী চক্র এবং নানা জায়গায় ছড়ানো তার এজেন্টরা তাদের কৌশল বার বার বদলালো। কখনও তারা এমন স্লোগান তুলল যার বাইরের চেহারা "বাম" কিন্তু যা অন্তরে অন্তরে "দক্ষিণ"—যেমন, "সবাইকে সন্দেহ করো!" "সবাইকে উৎখাত করো!" এই "সবাইকে" আঘাত হানার মানে হচ্ছে অনেকের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে নিজেদের "গুটিকয়েক" শয়তানকে বাঁচানো। তা ছাড়া তারা বিপ্লবী জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করল এবং কিছু লোককে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের গা বাঁচাবার পথ করে নিল।

সর্বহারা বিপ্লবীরা যখন এদের এই ছলা-কলা চুরমার করে দিল তখন লিউর দল মরীয়া হয়ে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু করল শীত কালে। সে আক্রমণ চলল বসন্ত পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য হল অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির ষোল দফা সিদ্ধান্তকে বাতিল করা, লিউ শাউ-চি, তার সদর দপ্তর আর তার লাইনের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা বাতিল করা এবং বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে দমন করা। কিন্তু এই পাল্টা স্রোতকে মাও ৎসে-তুং কঠোর সমালোচনা করলেন আর বিপ্লবী জনস্রোত এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। প্রতিবিপ্লবের পাল্টা স্রোত তাই জনগণের বিপ্লবী জোয়ারের এগিয়ে যাওয়াকে ঠেকাতে পারল না। স্রোত ও পাল্টা স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্যাপক জনগণ একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বুঝতে পারল। সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার গুরুত্ব। লিউ শাও-চি এবং তার দলবল খারাপ কাজ করতে পেরেছিল কেন? কারণ তারা অনেক ইউনিটে এবং বহু অঞ্চলে সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা জোর করে কেড়ে নিতে পেরেছিল। এটাই ছিল তাদের সফলতার প্রধান কারণ। লিন পিয়াও ব্যাখ্যা করে বলেছেন কোনও কোনও ইউনিটে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ব্যবস্থা ছিল নামে মাত্র, আসলে সেখানকার সমস্ত ক্ষমতা কব্জা করেছিল গুটিকয়েক দলত্যাগী বেইমান, শত্রুর চর অথবা ক্ষমতা দখল করে আছে এমন পুঁজিবাদের পথের পথিকরা। কিংবা সেখানকার ক্ষমতা পুরোনো পুঁজিবাদীদের হাতেই রয়ে গিয়েছিল। পুঁজিবাদের পথের পথিকরা যখন অর্থনীতিবাদের উল্টো হাওয়া বইয়ে দিল তখন ব্যাপক জনগণ আগের চাইতে ভালো ভাবে বুঝতে পারল যে কেবলমাত্র হারানো ক্ষমতা পুনর্দখল করেই তাদের পক্ষে ক্ষমতায় আছে এমন পুঁজিবাদের পথিকদের হারিয়ে দেওয়া সম্ভব।

লড়াই চলতে চলতে এল শাংহাইর ঝড়। অতীতের পাতায় শাংহাইর শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে। তারা নতুন বছরকে সত্যি নতুন রূপ দেবার জন্যে ঝড় তুলল। সর্বহারা সদর দপ্তরের নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণ আর বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাংহাইর শ্রমিকশ্রেণী নীচে থেকে ক্ষমতা দখল করল, আগেকার "মিউনিসিপ্যাল পার্টি কমিটি" এবং "জনগণের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল"-এর পুঁজিবাদী পথের পথিক সব কর্তাব্যক্তিদের হাত থেকে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। মাও ৎসে-তুং শাংহাইর বিপ্লবী

ঝড়কে অভিনন্দন জানালেন। এই বিপ্লবী 'অ্যাকশন'-টাকে প্রচার করবার জন্যে তিনি গোটা দেশকে ডাক দিয়ে বললেন: "সর্বহারা বিপ্লবীরা, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং পুঁজিবাদের পথ ধরেছে এমন গুটিকয়েক পার্টির লোকের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নাও!" এর পরই ২৩এ জানুয়ারী মাও আরেকটা নির্দেশ জারী করলেন: "জনগণের মুক্তি ফৌজ অবশ্যই ব্যাপক বামপন্থী জনতাকে মদৎ দেবে।" কয়েক দিনের মধ্যেই মাও ৎসে-তুং উত্তর-পূবের হেইলুংকিয়াং প্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে ও মিউনিসিপ্যালিটির অভিজ্ঞতার সার সংকলন করলেন এবং তা থেকে প্রতি স্তরে ক্ষমতার নতুন সংস্থা হিসেবে বিপ্লবী কমিটি প্রতিষ্ঠা করার মূল আদর্শ ও কর্মনীতি স্থির করলেন। "একের মধ্যে তিন" হল নতুন সংগঠনের রূপ। 'তিন' মানে বিপ্লবী কর্মীদের প্রতিনিধিরা, গণমুক্তি ফৌজের প্রতিনিধিরা আর বিপ্লবী জনগণের প্রতিনিধিরা।

এমনি করে দেশ জুড়ে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সর্বহারা শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা দখল ও পাল্টা দখলের সংগ্রাম হচ্ছে জীবন-মরণ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিন পিয়াও মাও ৎসে-তুংএর লেখা থেকে এই কথাগুলো তুলে দিয়েছেন: "অতীতে আমরা উত্তর আর দক্ষিণে লড়েছি; ওরকমের যুদ্ধে লড়া সহজ ছিল। কারণ শত্রু ছিল চোখের সামনে। ওরকমের যুদ্ধের চেয়ে বর্তমানের মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব অনেক বেশি কঠিন। সমস্যাটা হচ্ছে এই যে যারা মতাদর্শগত ভুল করে তারা মিশে আছে তাদের সঙ্গে যাদের আর আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা হচ্ছে আমাদের আর আমাদের শত্রুদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং কিছু দিন এদের আলাদা আলাদা করে ভাগ করে ফেলা কঠিন।" এই যে শত্রু থেকে মিত্রকে আলাদা করবার জটিল সমস্যা তার সমাধানের পথ শীগ্‌গিরই পাওয়া গেল। মাও গ্রীষ্মকালে ইয়াংসি নদীর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে ইন্‌স্‌পেক্‌শন্ বা পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বেড়াতে গিয়ে যে নির্দেশ জারি করলেন তাতেই সমাধানের পথের ইঙ্গিত ছিল। তাঁর নির্দেশ থেকে সর্বহারা বিপ্লবীদের এবং বিপ্লবী জনগণের সুবিধে হল জনগণ আর জনগণের শত্রুদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব থেকে জনগণের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে ক্রমে আলাদা করবার। মহান্ বিপ্লবী মৈত্রী এবং বিপ্লবী 'একের মধ্যে তিন' সংগঠন গড়বার এবং পেতিবুর্জোয়া দৃষ্টি-

সুবিধে হল। ফল হল এই যে শত্রুরা হল ছত্রভঙ্গ আর অন্য দিকে ব্যাপক জনগণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠল। মূলত এই বিপ্লবী জোয়ার সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হয়।

কিন্তু দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কখনও শেষ নেই। প্রথমে গ্রীষ্ম কালে এবং আবার বসন্ত কালে "দক্ষিণ" ও "অতি-বাম"-এর দিক থেকে আঘাত এল। গুটিকয়েক দলত্যাগী বেইমান, শত্রুর দালাল, নিজেদের সাবেকী চরিত্র বদলায়নি এমন জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতি-বিপ্লবী, বদমায়েস এবং দক্ষিণপন্থী, বুর্জোয়া সুবিধাবাদী আত্ম-উন্নতি-পন্থী এবং দুমুখো নীতিওয়ালা ধড়িবাজ—যারা এত দিন জনগণের মধ্যে লুকিয়ে ছিল—আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হল মাও ৎসে-তুংএর সর্বহারা সদর দপ্তর, জনগণের মুক্তি ফৌজ এবং সবে জন্মেছে এমন 'একের মধ্যে তিন' বিপ্লবী কমিটিগুলো। সর্বহারা শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল প্রতিবিপ্লবীরা। তাদের উল্টো আদর্শ উপস্থিত করে এই লোকগুলো নিজেদের আসল পরিচয় জনগণের চোখে প্রকাশ করে দিল এবং জনগণ তাদের ইঁদুর খোঁজার মতো করে খুঁজে এক এক করে বার করল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আজকের দিনের স্তর হচ্ছে "সংগ্রাম-সমালোচনা-রূপান্তর"। সংগ্রাম—শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সমালোচনা—বুর্জোয়া বিদ্বান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এবং বুর্জোয়া এবং অন্যান্য শোষক শ্রেণীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে সমালোচনা। রূপান্তর—শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সমাজতান্ত্রিক বুনিয়াদের সঙ্গে খাপ খায় না উপরের কাঠামোর এমন অন্য সব অংশের রূপান্তর বা পরিবর্তন। জয়লাভের পর বিপ্লবী জনগণকে সেই জয়কে সুদৃঢ় করতে হবে। তা করতে গিয়ে তাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যাপারেই মাও ৎসে-তুংএর চিন্তা থেকে নির্দেশ নিতে হবে এবং সে নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। তা করতে হলে লিউ শাও-চির বিষাক্ত প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য সংশোধনবাদী, বুর্জোয়া এবং নতুন করে গজিয়ে ওঠা ভুল ধারণার বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে। মাও ৎসে-তুং-এর নির্দেশ, "শ্রমিক শ্রেণীকে সব কিছুতে অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে।" সমাজের ইমারতের উপরমহলের প্রতিটি

বিভাগে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব করার দরুন এবং মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারা সম্বন্ধে শিক্ষাকে সব জায়গায় প্রাধান্য দেওয়ায়: চীনের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 'সামনের দিকে নতুন লাফ' চলছে।

আমরা এই মাত্র জয়লাভ করার কথা বলেছি কিন্তু এই জয়লাভকে সঠিক দৃষ্টিতে না দেখলে ভুল হবে। তাই মাও ৎসে-তুং-এর সতর্কবাণী দিয়ে শেষ করি:

> আমরা বিরাট জয়লাভ করেছি। কিন্তু পরাজিত শ্রেণী এখনও লড়াই চালিয়ে যাবে। এই লোকগুলো এখনও চার পাশেই আছে এবং এই শ্রেণীর এখনও অস্তিত্ব আছে। সুতরাং আমরা চূড়ান্ত জয়লাভের কথা বলতে পারি না। কয়েক দশকের মধ্যে পারি না। আমাদের কিছুতেই অসতর্ক হওয়া উচিত নয়। লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের চূড়ান্ত জয়লাভের জন্যে শুধু যে দেশের ভেতরকার শ্রমিক শ্রেণী ও ব্যাপক জনগণের চেষ্টাই দরকার তা নয়, বিশ্ব-বিপ্লবের জয় এবং সারা দুনিয়ায় মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসানের ওপরও তা নির্ভর করে—তাহলেই গোটা মানবসমাজ মুক্ত হবে। সুতরাং আমাদের দেশে বিপ্লবের চূড়ান্ত জয়ের কথা হাল্কা ভাব নিয়ে বলা ভুল; তা লেনিনবাদের বিরুদ্ধে যায় এবং বাস্তব ঘটনার সঙ্গে খাপ খায় না।

গ্রন্থপঞ্জী *

An Outline History Of China, Peking, 1958.

Handbook On People's China, Peking, 1957.

A History Of The Modern Chinese Revolution
—Ho Kan-Chih, Peking, 1959.

From Opium War To Liberati on—I. Epstein,
Peking, 1956.

The Unfinished Revolution In China—I. Epstein,
P. P. H., 1947.

Red Star Over China—Edgar Snow, London, 1946.

People On Our Side—Edgar Snow, New York, 1944.

Thirty Years Of The Communist Party Of China
—Hu Chiao-mu, Peking, 1951.

G. Astafyev's Report, U.S.S.R, 1949.

The Unquenchable Spark, Peking,

New China—Nym Wales, Calcutta, 1944.

Stories Out Of China—Rewi Alley, Peking, 1958.

The Rise Of The Chinese People's Communes
—Anna Louise Strong, Peking, 1959.

Imperialism And Chinese Politics—Hu Sheng,
Peking, 1955.

Socialist Upsurge In China's Countryside, Peking, 1957.

Mao Tse-tung On The Chinese Revolution—Chen Po-ta,
Peking,

On The Ten-Year Civil War—Chen Po-ta, Peking,

Long Live The Victory Of People's War ! —Lin Piao,
Peking,

Report To The Ninth National Congress Of The C. P. C.
—Lin Piao, Peking,

On The Counter-Revolutionary Double Dealer Chou
Yang—Yao Wen-Yuan, Peking,

* ॥ যে সব বই, পুস্তিকা, প্রবন্ধ ও দলিল ব্যবহার করেছি তার সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম ॥

Along The Socialist Or The Capitalist Road—Red Flag and People's Daily article,
A Great Historic Document, Editorial Departments of 'Hongqi and Renmin Ribao, May 18,
Betrayal Of Proletarian Dictatorship Is The Heart Of The Book On "Self Cultivation"—Editorial Depts. Of Hongqi And Renmin Ribao, May 8,
Highlights Of The Historical Struggle Between The Two Lines In The C.P.C.—Gerald Tannebaum, Eastern Horizon, Vol VIII ; Nos. 4 and 5.
The Long March Of Man—Dr. Joseph Needham, SACU News, Sep./Oct.
On The Theoretical Basis Of The Cultural Revolution—George Thompson, Broadsheet, October,
Decisions Of The C.C, C.P.S.U. (B), On Literature And Art (1946-48), Moscow, 1951.
Marx On China (1853-1860)—London, 1951.
Selected Works : Vols. XXVII, XXIX, XXX, XXXI, and XXXII—V.I. Lenin.
Works : Vols. VIII, IX, X and XI—J.V. Stalin
On The Draft Constitution Of The U S.S.R.—J.V. Stalin,
Report To The Eighteenth Congress Of the C.P.S.U (B) On The Work Of The C.C.—J.V. Stalin.
Economic Problems Of Socialism In The U.S.S.R.—J.V. Stalin, Moscow, 1952.
Selected Works Of Mao Tse-tung, Vols. I-IV, Peking,

Four Essays On Philosophy—Mao Tse-tung, Peking,
Five Documents On Literature And Art—Mao Tse-tung, Peking,

বর্ণানুক্রমিক সূচী

জ

ট

ড

ত

থ

দ

ন

প